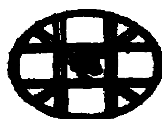
সুভাষচন্দ্র-ভাবমূর্তিতে
ও
ইতিহাসে



ঋদ্ধি ইণ্ডিয়া
২৮ বেনিয়াটোলা লেন কলিকাতা-৯

প্রকাশক : ঋদ্ধি-ইণ্ডিয়া
২৮ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশিত ১৯৫৬

মুদ্রক : সাধনা প্রেস
৪৫।১ এফ, বিডন ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

বৃটিশ নিপীড়নের শিকার হয়েছেন
জাতীয় নেতাদের দ্বারা
প্রতারিত হয়েছেন
যাদের আত্মত্যাগের কথা
ইতিহাসে লেখা নেই
— সেইসব লাখো স্বাধীনতা সংগ্রামী
দেশপ্রেমিককে

বিষয় সূচী

কিছু কথা

এদেশের ঐতিহাসিকরা এখনও সাম্প্রদায়িক আবেগের উর্দ্ধে নিজেদের নিরপেক্ষতাকে স্থান দিতে পারেননি। ফলে আমরা বারবার 'ইতিহাস' হিসেবে যা পড়েছি, তা কোনও না কোনও সম্প্রদায়ের ভাবাবেগ মেশান বিকৃত ইতিহাস। আমরা দেখেছি হিন্দু ঐতিহাসিকরা 'হিন্দু' রাজাদের রাজ্যাংশ ফিরে পাওয়ার যুদ্ধকে স্বদেশ প্রেমের নিদর্শন হিসেবে বারবার তুলে ধরেছেন। এরা আকবরের বিরুদ্ধে রাণা প্রতাপের যুদ্ধকে মুসলমানের বিরুদ্ধে হিন্দুদের যুদ্ধ বলে ইতিহাসে লিখে গেছেন। কিন্তু বাস্তব সত্য তো তা নয়। এই দুই রাজার মধ্যেকার যুদ্ধ কখনই মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের যুদ্ধও হয়ে ওঠেনি। এ যুদ্ধ ছিল স্পষ্টতই দুই রাজার মধ্যেকার স্বার্থের লড়াই। রাণা প্রতাপের বিরুদ্ধে আকবরের পক্ষে হিন্দু রাজপুত সেনা ছিল চল্লিশ হাজার। প্রতাপের বাহিনীতেও ছিল বিশাল সংখ্যক পাঠান সেনা। এই অবস্থায় রাণা প্রতাপের রাজ্য ফিরে পাওয়ার যুদ্ধকে 'স্বদেশ প্রেম' বলে চিহ্নিত করাটা আদৌ নিরপেক্ষতার নিদর্শন কি ? আর নিজ স্বার্থে লড়াই স্বদেশ প্রেমের নিদর্শন হলে, আকবর কেন স্বদেশ প্রেমিক হবেন না ? নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হলে আমাদের বলতেই হবে ঔরঙ্গজেব ও শিবাজীর লড়াইও ছিল এক বাদশাহ এবং এক রাজার স্বার্থের দ্বন্দ্ব মাত্র।

এমন যুক্তিহীন, ভাবাবেগে আপ্লুত ঐতিহাসিকদের কাজের ফলশ্রুতি হিসেবে মানুষ ইতিহাসে সত্যের চেয়ে আবেগকে বেশি গুরুত্ব দিতে শিখেছে। তারই ফলশ্রুতি হিসেবেই ২৩ জানুয়ারী প্রণব মুখার্জী আক্রান্ত হয়েছিলেন। দোষের মধ্যে তিনি সুভাষচন্দ্র বসুর ফ্যানদের আপ্লুত আবেগে আঘাত দিয়ে বলেছিলেন, "সুভাষচন্দ্র বসু স্বাধীনতার জন্য আমরণ সংগ্রাম করেছিলেন"। আমরণ মানে ? সুভাষচন্দ্র কি এই ১০০ বছরের জীবনেই মারা গেছেন নাকি ? আবেগে ভরপুর নেতাজী ফ্যানরা ধুন্দুমার কাণ্ড ঘটিয়ে ছেড়েছেন।

এই আবেগপ্রবণতাই ইতিহাসের সবচেয়ে বড় শত্রু। এই আবেগপ্রবণতাই ইতিহাসকে 'গল্প' করে ছাড়ে। ইতিহাসকে ইতিহাস রাখতে হলে ঐতিহাসিককে আবেগ-বর্জিত হতেই হবে।

গৌর অধিকারী একজন আন্তরিক সুভাষ গবেষক। অন্যান্য সুভাষ গবেষকদের সঙ্গে গৌর অধিকারীর একটি স্পষ্ট পার্থক্য আছে। গৌর 'বাঙ্গালী আবেগ' দ্বারা পরিচালিত নয়। তার গবেষণায় যে সুভাষকে গ্রন্থটিতে আমরা পেয়েছি, সে সুভাষ 'গপ্প'-এর সুভাষ নন, 'মিথ' সুভাষ নন; প্রকৃত সুভাষ, ইতিহাসের সুভাষ।

আবেগের পাল্টা স্রোতে সাঁতার কেটে ইতিহাসকে তুলে আনার জন্য গৌর অধিকারীকে অভিনন্দন জানাই।

কেন এই বই

হৃষিকেশবাবু কলেজে ইতিহাস পড়ান। ক্লাশে পড়িয়েছিলেন—স্বাধীনতা সংগ্রাম আর দেশভাগের ইতিহাস। দু'একদিনের মধ্যে একদল বহিরাগত ছাত্র (!) এসে [redacted] হুমকি ততই বাড়ে। শেষে ক্ষোভে ফেটে পড়েন হৃষিকেশবাবু—কি উইথড্র করব? ইতিহাস উইথড্র করব? ইতিহাস কি উইথড্র করা যায়?

এটি তপোবিজয় ঘোষের লেখা একটি গল্পাংশের ভাবার্থ মাত্র। কিন্তু হৃষিকেশবাবুর সেই উক্তি বর্তমান প্রজন্মের কাছে দাবী জানাচ্ছে—ইতিহাস কখনও উইথড্র করা যায় না। কোন রক্তচক্ষু, কোন প্রলোভন, কোন বহমান স্বার্থের কাছে সে নতিস্বীকার করে না।

রাষ্ট্রনেতারা বলছেন—ইতিহাস নতুন করে লিখতে হবে। ভারত ইতিহাসে জাতীয় নেতাদের ভূমিকাকে মূল্যায়ন করতে হবে বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষণ পদ্ধতিতে, যুক্তিবাদের আলোকে। এই রাষ্ট্রনেতারাই আবার ব্যক্তিপূজার চূড়ান্ত আয়োজন করছেন। জনতার মধ্যে চরম আবেগ সৃষ্টি করে মানুষের ইতিহাস-চেতনার শেকড়শুদ্ধ উপড়ে ফেলতে চাইছেন। আর এর মধ্যেই তো রয়েছে চালু রাষ্ট্র-কাঠামো অটুট রাখার চাবিকাঠি।

রক্তচক্ষু বলছে—ন্যাশনাল লীডারদের ভাবমূর্তি যাতে ক্ষুণ্ণ হয়, খবরদার এমন কিছু কোরো না। কারণ, এটা পুঁজি করেই ওদের বাড়-বাড়ন্ত। রাষ্ট্র-ব্যবস্থা বলছে—ন্যাশনাল লীডারদের মহিমায় সামান্যতম কালি লাগতে পারে, ইতিহাসের এমন পাতাগুলো ছেঁটে বাদ দাও। কিন্তু আজকের প্রজন্ম সত্য ইতিহাস থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারে না। ন্যাশনাল লীডারদের ভাবমূর্তি অনেকের কাছে বড় হতে পারে—মানুষের ইতিহাস তার চেয়ে অনেক বড়।

কাউকে না কাউকে এগিয়ে আসতেই হয়। দেশের সেরা সেরা ঐতিহাসিকেরা যখন তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করেন না, তখন বর্তমান লেখকের মত পান্ডিত্যহীন নবিসদেরই বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে হয়। পন্ডিতেরা যদি এগিয়ে আসেন, কথা দিচ্ছি—আর কলম ধরব না।

এই বইয়ের একটি লাইনও তথ্য-প্রমাণ ছাড়া লিখিত হয় নি। তথাপি, যদি কেউ কোন ত্রুটি বা অসংগতি লক্ষ্য করেন এবং তা ধরিয়ে দেন—অবশ্যই সংশোধন করব।

শ্রদ্ধেয় প্রবীর ঘোষ পুরো পান্ডুলিপিখানি পড়ে মূল্যবান ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। আগাগোড়া সহায়তা করেছেন সাথী ধনঞ্জয় সিকদার। সাথী সুদীপ মৈত্র গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন। অনুজ-প্রতিম কৌশিক মজুমদারের পরিশ্রমও উল্লেখের দাবী রাখে। বন্ধু জ্যোতিপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও গুরুপ্রসাদ মহান্তি কষ্ট করে প্রুফ সংশোধন করে দিয়েছেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এদের অবদানের যোগ্য মর্যাদা হতে পারে না।

প্রথম পর্ব

সুভাষ পূর্ব ইংরেজবিরোধী সংগ্রাম এবং সংগ্রাম-সংগ্রাম খেলা

১৮৫৭ র মহাবিদ্রোহে ভারতীয় এলিটদের ভূমিকা

পলাশী যুদ্ধের ঠিক একশো বছর পরে ১৮৫৭ সালে ইংরেজরা এক মহাবিদ্রোহের সামনে পড়ল। ইংরেজরা একে 'সিপাহী বিদ্রোহ' বললেও আসলে তা এক গণ-অভ্যুত্থানের চেহারা নিয়েছিল। উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাব আর অনৈক্যের দরুন বিদ্রোহীরা শেষ পর্যন্ত হেরে যায়। বিদ্রোহ কোনমতে দমন করতে পারলেও এর পরিণাম ইংরেজ রাজত্বে বেশ সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। ১৮৫৮ সালে ২ আগষ্ট বৃটিশ পার্লামেন্টে 'ভারতে সুশাসন প্রবর্তনের আইন' প্রণয়ন হল। এই আইনের বলে ভারতের রাষ্ট্রক্ষমতা সরাসরি বৃটিশ রাজের হাতে এল। বৃটিশ পার্লামেন্ট আর সরকার ভারতের শাসনকর্তা হল। ১ নভেম্বর বৃটেনের মহারাণী ভিক্টোরিয়া একথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন। বৃটিশ সরকারে একটা ভারত বিষয়ে মন্ত্রক তৈরী করা হল, একজন রাষ্ট্রীয় সচিব হলেন এর প্রধান। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের বাঘা বাঘা অফিসার নিয়ে 'ভারতীয় পরিষদ' নামে এক উপদেষ্টা পর্ষদ গঠন করা হল। আর ভারতে বৃটিশ গভর্নর জেনারেল পদের নতুন নাম দেওয়া হল ভাইসরয়। এই ভাইসরয়'ই হলেন ভারতে বৃটিশরাজের সর্বোচ্চ প্রতিনিধি।

কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যেটা বৃটিশ লক্ষ্য করল তা হল বাংলার জমিদার, মহাজন, বেনিয়া, দালাল, এমনকি ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী যারা সে সময়ে বৃটিশদের সংস্পর্শে ছিল——তাদের প্রায় সকলেই এই বিদ্রোহের দিনগুলোতে বৃটিশকে নিঃসর্ত সমর্থন করেছিল। বিদ্রোহ শুরু হবার সাথে সাথে ১৫ মে বাংলার বেশ কয়েকজন জমিদার কলকাতায় এক সভা করে। শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেবের সভাপতিত্বে ঐ সভা ইংরেজ শাসনের প্রতি আনুগত্য জানাল আর সবরকম সাহায্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিল। ২১ মে জমিদারদের সংগঠন 'বৃটিশ ইন্ডিয়া এ্যাসোসিয়েশন' কঠিন ভাষায় সিপাহীদের নিন্দা করে ইংরেজদের সাহায্য করবার ইচ্ছা প্রকাশ করল। এই লড়াইয়ে ভারতের বহু জমিদার সক্রিয়ভাবে ইংরেজদের সহযোগিতা করেছিল। কাজেই বিদ্রোহ দমনের পর বৃটিশ সরকার এইসব জমিদারদের ঢালাওভাবে নবাব, রাজা ইত্যাদি উপাধি বিতরণ করল। বিদ্রোহে যে সমস্ত সামন্ত অংশ নিয়েছিল তাদের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি সাহায্যকারী জমিদারদের দিয়ে দেওয়া হল। এভাবে বৃটিশ রাজের সাথে জমিদারদের সম্পর্ক আরও পাকাপোক্ত করা হল।

এটাও লক্ষ্য করার মত ব্যাপার যে বহু ভারতীয় রাজা, নবাব, জমিদার বিদ্রোহে অংশ নিলেও বাংলার জমিদারেরা পুরোপুরি ইংরেজদের পক্ষে ছিল। তার কারণ ইংরেজ শাসন বিশেষতঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তাদেরকে প্রচুর রোজগারের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পুরনো বংশানুক্রমিক জমিদারী প্রায় লোপ পেয়ে যায়, তার জায়গা দখল করেছিল 'হঠাৎ নবাব'-এর দল। নির্দিষ্ট পরিমান টাকা দিলে জমিদার হওয়া যেত। ইংরেজদের লেজুড় একদল ব্যবসাদার, দালাল, মহাজন বহু জমিদারী কিনে নিল। তারা যথেচ্ছ অত্যাচার করে চাষীদের কাছ থেকে টাকা তুলে সেই টাকা শহরে ব্যবসায় খাটিয়ে মুনাফা করত। আবার ব্যবসা থেকে মুনাফার টাকায় নতুন জমিদারী কিনত। এইসব জমিদারেরা কলকাতায় বসবাস করত আর প্রায়শই গ্রামের জমিদারী চড়াদামে ইজারা দিয়ে দিত। অনেক সময় এই ইজারাদারেরা নতুন কাউকে ইজারা দিয়ে ফাঁকতালে মোটা টাকা কামিয়ে নিত। যত হাত বদল হত তত কোপ পড়ত চাষীর ঘাড়ে। ঐতিহাসিক যোগেশ চন্দ্র বাগল লিখেছেন——

সেকালের যত বড়লোক উদ্ভূত হয়েছিল তার অধিকাংশই এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফল। ইংরেজের আশ্রয়ে একশ্রেণীর বাঙালী আগেই বর্ধিত হয়ে উঠেছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফল তারাও অনেকটা ভোগ করতে পায়। এই শ্রেণীর বাঙালী বড়লোকদের সঙ্গে কম্পানীর বড় বড় চাকরদের বেশ দহরম মহরম ছিল। ....ইংরেজ অধিকৃত অঞ্চলে, বিশেষতঃ বাঙলা দেশে যে শ্রেণীর বড়লোকদের সৃষ্টি হল তারা ইংরেজকে পরিত্রাতা বলেই গণ্য করতে লাগল *(যোগেশ চন্দ্র বাগল——মুক্তির সন্ধানে ভারত)।* সুতরাং এরা যে বৃটিশ শাসন বজায় রাখতে উঠেপড়ে লাগবে তাতে আর সন্দেহ কী! বৃটিশ শাসকের মতলব ছিল আরও সুদূর-প্রসারী। মহাবিদ্রোহের তিরিশ বছরেরও বেশি আগে লর্ড বেন্টিঙ্ক বলেই রেখেছিলেন——"যদি কোনদিন বিদ্রোহ উপস্থিত হয় তবে এইসব জমিদারেরা নিজেদের স্বার্থ সুরক্ষিত করতেই বৃটিশ শাসনকে বাঁচাতে এগিয়ে আসবে। ব্যাপক জনসাধারণের উপরও তাদের সম্পূর্ণ প্রভাব রয়েছে *(এ বি কীথ——স্পীচেস্ এ্যান্ড ডকুমেন্টস্ অব ইন্ডিয়ান পলিসি, ১৭৫০-১৯২১, VOL.I)।* অপরদিকে ভারতের উত্তর আর উত্তর-পশ্চিম ভাগের রাজ্যগুলো তখন সবে ইংরেজদের অধীন হয়েছিল। সেখানকার তালুকদারেরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূত্রে জমিদার ছিল না। তাদের জমিদারী ছিল বংশানুক্রমিক। ইংরেজ রাজত্বে তাদের ক্ষমতা খর্ব হওয়ায় তারা প্রথম সুযোগেই বিদ্রোহ করেছিল।

আবার ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত সে'সময়কার বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা প্রায় সকলেই ছিলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফসল। জমিদার, মহাজন, মধ্যসত্বভোগী, বেনিয়াদের ছেলেরাই ইংরেজী শিখে নিজেদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখছিল। সুতরাং মহাবিদ্রোহে বাঙালী জমিদার, ব্যবসাদার, দালাল, রাজকর্মচারী, বুদ্ধিজীবীরা যে ইংরেজদের পাশে এসে দাঁড়াল তা কোন আদর্শগত কারণে নয় বরং স্রেফ নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার তাগিদেই। ভারতের তথাকথিত রেনেসাঁ'র জনক স্বয়ং 'রাজা' রামমোহন রায় কম্পানির হোমড়া চোমড়া সাহেবদের চড়া সুদে টাকা ধার দিয়ে মোটা টাকা রোজগার করেছিলেন। তিনি ছিলেন বৃটিশ শাসনের একনিষ্ঠ সমর্থক। বৃটিশ শাসন রামমোহনের কাছে ছিল "ঈশ্বরের আশীর্বাদ"। পরবর্তীকালে এই রেনেসাঁ'র ধ্বজাধারীরা সে পথেই চলবে তাতে আর আশ্চর্য কী! উনিশ শতকে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাভাবনার পরিবর্তনকে তথাকথিত রেনেসাঁ বললাম এই কারণে যে তাকে ইউরোপের রেনেসাঁর সঙ্গে তুলনাই করা যায় না। প্রথমতঃ ভারতীয় মনীষীদের

যা কিছু চিন্তা-চেতনা, সংস্কার প্রচেষ্টা সবই ছিল ধর্মের চোহাদ্দিতে সীমাবদ্ধ, যুক্তি আর বিজ্ঞানের ভিত্তি তার ছিল না। অথচ ইউরোপীয় রেনেসাঁর মর্মবস্তুই হচ্ছে—— যুক্তি আর বিজ্ঞান। দ্বিতীয়তঃ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধাচরণ করা তারা সজ্ঞানেই এড়িয়ে গেছেন বরং আশ্রয় নিয়েছেন ইংরেজ প্রভুদের নিরাপদ, অর্থকরী বক্ষপুটে। ইউরোপীয় রেনেসাঁর চালিকাশক্তি 'স্বাধীনতাবোধ'কে তারা পায়ের তলায় পিষে মেরেছেন। তাই পরবর্তীকালে ভারতীয় রেনেসাঁর ভাবপুত্র ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বারবার ঘুরে মরেছে মৌলতন্ত্র, সাম্প্রদায়িকতা আর আপোষের অন্ধগলিতে।

যাইহোক, সেদিনকার বুদ্ধিজীবী আর বিখ্যাত ইয়ং বেঙ্গলরা প্রবল উৎসাহে ইংরেজ শাসকদের সেবা করতে থাকল। "১৮৩৩ সালের চার্টার এ্যাক্ট অনুযায়ী ১৮৪৫ সালে কিছু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ সৃষ্টি করা হয়। ঐ পদগুলোয় ডিরোজিওর অনেক ছাত্র নিয়োজিত হয়।' *(মজুমদার——হিস্ট্রি অব পলিটিক্যাল থট ইন ইন্ডিয়া)।* এক প্রখ্যাত ডিরোজিয়ান দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের কীর্তি আরও অপূর্ব। 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার সম্পাদক দক্ষিণারঞ্জন মুর্শিদাবাদের দেওয়ান হয়ে, কলকাতার কালেকটর হয়ে, ইংরেজদের সেবা করে বহু টাকা রোজগার করেন। বিদ্রোহ যখন তুঙ্গে তখন তিনি গোপনে কলকাতায় নির্বাসিত অযোধ্যার নবাবের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। কিন্তু পরে যখন বিদ্রোহীরা ইংরেজ পল্টনের হাতে পর্যুদস্ত হল তখন তিনি রাতারাতি ভোল পাল্টে বৃটিশ সরকারকে সাহায্য করতে কোমর বেঁধে নামলেন। পরে তার রাজভক্তির প্রতিদানে সরকার বিদ্রোহী রাজা বেনীমাধো'র জমিদারী তাকে দান করল। 'রাজা' উপাধিও মিলল——দক্ষিণারঞ্জন হলেন রাজা দক্ষিণারঞ্জন। 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার সম্পাদক কবি ঈশ্বর গুপ্ত যে ভাষায় ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈকে ব্যঙ্গ করে কবিতা (!) লিখলেন তা উল্লেখ করে পাঠকের রুচি পীড়িত করছি না। বৃটিশের বিজয় সংবাদ পেয়ে 'হিন্দুরত্ন কমলাকর' পত্রিকার সম্পাদক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য উল্লসিত হয়ে লিখলেন, "হে পাঠকগণ, আপনারা জয়ধ্বনি করুন। দুরাশয় সিপাহী এইক্ষণে ছিন্নভিন্ন হইয়া বৃটিশ তোপাগ্নিতে মরিতেছে।" কবি রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় ইংরেজ শাসকের উদ্দেশ্যে স্তুতিগীত লিখলেন——

ভারতের ভাগ্য জোর দুঃখ বিভাবরী ভোর
ঘুমঘোর থাকিবে কি আর?
ইংরেজের কৃপাবলে মানস উদয়াচলে
জ্ঞানভানু প্রভায় প্রচার।।
শান্তির সরসীমাঝে সুখ সরোরুহ বাজে,
মনভৃঙ্গ মজুক হরিষে।
হে বিভো করুণাময় বিদ্রোহ বারিদচয়
আর যেন বিষ না বরিসে।। *(পদ্মিনী উপাখ্যান)*

মুষ্টিমেয় দু'একজন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যারা ইংরেজদের সহযোগিতা করেন নি, চুপটি করে রইলেন। এ ছাড়া সামগ্রিক বুদ্ধিজীবীমহলের এই ছিল চেহারা।

পরবর্তীকালে অনেক ঐতিহাসিক এই মহাবিদ্রোহকে খাটো করে দেখাবার প্রয়াস করেছেন। তাদের কেউ বলেছেন এই বিদ্রোহ ছিল 'মরণোন্মুখ সামন্ততন্ত্রের শেষ নাভিশ্বাস', কেউ বলেছেন 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ধর্মান্ধ, স্বদেশ প্রেম-জাতীয়তাবোধ বর্জিত কতগুলি সিপাহির' বিদ্রোহ। তাদের কারো চোখে এই বিদ্রোহ 'প্রতিবিপ্লবী' তো কারো চোখে 'প্রতিক্রিয়াশীল'। অনেকে একধাপ এগিয়ে ঘোষণা করেছেন যে বিদ্রোহের এই চরিত্রের জন্যেই 'প্রগতিশীল

বিপ্লবী বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা' তাতে যোগ দেন নি। কিন্তু সেদিনকার এই বুদ্ধিজীবীরা কোনমতেই বিপ্লবী ছিলেন না। তাদের প্রগতিশীলতা কেবলমাত্র মস্তিষ্কের ব্যায়ামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাদের কার্যাবলীতে তা প্রতিফলিত হয় নি। সবার উপরে এই সব রেনেসাঁর নায়কদের অর্থনৈতিক টিকিটি ছিল বৃটিশ স্বার্থের সাথে বাঁধা। তাদের জ্ঞান, তাদের বুদ্ধিবৃত্তি যাই বলুক না কেন, তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান তাদেরকে ইংরেজদের পাশে এনে দাঁড় করিয়েছিল।

বাংলা রেনেসাঁ আন্দোলনের প্রাণ পুরুষদের অধিকাংশই ছিলেন ইংরেজদের সহযোগী অথবা ইংরেজ-সহযোগীদের সন্তান। এইসব বুদ্ধিজীবীদের একটা বিশেষ সীমাবদ্ধতা ছিল এই যে তাঁরা প্রগতিকে বৃটিশ প্রগতির সমার্থক হিসেবে গণ্য করেছেন এবং বৃটিশরা যে আমাদের দেশে আধা-ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ চালিয়ে গেছে, সে-কথা বার-বারই সজ্ঞানে এড়িয়ে গেছেন (*প্রবীর ঘোষ —সংস্কৃতি : সংঘর্ষ ও নির্মাণ*)।

ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসীর এই ভূমিকা ইংরেজদের চোখ খুলে দিল। ভারতবর্ষকে এক দীর্ঘ শোষণের যাঁতাকলে রাখার অস্ত্র ইংরেজ খুঁজে পেল।

বিদ্রোহের উৎসমুখে পাথর — কংগ্রেসের জন্ম

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের দিনগুলোতে দেশীয় জমিদারদের পুরোপুরি সমর্থন বৃটিশ শাসকদের ঘোর বিপদ থেকে উৎরে দিল। তার সঙ্গে উপরি পাওনা ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের সমর্থন। ইংরেজরা উল্লসিত হল মেকলের পরিকল্পনা সফল হওয়ায়। সেই ১৮৩৫-এ মেকলে বলেছিলেন—"আমাদের এখন থেকে এমন একটা শ্রেণী তৈরী করতে আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে যারা হবে আমাদের এবং আমরা যাদের শাসন করছি তাদের মধ্যে ভাবের যোগাযোগ রক্ষাকারী। এই শ্রেণীর লোকেরা হবে রক্তে এবং গায়ের রঙে ভারতীয় কিন্তু রুচি, চিন্তা, নীতি এবং বুদ্ধিতে হবে এক একজন ইংরেজ।" *(মেকলের মিনিট, ২৩ ফেব্রুয়ারী ১৮৩৫)।* সত্যিই তারা এরকম একটা শ্রেণী তৈরী করতে পারল যারা শয়নে স্বপনে শুধু ইংরেজ নয়, রুজি রোজগারের প্রশ্নেও বৃটিশ স্বার্থের সঙ্গে বাঁধা।

আবার ইংরেজী শিখলে টাকা রোজগারের সুযোগ আরও বেশি বেশি যুবকদের ইংরেজী শিখতে উৎসাহিত করল। ইংরেজী শিক্ষিতের সংখ্যা বেড়েই চলল। যেখানে ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মাত্র ২৪৪ জন এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়েছিল সেখানে পাঁচ বছর পরে ১৮৬৩ সালে এন্ট্রান্স পরীক্ষার্থী ছিল ১৩২৭ জন। এভাবে প্রতি বছরই পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়তে থাকল *(ক্যালকাটা রিভিউ—এডুকেশন ইন বেঙ্গল ১৮৬৪. NO. LXXIX)।* এই সব শিক্ষিত ছেলেরা চাকরি ছাড়াও মাস্টারি, ডাক্তারি, ওকালতির মত স্বাধীন পেশায় কাজ করতে থাকে। ১৮৫৭ র আগে শিক্ষিত ভারতীয়রা কেবলমাত্র ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানীতে চাকরি কিম্বা কম্পানির সাথে যুক্ত থেকে ব্যবসা বা দালালি করত। কিন্তু এর পর থেকে নানা স্বাধীন পেশায় নিযুক্ত হওয়ায় এইসব শিক্ষিত মানুষের চিন্তা অনেকটা স্বাধীন স্বাবলম্বী খাতে বইতে লাগল। ইংরেজরা নেটিভদের কাজ চালানোর মত ইংরেজী শেখাতে চেয়েছিল—পশ্চিমী দর্শন, বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস তারা শেখাতে চায় নি। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার হাত ধরেই ভারতীয়রা পশ্চিমী দর্শন, সাহিত্য, রাজনৈতিক ভাবধারার সাথে পরিচিত হন। পশ্চিমী স্বাধীনতা, গণতন্ত্রের ধ্যান-ধারণা তাদেরকে

উদ্দীপ্ত করল। সাথে সাথে স্বাধীন কাজকর্মে নিযুক্ত ভারতীয়রা দেখল যে তাদের স্বাধীন আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ অত্যন্ত কম। সব জায়গাতেই সাদা চামড়াদের সুযোগ বেশি। এতে শিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত ভারতবাসীদের মধ্যে ক্রমেই অসন্তোষের সৃষ্টি হতে থাকল। আবার যারা ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হল সকলেরই কর্মসংস্থানের সুযোগ সহজে হল না। বেকারীও বাড়তে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই এতে শিক্ষিতদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত গরীব মানুষদের মধ্যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাবী-দাওয়া মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। সুতরাং শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা তাদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখার জন্যে একটা সংগঠন সৃষ্টি করতে চাইল। ফলে ১৮৭৬ এ আনন্দমোহন বসুর নেতৃত্বে গঠন করা হল 'ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশান' বা 'ভারত-সভা'। এই ভারত-সভার সূচনা সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী 'আত্মচরিত'-এ লিখেছেন——

"যখন ব্রাহ্মসমাজে কেশববাবুকে লইয়া আন্দোলন চলিতেছে, তখন আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমি তিনজনে আর এক পরামর্শে ব্যস্ত আছি। আনন্দমোহন বাবু বিলাত হইতে আসার পর হইতেই আমরা একত্র হইলেই এক কথা উঠিত যে বঙ্গদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য কোন রাজনৈতিক সভা নাই। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ধনীদের সভা, তাহার সভ্য হওয়া মধ্যবিত্ত মানুষদের কর্ম নয়। অথচ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের সংখ্যা যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপযুক্ত একটি রাজনৈতিক সভা থাকা আবশ্যক।"

ভারতীয়দের মধ্যে নিজ নিজ শ্রেণীর স্বার্থে এ্যাসোসিয়েশন তৈরী করা নতুন কোন ঘটনা নয়। সেই ১৮৩৮ সালেই একজন জমিদার ও উদ্যোগপতি দ্বারকানাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে 'ল্যান্ড হোলডার্স সোসাইটি' স্থাপন করা হয়। এরপর দ্বারকানাথ বৃটিশ পার্লামেন্ট সদস্য জর্জ টমসনকে আমন্ত্রণ করে বাংলায় নিয়ে আসেন। জর্জ টমসনের সভাপতিত্বে ১৮৪৩ এ গড়ে উঠল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি। শেষে ১৮৫১ সালে এই দুটো সংগঠনকে মিশিয়ে তৈরী হল 'বৃটিশ ইন্ডিয়া এ্যাসোসিয়েশন'। ইংরেজী শিক্ষিত জমিদার রাধাকান্ত দেব হলেন এর সভাপতি। ভারতীয় ধনীদের স্বার্থ দেখাই ছিল এই সংগঠনের কাজ। এই ধরনের সংগঠন কেবল কলকাতাতেই হয়েছিল তা নয়। ১৮৫২ তে সমধর্মী বোম্বাই এ্যাসোসিয়েশন তৈরী হয়েছিল। মাদ্রাজেও হয়েছিল মাদ্রাজ এ্যাসোসিয়েশন।

এদিকে বৃটেনের শিল্প-বিপ্লবের পর ভারতেও কিছু কিছু শিল্প ইংরেজরা গড়ে তুলেছিল। ভারতীয় জমিদারেরা ছিল যথেষ্ট সম্পদের মালিক। এরাও কিছু কিছু শিল্প স্থাপনে আগ্রহী হল। বোম্বাই-এর বেনিয়ারা উদ্যোগ নিতে সবচেয়ে আগে এগিয়ে এল। স্বাধীন পেশায় নিযুক্ত ভারতীয়দের অনেকেই বেশ দু'পয়সা রোজগার করেছিল, তারাও চাইল শিল্পে টাকাটা বিনিয়োগ করতে। বিশেষতঃ ১৮৫৮ থেকে ভারতবর্ষ সরাসরি বৃটিশ সরকারি নিয়ন্ত্রণে আসার পর ভারতে শিল্প সম্ভাবনা আরও বেশি বেড়ে গিয়েছিল। (পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলোতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে)। কিন্তু ভারতীয় শিল্পের গড়ে ওঠার ব্যাপারে ইংরেজরা বাধা দিতে থাকল প্রতি পদে পদে। এতে ভারতীয় শিল্পোদ্যোগীরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হল। এইভাবে ইংরেজ শাসনের প্রতি ভারতের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, জমিদার আর উদ্যোগপতি, যারা ছিল এতদিনকার ইংরেজভক্ত সকলেরই ক্ষোভ ঘণীভূত হচ্ছিল।

আবার ১৮৫৭ র মহাবিদ্রোহ দমনের পরও ভারতের জায়গায় জায়গায় বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহ থেমে থাকল না। এর মধ্যে বেশ কয়েকটা কৃষক বিদ্রোহ ইংরেজ শাসনকে নাড়া দিল। ১৮৫৯-৬২ সালে পূর্ব বঙ্গের নীলবিদ্রোহ প্রথম ভারতীয় গ্রামীন জনসাধারণের সংগঠিত সংগ্রাম। নীলচাষ থেকে পিছু হটে ইংরেজরা এটা সমাল দিতে না দিতে ১৮৭২-

৭৩ সালে বাংলার কৃষকদের ব্যাপক অভ্যুত্থান শুরু হল। আবার দিল্লী, পাটনা, বাংলার রাজমহল, মালদা অঞ্চলে দ্বিতীয় বারের জন্যে ওয়াহাবী আন্দোলন দেখা দিল। বাংলার বাইরে মহারাষ্ট্রে ১৮৭০-৮০ সালে বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কের নেতৃত্বে কৃষক, কারিগর আর ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের বীরত্বপূর্ণ এক ব্যাপক সংগ্রাম চলতে থাকে। মাদ্রাজ প্রদেশের (বর্তমান তামিলনাড়ু) রাম্পায় কৃষকদের একটা বিরাট অভ্যুত্থান ঘটে। এইসব কৃষক বিদ্রোহ ছিল একেবারে স্থানীয় স্তরের। একের সাথে অন্যের কোনও যোগাযোগ ছিল না। সেইজন্যে এইগুলো দমন করা ইংরেজদের পক্ষে কণ্টকর হলেও অসম্ভব ছিল না। কিন্তু শাসকরা ভয় পেয়ে গেল অন্য জায়গায়। তারা লক্ষ্য করল এইসব কৃষক বিদ্রোহে দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ব্যাপক সমর্থন জানাচ্ছে। নানা দমনমূলক আইন এনেও এ সমর্থন বন্ধ করা যাচ্ছে না। ইংরেজ উচ্চপদস্থ ঝানু আমলা, এ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম অনেক গুপ্ত ফাইল ঘেঁটে এক প্রতিবেদন তৈরী করলেন। তাতে লিখলেন, "যদি শিক্ষিত সম্প্রদায় এইসব গণ-বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেয় তাহলে এগুলো আরও উদ্দেশ্যপূর্ণ হয়ে উঠবে। এমনকি একটা জাতীয় অভ্যুত্থানও ঘটে যেতে পারে।" যে শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা ১৮৫৭র মহাবিদ্রোহে চোখ-কান বন্ধ করে ইংরেজদের সাহায্য করেছিল আজ তাদের স্বার্থে আঘাত লাগায় তারা হয়ে দাঁড়াল বিদ্রোহের সমর্থক। যে শ্রেণীর সৃষ্টি করা হল ভারতে বৃটিশ শাসন অব্যাহত রাখার জন্যে, তারাই আজ বেসুর গাইছে। সম্ভাব্য 'দ্বিতীয় মিউটিনির' হাত থেকে বাঁচতে হলে এই শ্রেণীটাকে পোষ মানাতেই হবে। তাই তৈরী করতে হবে ভারতীয় ধনিক আর শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের নিয়ে এমন একটা সর্বভারতীয় দল যা দেশে ইংরেজ শাসন সুরক্ষিত রাখবে। নেটিভদের রোগটা যিনি ভালোভাবে ধরেছেন সেই ইংরেজ সিভিলিয়ান হিউমকেই দেওয়া হল রোগ সারানোর ভার। ১৮৮৩-৮৪ সাল জুড়ে শুরু হল দল তৈরীর প্রচেষ্টা। শেষ পর্যন্ত ১৮৮৫ সালে বোম্বাইতে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সম্মেলন হল। সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হলেন সেই এ্যালান হিউম। সভাপতি ডবল্যু সি ব্যানার্জী। আর সমস্ত কিছু যার অঙ্গুলিহেলনে অনুষ্ঠিত হল তিনি হলেন খোদ ভাইসরয় লর্ড ডাফরিন। প্রথম কংগ্রেস সভাপতি ডবল্যু সি ব্যানার্জী দ্বিধাহীনভাবে স্বীকার করেছেন কংগ্রেস 'ডাফরিনেরই অবদান' *(ডবল্যু সি ব্যানার্জী——ইনট্রোডাকশন অব ইন্ডিয়ান পলিটিক্স্)।* জাতীয় কংগ্রেস গঠন হবার পর জমিদার-শিল্পপতিদের সংগঠন ব্রিটিশ ইন্ডিয়া এ্যাসোসিয়েশন আর শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের সংগঠন ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন কার্যত কংগ্রেসের মধ্যে মিশে গেল। কংগ্রেস হয়ে দাঁড়াল একাধারে ভারতীয় জমিদার, শিল্পপতি আর শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের একমাত্র সর্বভারতীয় সংগঠন।

কংগ্রেসে যারা নেতৃত্ব দিলেন ডবল্যু সি ব্যানার্জী, দাদাভাই নওরোজি, ফিরোজ শাহ মেহতা, রমেশ চন্দ্র দত্ত, সবাই ছিলেন ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ধনী ব্যক্তি। এছাড়া ছিল জমিদার, বড় ব্যবসায়ী, মহাজন, শিল্পপতির দল। কংগ্রেসের প্রথম ছয়টা অধিবেশনে প্রতিনিধিদের সামাজিক স্তরবিন্যাস ছিল শতকরা ৫০ ভাগ শিল্পপতি ও ধনী বুদ্ধিজীবী, ২৫ ভাগ ব্যবসায়ী আর মহাজন, ২৫ ভাগ জমিদার। এরা প্রায় সকলেই রোজগারের প্রশ্নে ইংরেজ সরকারের অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল। একই সঙ্গে এইসব নেতারা জনসাধারণের বিক্ষোভ-আন্দোলনকে ভয় পেতেন। ১৮৯৩ র কংগ্রেস অধিবেশনে নওরোজি বললেন, "সরকারের বর্তমান কর্তব্য হল কঠিনভাবে জনসাধারণের শান্তিনষ্টকারী শক্তিগুলিকে (অর্থাৎ বিদ্রোহীদের) দমন করা।"

এইভাবে ইংরেজরা যা চেয়েছিল ভারতের কৃষকদের থেকে বুদ্ধিজীবীদের বিচ্ছিন্ন করা আর ভারতীয় এলিটদের বৃটিশ শাসনের অনুরাগী করে তোলা, দুটোতেই দারুন

সফল হল। এমনকি ১৮৯৮র মাদ্রাজ কংগ্রেসে সভাপতি আনন্দমোহন বসু ভারতের শাসনভার নিতে চলেছেন সেই লর্ড কার্জনকে জোর প্রশংসা করে এক উচ্ছ্বসিত বক্তৃতা দিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। কার্জন শাসনভার নেওয়ার পর সুরেন বাড়ুজ্জে রাজভবনে দলবল নিয়ে গিয়ে এক মানপত্র দিয়ে এলেন। রমেশচন্দ্র দত্ত ভারতের পত্রিকাগুলোতে কার্জনের প্রশংসা করে কতগুলো প্রবন্ধ লিখলেন। ইতিহাসের নিদারুণ পরিহাসে পরে কংগ্রেস নেতারাই গালাগালির চোটে এই কার্জনের দফারফা করেছিলেন। কংগ্রেসের তখনকার প্রত্যেকটা অধিবেশনেই ভারতে ইংরেজ শাসনকে স্বাগত জানিয়ে প্রস্তাব নেওয়া হত। শুধু হিউম নয় আর এক ইংরেজ উচ্চপদস্থ সরকারী আমলা স্যার হেনরি কটনকেও কংগ্রেস সভাপতি করা হল।

কিন্তু ইংরেজদের সাথে যেখানেই তাদের স্বার্থের সংঘাত সেখানে তারা সরকারের সমালোচনা করতে ছাড়তেন না। একদিকে তারা ছিলেন ইংরেজদের অনুগত, অন্যদিকে নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে ব্যবস্থাগুলো সরকারকে নেওয়ানোর চেষ্টা করতেন। তুলোর উপর ইংরেজ সরকার যে শুল্ক বসিয়েছিল কংগ্রেস তা তুলে নেওয়ার জন্য প্রস্তাব আনল। ভারতীয় সুতো ও বস্ত্রশিল্পের মালিকদের স্বার্থেই এ প্রস্তাব আনা হল। জমিদারদের স্বার্থে সারা দেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করার জন্যে সরকারের কাছে দাবী জানানো হল। দাবী করা হল——আইন সভায় ভারতীয় সদস্য বাড়ানো হোক আর আইনসভার ক্ষমতাও বাড়ানো হোক। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা ইংল্যান্ডের সাথে সাথে ভারতেও নেওয়ার জন্যে আবেদন জানানো হল। আয়করের নিম্নসীমা বাড়ানোর দাবীও করা হল। এগুলো সবই শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের স্বার্থে। এইভাবে ভারতীয় জমিদার, উদ্যোগপতি, শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের স্বার্থরক্ষাকারী সংস্থা হিসেবে কংগ্রেস কাজ করে যেতে লাগল। সারাদেশে যে কোনও সংগ্রাম আন্দোলনের বিরোধিতা করে, ইংরেজ শাসনের বন্দনা করে আবেদন-নিবেদনের পথে কংগ্রেস চলতে থাকল।

কিন্তু একদিকে বৃটিশ শাসকদের নির্বিবাদে দেশের সম্পদ লুঠ করে নেওয়া অন্যদিকে দেশে একের পর এক মহামারী,খাদ্যের অভাবে মৃত্যু, দেশের মানুষ আর আবেদন নিবেদনের রাজনীতিতে আস্থা রাখতে পারল না। বোম্বাইতে ব্যাপক প্লেগ আর ম্যালেরিয়ায় অগণিত মৃত্যু, তার প্রতি ইংরেজ সরকারের নিদারুণ অবহেলা, বাংলায় শিক্ষিত বেকারের কঠিন সমস্যা তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি করল। ভারতীয় শিল্পপতিরা ইংরেজ শিল্পপতিদের সমান সুযোগ পাওয়ার জন্যে সরকারকে একটা জোর ধাক্কা দেওয়া দরকার বলে মনে করল। সুতরাং ইংরেজ শাসকদের যে মানসপুত্র জাতীয় কংগ্রেস অত্যন্ত বাধ্য ছেলে ছিল, তাকেও আস্তে আস্তে বেয়াড়া ছেলে হয়ে উঠতে হল।

বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন —— ধর্ম-রাজনীতির গাঁটছড়া

কংগ্রেসের সাথে ইংরেজ শাসকদের মধুচন্দ্রের দিন শেষ হয়ে এল। প্রথম ধাক্কাটা এল ইংরেজদের তরফ থেকেই। বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব। এমন একটা ধারণা চালু আছে যে বঙ্গভঙ্গের মতলবটা লর্ড কার্জনের মাথা থেকেই বেরিয়েছে এবং তিনিই সবকিছুর খলনায়ক। আসলে বাংলাকে ভাগ করার প্রস্তাব অনেক আগে থেকেই ইংরেজ উচ্চপদস্থ আমলাদের মধ্যে ঘুরছিল। তখনকার বঙ্গ বলতে অবিভক্ত বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম আর ত্রিপুরাকে একসাথে বোঝাত। এই বিশাল এলাকাকে একসাথে শাসন করতে ইংরেজদের

বেশ বেগ পেতে হত। যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল অনুন্নত। তার উপর জায়গায় জায়গায় লেগে থাকত কৃষকদের বিদ্রোহ। বাংলাকে ভাগ করা ইংরেজদের সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত ছিল, নানা আমলার নানা মতে তা বাস্তবায়িত হতে পারে নি। কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটতে থাকায় কার্জন তাড়াহুড়ো করতে বাধ্য হলেন। কংগ্রেসের ইংরেজভক্ত জমিদার, ধনী বুদ্ধিজীবী নেতাদের পাশাপাশি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এক ঝাঁক নেতা উঠে এলেন। এরা ছিলেন কংগ্রেস নেতাদের ইংরেজ তোষামোদী নীতির বিরোধী। এদেরকে চরমপন্থী বলা হত। বাংলায় এদের নেতা ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ। এই চরমপন্থীদের দল দিনে দিনে ভারি হতে থাকল। কার্জন এটা সহ্য করতে পারল না। সেই ১৯০০ সালেই বলেছিলেন—"আমার বিশ্বাস যে কংগ্রেস এখন পতনের মুখে পৌঁছিয়াছে; ভারতে থাকাকালীন কংগ্রেসের শান্তিপূর্ণ মৃত্যুতে সাহায্য করা আমার একান্ত ইচ্ছা।" সুতরাং বঙ্গভঙ্গ করতে হবে। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ করার আগে কার্জন আরও একটা বড় চাল চাললেন। তিনি বঙ্গভঙ্গের পক্ষে সমর্থন জোটাবার জন্যে পূর্ববঙ্গে সফর করলেন। সেখানে মুসলিম জমিদার, বুদ্ধিজীবীদের বোঝালেন মুসলমান প্রধান আলাদা একটা প্রদেশ হলে মুসলিমরা অনেক বেশি সুযোগ পাবে। শিক্ষা, চাকরির ব্যাপারে বিশেষ সুবিধা পাওয়া যাবে। বাংলার মুসলিম জমিদার, মধ্যবিত্তদের তখন 'সব ক্ষীর হিন্দুরা খেয়ে গেল' ধারণা। ইংরেজ রাজত্বের প্রথমদিকে মুসলমান শাসকেরা রাজ্য রক্ষার তাগিদেই ইংরেজদের সাথে যুদ্ধ করেছিল। বৃটিশ শাসন কায়েম হবার পরেও মুসলমান সামন্তরা সহজে তা মেনে নেয় নি। যখনই সুযোগ পেয়েছে ইংরেজ তাড়ানোর লড়াইয়ে নেমেছে। এইজন্যে মুসলিম সামন্ত প্রভুদের সাথে ইংরেজদের সম্পর্ক প্রথম থেকেই খারাপ। আবার বৃটিশ শাসনের আগে মুসলমান সামন্তদের রাজসভায় উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের বেশিরভাগই ছিল মুসলমান। শাসন কাজ চালানোর মাধ্যমও ছিল আরবী বা ফারসি ভাষা। ইংরেজরা শাসন শুরু করার পর ফারসি বা আরবির বদলে ইংরেজী চালু করল। অন্যদিকে মুসলিম শিক্ষিত সম্প্রদায় এই নতুন ব্যবস্থায় খাপ খাইয়ে নিতে পারল না। একদিকে ক্ষমতা হারানোর বিদ্বেষ আর অভিমান অন্যদিকে ভাষার এই দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান ইংরেজ শাসনের প্রতি মুসলমানদের একেবারেই বিমুখ করে তুলল। এর সুযোগ নিল হিন্দু ধনীরা। এরা ইংরেজদের তাঁবেদারি করে বিলক্ষণ দু'পয়সা রোজগার করতে লাগল। সরকারী চাকরির সিংহভাগটাই গেল হিন্দু মধ্যবিত্তদের দখলে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে কলকাতার হিন্দু বেনিয়া, মহাজন, অনেকেই পূর্ববঙ্গে জমিদারি কিনে 'হঠাৎ নবাব' হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই জমিদারি হারিয়েছে মুসলমান জমিদার যাদের জমিদারি ছিল পুরুষানুক্রমিক। আজ সুযোগ এসেছে। সুতরাং বেশ কিছু মুসলমান জমিদার, ধনী বুদ্ধিজীবী কার্জনের ডাকে সাড়া দিল। ঠিক যেমনভাবে একদিন হিন্দু জমিদার, বেনিয়ারা ইংরেজদের অনুগ্রহ কুড়িয়েছিল আজ সেভাবেই একদল মুসলমান জমিদার, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী কার্জনের টোপ গিলল। তাদের নেতা হলেন ঢাকার জমিদার নবাব সলীমুল্লাহ।

কিন্তু বঙ্গভঙ্গের ব্যাপারে হিন্দু জমিদার, শিল্পোদ্যোগী, বেনিয়া, বুদ্ধিজীবীদের স্বার্থ ছিল একেবারে উল্টো। হিন্দু জমিদারেরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কলকাতা কিম্বা তার আশেপাশে বাস করলেও তাদের জমিদারী ছিল পূর্ববঙ্গে। আলাদা প্রদেশ হলে তাদের জমিদারী হাতছাড়া হাবার সম্ভাবনা দেখা দেবে। নবগঠিত 'চেম্বার অব কর্মাস এ্যান্ড ইন্ডাসট্রি' যার নেতৃত্বে প্রধানত হিন্দু শিল্পোদ্যোগীরা, তার প্রভাব সীমিত হয়ে পড়বে ভেবে আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। নতুন প্রদেশে অফিস কাছারি, কোর্ট, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদি স্থাপিত হলে কলকাতায় এইসব সংস্থার এক্তিয়ার ছোট হয়ে যাবে, চাকরির সুযোগও নিঃসন্দেহে কম

হয়ে যাবে, এই সম্ভাবনাতে শিক্ষিত হিন্দুরা আকুল হয়ে উঠল। অতএব হিন্দু-মুসলমান জমিদার, বেনিয়া, বুদ্ধিজীবীদের স্বার্থের সংঘাত মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। তবে সাধারণভাবে কৃষক, শ্রমিক, কারিগররা যে সম্প্রদায়েরই হোক না কেন তাদের কাছে বঙ্গভঙ্গ কিম্বা অবিভক্ত বঙ্গ কোনটারই আলাদা কোন তাৎপর্য ছিল না। এইসব কাজিয়া তাদের কষ্টকর কোনমতে বেঁচে থাকাতে কোন ইতর-বিশেষ ঘটাতে পারে নি।

বৃটিশ সরকার ১৯০৫ সালের জুলাই মাসে সরকারীভাবে বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল। আগস্টের গোড়া থেকেই হৈ হৈ করে শুরু হয়ে গেল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন। এই আন্দোলনের আদর্শগত ভিত্তি হল জাতীয়তাবাদ। কিন্তু এই জাতীয়তা ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ ছিল না। এ ছিল হিন্দু জাতীয়তাবাদ। জাতীয়তার এ হেন ধর্মীয় রূপ হওয়ার বিশেষ কারণ ছিল।

সব দেশে সব শাসকেরাই তাদের শাসনের একটা নীতিগত বৈধতা দেবার চেষ্টা করে, তা সে শাসন যতই অন্যায় অযৌক্তিক হোক না কেন। ইংরেজরাও তার ব্যতিক্রম নয়। ভারতে জাতীয় চিন্তার উন্মেষের একেবারে গোড়াতেই ইংরেজ বোঝানোর চেষ্টা করতে থাকল ভারতবর্ষ একটা অনুন্নত বর্বর দেশ। এদেশের মানুষের শিক্ষা, চেতনা, আচার ব্যবহার, সামাজিক জীবন সবই অনাধুনিক, অসভ্য। সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ ইত্যাদি হিন্দুসমাজের অমানবিক আচারগুলো তাদের আরও প্রচারের সুযোগ করে দিল। ইংরেজরা বোঝাল ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসন ভারতবাসীদের পক্ষে ঈশ্বরের আর্শীবাদ। ইংরেজরাই ভারতবাসীকে সুসভ্য আধুনিক করে গড়ে তুলতে পারে। প্রথম প্রথম এই প্রচারে প্রতারিত হলেও ধীরে ধীরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যাপ্তি বেড়ে যাওয়ার পর মধ্যবিত্তরা এর সমুচিত জবাব দেওয়া দরকার মনে করল। জাতীয়তা উন্মেষের এই যুগে ভারতের বুদ্ধিজীবীরা তাদের অতীত অনুসন্ধানে মন দিলেন। এই সময়ের পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়রা প্রায় সকলেই হিন্দু বা হিন্দুরই অংশবিশেষ ব্রাহ্ম হওয়ায় তাদের অনুসন্ধানের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়াল হিন্দু দর্শন, শাস্ত্র, পুরাণ ইত্যাদি। প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান চর্চা, কারিগরি বিদ্যা, বস্তুবাদী দর্শন, এগুলো অত্যন্ত উন্নত ও সমৃদ্ধ হওয়া সত্বেও জাতীয়তাবাদের উদ্গাতাদের নজর এসবের প্রতি এড়িয়ে গেল। দুঃখজনকভাবে তাদের সমস্ত মনোযোগ আকর্ষণ করল হিন্দুধর্মের আধ্যাত্মিকতা, বাস্তবজগত বিমুখ নানা ভাববাদী দর্শন, সামন্তযুগের আদিপর্বের সেই জীবনযাত্রা। এর সবগুলোকে অভ্রান্ত আর পশ্চিমী ধ্যানধারণার চেয়ে সেরা, নির্বিচারে এটা প্রতিপন্ন করাতেই তাঁরা সমস্ত প্রচেষ্টা ঢেলে দিলেন। আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের নিরিখে পুরনো চিন্তা-চেতনার যে জিনিসগুলো শ্রেষ্ঠ তাকে গ্রহণ আর বর্তমানে যা অচল যা ক্ষতিকর সেসব ভাবধারা, আচার-সংস্কারকে নির্মমভাবে বর্জন——এ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার মধ্যে তাঁরা গেলেন না। আধুনিক দর্শন, বিজ্ঞানের প্রতি অদ্ভূতভাবে অবজ্ঞা প্রকাশ করলেন। ইংরেজরা যা কিছু খারাপ বলে—— তা সে ঠিক বলুক বা বেঠিকই বলুক, তার স্বপক্ষে নানা যুক্তি দিয়ে তাকেই সঠিক প্রতিপন্ন করাটা একমাত্র কাজ হল। অনেকটা ঠিক রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের 'গোরা' চরিত্রের মত। উল্টোদিকে জাতিভেদ তাদের কাছে সমাজের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে হল। (প্রসঙ্গত জানাই, বিবেকানন্দ ও পরবর্তী কালে গান্ধী অস্পৃশ্যতার বিরোধী ছিলেন, কিন্তু জাতিভেদকে দুজনেই সমর্থন করতেন)। সতীদাহের মধ্যে ভারতীয় নারীর 'মহান আত্মত্যাগের আদর্শ' খুঁজে পেলেন। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহের মধ্যে কোন দোষ খুঁজে পেলেন না। (বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বহুবিবাহ করেছিলেন)। তাদের কাছে হিন্দু আধ্যাত্মিকতাই পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ

চিন্তা এবং এই ভাবধারা গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়াটাই ভারতবাসীর প্রধান কর্তব্য বলে মনে হল। এই হিন্দু পুনরুত্থানবাদের চিন্তাধারা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অন্যতম জনক বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দের রচনার ছত্রে ছত্রে পাওয়া যাবে। বেশ কিছু পাশ্চাত্য পন্ডিত (তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থেই) ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করতে থাকল। এটা শিক্ষিত ভারতবাসীর কাছে আত্মশ্লাঘার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। আর একটা বিষয়, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উদ্গাতাদের প্রায় সকলেরই ধনী কিম্বা উচ্চবিত্ত পরিবারে জন্ম। তাদের সেই আর্থ-সামাজিক অবস্থানের সাথে ধর্মীয় জাতীয়তাই বেশি খাপ খায়। পশ্চিমি ধারণার ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবোধ যে তাদের শ্রেণী অবস্থানের ভিতটাই নড়বড়ে করে দেয়।

এই দুটো প্রধান কারণে ভারতীয় মনীষার ভাবজগতের যে উন্মেষ প্রকাশিত হল তা হয়ে পড়ল হিন্দু জাতীয়তাবাদ। ভারতবর্ষের মাটিতে তাই ভারতীয় জাতীয়তা এবং ধর্মীয় জাতীয়তা সমার্থক হয়ে দাঁড়াল। তাই বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন কি বক্তৃতায়, কি মিছিল-বিক্ষোভ প্রদর্শনে একটা ধর্মীয় চেহারা নিল। ১৯০৫ সালের ৭ আগষ্ট কলকাতা টাউন হলে এক বিশাল সভা হল। সভাপতিত্ব করলেন কাশিমবাজারের জমিদার মহারাজা মহেশচন্দ্র নন্দী। তিনি ভাষণে বললেন "নতুন প্রদেশে মুসলমানরা প্রাধান্য পাইবে, বাঙালী হিন্দুরা সংখ্যালঘিষ্টে পরিণত হইবে। আমাদের জাতির ভাগ্যে যে কি হইবে তাহা চিন্তা করিয়া আতঙ্কিত হইয়া পড়িতেছি" *(এ আর মল্লিক——পার্টিশন অব বেঙ্গল)*। সভায় ময়মনসিংহের জমিদার সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী প্রস্তাব পাঠ করলেন। এই সভাতেই প্রথম গৃহীত হল বৃটিশের তৈরী পণ্য বয়কটের প্রস্তাব। আর প্রথম শোনা গেল স্বাধীনতা আন্দোলনের মূলমন্ত্র এবং স্বাধীন ভারতের জাতীয় স্তোত্র 'বন্দেমাতরম'।

২৮ সেপ্টেম্বর মহালয়া। এদিন কালীঘাটে কালীমন্দিরে অনুষ্ঠিত হল যজ্ঞ। দলে দলে মানুষ গেল কালীঘাটে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দিতে দিতে। এরপর নতুন এক প্রস্তাব নিয়ে এলেন কলকাতায় বসবাসকারী পূর্ববঙ্গের শিলাইদহের জমিদার রবীন্দ্রনাথ। ১৬ অক্টোবর মানে যেদিন থেকে বঙ্গভঙ্গ লাগু হবে সেইদিনটাকে টাউন হলের সভায় ঘোষণা করা হয়েছিল 'জাতীয় শোক দিবস' হিসাবে। রবীন্দ্রনাথ বললেন ঐ দিনটা হবে রাখী তৃতীয়া। সবাই সবাইকে রাখী পরাবে। ঠাকুরবাসীর অন্নে পালিত ক্ষেত্রমোহন কথকঠাকুর তদ্বির করে দিনটাকে পঞ্জিকার পাতাতেও তুলে দিলেন। ঐ দিন ভোরবেলাতে রবীন্দ্রনাথ দলবল নিয়ে খালি পায়ে চললেন গঙ্গাস্নান করে পবিত্র হয়ে সকলকে রাখী পরাবেন। স্নান করে ফেরার পথের ঘটনা শুনি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জবানীতে——'পাথুরেঘাটা দিয়ে আসছি, দেখি বীরু মল্লিকের আস্তাবলে কতগুলো সহিস ঘোড়া মলছে, হঠাৎ রবিকাকা ধাঁ করে বেঁকে গিয়ে ওদের হাতে রাখী পরিয়ে দিলেন। ভাবলুম রবিকাকা করলেন কি, ওরা যে মুসলমান, মুসলমানকে রাখী পরালে——এইবারে একটা মারপিট হবে। মারপিট আর হবে কী। রাখী পরিয়ে আবার কোলাকুলি, সহিসগুলো তো হতভম্ব, কান্ড দেখে' *(অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর——ঘরোয়া)*। এই হচ্ছে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে বহু-বিজ্ঞাপিত হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীর নমুনা।

ইতিমধ্যে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীমশাই এক মেয়েদের ব্রতকথা লিখে ফেলেছেন। সারাদিন অরন্ধন পালন করে 'শক্তিরূপিনী স্ত্রীজাতি' 'পুরুষজাতির শক্তি ও উৎসাহ বর্ধন' করার জন্যে পাঠ করবে "বঙ্গলক্ষীর ব্রতকথা"। 'যে এই বঙ্গলক্ষীর (ব্রত)কথা শোনে তার ঘরে লক্ষ্মী অচলা হয়'।

বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে অন্যতম প্রেরণা ছিল রমেশচন্দ্র দত্তের দুটি বই 'রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা ' আর 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত'। বঙ্গভঙ্গের দিনগুলোতে মহারাষ্ট্রের অনুকরণে বাংলাতেও শিবাজী জন্মজয়ন্তী মহা আড়ম্বরে পালন করা হল। সভা-সমিতিতে মুসলমান শাসকদের বিরুদ্ধে শিবাজীর যুদ্ধকে দেশপ্রেমের এক জ্বলন্ত নিদর্শন হিসেবে বর্ণনা করা হল। রাণা প্রতাপকে বানানো হল জাতীয় হীরো। রাণা প্রতাপ কিন্তু আকবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন তার নিজের রাজ্য ফিরে পাবার জন্যে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকেরা এই যুদ্ধকে মুসলমানদের হাত থেকে হিন্দুদের দেশরক্ষার লড়াই বলে বোঝাতে চাইলেন। প্রকৃত ঘটনা অবশ্যই তা নয়। আকবরের পক্ষে অন্তত চল্লিশ হাজার রাজপুত সেনা ছিল। আকবরের সেনাপতিও ছিলেন হিন্দু——মান সিংহ। উল্টোদিকে রাণা প্রতাপের ছিল এক পাঠান সৈন্যের বাহিনী। প্রতাপের সেনাপতি ছিলেন হাকিম খাঁ। এ ছাড়া তাজ খাঁর নেতৃত্বে আর একটা পাঠান বাহিনীও ছিল। সুতরাং আকবর আর রাণা প্রতাপের যুদ্ধ হিন্দু মুসলমানের যুদ্ধ ছিল না। এ যুদ্ধ ছিল দুই রাজার রাজ্য দখলের লড়াই। একই কথা বলা যায় শিবাজী আর আওরঙজেবের যুদ্ধের ব্যাপারেও। দুজনের কেউই দেশপ্রেমী বলতে যা বোঝায় তা ছিলেন না। যুদ্ধ করে রাজ্য দখলে রাখা দুজনেরই উদ্দেশ্য। রাজ্য জয় করবার জন্যে, দখলে রাখবার জন্যে, তাদের বিশাল বিশাল সৈন্যবাহিনী রাখতে হত। সেই সৈন্যবাহিনীর জন্য প্রচুর পরিমান খাদ্য, পোষাক, রসদ, কে জোগাত——কাদের টাকায় কেনা হত বাহিনীর বিপুল পরিমান অস্ত্রশস্ত্র। এ খরচের ব্যয়ভার বহন করতে হত গ্রামের লক্ষ লক্ষ চাষী-কারিগরদের। এই খরচ তোলার জন্যে চাষীদের উপর প্রচন্ড অত্যাচার করে কর আদায় করত সেদিনের রাজা বাদশারা। এই ব্যাপারে রানা প্রতাপ কিম্বা আকবর, শিবাজী কিম্বা আওরঙজেব একেবারেই এক। তবুও আজ পর্যন্ত ইতিহাসের সেদিনকার সেই সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা অবাধে প্রচারিত হচ্ছে। তরুণ প্রজন্ম এই বিকৃত ইতিহাস পড়ে শিখে আসছে আকবর বিধর্মী শাসক আর রাণা প্রতাপ স্বাধীনতা সংগ্রামী। আওরঙজেব অত্যাচারী আর শিবাজী দেশপ্রেমিক।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের ভাবগত অনুপ্রেরণা ছিল 'বন্দেমাতরম মন্ত্র'। এই বন্দেমাতরমই পরবর্তীকালে কি কংগ্রেসের আপসমুখী কি সন্ত্রাসবাদীদের গুপ্তহত্যা, দুই ধারারই আন্দোলনের ভাবগত চালিকাশক্তি হয়ে দাঁড়ায়। বন্দেমাতরম গানটা দেশীয় ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' বই থেকে নেওয়া যার কাহিনীর উপজীব্য হচ্ছে মুসলমান শাসকদের বিরুদ্ধে হিন্দু সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহ। তীব্র মুসলমানবিরোধী হিন্দু জাতীয়তা উত্থানের আকাঙ্খা আনন্দমঠের পাতায় পাতায়। উপন্যাসে সন্ন্যাসীদের নেতা ভবানন্দের মুখে উচ্চারিত হয়——

"ধর্ম গেল, জাতি গেল, মান গেল, কূল গেল, এখন তো প্রাণ পর্যন্ত যায়। এ নেশাখোর নেড়েদের না তাড়াইলে আর কি হিন্দুয়ানী থাকে?" আর এক সন্ন্যাসী সত্যানন্দ বলে—— "আমরা রাজ্য চাহি না——কেবল মুসলমানেরা ভগবানের বিদ্বেষী বলিয়া তাহাদের সবংশে নিপাত করিতে চাই।" শুধু তাই নয় এই সন্ন্যাসীরা আবার ইংরেজদের বন্ধু। তাদের শত্রু একমাত্র মুসলমানেরা। ভবানন্দ ইংরেজ টমাসকে বলে——"কাপ্তেন সাহেব, তোমায় মারিব না, ইংরেজ আমাদিগের শত্রু নহে। কেন তুমি মুসলমানদের সহায় হইয়া আসিয়াছ? আইস তোমায় প্রাণদান দিলাম; আপাতত তুমি বন্দী। ইংরেজের জয় হউক, আমরা তোমার সুহৃদ।" এই আনন্দমঠে ইংরেজ সুহৃদ, মুসলিম বিদ্বেষী সন্ন্যাসীদের মুখে বসানো 'বন্দেমাতরম' গানই হয়ে উঠল কংগ্রেসের মূল মন্ত্র।

সেই সময়ে প্রশ্ন উঠেছিল——বন্দেমাতরমের 'মা' কে ? দেশমাতৃকা না দেবী দুর্গা ?

কারণ সন্ন্যাসীরা শক্তিমূর্তির সামনে এই গান গাইত। প্রশ্নটা আরও জরুরী হয়ে উঠেছিল কারণ ইসলাম ধর্মে মূর্তিপূজা একেবারে বারণ। সুতরাং কংগ্রেসের মধ্যে থাকা মুসলমানেরা 'বন্দেমাতরম' বলবে কি করে? বিতর্ক দেখা দিল। এক সময় ডঃ জি. এ. গ্রিয়ারসন বলেছিলেন——সংহারকর্ত্রী কালীর উদ্দেশ্যে গানটি লেখা হয়েছে। সাথে সাথে কংগ্রেসের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক স্যার হেনরী কটন বললেন——না, বন্দেমাতরম গানটি জননী জন্মভূমির আহ্বানমাত্র। তো কালীমূর্তিকে বন্দনা করেই হোক বা দেশমাতাকে শক্তিরূপে চিন্তা করেই হোক গানটা যে হিন্দু মাতৃমূর্তিকে উদ্দেশ্যে করেই করা হয়েছে তা গানের মধ্যেই পরিষ্কার করে বলা আছে——

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী

কমলা কমল-দল বিহারিণী . . . . ইত্যাদি।

এত স্পষ্ট উল্লেখের পরও কেন এত গবেষণা তার কারণ বোঝা অসম্ভব নয়।

মোদ্দাকথা, জাতীয় ভাবধারা যে ইউরোপের রেনেসাঁর মত ধর্মনিরপেক্ষ ছিল না তা পরিষ্কার। বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ অনুসারী হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদই কংগ্রেস গ্রহণ করেছিল। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে কিছু মুসলমান নেতাও ছিলেন। তাদের ভয় ছিল বাংলা বিভক্ত হলে পশ্চিম বাংলায় তারা সংখ্যালঘু হয়ে পড়বেন। কিন্তু দিন দিন আন্দোলন যত হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হল এরা ধীরে ধীরে সরে পড়লেন। যারা রইলেন তারা 'হিন্দুদের পা-চাটা' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রইলেন। আম-মুসলমানের উপর তাদের কোন প্রভাব ছিল না।

বয়কট আর স্বদেশী আন্দোলনের পাশাপাশি নানা জায়গায় গড়ে উঠল সন্ত্রাসবাদী গ্রুপ। বেশ কিছু ইংরেজ এবং ইংরেজ-ঘেঁষা ভারতীয়কে হত্যা করা হল। প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের লেখাপড়া জানা ছেলেমেয়েরাই সন্ত্রাসবাদী দলে অংশ নিত। এই আন্দোলন অনুপ্রেরণা পেয়েছিল মাৎসিনি, গ্যারিবল্ডী ও রাশিয়ার বিপ্লবী আন্দোলন থেকে। কিন্তু এই অনুপ্রেরণাকে ভারতের মাটিতে প্রোথিত করতে গিয়ে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের তাত্ত্বিক নেতারা আবার সেই হিন্দু ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের খপ্পরেই গিয়ে পড়লেন। সন্ত্রাসবাদী চিন্তাধারার সাথে খাপ খায় এমনভাবে নতুন করে গীতার ভাষ্য লেখা হল। এবং এই গীতাই হয়ে দাঁড়াল তাদের ভাবগত ভিত্তি। সন্ত্রাসবাদী দলের ছেলেদের প্রত্যেকের পকেটে থাকত গীতা। ইংরেজ-বিরোধী আন্দোলনের এই দ্বিতীয় ধারাও হিন্দু ধর্মাশ্রয়ী হওয়ায় অন্য ধর্মের লোকেদের ঠাঁই একপ্রকার ছিল না। এবং এই হিন্দু ধর্ম স্বাভাবিকভাবেই ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদী। বর্ণহিন্দু ছাড়া তথাকথিত ছোটজাতেরা মোটেও গুরুত্ব পেত না।

মুদ্রারই অন্য পিঠ——মুসলিম লীগ

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে বাংলাকে ভাগ করার প্রস্তাব মুসলমান জমিদার, বুদ্ধিজীবীদের কাছে একটা বিরাট সুযোগ বলে মনে হয়েছিল। তাই যখন বাংলার কংগ্রেস বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে ব্যাপক আন্দোলন শুরু করল, মুসলমান জমিদারেরা পাল্টা আবেদন-নিবেদন চিৎকার-ধমাকা করবার জন্যে একটা সংগঠন তৈরী করার দরকার বুঝল। উদ্যোগ নিতে এগিয়ে এলেন ঢাকার জমিদার নবাব সলীমুল্লাহ। তিনি শুধু বাংলার নয়

একটা সর্বভারতীয় দল করতে চাইলেন যারা মুসলমানদের স্বার্থ দেখবে। শেষে ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকার শাহ্‌বাগে নবাব সলীমুল্লাহের বিলাসবহুল বাগানবাড়িতে জন্ম নিল 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ'।

ইংরেজ শাসনের গোড়ার দিকে মুসলমান শাসকেরা প্রধানত ছিল ইংরেজ-বিরোধী। আবার স্থানে স্থানে যে কৃষক বিদ্রোহগুলো ঘটছিল তাতে বিদ্রোহীদের একটা বড় অংশই ছিল মুসলমান চাষী। সেইজন্যে মুসলমানদের নামটা ইংরেজ শাসকদের গুড বুকে ছিল না। তাই মুসলিম লীগ একেবারে শুরু থেকেই তাদের 'দুর্নাম' ঘোচাতে উঠে পড়ে লাগল। লীগ তৈরীর আগে প্রস্তুতি হিসাবে নবাব সলীমুল্লাহ ভারতের নানা প্রদেশের মুসলমান নেতা, জমিদার, বুদ্ধিজীবীদের কাছে একটা সার্কুলার লেটার পাঠিয়েছিলেন। এই সার্কুলারটাকে মুসলীম লীগ গঠনের কাঠামো বলা যেতে পারে। সলীমুল্লাহ সার্কুলার শুরুই করেছিলেন ইংরেজ শাসকের স্তুতি করে—"আজ আমাদের সদাশয় সম্রাটের জন্মদিন। এই শুভদিনে আমি আমার মুসলমান ভ্রাতাদের......." ইত্যাদি। আকাঙ্খিত 'মুসলমানদের সর্বভারতীয় সংঘ' এর উদ্দেশ্য বলতে গিয়ে লিখেছিলেন—"ইহার উদ্দেশ্য—তথাকথিত জাতীয় কংগ্রেসের ক্রমবর্ধমান প্রভাব প্রতিহত করা। কংগ্রেস ভারতে বৃটিশ শাসন হেয় ও খর্ব করিতে প্রয়াস পাইতেছে এবং ইহার ফলে শোচনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হইতে পারে।" কোনও লুকোছাপা নেই। কংগ্রেস বৃটিশ শাসনকে হেয় ও খর্ব করছে, এর ফল খুব ভয়াবহ, অতএব কংগ্রেসকে থামাও। ৩০ ডিসেম্বর মুসলিম লীগ গঠনের সভায় 'সভাপতি নবাব ওয়াকার-উল-মূলক বৃটিশ সরকারের প্রতি মুসলমানদের রাজভক্তি প্রকাশ করেন। বৃটিশ শাসনের অবসান হইলে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের শাসনে মুসলমানদের যে কি অবস্থা হইবে তাহা ভাবিয়া তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন'। *(এম এ রহিম—বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস)* ঐ সভায় নবাব সলীমুল্লাহ তার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনার প্রস্তাবে মুসলমানদের রাজভক্তির উদাহরণ দিয়ে গর্বের সাথে বললেন—"এখন শাসকদের কাছে আমাদের মান বাড়িয়াছে, বিলাতের প্রধান রাজনীতিবিদগণ এখন মুসলমানদের বৃটিশ সাম্রাজ্যের রাজভক্ত পাহারাদার বলিয়া মনে করেন। এখন আর সাম্রাজ্যে বিদ্রোহের আশঙ্কা নাই, সৈন্যদের উপর সীমান্ত পাহারার ভার দিয়া প্রধান সেনাপতি সাম্রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে নিশ্চিত হইতে পারেন।" সব শেষে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ তৈরী হয়ে যাওয়ার পর লীগের উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রস্তাব গৃহীত হল—

নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য সাধন করা এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য হইবে ঃ—

(১) ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে বৃটিশ সরকারের প্রতি রাজভক্তি উদ্রেক করা এবং সরকারের কোন ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাহাদের মনে ভ্রান্ত ধারণা জন্মিলে তাহা অপনয়ন করা।

(২) মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা করা ও উন্নতির ব্যবস্থা করা।

(৩) সংস্থার উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলি অব্যাহত রাখা এবং অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি মুসলমানদের মধ্যে যাহাতে বিদ্বেষভাব সঞ্চার না হয় তাহার ব্যবস্থা করা।

একদিন যেভাবে হিন্দু জমিদার, বেনিয়া, মহাজন, বুদ্ধিজীবীরা ইংরেজ শাসকদের প্রতি পুরোপুরি আনুগত্য দেখিয়ে সরকারের কাছ থেকে ছিটেফোঁটা অনুগ্রহ ভিক্ষার জন্য কংগ্রেস তৈরী করেছিল, ঠিক একইভাবে মুসলমান জমিদার, ধনী বুদ্ধিজীবীর দল বৃটিশদের চাটুকারিতা করে শাসকদের কৃপাধন্য হবার আশায় মুসলিম লীগ তৈরী করল। আরও

একটা জায়গায় উভয়েরই ভীষণ মিল তা হল দুটো দলই কৃষক, কারিগর, শ্রমিকদের বিদ্রোহের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে ইংরেজদের সাথে আপোস করল। শুধু তাই নয়, এর পর থেকে গোটা স্বাধীনতা আন্দোলন জুড়ে যখনই শ্রমজীবী মানুষেরা বিদ্রোহ করেছে ততবারই এই দু'টো দল তাকে বিপথে চালিত করেছে, তাত্ত্বিক কচকচানিতে নৈতিকভাবে দুর্বল করেছে, বৃটিশ শাসকের দমনপীড়নে প্রত্যক্ষ সাহায্য যুগিয়েছে, এমনকি কখনও কখনও ক্ষমতা পেয়ে নিজেরাও দমন করেছে।

কেন বয়কট—কেন স্বদেশী

কংগ্রেসের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে সবচেয়ে ব্যাপক আর কার্যকর কর্মসূচী ছিল বৃটিশের তৈরী পণ্য বয়কট আর তার বদলে স্বদেশী জিনিসের ব্যবহার। প্রকৃতপক্ষে এটাই কংগ্রেসের মূল কর্মসূচী হয়ে দাঁড়ায়। শহরে-গ্রামে কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকেরা এটা রূপায়ণ করতে প্রাণপণ পরিশ্রম করে। এই কর্মসূচী সাফল্য লাভ করে অসংখ্য মানুষের শ্রম আর ত্যাগের বিনিময়ে। আন্দোলনকারী বহু সাধারণ মানুষ জেলে গিয়েছেন, ঘর ভেঙেছে বহু মানুষের। আজ যখন আমরা যুক্তিনিষ্ঠভাবে আন্দোলনের পর্যালোচনা করতে বসেছি তখন আমাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে আসে কিভাবে হাজার হাজার সরল দেশপ্রেমিক মানুষদের প্রতারিত করে নিজেদের আখের গুছিয়েছে দেশীয় শিল্পপতি আর তাদের প্রতিনিধি স্বদেশী নেতারা।

মজার কথা বৃটিশ পণ্য বয়কটের প্রস্তাব প্রথম কংগ্রেসের কোন কার্যকরি সমিতির বৈঠক বা সাধারণ সভায় আসে নি। সাতই আগষ্ট ১৯০৫ সালে টাউন হলের সভায় এই প্রস্তাব গৃহীত হলেও বিদেশী পণ্য বয়কটের আহ্বান প্রথম বেরোয় এর আগে ১৩ জুলাই 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায়। কৃষ্ণকুমার মিত্র তাঁর সম্পাদকীয়তে দৃঢ়ভাবে লিখলেন যাতে কেউ বিদেশী দ্রব্য স্পর্শ পর্যন্ত না করে। ১৭ জুলাই বেনামে একটা চিঠি বেরল অমৃতবাজারে। চিঠিতে বলা হয়েছে—বিলাতী দ্রব্য তো বটেই তবু বিশেষ করে ম্যাঞ্চেস্টারে তৈরী কাপড় বয়কট করা হোক। (ম্যাঞ্চেস্টারে তৈরী কাপড় বয়কট করা প্রস্তাবের একটা সুনির্দিষ্ট অর্থ আছে, সে আলোচনায় পরে যাচ্ছি)। শেষ পর্যন্ত টাউন হলের সভায় বৃটিশ পণ্য বয়কটের ডাক দেওয়া হল। বৃটিশ পণ্য বয়কটের তাৎপর্য বুঝতে গেলে আমাদের একটু পিছিয়ে যেতে হবে। ভারতে বৃটিশ পণ্যের ঢালাও আমদানি আর ভারতীয় শিল্পপতিদের কারখানায় তৈরী পণ্যের একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আমাদের জানতে হবে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানি যখন ভারতে ব্যবসা করতে এসে ক্রমেই ভারত দখল করে বসল তখন এদেশের বেশ কিছু শিল্পসামগ্রী বিদেশে রপ্তানি হত। গন্ধক, নীল, নানারকম মশলা ছাড়াও সুরাটের ক্যালিকো, মুর্শিদাবাদের সিল্ক, ঢাকার মসলিন, ইউরোপ আর এশিয়ার বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হত। বিদেশে রপ্তানি ছাড়াও দেশীয় সামন্ত, নবাব, রাজা, অভিজাতরা ছিল এই পণ্যগুলোর অন্যতম ক্রেতা। এইসব কারিগরেরা যাদের তৈরী শিল্পসামগ্রী বিদেশে যেত তাদের আর্থিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল। এটা দেখে পরবর্তীকালে অনেক ঐতিহাসিক লিখেছিলেন যে ইংরেজরা ভারতে আসার আগে এদেশের কারিগরদের খুব সমৃদ্ধি ছিল। তাদের এ চিন্তা একেবারেই ভ্রান্ত। এইসব কারিগর ছাড়া আরও অসংখ্য কারিগর কামার, কুমোর, ছুতোর, সাধারণ কাপড় গামছা তৈরী করা তাঁতী অত্যন্ত দুরবস্থার মধ্যে দিন কাটাত। এদের তৈরী জিনিসপত্র বিদেশে যেত না। আর

ব্যবহারও করত একেবারে গরীবগুর্বোরা। কার্যত গ্রামের বেশিরভাগ কারিগর, চাষী অর্ধাহারে অনাহারে দিন কাটাত। হতে পারে ইংরেজ শাসনে চাষী আর কারিগরদের অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা দেখে ভারতীয় ঐতিহাসিকেরা এতটাই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে ইংরেজ পূর্ববর্তী বাংলার এক রঙিন অর্থনৈতিক সামাজিক ছবি এঁকে গেছেন। সুভাষচন্দ্র প্রমুখ ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতারাও একই ধারণার অনুবর্তী ছিলেন। এই কথাগুলো বললাম তার মানে এই নয় যে ইংরেজরা আসার পর ভারতের কারিগরদের জীবন সুখের হল। একথাই বলতে চাই যে ইংরেজরা আসার আগে কারিগর, চাষীরা এমন কিছু দুধেভাতে ছিল না——অথচ বেশিরভাগ ঐতিহাসিকদের প্রচারে এমন ধারণাটাই চালু আছে।

যাইহোক, ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানির ভারত দখলের পর প্রথম আঘাতটা এসে পড়ল অপেক্ষাকৃত সচ্ছল স্বাধীন কারিগরদের উপর যারা মসলিন, সিল্ক, ক্যালিকো ইত্যাদি তৈরী করত। এক তো নবাব, রাজারা সব রাজ্য খোয়ানোয় দেশীয় বাজার একেবারে ছোট হয়ে গেল। অন্য দিকে বিদেশে পণ্য রপ্তানি পুরোপুরি ইংরেজ বণিকের হাতে চলে গেল। তাদেরই নির্ধারিত দামে কারিগরদের মাল সরবরাহ করতে হত। কোম্পানির নির্ধারিত দামে, নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত পরিমাণ মাল তৈরী করতে না পারলে কম্পানির এজেন্টরা কারিগরদের কঠিন শাস্তি দিত। লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা, জোর করে জরিমানা আদায় করা, বেত দিয়ে মারা থেকে এমনকি হাতের আঙুল পর্যন্ত কেটে নেওয়া হত *(বোল্টস্——কনসিডারেসন অন ইন্ডিয়ান এ্যাফেয়ারস্)।* এই অত্যাচারে বহু কারিগর তাদের বংশানুক্রমিক পেশা ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন কাজ ধরল। যারা ছাড়তে পারল না তারা দুর্দশার মধ্যে কোনোমতে দিন কাটাতে লাগল।

ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানি একতরফাভাবে ভারত থেকে নানা ধরনের শিল্পসামগ্রী, তুলো, মশলাপাতি লুণ্ঠন করে ইংল্যান্ডে চালান দিতে থাকল। সেইসব পণ্য ইউরোপের অন্য অন্য দেশে রপ্তানি করে ইংল্যান্ড দুনিয়ার সবচেয়ে সমৃদ্ধ দেশ হয়ে উঠল। অর্থনীতিবিদদের মতে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব হওয়ার পেছনে যে মূলধন দরকার ছিল তার গোপন উৎস হচ্ছে ভারত থেকে লুঠ করা এই সম্পদ *(ব্রুক এ্যাডামস——দ্য ল অব সিভিলাইজেশন এ্যান্ড ডিকে)।*

ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লব হয়ে যাওয়ার পর সেখানকার মিল কারখানাগুলোয় প্রচুর পণ্য উৎপাদন হতে থাকে। এই পণ্যের বাজার খুঁজে পাওয়া বৃটিশ শিল্পপতিদের খুব দরকার হয়ে পড়ল। এতদিন পর্যন্ত ইংল্যান্ডে যে পণ্য তৈরী হত তা সহজেই ইউরোপে বিক্রি হয়ে যেত। এখন আধুনিক যন্ত্র দিয়ে তৈরী সুবিপুল পণ্যের বাজার পাওয়া মুশকিল হয়ে পড়ল। ইউরোপের অন্যান্য দেশও শিল্পে উন্নত হয়ে ওঠার দরুণ সেখানেও প্রচুর পণ্য উৎপন্ন হতে থাকে। ইংল্যান্ডের মিলমালিকদের নজর তখন পড়ল ভারতের বাজারের উপর। আবার ভারতের গম, চাল, চা, তুলো, নীল, আফিম, নানাধরনের খনিজ ইত্যাদি কাঁচা মাল পাওয়ার জন্যেও তারা অত্যন্ত উদগ্রীব ছিল। এখানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে তাদের দেশের শিল্পপতিদের বিরোধ দেখা দিল। কোম্পানি চায় ভারতীয় মাল ও বাজারের উপর একচেটিয়া অধিকার। উল্টোদিকে ইংল্যান্ডের শিল্পপতিরা ভারতের বাজার খোলা পেতে চাইল। তখনকার বৃটিশ পার্লামেন্টে বেশি প্রভাবের দরুণ শিল্পপতিরা ধীরে ধীরে ভারতের বাজারে ঢোকবার সুযোগ পেতে শুরু করে। শুরু হল এক নতুন কায়দায় ভারত শোষণ। একদিকে ভারতের কাঁচামাল অবাধে ইংল্যান্ডে নিয়ে যাওয়া হতে থাকে, অন্যদিকে সেই কাঁচামাল দিয়ে উৎপাদিত পণ্য আবার ভারতের বাজারে এসে চড়া দামে

বিক্রি হয়। ১৮৫৮ তে ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানি এদেশ থেকে পাততাড়ি গুটোবার পর এই প্রক্রিয়া আরও জোরদার হল। ভারত হয়ে দাঁড়াল একাধারে ইংল্যান্ডে খাদ্যশস্য, খনিজ, কাঁচামাল সরবরাহকারী আর ইংল্যান্ডে প্রস্তুত শিল্পজ পণ্যের বড় বাজার। ইংরেজরা প্রথমে ১৮৫৩ সালে বোম্বে থেকে থানে এবং পরের বছরে কলকাতা থেকে রাণীগঞ্জের কয়লাখনি পর্যন্ত রেলপথ চালু করে। বেশকিছু রাস্তাঘাট, ব্রীজও তৈরী হল। টেলিগ্রাফের মাধ্যমে বেশ কিছু যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলল। এইসব ব্যবস্থাগুলো ইংরেজরা এদেশের উন্নতির জন্যে মোটেই করে নি। ভারতের কাঁচামাল ইংল্যান্ডের নিয়ে যাবার সুবিধার জন্যেই এগুলো করেছিল। রেললাইনের নকসা দেখলে এটা পরিষ্কার হবে যে খনিজগুলো বন্দরে নিয়ে যাবার জন্যেই রেলপথ। এছাড়া দেশের আভ্যন্তরীণ রেলের মাশুল ছিল চড়া কিন্তু দেশের ভেতর থেকে বন্দরে মাল নিয়ে যাবার রেলভাড়া ছিল কম। উদ্দেশ্য পরিষ্কার। বেছে বেছে পাঞ্জাব আর সিন্ধু প্রদেশের কৃষিতে সেচের উন্নত ব্যবস্থা করা হয়েছিল যে দুটো প্রদেশ ছিল গম আর তুলোর মূল উৎপাদক। এই গম আর তুলো যেত বৃটেনে। আবার রেলপথ, সড়ক, টেলিগ্রাফ হয়ে যাবার পর নানান জায়গার কৃষক বিদ্রোহগুলো দমন করতে ইংরেজ শাসকদের আরও সুবিধে হয়ে গেল।

ভারত থেকে কাঁচামাল জাহাজে করে বৃটেনে নিয়ে যাওয়া আবার বৃটেনে উৎপাদিত পণ্য ভারতে নিয়ে আসা যথেষ্ট খরচের ব্যাপার। তাই বেশ কিছু ইংরেজ শিল্পোদ্যোগী ভারতে শিল্পস্থাপনে আগ্রহী হলেন। ১৮৫৪ সালে হুগলী নদীর ধারে রিষড়ায় অকল্যান্ড সাহেব প্রথম জুটমিল খুললেন। বাড়তে বাড়তে বেশ কিছু ইউরোপীয় শিল্পপতির উদ্যোগে চটকলের সংখ্যা দাঁড়াল ২০টা। ১৮৫৪ সালে কয়লা খনি যেখানে ছিল মাত্র তিনটে, ১৮৬০-এ ৫০ টা, ১৮৮০তে তা হল ৬০ টা। ১৮৫০-এ চা বাগান ছিল সবেধন একটা, ১৮৬৯ সালে ৪৮ টা, ১৮৭১-এ চা বাগান নয় নয় করে ২৯৫ টা। এছাড়া লোহা ও ইস্পাত কারখানাও গড়ে উঠল।

এদিকে ইংরেজদের সাথে আর্থিকভাবে গাঁটছড়া বাঁধা ভারতীয় বেনিয়া, জমিদার, দালালরা প্রচুর পয়সা রোজগার করেছে। সেই উপার্জিত বিপুল অর্থ তারা শিল্পে বিনিয়োগ করতে চাইল। ইংরেজদের পক্ষে তা বেশিদিন আটকে রাখা সম্ভব হল না। বিশেষত ১৮৫৭ সালের পর থেকে বাধা ক্রমশই অপসারিত হল। মহাবিদ্রোহ থেকে শিক্ষা নিয়ে ইংরেজ শাসকেরা ভারতের অর্থ লগ্নিকারী শ্রেণীর সাথে সংঘাতে না গিয়ে সহযোগিতার রাস্তায় চলাটাই ঠিক মনে করল। ১৮৬১ তে ইংল্যান্ডের হাউস অব কমন্সে ভারত সচিব স্যার চার্লস উডের বক্তৃতায় এটা স্পষ্ট হয়ে যায়। ফলত ভারতীয় উদ্যোগীরা শিল্প স্থাপন করতে থাকল। চা বাগান, নীলকুঠির মত ছোট ছোট উদ্যোগে ইংরেজদের ছোট অংশীদার হয়ে প্রথমে পুঁজি লগ্নি করল। কিন্তু ভারতীয়দের মালিকানায় বড় বড় শিল্পের কেন্দ্র হয়ে ওঠে বোম্বাই আর তার আশেপাশের অঞ্চলগুলো। প্রধানতঃ পারসি বেনিয়া, মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী আর মহাজনেরা এখানে সুতোকল খুলল। 'বোম্বে উইভিং এ্যান্ড স্পিনিং কম্পানি' প্রথম উৎপাদন শুরু করল ১৮৫৪ সালে। এরপর বোম্বে, আমেদাবাদ অঞ্চলে অনেকগুলো সুতো আর কাপড়ের কল স্থাপন করল দেশীয় শিল্পপতিরা, ১৮৮৬ থেকে ১৯০৫ সালের মধ্যে সূতীকাপড় তৈরী করার মিলের সংখ্যা ৯৫ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ১৯৭ টা। সুতো এবং কাপড়ের ব্যবসায় ভারতীয়রা এক প্রভাবশালী শক্তি হয়ে দাঁড়াল। মিলগুলোর এই বাড়-বাড়ন্ত সরাসরি আঘাত করল গ্রামীণ কারিগরদের উপর। ১৯০১ থেকে ১৯১১ এই দশ বছরে বৃটিশ আর ভারতীয় মিলগুলোর চাপে অন্তত পাঁচ লক্ষ তাঁতী কাজ খুইয়েছিল।

দেশীয় সুতো এবং কাপড়ের উদ্যোগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিলেতের কাপড়ের মিলমালিকদের চিন্তা বহুগুণ বেড়ে গলে। ভারতের বিরাট বাজারের অনেকটাই যে খেয়ে ফেলছে দিশি মিলগুলো। এটা বৃটিশ মালিকেরা কি করে সহ্য করে। বৃটিশ পার্লামেন্টকে চাপ দিয়ে তারা ব্যবস্থা করে ফেলল। বৃটেন থেকে ভারতে আসা পণ্যে যে আমদানি ট্যাক্স ছিল, ১৮৮২ তে তা মকুব করা হল। এতে ভারতীয় কাপড় শিল্প খুব মার খেল। ১৮৯৪ সালে কাপড়ের উপর আবার ট্যাক্স বসাতে বাধ্য হলেও সাথে সাথে ইংরেজ সরকার ভারতে উৎপন্ন কাপড়ে অন্তঃশুল্ক বসাল।

ভারতীয় শিল্পপতিরা সুযোগ খুঁজছিল। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন তাদের সামনে সে সুযোগ এনে দিল। কংগ্রেসের মাথা থেকে বিদেশী দ্রব্য বয়কট আন্দোলনের মতলব না বেরিয়ে খবরের কাগজওয়ালাদের মাথা থেকে এটা বেরোবে এতে আর আশ্চর্য কি। খবরের কাগজগুলোর মালিকানা হয় সরাসরি নয় পরোক্ষভাবে তো ছিল ভারতীয় শিল্পপতিদের হাতে। মিল মালিকেরা কংগ্রেসে থাকা তাদের প্রতিনিধিদের দিয়ে এ প্রস্তাব সহজেই গ্রহণ করাল। কংগ্রেস গোটা বাংলা জুড়ে নেমে পড়ল বয়কট আন্দোলনে। তার সাথে দেশী পণ্য কেনানোর জন্যে স্বদেশী মেলা, স্বদেশী দোকান, স্বদেশী গান, আরও কত কি। 'বঙ্গবাসী', 'সন্ধ্যা'র মত কাগজে লেখা হতে থাকল বিদেশী লবন ও চিনিতে শুয়োর আর গরুর হাড়ের গুঁড়ো মেশানো থাকে। শুধু প্রচার নয়, গায়ের জোরও চলল সমানে ভাবে। কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকরা দল বেঁধে হাটে গিয়ে বিদেশী পণ্যের দোকানদার ফেরিওয়ালাদের জোর করে তুলে দিত। বিদেশী-পণ্যের ব্যবহারকারীদের খুঁজে বার করার জন্যে ছোট ছোট ছেলেদের চর লাগিয়ে দেওয়া হত। মতিলাল রায় তাঁর 'স্বদেশী যুগের স্মৃতি'তে লিখেছেন——

বিলাতী বস্ত্র ব্যবহার করা ক্রমেই আতঙ্কের বিষয় হইল। পথে ঘাটে বিলাতী কাপড় কাহাকেও ব্যবহার করিতে দেখিলে শতকরা ৯০ জন লোক তাহার বিরুদ্ধ হইয়া উঠিত। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্যেই অধিক উৎসাহ দেখা যাইত। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় স্বদেশজাত বস্ত্র ব্যবহার করিতে একপ্রকার সকলেই বাধ্য হইয়া পড়িত। ট্রামে, রেলগাড়িতে, স্টীমারে পরস্পর পরস্পরের পরিচ্ছদের দিকে দৃষ্টি রাখিত; বিদেশী বস্ত্রের পরিচ্ছদ কাহারও অঙ্গে দেখিতে পাইলে, তাহার আর লাঞ্ছনার সীমা থাকিত না।

ভারতীয় মিলমালিকদের এই পরিকল্পনা দারুণভাবে কাজে লাগল। বিলাতী কাপড়ের বিক্রি বেশ কমে গেল। সাথে সাথে বাড়ল দেশি মিলের কাপড়ের চাহিদা। স্টেটসম্যান পত্রিকা হিসেব করে দেখাল——১৯০৪ সালের সেপ্টেম্বরে যশোর জেলায় যেখানে তিরিশ হাজার টাকার বিলাতী কাপড় বিক্রি হয়েছিল, ১৯০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সেখানে বিক্রি হয়েছে মাত্র হাজার টাকা। আর দেশি জিনিসের ছিরিই বা কি! সেই সময়ের এক প্রত্যক্ষদর্শী সরোজেন্দ্রনাথ রায় লিখেছেন——

তখন আমেদাবাদে কাপড়ের কল খোলা হয়েছে মাত্র। তার কাপড় ছিল চটের মতো। এক ধোপেই রঙ উঠে যেত। তাও আবার সব জায়গায় পাওয়া যেত না। বাংলা দেশের ছাত্র-যুবকেরা সেই কাপড় মাথায় করে বাড়ি বাড়ি নিয়ে যেতেন। আমার মনে আছে তখন আমাদের নওগাঁ শহরে (রাজশাহী জেলায়) একটা এক-দরজাওয়ালা ছোট্ট দোকানে স্বদেশী কাপড় বিক্রি হত। তার পাশেই বড় বড় দোকানে বিলেতী কাপড় যেমন সস্তা তেমন সুন্দর। রেলী ব্রাদার্স ও মাড়োয়ারী আমদানীকারকেরা বাজার বোঝাই করে রাখত। নিত্য নতুন পাড়, সুতাও মিহি ও মসৃণ। সেই প্রলোভন সম্বরণ করে আমরা তখনকার দিনে দ্বিগুন দামে আমেদাবাদের চট কিনতাম। পরিস্কার ধবধবে বিলেতী নূন

বাদ দিয়ে কালো কালো মাটিভরা করকচ নুন ব্যবহার করতাম *(জয়শ্রী—সুবর্ণ জয়ন্তী বিশেষ সংখ্যা)।*

আদর্শের আবেগেই হোক বা পেশীশক্তির ভয়েই হোক দেশি মিলের কাপড়ের তখন বিপুল চাহিদা। মওকা বুঝে মিল মালিকেরা কাপড়ের দাম আরও বাড়িয়ে দিল। এই অবস্থায় সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়ল বাংলার গরীব চাষী-মজুর-কারিগরেরা। কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকরা বিলাতী কাপড় হাটে বসতে দিত না। ফলে তাদেরকেও নেহাৎ বাধ্য হয়ে কম টেঁকসই নিকৃষ্ট দেশি মিলের কাপড় কিনতে হত। বাংলার গরীব চাষীর রক্ত নিঙড়ানো পয়সায় লাল হতে থাকল বোম্বের মিল মালিকরা। আর বাংলার সোনার টুকরো ছেলেরা তাদের নেতাদের আদেশে সেই কাপড় ঘাড়ে করে হাটে-বাজারে ফিরি করতে থাকল।

এই দেশি মিলমালিকরা মোটেই ভারতীয় জনসাধারণের উপর সদয় ছিল না। বরং তারা নিজেদের স্বার্থে প্রায়ই ইংরেজ শিল্পপতিদের সাথে হাত মেলাত। বৃটিশ শিল্পের সাথে প্রতিযোগিতা চালাতে তারা অনেক কম মজুরি দিয়ে অনেক বেশি সময় কাজ করাত। শ্রমিক শোষণের ব্যাপারে তারা তাদের গুরু ইংরেজদের ছাড়িয়ে গিয়েছিল। আর সবই চলত দেশসেবার নামাবলী গায়ে দিয়ে। বৃটিশ পার্লামেন্টে যখন শ্রমিকদের কিছু সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্যে বিল আনা হয়েছিল তখন ইংরেজ শিল্পপতিদের সাথে ভারতীয় শিল্পপতিরাও একযোগে তাতে বাধা দিয়ছিল। বিলটা পাশ হলেও এদেশে বৃটিশ আর দেশীয় মিলমালিকেরা একজোট হয়ে তাকে কার্যকরী হতে দেয় নি। বাস্তবিকই বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে 'বিলেতী পণ্য বয়কট এবং স্বদেশী গ্রহণ' ভারতীয় শিল্পপতিদের স্বার্থে এমন এক অপূর্ব কৌশল উদ্ভাবন, যা দেখে গোখলে সেই বিখ্যাত উক্তি করেছিলেন— 'আজ যা বাংলা ভাবে, কাল ভাবে তা গোটা দেশ'।

এই আন্দোলন ভারতীয় পুঁজির মালিকদের বিরাট সুযোগ করে দিল এবং পরবর্তীকালে আমরা দেখব যে তারাই এক বিশাল শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। এই দেশীয় শিল্পপতিরা হয়ে দাঁড়াল কংগ্রেস তথা ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল চালিকা শক্তি। এরাই ভারতীয় ইতিহাসের চাকা সুপরিকল্পিত ভাবে নিজেদের অনুকূলে নিয়ে গেছে। কংগ্রেস তাদের আঙুলে সুতোয় বাঁধা পুতুল মাত্র।

নরমপন্থী-চরমপন্থী কাজিয়া

জমিদার, শিল্পপতি, ধনী বুদ্ধিজীবীদের স্বার্থরক্ষাকারী সংগঠন হিসেবে কাজ করতে গিয়ে কংগ্রেস একটা গুরুতর সংকটে পড়ল। একে তো এই তিন গোষ্ঠীর নিজেদের মধ্যে নানারকমের স্বার্থের সংঘাত ছিল। সামঞ্জস্য রাখার চেষ্টা করলেও কখনও কখনও তা পরস্পরের স্বার্থবিরোধী হয়ে দাঁড়াত। তার উপর বিরাট সমস্যা হয়ে সামনে এল ক্রমেই বেড়ে চলা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। লেখাপড়ার সুযোগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী শিক্ষাটা আর কেবলমাত্র ধনী নেটিভদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকল না। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের অনেক ছেলে লেখাপড়া শিখল। এইসব যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বিশেষ ছিল না। ইংরেজ সরকারে ভালো চাকরী. এমনকি ওকালতি ডাক্তারির মতো স্বাধীন কাজেও বড়লোকদের ছেলেরা মুরুব্বির জোরে ঢুকে পড়ত। গরীব শিক্ষিত যুবকের পক্ষে একটা কেরানির চাকরি জোটানোও মুশকিল ছিল। এছাড়া প্রতি পদে পদে শ্বেতাঙ্গ শাসকেরা তা সে উচ্চপদস্থ আমলাই হোক কিম্বা গোরা পল্টনই হোক যত্রতত্র নেটিভদের বিনা কারণে অপমান,

হেনস্তা, এমনকি মারধর পর্যন্ত করত। ইংরেজ বুদ্ধিজীবীরা অবিরত প্রকাশ্যে ভারতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করত। বড়লাট কার্জন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সভায় ভারতীয় সভ্যতা নিয়ে এক নিদারুণ অপমানসূচক মন্তব্য করলেন। এ সমস্তই সদ্যশিক্ষিত তরুণদের মনে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করল।

এইসব শিক্ষিত যুবকেরা জমিদার, শিল্পপতি পরিবারের ছেলেদের মতো ইংরেজদের মুখাপেক্ষী ও অনুগ্রহভাজন ছিল না। ফলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জোরদার আন্দোলন করতে এরা ছিল খুবই উদগ্রীব। তীব্র বেকারী, প্রতি পদে পদে বিদেশী শাসকদের অত্যাচার-অপমান, কংগ্রেসের দাসসুলভ আচরণ——এই যুবকদের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের দিকে ঠেলে দিল। কিন্তু সাথে সাথে কংগ্রেসের ভিতরেও এমন নেতৃত্ব গড়ে উঠল যাদের মধ্যে দিয়ে এই যুবকেরা নিজেদের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন দেখতে পারে। এরা কংগ্রেসের মধ্যে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী। এদের বেশির ভাগটাই স্বাধীন পেশায় নিযুক্ত শিক্ষিত মানুষ। জমিদার, শিল্পপতিদের স্বার্থ এদের সাথে মেলে না। আবার এই সময় বৃটিশ সরকার এমন কতগুলো ব্যবস্থা নিয়েছিল যেগুলো এদের স্বার্থে সরাসরি আঘাত করে। পাঁচশো টাকার বেশি বাৎসরিক আয়ে আয়কর সীমা আগে ছিল, নতুন এক আদেশে বাৎসরিক একশো টাকার বেশি আয় হলেই আয়কর দিতে হবে এমন আইন চালু হল। এটা সরাসরি উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর আঘাত। বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কারের নামে ১৯০৪ সালে টিউশন ফি বাড়ানো হল। মধ্যবিত্তদের ভয় হল যে এতে তাদের সুযোগ কমে যাবে আর ধনীরাই কেবল পড়াশুনার সুযোগ পাবে। এছাড়া কর্মক্ষেত্রে সর্বত্রই শ্বেতাঙ্গদের সুযোগ বেশি। কম যোগ্যতা নিয়েও তারা শিক্ষিত ভারতীয়দের উপর ছড়ি ঘোরাচ্ছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিশ্চিত মনে হল কংগ্রেসের বর্তমান নেতৃত্ব কেবল জমিদার, মিল মালিকদের স্বার্থই দেখবে, বিপুল সংখ্যক মধ্যবিত্তদের প্রতি তার নজর নেই। সুতরাং মধ্যবিত্তদের প্রতিনিধিরা বিকল্প নেতৃত্ব তৈরী করল। কংগ্রেসের মধ্যে গড়ে উঠল নতুন একটা উপদল। অফিসিয়াল নেতৃত্ব দাবী-দাওয়ায় খুব নরম তাই ওরা নরমপন্থী, আর নতুন উপদলের লক্ষ্য একেবারে চরম। এমনকি বৃটিশের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ পর্যন্ত এরা চায়——তাই এরা চরমপন্থী। বালগঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল, লাজপৎ রায়, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ এদের নেতা। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে এই দল দারুণ জনপ্রিয় হল। নামে চরমপন্থী হলেও এই দল মধ্যবিত্তদের স্বার্থরক্ষাকারী একটা সংস্থার বাইরে কিছু ছিল না। সেই বয়কট, সেই স্বদেশীর বাইরে নতুন কোন ক্রান্তিকারী কার্যক্রম এরা দিতে পারে নি। কি নরমপন্থী, কি চরমপন্থী কোনও দলের সাথেই দেশের অধিকাংশ মানুষ——চাষী, কারিগর, শ্রমিকদের কোন নাড়ীর টান ছিল না।

চরমপন্থী দলের ইংরেজ-বিরোধী আর রণং-দেহী মনোভাব কংগ্রেস নেতৃত্ব মেনে নিতে পারল না। কংগ্রেস চায় বৃটিশ শাসনে থেকেই কিছু সুযোগ সুবিধে আদায়। বৃটিশ শাসনের সাথে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ আর দেশজুড়ে জঙ্গী আন্দোলন, কোনটাই জমিদার মিল-মালিকদের অভিপ্রেত নয়। এতে উৎপাদন, পণ্য সরবরাহ, আইন-শৃঙ্খলা, সর্বোপরি শিল্পের মুনাফা এবং জমিদারির কর আদায় খুবই ব্যাহত হবে। তার উপর আন্দোলন সশস্ত্র পথে গেলে গোটা দেশে একটা গণ-অভ্যুত্থানের আশঙ্কা থেকেই যায়। সুতরাং কংগ্রেস নেতৃত্ব চরমপন্থীদের বরদাস্ত করতে পারল না। ফলে ১৯০৭ সালের সুরাট কংগ্রেসে চরমপন্থীরা কার্যত কংগ্রেস নেতৃত্ব থেকে বিদায় নিল। নেতৃত্বের এই অনৈক্যের সুযোগে ইংরেজ সরকার চরমপন্থীদের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানল। অনেক নেতা আর

কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হল। বিপিনচন্দ্র পাল চরমপন্থী রাজনীতি ছেড়ে দিলেন। বালগঙ্গাধর তিলক আর অরবিন্দ ঘোষকে জেলে যেতে হল। আবার জেলের নির্জন কুঠরীতে সে যুগের 'শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী' অরবিন্দ 'ভগবান দর্শন' পেয়ে 'বিপ্লবীয়ানার' কঠিন রাস্তা থেকে সরে পড়লেন। মোটকথা চরমপন্থী দল ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

কংগ্রেস নেতাদের দৃষ্টিতে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে এক বিরাট জয় হল। বাংলাকে ভাগ করা হল বটে, তবে যেভাবে ভাগ করা হল তাতে কংগ্রেস নেতারা অখুশী হলেন না। মর্লি-মিন্টো সংস্কারে খুশী না হলেও এর ক্ষীরটুকু নিতে ভুললেন না। সব মিলিয়ে কংগ্রেস খুশী। অতএব আন্দোলন-টান্দোলন বন্ধ। কিন্তু মধ্যবিত্ত মানুষের যে বেকারি-অর্থকষ্ট-ক্ষোভ তার কোনও সুরাহা হল না। দিন দিন শিক্ষিত বেকারের সমস্যা এক ভয়াবহ চেহারা নিল। চরমপন্থী দল ভেঙ্গে গেলেও এ দলের ভাবধারা এইসব যুবকের মধ্যে থেকে মুছে গেল না।

তিলক জেল থেকে মুক্তি পেলে চরমপন্থী চিন্তার মানুষেরা আবার সংগঠিত হবার সুযোগ পেল। ধীরে ধীরে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছিল তাতে ক্রমশই বিপুল থেকে বিপুলতর হয়ে ওঠা এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে এড়িয়ে কর্মসূচী নেওয়া কংগ্রেসের পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছিল না। আবার এই মধ্যবিত্তরাই কংগ্রেসের মূল শক্তি। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে এরাই প্রাণপাত পরিশ্রম করে সফল করেছিল। কংগ্রেসের হয়ে ঘাম ঝরাতে ধনীরা দলে দলে আসবে না। দলে দলে আসবে এরাই। সুতরাং এদেরকে কংগ্রেসে সামিল করতেই হবে। কিন্তু কংগ্রেসের নেতৃত্ব যারা কার্যত জমিদার, মিল-মালিকদের এজেন্ট তাদের পক্ষে ধনী গোষ্ঠীর স্বার্থ বজায় রেখে এই উদীয়মান মধ্যবিত্তদের মন যোগানো সম্ভব হল না। তারা এমন কোন কার্যক্রম নিতে ব্যর্থ হল যা জমিদার শিল্পপতিদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখবে অথচ শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা তাতে সোৎসাহে যোগ দেবে। সুতরাং কংগ্রেস থেকে এই পুরনো রক্ষণশীল নেতৃত্বের বিদায় অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ল। কংগ্রেসের চাই এমন একজন অবতার যে একসাথে জমিদার, শিল্পপতি, শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের স্বার্থ একই ঝুলিতে সুরক্ষিত রাখতে পারে। এবং মিলল সেই অবতার।

মেলাবেন তিনি মেলাবেন——মঞ্চে গান্ধীর প্রবেশ

কংগ্রেসের রক্ষণশীল নেতৃত্ব নিজেদের আসন্ন বিদায়ের মুখে এমন নেতৃত্বকে প্রতিষ্ঠা দিতে উদগ্রীব হল যে একাধারে ধনীদের স্বার্থের রক্ষক আবার আম-জনতার সংগ্রাম আকাঙ্খার প্রতিফলন হয়ে উঠতে পারে। তিনি তখন দক্ষিণ আফ্রিকায় বাড়ছেন। ভারতীয় নেতারা এ দেশের কথা ছেড়ে তারই আন্দোলনের কথা ভারতজুড়ে প্রচার শুরু করলেন। এবং শেষ পর্যন্ত তিনি এলেন।

গান্ধীকে পেয়ে রক্ষণশীল নেতারা হাতে চাঁদ পেয়ে গেল। তারা নিজেরা যা পারে নি অর্থাৎ মধ্যবিত্ত, জমিদার আর পুঁজিপতিদের স্বার্থের সমীকরণ করতে, তা করার মতো লোক পাওয়া গিয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীর আন্দোলন সম্পর্কে খোঁজখবর তাদের কাছে আগেই ছিল। যখন বোম্বাই বন্দরে জাহাজ থেকে নামলেন তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে বড় একটা জনতার জমায়েত করানো হল। গান্ধী নেতা হয়েই ভারতের মাটিতে পা রাখলেন। গান্ধীকে কংগ্রেসের একছত্র নেতা বানানোর জন্য নরমপন্থী নেতারা উঠে পড়ে

লাগলেন। গোখলের সাথে পরামর্শ করে গান্ধীর কার্যক্রম ঠিক হতে থাকল। বোম্বাই-এর বিশিষ্ট অভিজাত মি. পেটিট তার বিলাসবহুল অট্টালিকায় ডেকে গান্ধীকে সম্বর্ধনা দিলেন। গুজরাটি নাগরিকদের পক্ষ থেকেও সম্বর্ধনা দেওয়া হল। সব জায়গাতেই রক্ষণশীল নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

দেশে ফিরেই গান্ধী অতি দ্রুত কংগ্রেসের ভিতরের অবস্থাটা বুঝে নিতে চাইলেন। দলের ভিতরে এত দলাদলি, গোলমাল দেখে বুঝে গেলেন এ দলের ভিতরে ঢুকলে কিছু হবে না। বরং নিজে স্বাধীন কার্যক্রম নিয়ে কংগ্রেসকে নিজের পিছনে ছোটাতে হবে। তিনি তাই করলেন আর নরমপন্থী নেতৃত্ব তারই আঙুলের ইশারায় চলতে থাকল। প্রথমে গান্ধী যে সুযোগ পেলেন তা হল বিহারের চম্পারণে নীল চাষের বিরুদ্ধে আন্দোলন। এখানে গান্ধী কোন কংগ্রেস নেতার সাহায্য নিলেন না, কেবলমাত্র স্থানীয় কৃষক নেতাদের সঙ্গে একসাথে কাজ করলেন। গান্ধীর ভাষায়——"নেতৃবর্গকে ডাকি নাই। মালব্যজী আমাকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে আবশ্যক হইলে যেন সংবাদ দিয়া তাঁহাকে লইয়া আসি। তাঁহাকেও কষ্ট দিই নাই।" *(এম কে গান্ধী——মাই এক্সপেরিমেণ্ট উইথ্ দ্য ট্রুথ)।* এরপর গুজরাটের খেড়া সত্যাগ্রহ। এদিকে ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বেধে গেছে। বৃটেন সে যুদ্ধে অন্যতম অংশগ্রহণকারী। যুদ্ধে অনেক সেনা দরকার। ভারত হতে পারে সেনা সরবরাহকারী। অতএব 'বড়লাটের খুব ইচ্ছে' অনুযায়ী গান্ধী সেনা সংগ্রহে লেগে গেলেন। কারণ, গান্ধীর ভাষায় বড়লাট 'চেমসফোর্ডের সাথে আমার মৈত্রী ছিল'। আর সৈন্য সংগ্রহের সে কি ধুম! এত প্রবল চেষ্টা যে গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে গান্ধী গুরুতর অসুস্থ হয়ে গেলেন। দৃশ্যটা দেখার মত——সাম্রাজ্যবাদীদের নিজেদের বাজার দখলের যুদ্ধে অহিংসার পূজারী গান্ধী উঠে পড়ে সেনা সংগ্রহ করছে। গান্ধীর আশা যুদ্ধের পর ইংরেজরা ভারতকে স্বায়ত্তশাসন দেবে। "আমি মনে করিতাম মি. মন্টেগু ভারতের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিবেন না"।

কিন্তু গান্ধী তথা কংগ্রেস নেতাদের এই আশা আর বাস্তব জীবনে গরীব-মধ্যবিত্ত মানুষের অভিজ্ঞতা দেখা গেল সম্পূর্ণ বিপরীত। যুদ্ধের দিনগুলোতে মানুষকে চরম বিপর্যয়ের মধ্যে পড়তে হল। জিনিসপত্রের দাম আকাশ-ছোঁয়া। গরীব মানুষ তো দূরস্থান মধ্যবিত্তদের পক্ষে জীবন নির্বাহ করা কষ্টকর হয়ে পড়ল। ক্ষুধার্ত শ্রমিকেরা কলে-কারখানায় ধর্মঘট শুরু করে দিল, দু-এক জায়গায় কৃষকেরা বিক্ষিপ্তভাবে খাজনা বন্ধ করল। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী আবার সন্ত্রাসবাদের দিকে ঝুঁকল। এদিকে কংগ্রেস তার দু-মুখো নীতি চালিয়ে যাচ্ছে। একদিকে ভারতীয় শিল্পপতিদের স্বার্থে বৃটিশ শাসকের উপর চাপ সৃষ্টি, চাষী-মজুরদের দাবী-দাওয়া নিয়ে অল্পবিস্তর স্থানীয় ভিত্তিক আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকল। অন্যদিকে যুদ্ধে ইংরেজদের সাহায্য-সহযোগিতার ব্যাপারে কোনও ঘাটতি রাখল না। এমন কি পরে, সাম্রাজ্যবাদীদের নিজেদের মধ্যে সাম্রাজ্য দখলের যে যুদ্ধ, সেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর কংগ্রেস এই যুদ্ধকে মুক্তি ও স্বাধীনতার যুদ্ধ বলে ঘোষণা করেছিল এবং যুদ্ধ জেতার জন্য বৃটিশ-রাজকে অভিনন্দন জানিয়েছিল। *(পট্টভি সীতারামাইয়া——দ্য হিস্ট্রি অব দ্য ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস. Vol. I)।* কিন্তু গান্ধী তথা কংগ্রেসের এই ইংরেজ-তোষণ সত্ত্বেও বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে প্রতিদানে কিছুই মিলল না। উল্টে সন্ত্রাসবাদী দমনের নাম করে আনা হল কুখ্যাত রাওলাট বিল।

গোটা দেশ তখন রাগে-ক্ষোভে ফুঁসছে। গান্ধী অসুস্থ শরীরে আমেদাবাদে এলেন। সেখানে বল্লভভাই প্যাটেলের প্রশ্নের উত্তরে গান্ধী বললেন——"যদি আমি রোগে শয্যাশায়ী না থাকিতাম তবে আমি একাই ঝাঁপাইয়া পড়িতাম এবং আমার পিছনে অপরে আসিবে

এই আশা রাখিতাম। কিন্তু শরীরের এই অবস্থায় আমার কাজে নামার শক্তি আদৌ নাই।" এখানেও গান্ধীর ইচ্ছা তিনি ঝাঁপিয়ে পড়বেন আর অন্যরা তার পিছনে দাঁড়াবে। এ আস্থা গান্ধীর এমনি এমনি আসে নি। কংগ্রেস যদি কোনও কারণে তার পিছনে দাঁড়াতে দ্বিধা দেখাত, তবুও পিছনে দাঁড়ানোর লোক ছিল। গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আসার সময় ইউরোপীয় আর ভারতীয় মিলিয়ে একটা দল সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। এই দল কাঙরী গুরুকুলে শ্রদ্ধানন্দের আশ্রমে, শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের আশ্রয়ে বসবাস করছিল। গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় বাস করার সুবাদে এরা ভারতের বেশ কিছু প্রথম সারির মানুষকে গান্ধীর অনুরাগী করে তুলেছিলেন, আর নিজেরা তো ছিলেনই। সুতরাং গান্ধীর কখনও পিছনে দাঁড়াবার লোকের অভাব হয় নি। আর কংগ্রেস, তার অবস্থা তো তখন পাল-ছেঁড়া নৌকোর মতন। একটা উপযুক্ত নেতা পেলে বর্তে যায়। ১৯১৯ সালের ১৮ মার্চ রাওলাট আইন জারি করা হল। এখন কিভাবে আন্দোলন চলবে, কি নেওয়া হবে কর্মসূচী? নিশ্চয়ই গান্ধী কংগ্রেসের তাবড় তাবড় নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন, ভারতজুড়ে ঘুরে ঘুরে জনমত গঠন করবেন। গান্ধী ওসব হ্যাপাতেই গেলেন না। বরং একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে ঘোষণা করলেন——"আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে একটা ধারণা গতরাত্রে স্বপ্নাবস্থায় আমি পাইয়াছি। এই আইনের প্রত্যুত্তর স্বরূপ আমরা সারাদেশে হরতালের ডাক দিব। সত্যাগ্রহ আত্মশুদ্ধির যুদ্ধ, ইহা ধর্ম-যুদ্ধ। ধর্ম-কার্য শুদ্ধি দ্বারাই শুরু করা উচিত বোধ হয়। ঐ দিন সকলে উপোস করিবে ও নিজেদের কাজ-কর্ম বন্ধ রাখিবে।" *(মাই এক্সপেরিমেন্ট উইথ্ দ্য ট্রুথ)*। আসলে গান্ধী অন্য রাস্তা ধরেছেন। কংগ্রেসের গোষ্ঠীকোন্দল আর সবাই-নেতা ভাব বুঝে নিয়ে তিনি নিজেকে সকলের ঊর্ধ্বে এক ঈশ্বর প্রেরিত মানুষ হিসেবে প্রতিপন্ন করতে চাইলেন। কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাসে জর্জরিত এই দেশের মানুষকে অলৌকিকত্ব ঈশ্বরত্বের মোহে ভোলাও, তাড়াতাড়ি জনপ্রিয়তা মিলবে। এদেশে বড় বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, শিল্পী, রাজনীতিকের চেয়ে সাধু ফকিরের কদর বেশি। তাই লোকে যা চায় তাই বলো। স্বপ্নে প্রদত্ত শিকড়-বাকড়ে, তাবিজ-কবচে মানুষ কাতারে কাতারে ভিড় করছে, সুতরাং রাজনীতিতেও স্বপ্ন-প্রদত্ত দাওয়াই ঝাড়ো। স্বপ্ন-প্রদত্ত মানেই ঈশ্বর-প্রদত্ত। অতএব এর যৌক্তিকতা নিয়ে কোন প্রশ্ন উঠতেই পারে না। তার সাথে যোগ করা হল ধর্ম-যুদ্ধের ডাক। সফল না হয়ে যায় কোথায়।

৬ এপ্রিল দেশজুড়ে হরতালের ডাক দেওয়া হল। দেশের মানুষ দুঃখ ক্ষোভে আগুন হয়ে আন্দোলনের জন্যে প্রস্তুত হয়েই ছিল। হরতাল দারুণ সফল হল। কিন্তু হরতালের কর্মসূচীতে নেওয়া হয়েছিল সভা, উপবাস, প্রার্থনা ইত্যাদি। ধর্ম আর রাজনীতির এই অপূর্ব মেলবন্ধন আর কোথায়ই বা মিলবে। আন্দোলন সবচেয়ে ফলপ্রসূ হল পাঞ্জাবে। সরকার অমৃতসরের দুই জনপ্রিয় নেতা সৈফুদ্দিন কিচলু আর সত্যপালকে পাঞ্জাব থেকে বহিষ্কার করলে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। এরকমই এক আন্দোলনের জমায়েতে জেনারাল ডায়ারের নেতৃত্বে বৃটিশ পুলিশ মিলিটারি নিরস্ত্র শত শত মানুষের উপর গুলি চালিয়ে দিল। দেশ ক্ষোভে ফেটে পড়ল। গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিতে বাধ্য হলেন। কিন্তু সাথে সাথে দেশবাসীকে সাবধান করে দিলেন——'আন্দোলনকে অবশ্যই হতে হবে অহিংস'।

কিন্তু ভারতের জনতা তখন ছিল ক্ষোভের বারুদ। গান্ধীর রেখেঢেকে আন্দোলন তাদের ক্ষোভের জ্বালামুখে বলগা পরাতে পারল না। স্থানে স্থানে আন্দোলন সহিংস রূপ নিল। ৩০ মার্চ দিল্লীর রেলস্টেশনে পিকেটিং করা হয়েছিল। সেখান থেকে দু'জন যুবককে

পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। জনতা তাদের মুক্তির দাবীতে জোরদার আন্দোলন শুরু করল। পুলিশ আর মিলিটারি গুলি চালিয়ে কয়েকজন বিক্ষোভকারীকে হত্যা করে। পাঞ্জাবের অমৃতসরে ব্যাপক গন্ডগোল শুরু হল। আন্দোলনকারীরা অনেকগুলো ব্যাঙ্কে হামলা চালিয়ে টাকা লুঠ করে, পরে ব্যাঙ্ক পুড়িয়ে দেয়। বেশ কয়েকজন ইংরেজকে ধরে প্রচন্ড মারধর করে, কয়েকজন মারাও যায়। *(জে এম সেনগুপ্ত— দ্য কংগ্রেস এ্যান্ড দ্য ন্যাশনাল মুভমেন্ট)।* অমৃতসর শহরে সরকার সামরিক আইন জারি করে। কিন্তু এতেও কোন কাজ হল না, পাঞ্জাবের কয়েকটা জায়গায় আন্দোলনকারীরা 'দন্ডফৌজ' নামে এক রক্ষীদল পর্যন্ত গড়ে তুলল। মাঝে মাঝেই থানা আক্রমণ করে বন্দীদের ছিনিয়ে নিয়ে আসা চলতে থাকে। এমনকি স্থানীয় চাষীদের সাহায্যে রেলকর্মীরা কয়েকটা সৈন্য বোঝাই ট্রেনও লাইনচ্যুত করে। সারা ভারতের শ্রমিকেরা ব্যাপক আন্দোলন করে। কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, কানপুরে ঘনঘন ধর্মঘট বিক্ষোভ সমাবেশ হয়। ১৯২১ এর ১৭ নভেম্বর প্রিন্স অব ওয়েলেশের ভারতে আসার দিনগুলোতে বোম্বাইতে চারদিনের স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট হল। গান্ধী এই ধর্মঘটের নিন্দা করলেন। শুধু শ্রমিকেরা নয় ভারতবর্ষ জুড়ে বিক্ষিপ্তভাবে কৃষকদের গণঅন্দোলনও হয়েছিল। কেরালার মোপলাদের বিদ্রোহের ধর্মীয় রূপ থাকলেও তা ছিল মূলত জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষক বিদ্রোহ। যুক্ত প্রদেশের (এখনকার উত্তরপ্রদেশ) ফৈজাবাদ, রায়বেরিলি, পরবর্তীতে সুলতানপুর জেলায় বিদ্রোহ দেখা দিল। সেখানকার বিদ্রোহ ছিল অত্যাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে। ক্ষুব্ধ কৃষকরা জমিদারের ক্ষেতের ফসল নষ্ট করল, এমনকি জমিদারদের বাড়ীতেও হামলা চালিয়েছিল। এই বিদ্রোহের অন্যতম বিশেষত্ব ছিল যে এদের নেতা বাইরের কেউ ছিল না। তথাকথিত ছোটজাতের কৃষকদের মধ্যে থেকেই তাদের নেতা উঠে এসেছিল। কৃষক কবিরা তাদের আন্দোলনের উপযোগী গান নাটক তৈরী করেছিল। কৃষক গায়কেরাই সেই গান গেয়ে জনমত গঠন করত। এইভাবে তারা আন্দোলনের একটা সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল তৈরী করতে পেরেছিল।

কংগ্রেস নেতারা আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। বেশ তো চলছিল নরমে গরমে সুযোগ সুবিধা আদায়। এর মধ্যে কোথা থেকে চাষী-মাজুরেরা এসে সাধের সুশৃঙ্খল আন্দোলনকে বিপথে চালনা করছে। শুধু ইংরেজদের বিরুদ্ধে হলেও হত। এদের আন্দোলন তো ভারতীয় শিল্পপতি জমিদারদের ভিত নাড়িয়ে দিচ্ছে, যারা কিনা কংগ্রেসের ভিত্তিভূমি। গান্ধী আর অপেক্ষা করতে পারলেন না। একটা সামান্য ঘটনার অজুহাতে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন। এর পরেও আমরা দেখব যখনই আন্দোলন শ্রমিক-কৃষকের মুক্তির সংগ্রামে পরিণত হওয়ার সামান্য সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছে, তখনই তিনি তড়িঘড়ি আন্দোলন গুটিয়ে নিয়েছেন। আর সব কংগ্রেস নেতাদের মত গান্ধীরও খুব ভয় শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনকে। নেতৃত্বও যেন কখনো চাষী-মজুরের হাতে না চলে যায়। ধর্মাশ্রয়ী অহিংস আন্দোলন তারই উপযুক্ত বর্মই বটে।

গান্ধী নিজের পছন্দমত কর্মসূচী কংগ্রেসকে নিতে বাধ্য করাতে পারলেও সব কংগ্রেস নেতাদের তিনি বশে আনতে পারেন নি। তাদের অন্যতম ছিলেন বালগঙ্গাধর তিলক, চিত্তরঞ্জন দাশ, মদনমোহন মালব্য, এ্যানি বেসান্ত প্রমুখ। নিজের কর্মসূচী কংগ্রেসে গৃহীত হতে এরা বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। গান্ধী অন্য উপায়ে শক্তি বাড়ানোয় মন দিলেন। তখন তুরস্কের খলিফাকে ইংরেজরা ক্ষমতাচ্যুত করায় ভারতীয় প্রভাবশালী মুসলমানেরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিল। তারা খিলাফৎ আন্দোলন শুরু করল। গান্ধী খিলাফতীদের সঙ্গে হাত মিলালেন। সুভাষচন্দ্রের ভাষায়——"....তিনি মুসলিম নেতৃবর্গ ও নিখিল ভারত খিলাফৎ

কমিটির সঙ্গে মৈত্রী সম্পাদন করে নিজের শক্তিবৃদ্ধি করেছিলেন। বস্তুত, নিজের শক্তি সম্পর্কে গান্ধীজী সুনিশ্চিত ছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন যে, কংগ্রেস যদি তাঁর অহিংস অসহযোগের পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যানও করে তাহলে খিলাফৎ সংগঠনগুলির সমর্থন লাভ করে তিনি আন্দোলন শুরু করতে পারবেন।" *(সুভাষচন্দ্র বোস—দ্য ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল)।* এই ভাবে দু'টো বিবাদমান ধনী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা একই মঞ্চে এসে দাঁড়াল। অবশ্য পরবর্তীকালে এদের নেতাদের ধর্মীয় গোঁড়ামিতে আর ইংরেজ শাসকদের কূটকৌশলে এরা আর কোনও দিনই একসাথে হতে পারে নি। একসাথে হয়েছে তখনই যখন কোন শ্রমিক-কৃষকদের বিক্ষোভ আন্দোলনের মুখে তারা পড়েছে।

যাইহোক, কংগ্রেসের মধ্যে গান্ধীর এই শক্তিবৃদ্ধি আর জনসাধারণের মধ্যে গান্ধীর কৌশলী অলৌকিক সাধু'র ইমেজ তৈরী করাতে কংগ্রেসের সদস্য হু হু করে বাড়তে থাকল। জমিদার, শিল্পপতি আর মধ্যবিত্তদের স্বার্থ গান্ধী একই মঞ্চে আনতে সফল হলেন। সাথে চাষী-মজুরের জন্যে কিছু লোক-দেখানি আন্দোলন। চিত্তরঞ্জনের মতো নেতারা যারা তার সাথে কখনও মিল কখনও অমিল নীতিতে চলতেন তারা আঞ্চলিক স্তরেই সীমাবদ্ধ রইলেন। গান্ধী বিরোধী হলেও চিত্তরঞ্জন কখনই ভারতীয় শিল্পপতি, জমিদারদের বিরোধী ছিলেন না। তিনি কখনও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরোধিতা করেন নি। শিল্পপতিদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দিতে বৃটিশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টিতে তিনি ছিলেন সর্বদাই সচেষ্ট। তিনি কেবল গান্ধীর মত ধীরে চলার নীতিতে একমত ছিলেন না। তিনি চাইতেন 'শতকরা আটানব্বুই জনের জন্য স্বরাজ'। তবে সেই স্বরাজ মানে—"বৃটিশ সম্রাজ্যের বাইরে যেতে হবে এমন কোনো কথা নেই। বরং সাম্রাজ্যের ভিতরে থাকলে অনেক সুবিধা আছে। ডোমিনিয়ান স্টেটাসের মানে আজ আর অধীনতা বলা চলে না।" *(পি সি রায়—লাইফ এ্যান্ড টাইমস্ অব সি আর দাস)*। এই হচ্ছে ঝুলির ভেতরকার আসলি বেড়াল।

এই রাজনৈতিক পটভূমিতেই সুভাষচন্দ্রের ভারতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ।

দ্বিতীয় পর্ব

সুভাষচন্দ্র : প্রস্তুতি কাল

পরিবার এবং স্কুলের দিনগুলি

এক উচ্চ-মধ্যবিত্ত রক্ষণশীল পরিবারে সুভাষের জন্ম। আর বাংলার রাজনৈতিক ডামাডোলের বাইরে কটকের শান্ত নিস্তরঙ্গ পরিবেশে তার বেড়ে ওঠা। সুভাষচন্দ্রের জন্ম তথাকথিত উঁচু বংশে। তিনি আত্মজীবনীতে গর্ব করে তার ঊর্ধ্বতন সাতাশ পুরুষের পরিচয় দিয়েছেন। বাবা জানকীনাথ বসু কটকে ওকালতি করে বিস্তর রোজগার করতেন। ছেলেদের পড়াশোনার সুবিধার জন্যে কলকাতায় এলগিন রোডে একটা বাড়ী কিনেছিলেন। বসু পরিবার ছিল বেশ ইংরেজ-ঘেঁষা। জানকীনাথ ছিলেন সরকারী পাবলিক প্রসিকিউটর। পরে তিনি আইনসভারও সদস্য হন। বৃটিশ সরকার খুশি হয়ে তাকে রায়বাহাদুর উপাধিও দিয়েছিল। সেই খেতাব জানকীনাথ ত্যাগ করেন ১৯৩০ সালে যখন কংগ্রেস নেতা হিসাবে সুভাষচন্দ্রের ভারতজোড়া নাম। জানকীনাথের পরিবারে ছেলে-বাবা, দুই ভাই-এর মধ্যে চিঠির আদান-প্রদান হত ইংরেজী ভাষায়। ইংরেজ প্রীতির দিক দিয়ে সুভাষের মামাবাড়ি হাটখোলার দত্ত পরিবার আবার এককাঠি বাড়া। ইংরেজদের তাঁবেদারি করে কলকাতার যে কয়টি পরিবার 'হঠাৎ নবাব' হয়ে উঠেছিল হাটখোলার দত্ত পরিবার তাদেরই একটা। সুভাষের ভাষায়—"ব্রিটিশ শাসনের গোড়ার দিকে কলকাতার যে সমস্ত পরিবার ঐশ্বর্যের জন্য এবং নবসৃষ্ট শাসনব্যবস্থার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেওয়ার সুবাদে প্রভূত প্রাধান্য বিস্তার করেছিল, দত্ত পরিবার তাদের অন্যতম।" (*সুভাষ চন্দ্র বোস—এ্যান্ ইন্ডিয়ান পিলগ্রিম*)। এই পরিবারে বিয়ে করতে গিয়ে জানকীনাথকে বেশ কাঠখড় পোড়াতে হয়। প্রভাবতী দেবীর বাবা গঙ্গানারায়ণ দত্ত জানকীনাথের রীতিমত ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন। যাইহোক এ বিয়েতে জানকীনাথের লাভই হয়েছিল। এদিক ওদিক কাজকর্ম করেও বিশেষ সুবিধা না হওয়ার পর তার পিসশ্বশুর রায়বাহাদুর হরিবল্লভ বসু যিনি ছিলেন কটকের নামজাদা উকিল আর সরকারী পাবলিক প্রসিকিউটর, জানকীনাথকে কটকে ওকালতি করতে নিয়ে যান। হরিবল্লভ বসু মারা যাবার পর তার পদটা জানকীনাথই পেলেন।

সুভাষচন্দ্রের মা প্রভাবতী দেবী আট ছেলে ছয় মেয়ের গর্বিতা জননী। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্না প্রভাবশালী মহিলা। একান্নবর্তী বিরাট পরিবার, পরবর্তীকালে ছেলেদের বিয়ে দেবার পর আরও বিশাল পরিবার তারই অঙ্গুলিহেলনে চলত। নাতি শিশিরকুমার

বসুর ভাষায়——"আমি মনে মনে মাজননীকে তুলনা করতাম একটি জার্মান পকেট ব্যাটলশিপের সঙ্গে"। সবদিকে তার ছিল প্রখর দৃষ্টি। সব কাজ পরিপাটি করে করা ছিল তার স্বভাব। হাতের লেখা, সেলাই, রান্নার কাজ, সবই নিখুঁত। আবার একরোখা। এমনকি দরকার পড়ায় বাড়ীতে মেমসাহেব রেখে ইংরেজী শিখেছিলেন। প্রভাবতী দেবী ছিলেন বেশ আত্মম্ভরীও। ছেলেদের বিয়ের পাত্রীদেখার সময় পাত্রীর বাপের বাড়ীতে ঢুকতেন না। বাড়ীর সামনে জুড়িগাড়ীতে বসে থাকতেন। মেয়েকে সাজিয়ে গুছিয়ে তার গাড়ীতে এনে তোলা হত। সেখানে চলত মেয়েটাকে নিয়ে নানা পরীক্ষা। তার অন্যতম হল গায়ের ক্রীম পাউডার ঘসে ঘসে তুলে গায়ের রঙ পরীক্ষা। একেবারে ধবধবে ফরসা না হলে এক কথায় খারিজ। (*শিশির কুমার বসু——বসুবাড়ী*)। সুভাষচন্দ্রের সমস্ত জীবনীকারই বলেছেন——সুভাষের চরিত্রের উপর তার মায়ের প্রভাবই পড়েছিল সবচেয়ে বেশি।

বৃটিশ সরকারের অধীনে ভালো চাকরি পেতে হলে ইংরেজী স্কুলেই পড়তে হবে। সেকালের সব ইংরেজভক্ত পরিবারের ছেলেদেরই ইউরোপীয় স্কুলে পড়ানো হত। সুভাষচন্দ্রের দাদারা পড়ত প্রটেস্টাণ্ট ইউরোপীয় স্কুলে। সেই স্কুলেই সুভাষকে ভর্তি করা হল। তখন তার বয়স পূরো পাঁচ বছরও হয় নি। স্কুলে ইতিহাস ভূগোল পাঠ্যে ভারত সম্পর্কে থাকত সামান্যই, জোর দেওয়া হত গ্রেট বৃটেনের ভূগোল ইতিহাসে। কোনও ভারতীয় ভাষাই শেখানো হত না। আর ছিল বাইবেল মুখস্ত করা। এরকম লেখাপড়া ছোট্ট সুভাষের ভালো না লাগলেও পরীক্ষায় সে ছিল বরাবরই ফার্স্ট।

এইসব ইংরেজী স্কুলে যেভাবে ছাত্রদের মগজধোলাই করে কিশোর মনকে একটা বিশেষ ছাঁচে ঢালাই করা হয় তার ফল সুভাষের মধ্যেও দেখা দিল। স্কুলে একটা রচনা লিখতে বলা হল——আমি বড় হলে কি হতে চাই। দশ বছরের সুভাষ জজ, ব্যারিস্টার, কমিশনার ইত্যাদি লিখবার পর রচনাটা শেষ করল এই বলে যে সে ম্যাজিস্ট্রেট হতে চায়। বাড়ীর আলোচনাতেও সুভাষ জেনেছিল সবচেয়ে বড় পদ কেউ পেতে পারে তা হল আই সি এস-এর পদ। সুতরাং বাড়ী আর স্কুলের এই পরিবেশের মধ্যে চোদ্দ বছর বয়সে সুভাষ পঞ্চম জর্জের রাজ্য অভিষেক নিয়ে একটা রচনা লিখবে এতে আর আশ্চর্য কি! রাজা পঞ্চম জর্জ যখন কলকাতায় এলেন ইংরেজভক্ত আর দশটা পরিবারের মত জানকীনাথের পরিবার কলকাতায় গেল তাকে স্বাগত জানাতে। সুভাষের ভাষায়——"এবং যখন ফিরে আসলাম তখন মনের মধ্যে ছিল উদ্দীপনার ভাব"। (*সুভাষচন্দ্র বোস——এ্যান ইণ্ডিয়ান পিলগ্রিম*)।

ইতিমধ্যেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বাংলাকে আবশ্যিক করা হয়েছে। সুতরাং বাধ্য হয়ে সুভাষকে পি ই স্কুল ছাড়তে হয়েছে। তাকে ভর্তি করা হয়েছে র‍্যাভেন শ' কলেজিয়েট স্কুলে। এ যেন বাড়ীর কুয়ো ছেড়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়া! সুভাষের মতে——আমার মধ্যে সহসা এক পরিবর্তন ঘটে গেল। এই স্কুলে যার প্রভাব তার উপর পড়েছিল তিনি হেডমাস্টার মশাই বেণীমাধব দাস। তার কাছ থেকে সুভাষ শিখল প্রকৃতি-প্রেম। "একটা জিনিস এখন তাঁর কাছ থেকে শিখলাম——সৌন্দর্যের বিচারে শুধু নয়, বরং নৈতিকতার দিক থেকেও প্রকৃতিকে কিভাবে ভালোবাসা যায় এবং তার কাছে অনুপ্রেরণা লাভ করা যায়। তাঁর উপদেশানুসারে, যা করতে লাগলাম, তাকে বলা যায় একপ্রকার প্রকৃতি-পূজা।" কিন্তু এতেই সুভাষ সন্তুষ্ট হল না। তার মনে হতে লাগল এটাই যথেষ্ট নয়। এমন সময় বিবেকানন্দের রচনাবলী পড়ার সুযোগ তার হল। পড়েই মনে হল——এতে এমন কিছু আছে যা আমি খুঁজে মরছি। "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়——তোমার

নিজমুক্তি ও মানবসেবা——এই হবে জীবনের লক্ষ্য।" একে মায়ের কাছে হিন্দুধর্মের নানা বই পড়ে জমি তৈরীই ছিল। এরসাথে যোগ হল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রভাব। "রামকৃষ্ণের উপদেশগুলির মূলকথা ছিল——কাম ও কাঞ্চন ত্যাগ। তিনি মনে করতেন আধ্যাত্মিক জীবনে কোন মানুষের যোগ্যতা বিচার করতে হলে, এই দ্বিবিধ ত্যাগের মাপাকাঠিতেই তা বিচার্য।" সুতরাং একেবারে বয়সন্ধিক্ষণে সুভাষের চলল এই সাধনা। এর ফলে যে কি বিপত্তিতে সে পড়েছিল সে সম্পর্কে পরে আলোচনা করব।

দলবল জুটিয়ে নিয়ে সুভাষ লেগে পড়ল, পড়াশোনা গেল চুলোয়। "আমার কাছে পড়াশুনার গুরুত্ব কমে আসছিল এবং কয়েকবছর খুব বেশি পড়াশুনো করেছিলাম বলেই আমার সর্বনাশ ঘটতে পারে নি।" যেখানেই কোন সাধু-সন্ন্যাসীর আগমন, দলবল নিয়ে সেখানেই সুভাষ। কটক পুরীর কাছাকাছি হওয়ায় সেখানে সাধুদের যাতায়াত লেগেই ছিল। আর নানান সাধুর নানান উপদেশে সুভাষের নানান আচরণ। পরিবারের লোকজন ভয় পেয়ে গেল। শাসন, পিঠে হাত দিয়ে বোঝানো কোনটাতেই কাজ হল না। "আমার স্কুলজীবন যতই শেষ হয়ে আসতে লাগল, ততই গভীরভাবে বাড়তে লাগল ধর্মীয় আবেগ। পড়াশুনার গুরুত্ব আর আমার কাছে মুখ্য ছিল না। ..... রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের অনুগামী——দুই একজন ছাড়া——সাধারণভাবে আর কোন শিক্ষক আমাদের মধ্যে প্রেরণা সৃষ্টি করতে পারেন নি।" আসলে এসময় সুভাষের মানসিক অবস্থা এরকম যে রামকৃষ্ণঃ বিবেকানন্দ অনুগামী ছাড়া আর কারও কাছ থেকে কিছু শুনতেই রাজী নয়। এই সময় মাকে লেখা চিঠিগুলো পড়লেই তার মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। চিঠিগুলোতে একটা চোদ্দ-পনেরো বছরের ছেলে ধর্ম নিয়ে (অবশ্যই হিন্দুধর্ম) নানা কথা লিখেছে। তার সবটাই ধর্মপুস্তক বা ধর্মগুরুর মুখে বসানো কথা। মনে হয় যেন একটা তোতাপাখি বুলি আউড়িয়ে যাচ্ছে। সুভাষচন্দ্র পরে নিজেই লিখেছেন——"এই সময় আমার কোন উপযুক্ত পথ-প্রদর্শক ছিল না, বই পড়ে যতটা সাহায্য লাভ করা যায় সেদিকেই মনোনিবেশ করেছিলাম। কিন্তু এসব বইয়ের অধিকাংশই যে বিশ্বস্ত বা অভিজ্ঞ লোকের লেখা নয় একথা পরে বুঝেছিলাম।"

যাইহোক, গোটা বসু পরিবারে ঝড় বয়ে গেল। ছেলেকে কত আশা নিয়ে লেখাপড়া শেখানো হচ্ছে যে বড় হয়ে উঁচু পদে কাজ করে বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে। যে ছেলে কত মেধাবী, সামনে সোনায় মোড়া ভবিষ্যৎ, সে কিনা পড়াশোনা চুলোয় দিয়ে সাধু-সন্ন্যাসীদের পিছন পিছন ছুটে বেড়াচ্ছে। বাড়ী থেকে যত বাধা দেওয়া হতে থাকল সুভাষের জেদ আরও বেড়ে গেল। বাবা-মা তখন অন্য চিন্তা করলেন। "এরপর আমার বাবা-মা ভাবলেন, পরিবেশের পরিবর্তন ঘটলে হয়ত আমার ভাল হবে এবং কলকাতার বাস্তব আবহাওয়ায় আমার সব অদ্ভুত স্বভাব ঝেড়ে ফেলে আমি আমার সমবয়স্ক আর সকলের মতোই স্বাভাবিক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারব। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে আমি সারা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলাম। আমার বাবা-মা বিশেষ আনন্দিত হলেন। আমাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হল।"(*এ্যান ইন্ডিয়ান পিলগ্রিম*)।

সন্ন্যাসী সুভাষ

কলকাতায় এসেও সাধু সন্ন্যাসীর ভূত ঘাড় থেকে নামল না বরং অনুকূল পরিস্থিতিতে

তা বেড়ে গেল। এখানেও সুভাষ দলবল জুটিয়ে ফেলল। কলকাতায় আসার আগে তারই সমবয়সী হেমন্তকুমার সরকারের সাথে পরিচয় হয়েছিল। ১৯১২ সাল নাগাদ হেমন্ত কটকে বেড়াতে গিয়েছিল। সে ছিল বেণীমাধব দাসের ছাত্র এবং মাস্টারমশাইয়ের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে হেমন্ত সুভাষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। সুভাষের ভাষায়——"যখন আমার মন জাতীয় ও সামাজিক সমস্যাগুলোর দিকে ফিরতে শুরু করেছিল, সেই সময়েই কটকে তার আগমন হয়।" সুতরাং দু'জনের কথা আর শেষ হতেই চায় না। হেমন্তকুমার সরকার পরে লিখেছেন——"প্রথম যেদিন সুভাষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল——সে-ও দৈনন্দিন জীবনের আচরিত পথ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল। কখনও যে সকালে বাড়ীর বার হয় না, সে দুপুর পর্যন্ত আমার সঙ্গে কথায় বিভোর হয়ে থাকল। স্নেহময়ী মা তার জন্য খাবার নিয়ে বসে আছেন স্মরণ হওয়ায় সে দুপুরে বাড়ী ফিরে খাওয়া শেষ করেই আমার কাছে এল!" (*সুভাষের সঙ্গে বারো বছর*)। চারদিন পরে হেমন্ত কটক ছেড়ে চলে গেলেও চিঠিপত্রে যোগাযোগ চলতেই থাকল।

কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়েই সুভাষ দেখা করল হেমন্তকুমার আর তার দলের সঙ্গে। এই দলের নেতা ছিলেন মেডিকেল কলেজের দুই ছাত্র সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আর যুগলকিশোর আঢ্য। প্রথমে ৫৩ নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন. পরে ৩নং মির্জাপুর স্ট্রীটের মেসে ছিল এই দলের আড্ডা। সুভাষ এখানে নিয়মিত যাতায়াত শুরু করে দিল। মতামতের দিক থেকেও সুভাষের সঙ্গে দিব্যি মিলে গেল কারণ এই দলও ছিল আধ্যাত্মিক উন্নতির আশায় ব্যাকুল। চিরকাল ব্রহ্মচর্য্য পালন করবে এই ছিল সকলের প্রতিজ্ঞা। সুভাষসহ এ দলের সকলে মনে করত বিবেকানন্দের নিজের অনুগামীরা আর তারই প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন——বিবেকানন্দের শিক্ষাগুলো অবহেলা করছে। এই দলের উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম আর জাতীয়তার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

এই দলে ভিড়ে সুভাষের পড়াশোনা একেবারে শিকেয় উঠল। দলের সাথে নানা তীর্থ আর ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণ করতে লাগল। দলবেঁধে সকলে মিলে একবার গেরুয়া পরে সন্ন্যাসী হয়ে নদীয়া জেলার শান্তিপুরে কিছুদিন থাকল। সুভাষ একবার রবীন্দ্রনাথের সাথেও দেখা করেছিল। এরপর হেমন্ত সন্ন্যাসী হয়ে বেরুল উত্তর ভারতে। ব্যাকুল সুভাষ কয়েকদিন পরে হরিদ্বারে গিয়ে মিলল হেমন্তর সাথে। দুই কিশোর সন্ন্যাসী ঘুরে বেড়াতে থাকল হরিদ্বার, মথুরা, বৃন্দাবন, কাশী প্রমুখ তীর্থস্থানে। এইসব তীর্থে সাধু আর তাদের আশ্রম-মঠগুলো খুব কাছ দেখে যে অভিজ্ঞতা জুটল তা ভক্তি চটে যাবার পক্ষে যথেষ্ট।

সন্ন্যাসী হওয়ার নীট ফল কঠিন টাইফয়েড। টাইফয়েড থেকে কোনমতে সেরে উঠলে সুভাষের বাড়ীর লোকেরা কতকটা স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য কতকটা এই পরিবেশ থেকে দূরে রাখার জন্য কার্সিয়াং-এ আত্মীয়ের বাড়ীতে পাঠাল। সেখানে থেকে স্বাস্থ্য কিছুটা ভাল হল বটে, এদিকে আবার অন্যদিক থেকে বিরাট একটা আঘাত এল। দলের বেশ কিছু সদস্যদের মধ্যে সুভাষ আর হেমন্তর মধ্যেকার সম্পর্ক নিয়ে কুরুচিকর সংশয় দেখা দিল। তারা বলল এ সম্পর্ক অস্বাস্থ্যকর। বিচারের ভার পড়ল দলনেতা সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জীর উপর। গভীর মনোকষ্টে সুভাষ হেমন্তকে চিঠি লেখে—— "প্রথমতঃ আর ভালবাসা পেতে ইচ্ছা হয় না——জগতের কাছ থেকে তার ɔpposite টি পেতে ইচ্ছা করি অর্থাৎ নিন্দা, অপবাদ, অপমান, লাঞ্ছনা ইত্যাদি——দ্বিতীয়তঃ যাহারা কেবল গুণানুসন্ধী তাহাদের ভালবাসা ক্ষণস্থায়ী এবং তাহা না পাওয়াই শ্রেয়স্কর, কারণ পেলে হয়ত কোন না কোনদিন ভাবের পরিবর্তনের জন্য কষ্ট পাইতে হইবে। তৃতীয়তঃ (দলের) ভাইদের সম্প্রতি

ব্যবহার দেখিয়া জগতের ভালবাসার প্রতি বিরূপ জন্মিয়াছে।" (*২৭ শে মার্চ ১৯১৫, হেমন্তকুমার সরকারকে লেখা চিঠি*)। যাইহোক দলনেতা সুরেশ ব্যানার্জী রায় দিলেন, **I thought the relation to be undesirable but not unhealthy.** সুভাষ আর হেমন্ত দোষমুক্ত হলেও দলের প্রতি তাদের টান উঠে গেল। হেমন্তকুমার সরকারের ভাষায়——"পূর্বেই সন্ন্যাসের উপর বিরাগ জন্মেছিল——তারপর এই সন্ন্যাসীর দলের ব্যবহারে আমাদের দারুন বিতৃষ্ণা জন্মে গেল।" (*সুভাষের সঙ্গে বারো বছর*)। এর উপর বিষফোঁড়া I. A. পরীক্ষার ফল দু'জনেরই অত্যন্ত খারাপ হল। সুভাষ সম্বিৎ ফিরে পেল——"ক্ষণিকের জন্য আমার তীব্র অনুশোচনা হল, এবং আমি সংকল্প করলাম ডিগ্রি পরীক্ষায় ভাল ফল করব।" এ সময়ে তার মনোভাবের বিবরণ মেলে হেমন্ত সরকারকে লেখা চিঠিতে——-"এ ছাড়া মনে করিতেছি——কলেজের বইগুলি সব একবার শেষ করিব। এখন পড়াতে খুব উৎসাহ। আমি দেখছি এখন সব উল্টো——পরীক্ষা শেষ হইল অমনি পড়ায় খুব চাড় হইল। ইচ্ছা হচ্ছে সব বইগুলি গ্রাস করে ফেলি। B. A. তে Philosophy Honours লইব এবং first হইব।"

দেশপ্রেমের উন্মেষ

কিন্তু ফার্স্ট হওয়া আর সুভাষের হয়ে উঠল না। ১৯১৬র জানুয়ারী মাসে এমন একটা ঘটনায় জড়িয়ে পড়লেন তাতে তার শুধু পড়াশোনায় ছেদ পড়ল না, তার জীবনের গতিধারাও সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজ অধ্যাপক ওটেনের সাথে ভারতীয় ছাত্রদের সম্পর্ক মোটেই ভাল ছিল না। ছাত্রদের অভিযোগ ছিল তিনি প্রায়শঃই ভারতীয়দের সম্পর্কে নানা অপমানজনক মন্তব্য করেন। অবস্থা চরমে উঠলে একদিন ছাত্রদের হাতে ওটেন প্রহৃত হলেন। সুভাষ এবং আর একজন ছাত্র অনঙ্গমোহন দামকে অধ্যক্ষ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বহিস্কার করলেন। স্যার আশুতোষ মুখার্জীর সভাপতিত্বে এক তদন্ত কমিটি বসল। আশুতোষ মুখার্জী তদন্ত কমিটির সভাপতি হওয়ায় সুভাষের খুব আশা ছিল তার উপর অধ্যক্ষের বহিস্কারের আদেশ পুনর্বিবেচনা করা হবে, কিন্তু তা হল না। সুভাষ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বহিস্কৃত হলেন।

এরকম পরিস্থিতি কিন্তু একেবারে হঠাৎ সৃষ্টি হয় নি। কলকাতায় আসার পর থেকেই সুভাষের চিন্তা অন্য খাতে বইছিল। ছোটবেলায় কটকের দিনগুলো ছিল নিরুপদ্রব, নিস্তরঙ্গ। সে সময়কার বাংলাদেশ বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন, বয়কট, স্বদেশীতে উত্তাল। দলে দলে ছাত্র স্কুল-কলেজ ছাড়ছে। সেই ঝোড়ো হাওয়া কটকে পৌঁছলেও ইউরোপীয়ান স্কুল বা অভিজাত বসু পরিবারে তার আঁচ লাগতে পারে নি। তবু তারই ফাঁকে ফাঁকে এমন কতগুলো ব্যাপার ঘটল যা বালক সুভাষের ইংরেজ-ভক্তি অনেকটা নাড়িয়ে দিল। ইউরোপীয় স্কুলে নিয়ম ছিল কোন ভারতীয় ছাত্র প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বৃত্তি পরীক্ষায় বসতে পারবে না। সুভাষ বরাবর স্কুলে ভাল রেজাল্ট করলেও শুধুমাত্র ভারতীয় হবার অপরাধে বৃত্তি পরীক্ষায় বসতে পারে নি। ব্যাপারটা তাকে খুব আঘাত করেছিল। ইউরোপীয় আর এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ছাত্ররা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগ দিয়ে রাইফেল ট্রেনিং নেওয়ার সুযোগ পেত, ভারতীয় ছাত্ররা সেখানেও বাদ। সেই অল্পবয়সেই সুভাষ বুঝতে পেরেছিল ভারতবাসী আর ইংরেজ আসলে 'ভিন্নশ্রেণী'। তবুও কি সন্ত্রাসবাদী কি স্বদেশী পরিবার আর স্কুলের প্রতিকূলতা ডিঙিয়ে সুভাষকে টেনে আনতে পারে নি। "ঐ সময়েই বঙ্গভঙ্গের

প্রতিবাদে ও স্বদেশীর উদ্দেশ্য প্রচারের জন্যে বহু মিছিল বের হত। তাতে কখনও কখনও সামান্য আগ্রহ বোধ করতাম, কিন্তু আমাদের বাড়ীতে রাজনীতি নিষিদ্ধ ছিল।" সে সময়কার আর সব স্কুল ছাত্রের মতো সুভাষ খবরের কাগজ থেকে বিপ্লবীদের ছবি কেটে পড়ার ঘরে টাঙিয়ে রাখলে বাবার হুকুমে ছবিগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছিল।

কিন্তু কলকাতায় এসে এ নির্লিপ্ততা বজায় রাখা সম্ভব হল না, বিশেষতঃ সুভাষের মত সংবেদনশীল ছেলের পক্ষে। এ প্রসঙ্গে তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা আত্মজীবনী ভারত-পথিক-এ লিখেছেন—

কিন্তু কলকাতার অবস্থা ছিল অন্যরকম। প্রতিদিন কলেজে যাতায়াতের সময়, তারা (ইংরেজরা) যে অঞ্চলে বাস করত তার মধ্য দিয়ে আমাদের যেতে হত। ট্রামগাড়ীগুলোতে অপ্রীতিকর কিছু ঘটা বিরল ছিল না। গাড়ীতে যাতায়াতকালে বৃটিশগণ ইচ্ছে করেই ভারতীয়দের প্রতি পদে নানা প্রকার রূঢ় ও অপমানসূচক ব্যবহার করত, কখনও কখনও তারা সামনের আসনগুলোতে ভারতীয়রা বসে থাকলে ঐগুলোতে পা তুলে দিত যাতে ভারতীয়দের শরীরে তাদের জুতোর ছোঁওয়া লাগে। বহু ভারতীয় দরিদ্র কেরাণী অফিসযাত্রীরা এ অপমান সহ্য করত, কিন্তু অন্য সকলের পক্ষে এ অপমান সহ্য করা কঠিন ছিল। আমার প্রকৃতিটা শুধু যে কেবল স্পর্শকাতর ছিল তাই নয়, শৈশব থেকেই অন্যরকম ব্যবহার পেতে অভ্যস্ত হয়ে এসেছিলাম। প্রায়ই ট্রামে বৃটিশদের সাথে আমার ঝগড়া বেধে যেত। কদাচিৎ কোন কোন ভারতীয় যাত্রীর সঙ্গে তাদের হাতাহাতি হয়ে যেত। রাস্তাঘাটেও ঐ একই ব্যাপার ঘটত। বৃটিশরা চাইত ভারতীয়রা তাদের পথ ছেড়ে দেবে এবং যদি তারা একাজ না করত, তাহলে জোর করে ঠেলে তাদের পাশে সরিয়ে দেওয়া হত, অথবা তাদের কান মলে দেওয়া হত। এ বিষয়ে অসামরিক ব্যক্তিদের চাইতে বৃটিশ টমিরা ছিল আরও খারাপ, এবং তাদের মধ্যে গর্ডন হাইল্যান্ডারদের কুখ্যাতিই ছিল সর্বাধিক। রেলগাড়িগুলিতে কখনও কখনও লড়াই করার জন্য প্রস্তুত না হয়ে কোন ভারতীয়ের পক্ষে আত্মসম্মানের সঙ্গে ভ্রমণ করা কঠিন হত। রেলের কর্তৃপক্ষ বা পুলিশ ভারতীয় যাত্রীদের রক্ষার কোন বৈধ ব্যবস্থা করত না, হয় তারা নিজেরাই বৃটিশ (অথবা এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান) ছিল, কিংবা উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে বৃটিশদের বিরুদ্ধে নালিশ করতে ভয় পেত। যখন আমি নিতান্ত ছোট ছিলাম, তখন কটকের একটি ঘটনার কথা মনে আছে। রেলের উচ্চতর শ্রেণীর কামরা দখলকারী বৃটিশরা কখনও ভারতীয়কে সেখানে প্রবেশ করতে দেবে না। এজন্য আমার এক মাতুলকে স্টেশন হতে ফিরে আসতে হয়েছিল। মাঝে মাঝে আমরা উচ্চপদে আসীন ভারতীয়দের সম্বন্ধে গল্প শুনতাম—তাদের মধ্যে হাইকোর্টের বিচারপতিও ছিলেন—রেলগাড়ীতে বৃটিশদের সঙ্গে যাঁদের সংঘর্ষ ঘটে গেছে। গল্পগুলি স্বভাবতই চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ত।

যখনই এরকম কোন ঘটনা ঘটতে দেখতাম আমার স্বপ্নগুলি প্রচণ্ড আঘাত পেত, এবং শঙ্করাচার্যের মায়াবাদের ভিত্তিমূল পর্যন্ত একেবারে নড়ে উঠত। নিজেকে বোঝানো সম্পূর্ণ অসম্ভব হত যে কোনও বিদেশীর হাতে অপমানিত হওয়া একটা মায়া, যা উপেক্ষনীয়। অবস্থাটা আরও জটিল হত যদি কলেজের কোন বৃটিশ অধ্যাপক আমাদের প্রতি রূঢ় ও অপমানজনক আচরণ করতেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এরকম দৃষ্টান্তের অভাব ঘটত না। (আমার কলেজে যোগদানের আগে কয়েকবার ছাত্ররা অধ্যাপকদের ধরে খুব মেরেছিল। এই সব ঘটনার বিবরণ সযত্নে রক্ষা করা হত এবং পুরুষানুক্রমে গল্পগুলি চলে আসছিল)। কলেজের প্রথম বছরে এ সম্বন্ধে আমার কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তবে সেগুলি

তত সাংঘাতিক ধরনের ছিল না। যদিও তিক্ততা সৃষ্টি করবার পক্ষে সেগুলি ছিল যথেষ্ট।

জাতিগত এইসব বিরোধে ভারতীয়েরা আইনের কোন সাহায্য পেত না। ফলে কিছুকাল পরে ভারতীয়গণ অনন্যোপায় হয়ে প্রত্যাঘাত করতে শুরু করল। রাস্তাঘাটে, ট্রামে, রেলগাড়ীতে তারা আর মুখ বুঁজে সব সহ্য করত না। সঙ্গে সঙ্গে ফল পাওয়া গেল। সর্বত্র ভারতীয়দের সমীহ করে চলা হতে লাগল। তখন চারিদিকে এ কথা রাষ্ট্র হয়ে গেল যে ইংরেজ দৈহিক শক্তি ছাড়া আর কিছু বোঝে না বা সম্মান করতে জানে না। এই ব্যাপারটিই মনস্তত্ত্বের দিক থেকে সন্ত্রাসমূলক বৈপ্লবিক আন্দোলনের ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল অন্তত বাংলাদেশে।

এ সত্ত্বেও সুভাষ কোন সন্ত্রাসবাদী দলে যোগ দেন নি। যোগ দিয়েছিলেন সুরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের দলে। যে দলের আদর্শ ছিল—'আধ্যাত্মিক উন্নতি ও গঠনমূলক কাজের মধ্যে দিয়ে জাতির সেবা'। কলেজে সুভাষের পড়াশোনার চেয়ে সভা-সমিতি, শিক্ষামূলক ভ্রমণ, বিতর্কসভা ইত্যাদি বেশি ভাল লাগত। তিনি ছিলেন এসবের একজন পান্ডা। বন্ধু দিলীপকুমার রায়কে এক বিতর্কসভায় নিমন্ত্রণ করতে গিয়ে বলেছিলেন—"দেশে ভাল ভাল বক্তার দরকার হবে যারা পার্লিয়ামেন্টে তর্কবিতর্ক করতে পারবে।" এইসব সভাতে সুভাষ নিজেকেও তৈরী করছিলেন। একদিকে বৃটিশদের ভারতীয়দের উপর নিদারুণ অপমানজনক ব্যবহার, গোটা দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা, তার উপর বিশ্বযুদ্ধের ধাক্কায় অস্থির ভারতীয় সমাজ, অন্যদিকে সুভাষের মধ্যে অঙ্কুরিত ইংরেজদের প্রতি ক্রমেই বেড়ে চলা বিতৃষ্ণা। সব মিলিয়ে ক্ষেত্র প্রস্তুতই ছিল।

অধ্যাপককে ধরে মারা প্রেসিডেন্সি কলেজে এমন কোন নতুন ঘটনা নয়। কিন্তু এবারের ঘটনার প্রচার ও ফলাফল বেশ দূর প্রসারী হল। এই প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন এসেই যায় যে সুভাষ কি সত্যিই ওটেনকে মেরেছিলেন? নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে একসাথে প্রেসিডেন্সি জেলে ছিলেন ১৯৪০ সালে। সেখানে সুভাষচন্দ্র নাকি তাকে বলেছিলেন যে তিনি ওটেনকে মারেন নি, বাঙাল অনঙ্গ দাম মেরেছিল। (*নেতাজীঃ সঙ্গ ও প্রসঙ্গ, ২য় খন্ড*)। সুভাষচন্দ্রের প্রায় সব জীবনীকারই লিখেছেন যে তিনি নিজে ওটেনকে মারেন নি। ছাত্রদের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে তিনি মহত্বের পরিচয় দিয়েছেন। আবার সুভাষের অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং সেই সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের সহপাঠী দিলীপকুমার রায়ের মতে—"বলা বাহুল্য সবাই বুঝতে পেরেছিল এই প্রহার পর্বের মূলে সুভাষ রয়েছে। ... দলপতির সমস্ত অপরাধের দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল সুভাষ—যদিও তার বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ প্রয়োগ কেউ খুঁজে পায় নি। তবে এটা সবাই জানত, এ তারই কাজ।" (*দিলীপকুমার রায়—আমার বন্ধু সুভাষ*)। এ প্রসঙ্গে সুভাষ নিজে কি বলছেন দেখা যাক। তিনি নিজে এই ঘটনার বিবরণ তার আত্মজীবনীতে দিয়েছেন অত্যন্ত নৈর্ব্যক্তিকভাবে। যেন তিনি কিছু জানেনই না—"সুতরাং কিছু কিছু ছাত্র স্থির করল তারা নিজেরাই ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এর ফল হল Mr.O'র বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগের পন্থা বেছে নেওয়া হল এবং তদনুযায়ী তাঁকে নিদারুনভাবে প্রহার করা হল।" এর পরেই আবার তিনি লিখেছেন যে 'নিজে একজন প্রত্যক্ষদর্শী ছিলাম'। আবার তদন্ত কমিটির কাছে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে—"আমাকে সোজাসুজি একটা প্রশ্ন করা হল—Mr.O'র উপর এই আক্রমণকে আমি সমর্থন করি কি না। আমি উত্তর দিয়েছিলাম যে যদিও এই আক্রমণকে সমর্থন করা যায় না, কিন্তু ছাত্রদের উত্তেজিত হবার গুরুতর কারণ ছিল।" এই সাক্ষ্য থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে তিনি নিজে ওটেনকে মারেন নি। কিন্তু আবার ১৯২১

সালে আই.সি.এস থেকে পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়ে মেজদা শরৎচন্দ্র বসুকে লেখা ২৩ এপ্রিলের চিঠিতে তিনি লেখেন—"ওটেনকে মারার ব্যাপারে যখন আমার কাছে কৈফিয়ত চাওয়া হয়েছিল, আমি সেই ব্যাপার সম্পর্কে আমার যোগাযোগের কথা অস্বীকার করেছিলাম। আমি তখন এই মোহে আচ্ছন্ন ছিলাম।...... এসব দৃষ্টান্ত দেখে আমার শিক্ষা হয়েছে যে একটি আপোষ থেকে অন্য একটি আপোষের জন্ম হয়।" স্পষ্টই বোঝা যায় সুভাষ তদন্ত কমিটির কাছে সঠিক সাক্ষ্য দেন নি। এবার যে ওটেন সাহেবকে নিয়ে এত কান্ড তার ভাষ্যটা কি দেখা যাক। এডওয়ার্ড ফার্লে ওটেন তার কর্মজীবন শুরু করেন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপনা দিয়ে। ক্রমে পদোন্নতি হতে হতে শেষ পর্যন্ত ডাইরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন হয়েছিলেন। তার লেখা তিনটে বই Anglo Indian Literature, Glimpses of India's History, European Travellers in India দেশে বিদেশে বেশ সমাদৃত হয়। বৃদ্ধ বয়সে তার একটা কবিতার বই প্রকাশিত হয়। বইটার নাম Song of Aton and Other Verses. বইটাতে একটা কবিতা আছে সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে। ১৯৪৫ সালে দুর্ঘটনায় সুভাষের মৃত্যু হয়েছে সংবাদ শুনে ব্যথিত ওটেন কবিতাটি লেখেন। এই কবিতাতে তিনি সুভাষকে এক মহান দেশপ্রেমিক হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং গ্রীক পুরাণের আইকারাসের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কবিতার লাইনে লাইনে প্রকাশিত হয়েছে সুভাষের প্রতি শ্রদ্ধা। ওটেন কবিতাটি শুরু করেছেন—

Did I once suffer, Subhash, at your hand?
Your patriot heart is stilled! I would forget! ইত্যাদি।

এই কবিতাটা থেকেও বোঝা যায় সুভাষ ওটেনকে মেরেছিলেন।

যাইহোক, প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এই বহিষ্কার সুভাষের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। প্রথম তো তিনি পুলিশের নজরে পড়লেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের কয়েকজন বহিষ্কৃত ছাত্রকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে দেখে দাদারা সুভাষকে কটকে পাঠিয়ে দিলেন। দ্বিতীয়তঃ সুভাষের জীবনের গতিপথ একরকম নির্ধারিত হয়ে গেল। তার ভাষায়—"আমি আমার নিজের সামনে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলাম, ভবিষ্যতে যা থেকে সরে আসা আমার পক্ষে সহজ হবে না। এক সঙ্কটের মধ্যে সাহস ও স্থৈর্য্য নিয়ে দাঁড়িয়েছি এবং আমার কর্তব্য পালন করেছি। আমার মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও সেই সঙ্গে উদ্যমশীলতা গড়ে উঠেছিল, যা ভবিষ্যতে আমার খুব কাজে লাগবে। অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে হলেও, নেতৃত্বের ও তার আনুসঙ্গিক আত্মত্যাগের স্বাদ আমি পেয়েছিলাম। এক কথায়, আমার চরিত্র তৈরী হয়ে গিয়েছিল এবং প্রশান্ত চিত্তে ভবিষ্যতের সম্মুখীন হতে সমর্থ হয়েছিলাম।" পরবর্তীকালে কংগ্রেস নেতা সুভাষ এই বহিষ্কারের ঘটনা বারবার সগৌরবে উল্লেখ করেছেন, বিশেষত ছাত্র-যুবকদের সভায় এর উল্লেখ করতে ভুলতেন না।

প্রতি পদে পদে ভারতবাসীকে ইংরেজদের অপমান সুভাষকে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। তিনি নিজেও তার ভুক্তভোগী। তাছাড়া এই সময়টাও ছিল শিক্ষিত ভারতীয়দের নিজেদের ফিরে পাওয়ার যুগ। একেবারে জমিদার কারখানামালিক ছাড়া শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের সকলেই প্রকাশ্যে বলতে শুরু করেছে বৃটিশ শাসনে সুবিচার পাওয়া যাবে না। সর্বত্র অবিচার, অবহেলা শিক্ষিত ভারতবাসীকে মরীয়া করে তুলেছিল—ইংরেজদের দেখিয়ে দিতে হবে, আমরাও কম যাই না। সুভাষচন্দ্রও তার ব্যতিক্রম নয়। তাই বাবা যেই তাকে বিলাতে গিয়ে I.C.S. পরীক্ষায় বসতে বললেন তিনি এক কথায় রাজী। দেখিয়ে দিতে হবে আমরাও পারি। ইংল্যান্ডে গিয়ে সর্বত্র এই মনোভাব নিয়েই চলতেন। অন্যরা যখন

গল্পগুজব করছে, তিনি তাদের ধমকাতেন। অন্যান্য ভারতীয় ছাত্ররা তার সাথে খুব একটা মিশত না, তাকে বেরসিক দাম্ভিক ভাবত। সুভাষের কোন পরোয়া নেই, একমনে সাধনা চলতে থাকল। ইংরেজেদের প্রতি ঘৃণা তার কতদূর পৌঁছেছিল হেমন্ত সরকারকে লেখা চিঠি থেকে তা বোঝা যায়——"আমার সবচেয়ে বেশি সুখ হয় যখন দেখি যে সাদা চামড়ায় আমার সেবা করিতেছে এবং জুতা সাফ করিতেছে।" আর একটা চিঠিতে ইংরেজদের ওদেশের 'নেটিভ' বলে মনের ঝাল মিটিয়েছেন। ভারতীয় ছাত্ররা ইংল্যান্ডে গিয়ে দুর্নাম কুড়োবে তা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। আচার ব্যবহার এমন কি বসা দাঁড়ানোও নিখুঁত হতে হবে। দিলীপকুমার রায় লিখেছেন যে ঘরের দরজা জানলা বন্ধ থাকলেও পায়ের উপর পা তুলে বসতে দিতেন না। জোরে কথা বললে বলতেন——"ওসব এখানে চলে না। কি করে সংযত কণ্ঠে কথা বলতে হয় শেখো। আর দোহাই, কথা বলতে গিয়ে ওরকম হাত পা ছুড়ো না।" বন্ধুদের প্রায়ই বলতেন——"আমরা ওদের স্রেফ বুঝিয়ে দেব যে আমরা ওদের চেয়ে বড়। মোটকথা ওদের ঘরে এসে ওদের জব্দ করে যেতে পারি তবেই তো।" *(দিলীপকুমার রায়——আমার বন্ধু সুভাষ)।*

সামনের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ছেড়ে সুভাষ রাজনীতিতে ঝাঁপিয়েছিলেন এই ইংরেজবিরোধী মনোভাব নিয়েই। সেযুগের এরকম শত শত মধ্যবিত্ত পরিবারের মেধাবী ছাত্র পড়াশুনা বন্ধ করে রাজনীতিতে ঢুকেছিল ঐ একটাই চিন্তা করে ইংরেজদের ঔদ্ধত্যের সমুচিত জবাব দিতে হবে। কারণ ইংরেজ তাদের স্বাভিমানে আঘাত করেছে। সুভাষের ইংরেজ জীবনীকার হিউ টয় দুঃখ করে লিখেছেন——(সুভাষ ছাড়াও) "আরও অনেকে ছিল যাদের বাপ দাদারা একদিন বৃটিশের সঙ্গে থেকে মনপ্রাণ দিয়ে ভারতের সেবা করে গেছেন কিন্তু তারা নিজেরা বিপ্লবের পথই একমাত্র পথ বলে ধরে নিয়েছে।" *(দ্য স্প্রিংগিং টাইগার)।* সেযুগে ইংরেজ-বিরোধিতা আর দেশপ্রেম ছিল সমার্থক। একথা সত্য যে একটা বিদেশী ঔপনিবেশিক শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা অবশ্যই একজন দেশপ্রেমিকের অন্যতম কাজ। কিন্তু সেযুগের কোটি কোটি মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কারণ শুধুমাত্র বৃটিশ শাসকেরাই ছিল না। দেশীয় জোতদার-জমিদার-মিলমালিকেরা নির্মম শোষণ চালিয়েছে নিরন্ন ভারতবাসীকে। ইংরেজদের ছত্রছায়ায় মুনাফার পাহাড় বানিয়েছে তারা। কিন্তু ইংরেজ-বিদ্বেষের অন্তরালে সেদিনের 'দেশপ্রেমীরা' এই শোষণের প্রতি দৃষ্টি এড়িয়ে গেছেন। বরং জ্ঞাতে হোক বা অজ্ঞাতে এদেরই হাত শক্ত করেছেন। তারা ভেবেছেন বৃটিশকে এদেশ থেকে হঠাতে পারলে সব আপনা আপনি ঠিক হয়ে যাবে। দেশের শৃঙ্খল মোচন বলতে বুঝেছেন ইংরেজ শাসন থেকে মুক্তি। তারই ফলশ্রুতিতে ইংরেজ যত দেশ শাসনে ভারতীয়দের গুরুত্ব দিয়েছে, দেশীয় জমিদার-শিল্পপতিদের শোষণ তত জাঁকিয়ে বসেছে। কিন্তু দেশের কৃষক-আদিবাসীরা এ শোষণ মুখ বুঁজে সহ্য করে নি। তারা বারবার কঠিন লড়াই করেছে। সে লড়াই দেশিয় জমিদারদের নিজস্ব বাহিনী, পুলিশ, মিলিটারির সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে। কিন্তু এই শ্রমজীবী মানুষদের দেশপ্রেমিকের মর্যাদা দেওয়া হয় নি। দেশপ্রেমিকের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে সে যুগের ধনী আর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনীতিকদের যারা শুধু এই বিদ্রোহের পাশে দাঁড়ায় নি তা নয়, তারা প্রকাশ্যে এইসব বিদ্রোহের বিরুদ্ধাচরণ করেছে, কখনও বন্ধু সেজে এই গণআন্দোলনে ঢুকে তাকে বিপথে চালিত করেছে। ধনী, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এইসব নেতা, বুদ্ধিজীবী, ঐতিহাসিকের কাছে দেশ বলতে দেশের কোটি কোটি নিরন্ন মানুষ ছিল না, দেশ বলতে বুঝিয়েছেন দেশমাতৃকা। সেদিনের স্বদেশী গান লেখা হয়েছে দেশের মাটিকে নিয়ে, দেশের পাহাড়-নদী-বনকে নিয়ে——দেশের মানুষকে নিয়ে নয়। দেশপ্রেমের সেই ধারণা আজও ইচ্ছাকৃতভাবে চালানো হচ্ছে। দেশের গান বলতে বোঝানো হচ্ছে——

"ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা" কিংবা "এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি, সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।" দেশের নদী-বন-পাহাড় অবশ্যই সম্পদ, কিন্তু আসল সম্পদ হচ্ছে দেশের মানুষ। দেশের সোনায় মোড়া পাহাড়, রূপোয় মোড়া উপত্যকা, হীরে ভরতি খনি নিয়ে আমরা কি করব যদি না দেশে শ্রমিক থাকে সেগুলোকে মানুষের ব্যবহারের উপযোগী করার জন্যে, দেশে যদি কৃষক না থাকে ফসল ফলাবার জন্যে। কোন দেশের মানুষ গর্ব করতে পারে যদি সেদেশের সমস্ত মানুষ সুখে-সমৃদ্ধিতে থাকে, সবার জন্যে মেলে পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা। আর এসব থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেশমাতাকে পুজো করাকে দেশপ্রেম বলে চালানো হয়। অব্যাহত থাকে শোষণ-বঞ্চনা-নিপীড়ন। আজও ভারতে বহন করা হচ্ছে দেশপ্রেমের এই বিকৃত ঐতিহ্য।

দেশপ্রেমের এই ভ্রান্ত ধারণা থেকে অন্য জাতীয়তাবাদী নেতাদের মত সেদিনের সুভাষচন্দ্রও মুক্ত ছিলেন না।

আই সি এস পর্ব

প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বিতাড়িত হয়ে সুভাষ কটকে ফিরে গেলেন। তার ইচ্ছা ছিল ইংল্যান্ডে গিয়ে পড়াশুনা করবেন। কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার জানকীনাথের আঁতে প্রবল ঘা দিয়েছিল। তিনি পরিষ্কার বললেন যে আগে সেই কলকাতা থেকেই পড়া শেষ করতে হবে। সুতরাং এক বছর পরে আবার চেষ্টা-চরিত্র চলতে থাকল। আশুতোষ মুখার্জী অনুমতি দিলেন। সুভাষ ভর্তি হলেন স্কটিশ চার্চ কলেজে। কলেজে এবার সুভাষ সুবোধ বালক হয়েই থাকলেন। তার ভাষায়——"কলেজে আমি গন্ডগোল এড়িয়ে চলেছিলাম"। ১৯১৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় হয়ে B. A. পাস করলেন। স্কটিশের জীবনে উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলতে গভর্ণমেন্ট ভারত-রক্ষা বাহিনীর একটা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা খুলেছিল, তাতে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। এই চারমাসের সামরিক শিক্ষা সুভাষের খুব ভালো লেগেছিল। এবং আমরা দেখব পরবর্তীকালে এই সামরিক বিদ্যার বলেই তিনি একটা সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক পর্যন্ত হয়েছিলেন।

এরপর সুভাষ এক্সপেরিমেন্টাল সাইকোলজি নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে M.A. তে ভর্তি হলেন। এদিকে বাংলায় তখন চলছে জোর ডামাডোল। বিশ্বযুদ্ধের দরুন দারুণ মূল্যবৃদ্ধি গরীব-মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনযাপনকে কঠোর করে দিয়েছে। চারদিকে বেকারি দুঃখ-দুর্দশা। গান্ধী যে আশায় যুদ্ধে বৃটিশকে সাহায্য করলেন তা পূরণ হল না। ক্ষোভে বাংলাদেশে আবার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। সাথে সাথে চলল পুলিশের ধর-পাকড়। জানকীনাথ দেখলেন বিপদ। যা ছেলে, সন্ত্রাসবাদীদের সাথে ভিড়ে না পড়ে। ছেলেকে ডেকে বললেন——I.C.S. পড়াতে তোমাকে ইংল্যান্ডে পাঠাতে চাই। রাজী আছ কিনা চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে জানাও। না, চব্বিশ ঘন্টা লাগে নি। কয়েক ঘন্টার মধ্যে সুভাষ জানিয়ে দিলেন যে তিনি রাজী। এক আত্মীয় পুলিশের বড়কর্তা ছিল। তার তৎপরতায় জলদি পাসপোর্ট মিলে গেল। সুভাষ চেপে বসলেন জাহাজে। তার সেই দল সাধ্যমত বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কোন বাধাতেই কাজ হল না। কিন্তু যে সুভাষ বৃটিশ শাসনের প্রতি এত বীতশ্রদ্ধ, সেই ইংরেজ সরকারের অধীনে একটা পদের জন্যে তিনি ছুটলেন কেন ? বয়স অনুযায়ী আই সি. এস পরীক্ষায় বসার সেটাই তার শেষ সুযোগ। পরীক্ষায় আর মাত্র আট মাস বাকি। সুভাষ ভাবলেন আই সি. এস পাশ করি বা না করি কেম্ব্রিজে পড়ার এই সুযোগটা ছাড়া ঠিক হবে না। আর যদি আই সি. এস. পাশ

করেই যাই, কি করব না করব পরে দেখা যাবে। কেম্ব্রিজের ডিগ্রি নেবার জন্যে তিনি কত আগ্রহী ছিলেন তা বোঝা যায় হেমন্ত সরকারকে লেখা চিঠি পড়লেই—"এখানকার degree আমাকে লইতে হইবেই, কারণ ভবিষ্যতে আমার কাজে লাগিবে।" এই ডিগ্রি নেওয়াটাকে সুভাষ অত্যন্ত জরুরী বুঝেছিলেন। কলকাতা থেকে বহিস্কৃত হবার পর কটক থেকে বন্ধু হেমন্তকে লেখা চিঠিতে তিনি লেখেন—

একটা কথা বলি তুমি rusticated student কে যেভাবে দেখ সমাজ সে ভাবে দেখে না। তাহার ভিতরে potential যাহা কিছু থাক না কেন উপযুক্ত লেজ সংগ্রহ না করিলে সমাজ সহজে তাহার নিকট মাথা নত করিতে চাহিবে না। লেজ না থাকিলে আত্মপ্রতিষ্ঠার দেরী হয়। আমার সে লেজ নাই।........লেজ না থাকিলে অবশ্য বারে বারে কাজ কবিয়া গেলে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করা যায়। কিন্তু আমি লেজ সংগ্রহ করে কাজটা accelerated করিতে চাহি। আমার এইটুকুমাত্র বলার আছে।

অতএব লেজ সংগ্রহ করতে সুভাষ আদাজল খেয়ে লেগে গেলেন। আই সি. এস পাশ করতে ততোধিক। প্রচন্ড পরিশ্রম করে প্রস্তুতি নিলেন। পরীক্ষা তার মনোমত না হলেও তিনি চতুর্থ স্হান পেলেন। পড়াশোনার ব্যাপারে কোন বাধাই তার কাছে বাধা নয়।

আই সি. এস. তো পাশ হল, এবার কি করবেন? এর আগেও কয়েকজন ভারতীয় আই সি. এস. পাশ করেছেন। কিন্তু তিনি একটা নতুন দৃষ্টান্ত রাখতে চান। এর বহু আগে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়বার সময় ঠিক করেছিলেন তিনি I.C.S. আর হেমন্ত I.E.S. এ ঢুকে চাকরি ছেড়ে দিয়ে চাকরির মোহগ্রস্ত দেশবাসীর কাছে একটা আদর্শ স্হাপন করবেন। পুরো কলেজ জীবনে সুভাষ এমন একটা ভাবমূর্তি তৈরী করেছিলেন যে তার I.C.S. পরীক্ষা দিতে যাওয়াটাই ছিল বন্ধুদের কাছে একটা বিস্ময়। তাই তাকে বিলাত থেকে লিখতে হয—"আমার একমাত্র প্রার্থনা যে আমার হিতৈষীরা আমার সম্বন্ধে কোন hasty opinion না form করেন।" প্রেসিডেন্সি কলেজের সহপাঠী দিলীপকুমার রায়ও সুভাষ আই সি. এস পরীক্ষা দিতে বিলেত যাবে শুনে 'নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারেন নি'। এরপর সুভাষ ইংল্যান্ডে দিলীপ এবং আরও কয়েকজন বন্ধুকে গোপনে জানালেন যে পাশ করলেও তিনি নিজে থেকে ইস্তফা দেবেন। সুভাষ যে পাশ করবে এ বিষয়ে কারও সন্দেহ ছিল না। ইংল্যান্ডের সবাই অপেক্ষা করে ছিল কবে সে ইস্তফা দেবে সেই দিনটার জন্য। এমনকি পদত্যাগ করার আগেই কলকাতায় রটে গিয়েছিল যে সুভাষ পদত্যাগ করেছেন। এ সম্বন্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি লিখেছিলেন—"কিছু কিছু লোক আমার সম্বন্ধে আমার চাইতে বেশি জানে বলে মনে হচ্ছে।"

তবুও মনস্থির করতে দীর্ঘ সাত মাস সময় লাগল। বাবার সব উপরোধ ঠেলে সুভাষ আই সি. এস থেকে পদত্যাগ করলেন। বাবা টাকা পাঠাবেন না বুঝে বন্ধুর থেকে নব্বই পাউন্ড ধার নিয়ে দেশে ফেরার জাহাজে চাপলেন। কারণ সময়-সুযোগ বয়ে যাচ্ছে। আর দেরি করা যায় না। জাহাজ চলল স্বদেশের দিকে। না কলকাতা নয়, সুভাষ যাচ্ছেন বোম্বাইতে যেখানে তিনি দেখা করবেন ভারতের জাতীয় আন্দোলনের একছত্র সম্রাট গান্ধীর সঙ্গে।

কেন আই সি এস ছাড়লেন

সুভাষচন্দ্র যখন ইংল্যান্ডে কঠোর পড়াশোনা করছেন ভারতবর্ষের পরিস্থিতি তখন অগ্নিগর্ভ। তিনি দেশ ছেড়ে যাবার আগেই জালিওয়ানাবাগের হত্যাকান্ড হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সে খবর তিনি জানতেন না ! তার ভাষায়——"কিন্তু জনসাধারণ উত্তর-পশ্চিমে কি ঘটছিল সে বিষয়ে কোনও খবরই জানত না, এবং আমি একটা আত্মতুষ্টির ভাব নিয়েই ইউরোপের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম।" (*এ্যান ইন্ডিয়ান পিলগ্রিম*)। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে জালিওয়ানাবাগের হত্যাকান্ড হয়েছিল ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ এপ্রিল। সুভাষচন্দ্র ইংল্যান্ডে যাবার জন্য জাহাজে উঠলেন ১৫ সেপ্টেম্বর। এই দীর্ঘ পাঁচ মাসেও তিনি কেন যে এ বিষয়ে কোনও খবরই জানলেন না তা বিস্ময়কর। ১৩ এপ্রিল ঘটা এই ঘৃণ্য হত্যাকান্ডের খবর অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৭ এপ্রিল। সে খবর কি সুভাষের চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল ? ধরা যাক, তিনি খবরটা পড়েন নি। কিন্তু জালিওয়ানাবাগের গণহত্যার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করলেন ৩০ মে। তার এই প্রতিবাদী ভূমিকায় গোটা দেশজুড়ে বিশেষতঃ শিক্ষিত ভারতবাসীর মধ্যে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। এমত অবস্থায় সুভাষের মত একজন রাজনীতি সচেতন ছাত্র কিছুই জানতে পারেন নি——এটা ভাবা যায় না। মজার কথা, আজ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রের কোন জীবনীকারই এ বিষয়ে প্রশ্ন তোলে নি।

যাইহোক, জালিওয়ানাবাগের পাশবিক হত্যাকান্ডের প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেশের মানুষের ক্ষোভ ক্রমেই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের চেহারা নিল এবং অতি দ্রুত সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ল। গান্ধী দেখলেন যে বৃটিশকে তোষামোদ করে চললে আর জনতার চোখের মণি হয়ে থাকা যাবে না। তিনি তড়িঘড়ি করে বৃটিশ সরকারের বিরুধে অহিংস আন্দোলনের ডাক দিলেন। দেশের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষিপ্ত আন্দোলনের কোন উপযুক্ত নেতৃত্ব ছিল না। দেশবাসী নেহাত বাধ্য হয়েই গান্ধীর নেতৃত্ব মেনে নিলেন। লক্ষ লক্ষ জনতার উৎসাহিত আত্মত্যাগে আন্দোলন সর্বাত্মক চেহারা নিল।

এদিকে সুভাষ তখন আই সি এস পাশ করে কেম্ব্রিজে ডিগ্রি পরীক্ষার জন্যে তৈরী হচ্ছেন আর চিঠি লিখে লিখে বাবা-দাদাকে আই সি এস থেকে পদত্যাগের অনুমতি দিতে অনুরোধ করছেন। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের ব্যাপকতায় এবং তখন পর্যন্ত তার সাফল্যে সুভাষের নিশ্চিত ধারণা হল যে রাজনীতিতে যোগ দেবার সুবর্ণ সুযোগ চলে যাচ্ছে। প্রথমে যখন আই সি এস পরীক্ষায় বসেছিলেন তখন অন্য চিন্তা ছিল। মেজদা শরৎচন্দ্র বসুকে ১৬ ফেব্রুয়ারী ১৯২১-এর চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন——"কয়েক মাস আগে আমি যখন বর্তমানে এই চাকরী গ্রহণ করার কথা চিন্তা করছিলাম, আমার উদ্দেশ্য ছিল আমার জন্য যত টাকা খরচ হয়েছে, মোটামুটি সমপরিমাণ টাকা সঞ্চয় করে তারপর চাকরী থেকে পদত্যাগ করে জনকল্যাণমূলক কাজে যোগদান করা।" কিন্তু এখন পরিস্থিতি অন্যরকম। অসহযোগ আন্দোলন তুঙ্গে। তার উপর আবার গান্ধী বলেছেন যে এক বছরের মধ্যে স্বরাজ আসবে। রাজনীতিতে যোগ দেবার এই সুযোগ সুভাষ হাতছাড়া করতে রাজী নন। তিনি ছয় মাসও দেরী করতে চান না, কারণ——"ছয় মাসে, গঙ্গার জল অনেক দূর বইতে পারে।" অর্থাৎ ছ'মাস পরে রাজনীতিতে যোগ দিলে এরকম একটা আন্দোলনের সুযোগ নাও মিলতে পারে। সেইজন্য সুভাষ তার পূর্ব পরিকল্পনার আগেই আই সি এস থেকে পদত্যাগ করে ভারতে ফিরে চললেন। যদিও তিনি জানেন——"এ

আন্দোলনে আমি সামান্য সাহায্য করার চাইতে বেশী কিছু করতে সক্ষম নই।" *(শরৎচন্দ্র বসুকে ৬ এপ্রিল ১৯২১ লেখা চিঠি)*।

বৃটেনে থাকতেই সুভাষচন্দ্র ভারতে চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে চিঠিতে আলাপচারিতা করেছিলেন। তার উদ্দেশ্য তিনি সেই চিঠিতেই উল্লেখ করেছেন—"আমার ইচ্ছা clear-cut plans লইয়া চাকুরী ছাড়িতে। তাহা করিতে পারিলে চাকুরী ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে নামিতে পারিব।" ঐ চিঠিতে আরও জানালেন যে দেশে ফিরে তিনি জাতীয় কলেজে পড়াতে পারবেন এবং যদি কোন দৈনিক খবরের কাগজ ইংরাজীতে প্রকাশ করা যায় তবে তিনি তাতে লিখতে পারবেন। *(১৬ ফেব্রুয়ারী ১৯২১ চিত্তরঞ্জন দাশকে লেখা চিঠি)*। জবাবে চিত্তরঞ্জন কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রকে স্বাগত জানালেন। আরও লিখলেন যে কংগ্রেসে আন্তরিকতাসম্পন্ন ভাল কর্মীর খুব অভাব।

কিন্তু দেশে ফিরে সুভাষ প্রথমেই দেখা করলেন গান্ধীর সঙ্গে। কারণ যার অঙ্গুলিহেলনে কংগ্রেস চলছে সুভাষ চাইলেন তার মতামত আর কর্মসূচী সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিতে। বোম্বাই-এর মণিভবনে দু'জনের দেখা হল। গান্ধীর ব্যক্তিত্বে সুভাষ মুগ্ধ হলেন। কিন্তু রাজনৈতিক কর্মসূচী আর কৌশল নিয়ে গান্ধীর কাছে তিনি যা জেনে নিতে চাইলেন, গান্ধীর জবাবে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। বিচক্ষণ গান্ধী বুঝলেন কার সাথে এই তরুণের ভাল খাপ খাবে। তিনি সুভাষকে কলকাতায় গিয়ে চিত্তরঞ্জনের সাথে দেখা করতে বললেন। সুভাষ চলে এলেন কলকাতায়—চিত্তরঞ্জনের সাথে দেখা করতে। কিন্তু চিত্তরঞ্জন তখন কিছুদিনের জন্যে কলকাতার বাইরে। সুতরাং সুভাষকে কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতেই হল।

তৃতীয় পর্ব

কংগ্রেস নেতা সুভাষ

চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে

চিত্তরঞ্জন দাশ আগেই চিঠিতে জানিয়েছিলেন যে ভাল কর্মীর খুব অভাব। সুতরাং সুভাষের কাজ পেতে অসুবিধা হল না। একে বড় বংশের ছেলে, সুদর্শন, তার উপর সদ্য সিভিল সার্ভিস অবহেলায় ছেড়ে এসেছেন (জনপ্রিয় রাজনীতিতে এগুলোর বেশ দাম আছে)——কাজেই কংগ্রেসে একজন কর্মী হিসেবে শুরু করতে হল না। সুভাষচন্দ্র শুরু থেকেই কংগ্রেসের নেতা। জাতীয় বিদ্যালয়ে পড়ানো, সাপ্তাহিক 'বাংলার কথা' পত্রিকার সম্পাদনা আর বঙ্গীয় কংগ্রেসের প্রচার সচিবের দায়িত্ব দেওয়া হল তাকে। নতুন কাজ তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে করতে লাগলেন। জাতীয় বিদ্যালয় ছিল অত্যন্ত টিমটিমে। দেখা গেল, কোনদিন যদি কোন ছাত্র নাও আসে তবুও সুভাষচন্দ্র শূন্য ঘরে একা বসে আছেন। স্বভাবতই তিনি চিত্তরঞ্জনের খুব আস্থাভাজন হয়ে গেলেন।

এরমধ্যে ১৯২১ এরই ১৭ নভেম্বর প্রিন্স অব ওয়েলশ বোম্বাইতে এসে পৌঁছুলেন। ঐ দিনই কংগ্রেস সারা দেশে হরতাল ডাকল। খিলাফতী সংগঠনগুলোর সহযোগিতায় কলকাতায় হরতাল বেশ ভালরকম সফল হল। এরপর বাংলার কংগ্রেসকর্মীরা চাইল আইন অমান্য করতে। চিত্তরঞ্জন তার কর্মীদের শক্তি বেশ ভালই জানতেন। তিনি বড় সমাবেশ না করে পাঁচজনের ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে কলকাতায় শান্তিপূর্ণভাবে খদ্দর বিক্রি করার পরামর্শ দিলেন। দেখা গেল তাতেও ছেলে জুটছে না। বিচক্ষণ চিত্তরঞ্জন নিজের ছেলে ভোম্বলকে পাঠালেন আইন অমান্য করতে। ভোম্বলের গ্রেপ্তারের পর চিত্তরঞ্জন স্ত্রী বাসন্তী দেবীকে দিয়ে আইন অমান্য করালেন। বাসন্তী দেবীকে পুলিশ অনেকক্ষণ রেখে গভীর রাত্রিতে ছেড়ে দিল। কিন্তু তাতেই চিত্তরঞ্জন তার ইপ্সিত ফল পেয়ে গেলেন। এবার কংগ্রেসের ছেলেরা আইন অমান্য আন্দোলনে দলে দলে অংশ নিয়ে গ্রেপ্তার বরণ করল। এদিকে সুভাষ কেবলই কাঁদতে থাকলেন—— কেন পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করছে না। সুভাষের এই কাঁদুনে স্বভাবের জন্যে চিত্তরঞ্জন তাকে আদর করে 'ক্রাইং ক্যাপ্টেন' বলে ডাকতেন। এর পরেও আমরা দেখব সুভাষ এরকম যখন তখন কেঁদে ফেলে অপরকে অপ্রস্তুতে ফেলে দিতেন। দু'একটা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ দিই—— তখন তার ধর্মের ভাব ছিলো প্রধান, কর্মের ভাব গৌণ। কর্মের দিকে মাথা ঘামাতেই চাহিতো না। আমাদের ক্লাশের আশুতোষ দাস আমার পাশের ঘরেই থাকিতো। আশুর

কথা শুনিয়া কাঁদ কাঁদ মুখে সুভাষ আসিয়া বলিল সুরেশ'দা, আমায় নাকি কাজ করতে হবে। আমি তাকে সান্ত্বনার সুরে তাড়াতাড়ি বলিলাম না,না; কে বল্লে তোমায় কাজ করতে হবে ভগবান লাভেই তোমার সারা জীবন কাটবে। আমার কথা শুনিয়া সে ভারি খুসি হইলো তার কাঁদ কাঁদ ভাব দূর হইলো (*সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়–জীবন প্রবাহ*)। কিংবা তার প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াকালীন আর একটা ঘটনা——

আমরা হেঁটে চলেছি, মাঠের দু'ধারে অড়রের ক্ষেত্র। সুভাষের জীবনে পল্লীর সঙ্গে এই প্রথম পরিচয়। এত বড় সবুজ ক্ষেত্র দেখে সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে আমায় জিজ্ঞাসা করলো এটা কিসের বন? আমি উত্তর করলাম অশ্বত্থ গাছের বন। খানিক দূর এগিয়ে আর একটি অড়র ক্ষেত্র দেখে সুভাষ বললো, কত বড় আর একটি অশ্বত্থ বন, দেখ। সঙ্গীরা সকলে হেসে উঠলেন। সুভাষ হাসির কারণ বুঝতে না পেরে ছল ছল চোখে জিজ্ঞাসা করলো ওরা হাসলো কেন? আমি বললাম ওগুলো অশ্বত্থ গাছ নয়, অড়র গাছ। সুভাষ আমায় সুধালো, তুমি আমায় অমন অপ্রস্তুত করলে কেন? বলতে বলতে তার চোখ দিয়ে ধারা বেয়ে জল পড়তে লাগলো (*হেমন্তকুমার সরকার——সুভাষের সঙ্গে বারো বছর*)। আর এক প্রিয় বন্ধু দিলীপকুমার রায়ও লিখেছেন কিভাবে বন্ধুকে পেয়ে সুভাষ জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠতেন। (*আমার বন্ধু সুভাষ*)। আরও পরে তিনি যখন কংগ্রেসের একজন বড়মাপের নেতা সে সময়কার একটা ঘটনার উল্লেখ করে এ প্রসঙ্গের ইতি টানবো——

১৯৩৩-এর গোড়ায় ঠাকুমা আমাদের সঙ্গে জব্বলপুর গিয়েছিলেন, জেলে বাবা ও রাঙাকাকুর সঙ্গে দেখা করতে। রাঙ্গাকাকাবাবু ইউরোপে যাবেন চিকিৎসার জন্য। বিদায়ের সময় রাঙ্গাকাকাবাবু বেশ খানিকটা কান্নাকাটি করলেন। দেশবন্ধু কেন তাঁকে ক্রাইং ক্যাপ্টেন বলতেন বুঝলাম (*শিশিরকুমার বসু——বসু-বাড়ি*)। যাইহোক শেষ পর্যন্ত ১০ ডিসেম্বর ১৯২১ সুভাষচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন-কে গ্রেপ্তার করা হল। সুভাষচন্দ্রের ছ'মাস জেল হল! তিনি কিন্তু মোটেও সন্তুষ্ট হলেন না। বললেন——'মোটে ছ' মাস! আমি কি মুর্গিচোর' ? এদিকে ঐ ডিসেম্বরেই আমেদাবাদ কংগ্রেস। চিত্তরঞ্জন দাশের ঐ কংগ্রেসে সভাপতি হবার কথা। স্বভাবতঃই তিনি কংগ্রেসে যোগ দেবার জন্যে জেল থেকে ছাড়া পেতে অত্যন্ত উদগ্রীব। সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এলেন আবুল কালাম আজাদ আর মদনমোহন মালব্য। তারা চিত্তরঞ্জন এবং অপরাপর বন্দীদের মুক্তির চেষ্টায় বৃটিশ সরকার আর গান্ধীর মধ্যে চুক্তির জন্যে ছোটাছুটি করতে লাগলেন। সরকার থেকে বলা হল, যুবরাজের ভারত ভ্রমণ বয়কট করা হবে না এই শর্তে আইন অমান্যে যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের মুক্তি দেওয়া হবে। শর্তে রাজী থাকলেও গান্ধী আলি ভাইদের মুক্তি দাবী করলেন। কিন্তু তাদেরকে আইন অমান্যে বন্দী করা হয় নি এই অজুহাতে সরকার মুক্তি দিতে অস্বীকার করল। বন্দীমুক্তি নিয়ে কোন চুক্তি হল না। চিত্তরঞ্জন দাশ ক্ষেপে আগুন হলেন। আমেদাবাদ কংগ্রেসে আর তার যাওয়া হল না। এই আমেদাবাদ কংগ্রেসেই প্রথম পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব তোলেন যুক্ত প্রদেশের এক নেতা——হসরৎ মোহানী। কিন্তু না নরমপন্থী, না চরমপন্থী——তার পাশে দাঁড়াবার মত সেদিন কেউ ছিল না।

জেলে বসেই চিত্তরঞ্জন তার সঙ্গীদের সাথে পরামর্শ করে ঠিক করলেন যে তারা আইনসভার ভোটে অংশ নেবেন। যেহেতু গান্ধী ১৯২০ তেই আইনসভা বর্জনের ডাক দিয়েছিলেন এবং এতদিন সেটাই কার্যকরী ছিল, সেইজন্যে বাংলায় যারা গান্ধীবাদী ছিলেন এতে রাজী হলেন না। জেলের মধ্যেই প্রবল তর্ক-বিতর্ক ঝগড়াঝাটি চলতে থাকল,

মারামারিও বাদ গেল না। এরই মধ্যে ১৯২২ এর মে মাসে চট্টগ্রামে বাংলা কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলন। ওখানে আইনসভায় যোগদানের প্রস্তাব পাশ করাতে হবে। চিত্তরঞ্জন তো জেলে। তিনি অন্য কাউকে সভাপতিত্ব করাতে ভরসা পেলেন না। সম্মেলনে সভাপতির আসনে বসানো হল তারই স্ত্রী বাসন্তী দেবীকে। সভাপতির আসন থেকে বাসন্তী দেবী যে ভাষণটা পাঠ করলেন তা লিখে দিয়েছিলেন চিত্তরঞ্জনের পার্শ্বচর হেমন্তকুমার সরকার (*সুভাষের সঙ্গে বারো বছর*)। যারা এখনকার রাজনীতিতে বৌ-ছেলেমেয়ে-ভাগ্না-ভাতিজা'দের প্রভাব দেখে হাহুতাশ করেন তারা কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা পেতে পারেন। যাইহোক আইনসভায় অংশ গ্রহণের প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে চিত্তরঞ্জন আর সুভাষ দুজনেই আইনসভায় ঢোকার প্রস্তাব সর্বভারতীয় কংগ্রেসে পাশ করানোর জন্যে উঠেপড়ে লাগলেন। এছাড়া আর কী-ই বা উপায় আছে। ইতিমধ্যে গান্ধী বরদোলি থেকে আইন-অমান্য আন্দোলন সম্পূর্ণ বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। কংগ্রেস সদস্য সংখ্যা হু হু করে কমছে, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, দেশে বামপন্থী কৃষক এবং শ্রমিক সংগঠনের জন্ম হয়েছে আর ক্রমেই তাদের প্রভাব বাড়ছে। এই প্রবণতাগুলোকে রুখতেই বিকল্প কর্মসূচী ঐ আইনসভা এবং কর্পোরেশন. পুরসভাগুলোতে যোগদান।

ঐ সময়েই ১৯২২ এর সেপ্টেম্বর নাগাদ উত্তরবঙ্গে ভয়ঙ্কর বন্যা দেখা দিল। বন্যাত্রাণে সুভাষচন্দ্র উত্তরবঙ্গে গেলেন। তিনি ইন্ডিয়ান স্টাগল-এ লিখেছেন—'সরকারের নিকট হইতে কোনরূপ সাহায্য না পাইলেও জনসাধারণ পরিচালিত এই ত্রাণকার্য এরূপ সাফল্যলাভ করিয়াছিল যে ইহার ফলে কংগ্রেসের সম্মান অনেকাংশে বৃদ্ধি পাইল। এই সাফল্যেব প্রধান কৃতিত্ব কংগ্রেস সদস্যবৃন্দের।'' বস্তুতঃপক্ষে এই ত্রাণকার্যের সুবাদে সুভাষচন্দ্রের নাম সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে যা তার পরবর্তীকালের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠায় বেশ কাজে লেগেছিল। সুভাষচন্দ্রের লেখা পড়ে মনে হয় যেন কংগ্রেসই এই ত্রাণকার্য করেছিল। আসলে কিন্তু ত্রাণকার্য পরিচালনা করেছিল বেঙ্গল রিলিফ কমিটি। সেই কমিটির সভাপতি ছিলেন বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তার 'আত্মজীবনী'তে প্রফুলচন্দ্র লিখেছেন—বেঙ্গল রিলিফ কমিটি এইগুলির (স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির—লেখক) কার্যকে ঐক্যবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত না করিলে নানা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইত এবং বহু শক্তির অপব্যয় হইত। বেঙ্গল রিলিফ কমিটি পূর্ব হইতেই অবস্থা বুঝিয়া, কংগ্রেস কমিটি, বেঙ্গল কেমিক্যাল এবং ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস, বেঙ্গল সোশ্যাল সার্ভিস লীগ, বঙ্গীয় যুবক সংঘ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে, কার্য নির্বাহক সমিতিতে তাঁহাদের প্রতিনিধি পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন; উদেশ্য, যাহাতে পরস্পর পরামর্শ ও আলোচনা করিয়া কার্যের শৃঙ্খলা বিধান করা যাইতে পারে! সুতরাং আরও অনেকগুলো স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের মত কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সুভাষচন্দ্রের নাম কয়েকজন সম্পাদকের অন্যতম হিসাবে গৃহীত হয়। প্রফুল্লচন্দ্র রায় ত্রাণকার্যের কর্মী হিসেবে সুভাষচন্দ্রের অবদান স্বীকার করেও ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত এবং সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের নাম অধিকতর গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছেন। বরং পরবর্তীকালে তিনি জানিয়েছিলেন যে ত্রাণকার্যের কাজ মাঝপথে ফেলে রেখে সুভাষ হঠাৎ উত্তরবঙ্গ ছেড়ে চলে যাওয়ায় ত্রাণকার্যের খুব ক্ষতি হয়েছিল (*২১ আগস্ট ১৯৩১. লিবার্টি পত্রিকায় প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের চিঠি*)। এই ত্রাণকার্যের ব্যাপারে পরে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অপ্রীতিকর মনোমালিন্য আর বিবৃতির লড়াই হয়েছিল। অথচ ত্রাণকার্যে সবচেয়ে বেশি নাম হয়েছিল সুভাষেরই।

কংগ্রেসে তার মনোমত প্রস্তাব পাশ করানোর উদ্যোগে চিত্তরঞ্জন তড়িঘড়ি করে

উত্তরবঙ্গ থেকে সুভাষকে ডেকে নিলেন। কিন্তু ১৯২২এর ডিসেম্বরের গয়া কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জনের আইনসভায় যোগদানের প্রস্তাব বেশ ভালোমতই হেরে গেল। অসন্তুষ্ট চিত্তরঞ্জন সভাপতির পদ ছেড়ে দিয়ে আলাদা স্বরাজ্য দল তৈরী করলেন। যুক্তপ্রদেশের মতিলাল নেহেরু, বোম্বাই-এর বিঠ্ঠলভাই প্যাটেল স্বরাজ্যদলের পক্ষে গেলেন। বাংলা থেকে গেলেন সুভাষচন্দ্র বসু, কিরণশঙ্কর রায়, হেমন্তকুমার সরকার——এরা। বাংলাতে যারা গান্ধীর অনুরাগী ছিলেন তারা এর বিরোধিতা করতে থাকলেন। দু'দলের মধ্যে কাদা ছোড়াছুড়িও কম হল না। কিন্তু চিত্তরঞ্জনই দূরদর্শী বলে প্রমাণ হয়ে গেল। কংগ্রেসের অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও বুঝতে পারল যে আন্দোলনবিমুখ কংগ্রেসের পক্ষে আইনসভায় যোগ দেওয়া ছাড়া অন্য রাস্তা নেই। বিশেষতঃ অবস্থার যিনি কিছু পরিবর্তন করতে পারতেন সেই গান্ধীই যখন জেলে। সুতরাং ১৯২৩ এর সেপ্টেম্বরে দিল্লীতে কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশনে আইনসভায় অংশ নেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হল। কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জন-মতিলালের নেতৃত্ব কায়েম হল। এই বছরই সুভাষচন্দ্র বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকের পদ পেলেন।

কংগ্রেসের নেতৃত্ব পেয়েই চিত্তরঞ্জন গান্ধীর ডানা ছাঁটতে উদ্যোগী হলেন। সদ্যমুক্ত গান্ধীর সাথে চিত্তরঞ্জন আর মতিলাল এক চুক্তি করলেন। 'গান্ধী-দাশ চুক্তি' অনুযায়ী ঠিক হল যে কংগ্রেসের নীতি ও কর্মসূচী নির্ধারণ করবে এবং নেতৃত্ব দেবে স্বরাজ্যপন্থীরা। আর গান্ধী নানা সমাজ সংস্কারমূলক কার্যক্রমে নিজেকে আবদ্ধ রাখবেন। গান্ধী বললেন—— "শিশু যেমন তার মা'কে আঁকড়ে থাকে তেমনি আমিও স্বরাজ্যদলের আশ্রয়ে থাকব" *(সুভাষচন্দ্র বসু——দ্য ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল)*। এভাবে চিত্তরঞ্জন বড় একটা পথের কাঁটা সরিয়ে ফেললেন। কিন্তু যে গান্ধী জমিদার মিলমালিকদের নয়নের মণি, সেই গান্ধীকে চিত্তরঞ্জন এত সহজে সরালেন কি করে? আসলে সেই মুহূর্তে ভারতীয় ধনীরা গান্ধীকে চাইছিল না। ১৯২০-২১ সালের অসহযোগ আন্দোলন গান্ধীর আয়ত্তের বাইরে চলে যাওয়ায় আর সেই আন্দোলনে শ্রমিক-কৃষকের স্বতঃস্ফূর্ত নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তারা খুব আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। বৃটিশ শাসনের অধীনে থেকে এই আইনসভায় লড়াই করে সুযোগ সুবিধা আদায়ের প্রস্তাব তাদের খুব ভালো লেগেছিল। চিত্তরঞ্জন কংগ্রেস রাজনীতির চালকের আসনে বসলেন।

মুডিম্যান কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বৃটিশ সরকার আইনসভায় কতগুলো হস্তান্তরিত মন্ত্রক সৃষ্টি করে। ভারতীয় সদস্যরা ঐসব বিভাগে মন্ত্রী হতে পারত। এর মধ্যে দিয়ে মন্ত্রীত্বের গাজর ঝুলিয়ে বৃটিশ বেশ ভালরকম ধর্মীয় বিভেদ সৃষ্টি করতে পেরেছিল। তখনকার অবিভক্ত বাংলা একটা মুসলিম-গরিষ্ঠ প্রদেশ হওয়ায় এখানে ক্ষমতায় আসার জন্যে চিত্তরঞ্জন মুসলমান নেতাদের সাথে এক চুক্তি করলেন। 'বেঙ্গল-প্যাক্ট' নামের এই চুক্তি সাক্ষী হিসাবে সুভাষচন্দ্র বসুর নাম-সহ ১৮ ডিসেম্বর ১৯২৩ খবরের কাগজে প্রকাশিত হল। চুক্তি অনুযায়ী ঠিক হয়েছিল——যে জেলায় যে ধর্মীয় সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে তারা ৬০ শতাংশ আসন পাবে। সংখ্যালঘুরা পাবে ৪০ শতাংশ আসন। সরকারি দপ্তরে ৫৫ শতাংশ আসন মুসলমানদের জন্যে সংরক্ষিত থাকবে। যেহেতু সরকারি চাকরিতে মুসলমানের সংখ্যা যথেষ্ট কম, তাই ঠিক হল যতদিন পর্যন্ত নির্ধারিত সংখ্যক আসন মুসলমান চাকুরে দিয়ে পূর্ণ না হবে ততদিন সরকারি চাকরিতে ৮০ শতাংশ আসন মুসলমানদের জন্যে সংরক্ষিত থাকবে। *(জে এইচ ব্রোমফিল্ড——টোয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরি বেঙ্গল)*। কিন্তু পরে কর্পোরেশনের মেয়র হয়ে মাত্র ২৫ জন মুসলমানকে নিয়োগ করেই

চিত্তরঞ্জনকে যথেষ্ট ঢোক গিলতে হয়েছিল। বেশ কিছু হিন্দু কংগ্রেসকর্মীকে কর্পোরেশনে ঢোকালেও তিনি তার গোঁড়া হিন্দু অনুচরদের অসন্তুষ্টি কমাতে পারেন নি। কোকনদ কংগ্রেসেও বেঙ্গল প্যাক্ট অনুমোদন পায় নি। যাইহোক ধর্মের ভিত্তিতে পদ সংরক্ষণের এই ছিল সূচনা।

বেঙ্গল প্যাক্টে স্বাক্ষরকারী হিসেবে সুভাষচন্দ্রের নাম থাকলেও তিনি কিন্তু সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। আর একজন স্বাক্ষরকারী হিসেবে নাম ছিল হেমেন্তকুমার সরকারের। তিনি কি বলছেন দেখা যাক——

এদিকে হিন্দু-মুসলমান প্যাক্টের কপি নেতাদের সই দিয়ে বেরুলো। আমার এবং সুভাষের নামও তাতে ছিল, আমরা নিজে সই করিনি বা সই করতে মতও দিইনি। সুভাষ ও আমি আস্তিন গুটিয়ে ১৪৮ নং রসা রোডে দেশবন্ধুর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম আমাদের নাম কেন দেওয়া হয়েছে। দেশবন্ধু একটা কানে একটু কম শুনতেন, সেই কানটা বাড়িয়ে শোনবার ভান করলেন এবং অনেকক্ষণ আপনমনে চুপ করে কাজ করে যেতে লাগলেন, আমরা অপেক্ষা করে চলে আসছি, তিনি দেখতে পেয়ে একটুখানি হেসে বললেন তোমাদের নাম সই করে দিতে আমাকে আবার অনুমতি নিতে হবে? আমরা ফিরে এসে বসলাম (*সুভাষের সঙ্গে বারো বছর*)।

এরকমভাবেই চলতেন তখনকার তাবড় জাতীয়তাবাদী নেতারা। অবশ্য এ ধরনের কাজে সুভাষ নিজেও কতটা সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠেছিলেন তা আমরা পরে দেখাব।

মুসলমান নেতাদের সাথে প্যাক্ট করেও স্বারাজ্যদলের ফলাফল আইনসভায় খুব একটা ভালো হল না। কিন্তু কলকাতা কর্পোরেশন নির্বাচনে তারা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল। চিত্তরঞ্জন দাশ মেয়র হলেন, ডেপুটি মেয়র সোহ্‌রাবর্দী। চিত্তরঞ্জন সুভাষকে করলেন কর্পোরেশনের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার। হিউ টয়ের ভাষায়——আই সি এস হয়ে যে পদ পেতে বেশ কয়েক বছর লেগে যেত, আই সি এস ছেড়ে সুভাষ তিন বছরের মধ্যেই তা পেয়ে গেলেন। (*দ্য স্প্রিঙ্গিং টাইগার*)। চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার হিসেবে তিনি বেশ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। কর্পোরেশনের কাজকর্মই হয়ে উঠল তার ধ্যান-জ্ঞান। খুব সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত চলত কাজ। এর ফলে কংগ্রেসের কাজকর্ম গেল চুলোয়। অবশ্য সেসময় স্বরাজ্য দল আন্দোলন বলতে কিছুই করত না। স্বরাজ্যদলের গোটা শাসনকালে আন্দোলন তারা একটাই করেছিল। তবে সেটা ইংরেজদের বিরুদ্ধে নয়, তা ছিল তারকেশ্বরের মোহন্তদের বিরুদ্ধে——তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ।

বৃটিশ সরকার এই সুযোগটাই নিল। গোটা কংগ্রেস আন্দোলন পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে যখনই কংগ্রেস তার আন্দোলন-আন্দোলন খেলা বন্ধ করেছে তখনই বৃটিশ তাকে আঘাত করেছে। ১৯২৪এর ২৫ অক্টোবর বাংলার বেশ কয়েকজন কংগ্রেস নেতার সাথে সুভাষকেও গ্রেপ্তার করা হল। প্রথমে রাখা হল আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে। জেলে বসেই তিনি কর্পোরেশনের কাজকর্ম চালাতে লাগলেন। এরজন্য বিশেষ অনুমতি মিলেছিল। কিন্তু অবিলম্বে তাকে বহরমপুর জেলে পাঠানো হল এবং সেখান থেকে দূর বর্মায়——মান্দালয় জেলে। এই মান্দালয় জেলে বসেই সুভাষচন্দ্র ১৯২৫ এর জুনে চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর খবর পেলেন।

বর্মার জেলে

১৯২৫ এর অক্টোবরে সুভাষচন্দ্রের গ্রেপ্তারের কারণ হিসাবে কংগ্রেসের বহু নেতা নিজেদের কিছু কিছু নেতার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। এমনকি অনেকেই নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে অন্য গোষ্ঠীর নেতাদের দোষারোপ করেছেন। সুভাষচন্দ্র জেলে যাবার পর মেদিনীপুরের নির্বাচনে কংগ্রেস নেতা বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের বিরুদ্ধে স্বরাজ্য দল নাড়াজোলের জমিদার দেবেন্দ্রনাথ খাঁকে সমর্থন করে। সেখানে এক প্রকাশ্য সভায় সুভাষচন্দ্রের সহকর্মী উপেন বন্দোপাধ্যায় খোলাখুলি বলেন যে সুভাষচন্দ্রকে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ধরিয়ে দিয়েছে। *(বিমলানন্দ শাসমল——স্বাধীনতার ফাঁকি)*। এই কথা বল[illegible]নে একটা ছোট ইতিহাস আছে। চিত্তরঞ্জন কলকাতার মেয়র হবার পর মোটামুটি ঠিক ছিল শাসমলই চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার হবেন। তিনি পাঁচশো টাকা মাসোহারাতেই কাজ করতে রাজী ছিলেন। কিন্তু বাংলা কংগ্রেসের বেশ কিছু সদস্য যাদের বেশির ভাগটাই ছিল পূর্বতন সন্ত্রাসবাদী, তারা সুভাষচন্দ্রকে ঐ পদে নিয়োগ করতে চাইল। (পরে অনেক প্রাক্তন সন্ত্রাসবাদীকে সুভাষ কর্পোরেশনে চাকরি দিয়েছিলেন)। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভায় খুব অল্প ভোটের ব্যবধানে সুভাষই নির্বাচিত হলেন। তার মাইনে হল পনেরশো টাকা। সুতরাং শাসমলের প্রতি অভিযোগ সহজেই বিশ্বাসযোগ্য হয়েছিল। আবার সুভাষচন্দ্র জেল থেকে বেরোবার পর কংগ্রেস মহলে এইকথা প্রচার হয়েছিল যে নলিনীরঞ্জন সরকার সুভাষের সঙ্গে যুগান্তর গোষ্ঠীর যোগাযোগের দলিল পুলিশের হাতে পৌঁছে দিয়েছিল। *(সুধী প্রধান——সুভাষচন্দ্র, ভারত ও অক্ষশক্তি)*। আবার মেজদা শরৎচন্দ্র বসু জেলে থাকা সুভাষকে লেখেন——

বড়মামাবাবু *(মিস্টার জে এস ডাট)* সেদিন তোমার খবর নিচ্ছিলেন। তিনি যখন এখানে এসেছিলেন তাঁর সেই প্রিয় উদ্ধৃতিটির কথা আমার মনে পড়ে গিয়েছিল।

"কাল বামুন, কটা শূদ্র, বেঁটে মুসলমান,

ঘরজামাই, পুষ্যিপুত্র সব বেটাই সমান।" বর্তমান পরিস্থিতিতে, বিশেষ করে তোমার প্রসঙ্গে কথাটা বোধহয় খাটতে পারে। স্পষ্টতঃই তিনি ইঙ্গিত করছেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর দিকে। সবমিলিয়ে এই গ্রেপ্তার নিয়েও তখনকার বঙ্গীয় কংগ্রেস নেতারা কাদা ছোড়াছুড়িতে নেমে পড়েছিলেন।

কংগ্রেসে যোগ দেবার পর সুভাষচন্দ্র চিত্তরঞ্জনের ছত্রছায়ায় বেড়ে উঠছিলেন। একটু একটু করে রাজনৈতিক কূটকচালিতে হাত পাকালেও স্বাধীনভাবে নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা তখনও গড়ে ওঠে নি। দ্বিতীয়বারের এই জেলবাসকে সুভাষ তার রাজনৈতিক নেতৃত্বলাভের প্রস্তুতিকাল হিসেবে কাজে লাগিয়েছিলেন। বিশেষত চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পর তিনি বেশ বুঝতে পেরেছিলেন যে নেতার দায়িত্ব হাতে তুলে নেবার সময় সামনে উপস্থিত। এদিকে চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর ধুরন্ধর গান্ধী বুঝতে পারলেন যে বাংলার কংগ্রেসকে হাতের মুঠোয় নেবার এটাই সুবর্ণ সুযোগ। তিনি বেশ কিছুদিন কলকাতায় থাকলেন এবং বাংলায় নিজের প্রতিনিধি হিসেবে বাছলেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে। যতীন্দ্রমোহন যদিও এতদিন চিত্তরঞ্জনের শিষ্য ছিলেন তবুও লোক বাছতে গান্ধীর একটুও ভুল হয় নি। এর পর থেকে যতীন্দ্রমোহন একান্ত গান্ধী-অনুগামী বনে গেলেন। গান্ধী তাকে চিত্তরঞ্জনের সবকটা শূন্য আসন, মানে প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি, কলকাতার মেয়র এবং আইনসভায় কংগ্রেসের দলনেতা, তিনটেতেই বসালেন। সুভাষচন্দ্রের অভিন্নহৃদয়

দাদা শরৎচন্দ্র সহজে ব্যাপারটা মেনে নেন নি। জেলে থাকা ভাইকে ১৫ জুলাই ১৯২৫ চিঠি লিখলেন——

দেশবন্ধু যে পদগুলো অধিগ্রহণ করেছিলেন, সেই পদগুলি পূরণের প্রশ্নে সম্প্রতি বেশ উত্তেজনা দেখা গিয়েছিল। শেষে স্থির হয়েছে (মহাত্মা গান্ধীর পরামর্শে) যে, শূন্য পদ তিনটি জে, এম, সেনগুপ্ত গ্রহণ করবেন। অন্য কোন এক ব্যক্তিকে দেশবন্ধুর শূন্য পদগুলিকে দেওয়া আমার বিচারে একটা বড় মাপের ভুল। কিন্তু মহাত্মার সিদ্ধান্তটি মেনে নেওয়া হয়েছে। সুতরাং চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু বাংলার কংগ্রেসে গোষ্ঠীকোন্দলের আর এক নতুন অধ্যায়ের সূচনামাত্র হয়ে দাঁড়াল।

জেলে বসে সুভাষ রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রস্তুতি হিসেবে কিছু বই পড়লেন। জেলে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বেশ কিছু চাপ সৃষ্টি করে সফল হলেন। এমনকি জেলে ধুমধাম করে দুর্গাপূজা করলেন। তার খরচ-খরচা সরকারের কাছ থেকে আদায় হল। এই প্রস্তুতির মধ্যে সুভাষচন্দ্র বেশ আত্মবিশ্বাস সঞ্চয় করতে পারলেন। তিনি যে একজন নেতা হচ্ছেনই—— এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হলেন। ১২ ফেব্রুয়ারী ১৯২৬ মেজবৌদিকে চিঠিতে লিখলেন—— "আমার চিঠিগুলি আপনি রেখে দেবেন এবং মেজদাদাকে বলবেন রেখে দিতে।" সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন তার চিঠিগুলো সংরক্ষিত হোক এবং সেইজন্য চিঠি বেশ সতর্কতার সাথে সুচিন্তিতভাবে লিখতেন। এ অভ্যাস তিনি বরাবরই বজায় রেখেছিলেন।

চিত্তরঞ্জন বেঁচে থাকতে কংগ্রেসের মধ্যে যে দলাদলি ছিল তিনি মারা যাবার পরও তা কমল না। গান্ধী যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে চিত্তরঞ্জনের উত্তরসূরী বানালেও বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে একটা গোষ্ঠী বিরোধিতা করতে লাগল। কিন্তু শরৎচন্দ্র বসু চাইলেন চিত্তরঞ্জনের শূন্য জায়গায় সুভাষচন্দ্রকে প্রতিষ্ঠিত করতে। তিনি চিত্তরঞ্জনের সহকারী বিখ্যাত 'বিগ ফাইভ' এর বিধান রায়, তুলসী গোস্বামী, নির্মল চন্দ্র, নলিনী সরকারের, (পঞ্চমজন তিনি নিজে) সাথে যোগাযোগ রেখে যেতে লাগলেন। একই সাথে জেলবন্দী সুভাষের সাথে চিঠিতে শলা-পরামর্শ চলতে থাকল। সুভাষচন্দ্র তার নিজস্ব লোকজন দিয়ে কর্পোরেশনের কাজে যতটা সম্ভব প্রভাব বিস্তার করতেন। এছাড়া সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ট অনুগামী সত্যরঞ্জন বক্সী ছিলেন চিত্তরঞ্জন প্রতিষ্ঠিত 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকার সম্পাদক। 'নব শক্তি' (আগে নাম ছিল আত্মশক্তি) পত্রিকাও ছিল শরৎ বসুর দখলে। সব মিলিয়ে জেল থেকে বেরিয়ে বাংলা কংগ্রেসের নেতৃত্ব নেওয়ার লড়াইয়ে সুভাষকে দাদা শরৎচন্দ্র অনেকটা এগিয়ে রেখেছিলেন।

চিত্তরঞ্জন মারা যাবার পর স্বরাজ্যদলও কার্যত ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। দলের ঘোষিত নীতি ছিল, আইনসভায় নির্বাচিত হয়ে আইনসভার কাজে অচলাবস্থা সৃষ্টি করা। কিন্তু কাজে দেখা গেল ক্ষমতার সামান্য টুকরো টাকরা এঁটোকাঁটা পেয়েই বহু সদস্য ভোল পাল্টাচ্ছে। আবার আইনসভায় বৃটিশ সরকারের উপর প্রত্যাশিত চাপ দানে ব্যর্থতা জমিদার আর শিল্পপতিদের স্বরাজ্যদলের প্রতি বিমুখ করে তুলল। আর হিন্দু-মুসলমানের পৃথক আসন সংরক্ষণের সুযোগ নিয়ে ইংরেজ এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে লড়াই বাধিয়ে দিতে পারল। গোটা ১৯২৬ সাল জুড়েই চলল দাঙ্গা। এই দাঙ্গার মধ্যে দিয়ে মুসলীগ লীগ, হিন্দু মহাসভার মত মৌলবাদী দলগুলো তাদের শক্তি বাড়িয়ে নিতে পারল। খবরের কাগজগুলো ধর্ম অনুযায়ী এক এক পক্ষে দাঁড়িয়ে ইন্ধন যোগাতে লাগল। এই সাম্প্রদায়িক অন্ধত্ব থেকে কংগ্রেসের তাবড় নেতারাও মুক্ত ছিলেন না। ময়মনসিংহের জমিদারের বিরুদ্ধে চাষীদের সংগ্রামকে কলকাতার বেশ কিছু কাগজ হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা বলে চালাতে

থাকে। নবশক্তি পত্রিকাতে কাজ করতেন নাট্যকার শচীন্দ্রলাল সেনগুপ্ত। তিনি সঠিকভাবেই এই সংগ্রামকে জমিদারদের বিরুদ্ধে চাষীদের লড়াই বলে চিহ্নিত করেন। এর ফলে শচীন সেনগুপ্ত শরৎচন্দ্র বসুর কোপদৃষ্টিতে পড়েন এবং চাকরি খোয়াতে হয় *(নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়——বিপ্লবের সন্ধানে)*।

বর্মার জেলে থাকাকালীন সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের আর একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল——তিনি বঙ্গীয় আইনসভার নির্বাচনে দাঁড়ালেন এবং জিতলেন। অনেক জীবনীকার লিখেছেন তিনি নাকি নির্বাচনে দাঁড়াতে চান নি। শরৎচন্দ্র বসু এবং অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের অনুরোধে তিনি ভোটে নেমেছিলেন। প্রকৃত ঘটনা হল, সুভাষচন্দ্র ভোটে দাঁড়াতে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু বাংলা কংগ্রেসে যা দলাদলি তাতে তিনি অপরপক্ষের বাগড়া দেওয়ার খুবই ভয় পাচ্ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন তার মনোনয়ন দলে সর্বসম্মত হোক। কিন্তু তা না হয়ে শরৎ বসুর তরফ থেকে অনুরোধ আসায় তিনি দোটানায় পড়ে যান। ৭ আগস্ট ১৯২৬ এ মেজদাদাকে চিঠিতে লেখেন——

বাংলা কাউন্সিলে উত্তর কলকাতা আসনের জন্য আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ইচ্ছুক কিনা আপনি জানতে চেয়েছেন। ভেবেছিলাম, এ-প্রশ্ন অন্য কোন জায়গা থেকে আসবে। কিন্তু এটি আপনার কাছ থেকে আসার ফলে আমি একটু অবাক হয়েছি। প্রশ্নটি আসতে পারে একথা ভেবে আমি অনেক আগেই মনস্থির করেছিলাম, কিন্তু এটি এখন আপনার কাছ থেকে আসার ফলে বিষয়টি আবার নতুন করে ভেবেছি। এ বিষয়ে আমি মনস্থির করে ৫ আগস্ট জানিয়েছিলাম যে, বাংলা কাউন্সিলের উত্তর কলকাতা আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব না বলে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণগুলি জানাবার দরকার নেই, আপনি সহজেই সেগুলি অনুমান করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে সুভাষচন্দ্রকে কাউন্সিলের ভোটে জেতাবার খুব দরকার হয়ে পড়েছিল। এক তো নেতা হিসাবে তাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে এটা ছিল সহায়ক। দ্বিতীয়তঃ শরৎচন্দ্র ভেবেছিলেন বাংলা আইনসভার সদস্য হতে পারলে বৃটিশ সরকার সুভাষচন্দ্রকে মুক্তি দিতে বাধ্য হবে। কংগ্রেসের অন্যপক্ষ থেকে তার নাম উত্থাপিত না হওয়াতে বাধ্য হয়ে শরৎ বসুকেই ভাইয়ের নাম প্রস্তাব করতে হল। কিন্তু কংগ্রেসের দলাদলিতে সুভাষ এতটাই ভীত ছিলেন যে ১৩ আগস্ট চিঠিতে দাদাকে লেখেন——

কিরণবাবু ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গোরা যে আমাকে প্রার্থী হিসেবে চান তার কি গ্যারান্টী আছে? এখন পর্যন্ত আমার প্রার্থীপদ নিয়ে তাঁদের বিশেষ উৎসাহ আছে বলে মনে হচ্ছে না। কাউন্সিল অব স্টেট নির্বাচনের পুনরাবৃত্তি হবে না কি? তবু উপায়ান্তর না দেখে তাকে দাঁড়াতে হল। দাঁড়াতে হল যতীন্দ্রনাথ বসুর বিরুদ্ধে। যার সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র লিখেছেন——"তিনি তাঁর নির্বাচন কেন্দ্রে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন এবং উদারপন্থী রাজনীতি ব্যতীত তাঁর বিরুদ্ধে বলবার মতন আমাদের আর কিছুই ছিল না।"

যদিও সুভাষচন্দ্র আগে চিঠিতে লিখেছিলন——"আমার নির্বাচনের জন্য যদি অনেক অর্থের প্রয়োজন হয় তাহলে এম-এল-সি হওয়ার বিলাসিতা আমি ভোগ করতে চাই না"——তবুও এই ভোটে কংগ্রেস থেকে বহু পয়সা খরচ করা হয়েছিল। অনেক প্রচারপত্র ছাড়া হয়েছিল যেগুলোতে সুভাষচন্দ্রের ছবি ছাপা, দেখানো হয়েছিল তিনি গরাদে বন্দী হয়ে আছেন। এই প্রচারপত্রগুলো হাউস দিয়ে আকাশে ছড়ানো হয়েছিল। তিনি ভোটে জেতার পর কলকাতায় বেশ বাজী পোড়ানো হল, অনেক বাজী এমন ছিল যেগুলো আকাশে ফাটার পর আকাশের বুকে লেখা হয়ে ফুটল——সুভাষচন্দ্রের জয়। সুভাষ এত খরচ বা

ব্যয়বাহুল্যের মোটেই বিরুদ্ধে ছিলেন না। বরং জেল থেকে তিনি এতে আনন্দ প্রকাশ করে লিখলেন——

রেঙ্গুনের যে খবরের কাগজগুলো কাল পেয়েছি, তাতে উত্তর কলকাতা নির্বাচনে আমাদের দল নির্বাচনী প্রচারের যে অভিনব পদ্ধতি অবলম্বন করেছে, তার বর্ণনা আছে। রকেটের সাহায্যে রঙীন প্রচারপত্র ছড়ানো হচ্ছে খুবই আশ্চর্য উদ্ভাবনীশক্তির পরিচয়। গত মহাযুদ্ধের সময় ফ্রান্স ও ফ্ল্যান্ডার্সে উড়োজাহাজ থেকে প্রচারপত্র বিলি করার কথা মনে করিয়ে দেয় *(১৩ নভেম্বর ১৯২৬ শরৎ বসুকে লেখা চিঠি)।*

এছাড়াও, সুভাষচন্দ্র জেলে বসে চিঠি দিয়ে ভোটারদের সাথে যোগাযোগ করেন। (তখন সার্বজনীন ভোটাধিকার ছিল না)। কোন ভোটারকে কিভাবে প্রভাবিত করতে হবে তারও নির্দেশ পাঠান। সব মিলিয়ে এই নির্বাচন একটা বিশাল যজ্ঞের চেহারা নিয়েছিল। তার ফলও মিলল হাতে হাতে। সুভাষচন্দ্র বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য হলেন।

বর্মার জেলে সুভাষচন্দ্র অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। হেমন্ত সরকার, সত্যরঞ্জন বক্সী, শরৎচন্দ্র বসু——এরা তার মুক্তির দাবীতে প্রাদেশিক আইনসভায় বেশ চাপসৃষ্টি করতে থাকেন। খবরের কাগজ আর বুদ্ধিজীবী মহলেও বেশ একটা শোরগোল পড়ে যায়। এমনকি খোদ বৃটেনের পার্লিয়ামেণ্টে এ নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। সবশেষে, সুভাষচন্দ্রের দাদা ডাঃ সুনীল বসু এবং ডাঃ বিধান রায়কে নিয়ে একটা মেডিকেল বোর্ড তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে। অনেক জল ঘোলার পর শেষ পর্যন্ত ১৯২৭ সালের মে মাসে সুভাষচন্দ্র মুক্তি পেলেন।

বঙ্গীয় কংগ্রেসের প্রধান

১৯২৭-এ বর্মার জেল থেকে সুভাষচন্দ্র যখন ছাড়া পেলেন তখন গোটা দেশে কংগ্রেসের আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে আছে। চিত্তরঞ্জন মারা গিয়েছেন, গান্ধী তার দলবল নিয়ে সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে আছেন, মতিলাল নেহেরু নিশ্চুপ। এদিকে বাংলার কংগ্রেস নেতারা নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি নিয়ে ব্যস্ত। এরকম একটা শান্তির সময়ে বৃটিশ সুভাষকে জেল থেকে ছেড়ে দিল কেন? কেনই বা তার মুক্তির পর বৃটিশের এক নম্বর সমর্থক কাগজ স্টেটসম্যান খুশিতে ডগমগ হয়ে লিখেছিল——"যে নতুন পরিবেশ সৃষ্টি হল তাতে সকল রাজবন্দীকে মুক্তি দেওয়াই হবে রাষ্ট্রনীতিজ্ঞতার পরিচায়ক।" এর উত্তরে আমরা পরে যাব।

মুক্তির পর সুভাষচন্দ্র স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্যে পরিবারের সঙ্গে শিলং-এ গেলেন। শিলং-এ বসেই শুরু করলেন রাজনৈতিক ঘুঁটি সাজানোর কাজ। বাংলায় কংগ্রেসের সব পদগুলো দখল করে রেখেছেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। সেনগুপ্ত আগে চিত্তরঞ্জনের সাকরেদ থাকলেও গান্ধী তাকে হাত ধরে গদিতে বসাবার পর হয়ে পড়েছেন একান্ত গান্ধীভক্ত। তার বিরোধী অবশ্য আছেন বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। কিন্তু এর আগে কর্পোরেশনের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার পদে সুভাষ তার বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছেন। তার উপর স্বরাজ্যদলে যে পূর্বতন সন্ত্রাসবাদী দলের লোকজন আছে তারা শাসমলের উপর হাড়েচটা। এরাই আবার বিশেষতঃ যুগান্তর গোষ্ঠীর সদস্যরা তখন সুভাষচন্দ্রের দক্ষিণহস্ত। সুতরাং এদের দু'জনকেই হঠিয়ে সুভাষের ক্ষমতা দখল করতে হবে। এর মধ্যেই অবশ্য দাদা শরৎচন্দ্র বিখ্যাত Big five কে হাতে রেখেছেন। বুদ্ধিমান সুভাষ ধরলেন চিত্তরঞ্জনের বিধবা স্ত্রী বাসন্তীদেবীকে। যতীন্দ্রমোহনের বদলে নিজেকে নেতা হিসেবে না প্রজেক্ট করে

বাসন্তীদেবীর নাম সামনে আনলেন। ঠিক যেমনভাবে এখনকার কংগ্রেসীরা ক্ষমতার কক্ষে না পেলে 'সোনিয়াজীকো লাও' আওয়াজ তোলে। শিলং থেকে বাসন্তীদেবীকে ৩০ জুলাই ১৯২৭ লিখলেন——

আমি কলকাতায় আপনাকে যে প্রশ্ন করিয়াছিলাম তার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। তার মীমাংসা এই যে আপনি যদি আমাদের নেতৃত্বের ভার গ্রহণ না করেন তবে বাংলাদেশে এমন কেহ এখন নাই যাঁকে আমরা অন্তরের সহিত নেতা বা নেত্রী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। কোনও সভায় সভাপতির কাজ চালাইবার জন্য কাহাকেও বরণ করিলে তাঁহাকে নেতা বলিয়া স্বীকার করা হয় না। তেমন নেতা যাঁর কাছে হৃদয় সহজেই ভক্তিতে আনত হইয়া পড়ে আজ বাংলাদেশে বিরল। যদি আপনাকে আমরা না পাই তবে এই লক্ষ্মীছাড়ার দলকেই আত্মপ্রতিষ্ঠার রাস্তায় চলতে হবে। এই চিঠি থেকে পরিস্কার যে বাসন্তীদেবী যদি নেতৃত্ব দিতে না চান তবে সুভাষচন্দ্র নিজেই নেতা হবেন। আসলে তিনি জানতেন বাসন্তীদেবী নেত্রী হতে রাজী হবেনও না। প্রকৃতপক্ষে তিনি চেয়েছিলেন বাসন্তীদেবী তাকে খোলাখুলি সমর্থন করুন। এর পরেও যখন বাসন্তীদেবী জানান,"কোনও বিষয়ে আমার সাহায্য তোমরা (সুভাষচন্দ্র ও যতীন্দ্রমোহন উভয়পক্ষই——লেখক) আশা করো না।" ক্ষুব্ধ সুভাষ এক দীর্ঘ চিঠি লিখে বার বার চিত্তরঞ্জনের নাম করে তাকে নিজের পক্ষে আনবার চেষ্টা করলেন। এই সময় সুভাষ বাসন্তীদেবীকে অত্যন্ত ঘন ঘন একেবারে দু-চার দিন অন্তর চিঠি লিখতে থাকেন। ১৯২৭ সালের নভেম্বর মাসে যথাক্রমে ১, ১৫, ২০, ২৪ তারিখে পর পর চিঠি দেন। সব চিঠিতেই যে কাজের কথা থাকত তা নয়। কোনটাতে থাকত শুধুই কুশল-জিজ্ঞাসা তো কোনটাতে থাকত নিজের পরিবারের খবর। এতে কাজও হয়েছিল। তিনি নিজের দিকে বাসন্তীদেবীর সমর্থন আদায় করতে পেরেছিলেন। পরবর্তীকালে আমরা দেখব সুভাষ বাসন্তীদেবীকে চিঠি লেখার সময় পাচ্ছেন না। ১৯৩০ এ ২৩ জানুয়ারী সুভাষ দু-এক লাইনের চিঠিতে লেখেন——"মা, আপনার সব চিঠি পেয়েছি। নানা গোলমালের জন্য সময়মত উত্তর দিতে পারি নাই।" আবার ৭ নভেম্বর ছোট্ট একটা চিঠিতে লিখলেন——

মা, আপনার পত্রগুলি পেয়েছি কিন্তু উত্তর দিতে পারি নাই। আপনি বোধহয় রাগ করেছেন অথবা দুঃখিত হয়েছেন। কিন্তু আমি ক্ষমা প্রার্থনা করব না কারণ আমার স্বভাব আপনি জানেন। উত্তর তাড়াতাড়ি সব সময় দিতে পারি না।

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

বাংলা কংগ্রেসের সম্মেলনের আগে সুভাষচন্দ্র একটা বিবৃতি দিলেন। ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৭ এ প্রকাশিত এই বিবৃতিতে তিনি বললেন——

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির নির্বাচন শীঘ্রই হইবে এবং সাধারণ সভা হইতে ষাট জন সভ্য লওয়া হইবে। বাংলার কংগ্রেস কর্মীদিগের প্রতি সনির্বন্ধ অনুরোধ তাঁহারা যেন সৎ, অকপট, দেশভক্ত ব্যক্তিতে নির্বাচন করেন। হয়তো যাঁহাদিগকে নির্বাচন করিবেন, বিশেষ কোনো বিষয়ে তাঁহাদিগের সহিত মতের মিল ছিল না, হয়তো তাঁহারা গত দুই বৎসর কাল দলাদলি হিসাবে নানাপ্রকার কাজ করিয়াছেন কিন্তু এ ক্ষেত্রে সেদিকে দৃষ্টি দিলে চলিবে না।

একদিকে বাসন্তীদেবীর সমর্থন, দাদা শরৎ বসুর হেভিওয়েট কংগ্রেস নেতাদের সাথে যোগাযোগ, ফরওয়ার্ড পত্রিকার নিরবিচ্ছিন্ন প্রোপাগান্ডা, যুগান্তর গোষ্ঠীর পূর্বতন

সন্ত্রাসবাদীদের প্রচেষ্টা——সব মিলিয়ে সুভাষচন্দ্রের রাস্তা পরিষ্কার হয়ে গেল। ১৯২৭ এর নভেম্বর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির বার্ষিক সভায় তিনি সভাপতি নির্বাচিত হলেন। সভাপতি হয়েই বললেন——

যাঁরা কংগ্রেস ছেড়ে গিয়েছেন তাঁরা আবার ফিরে আসুন। আসুন নবীনের দল।......................দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর আজ এতদিনে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের দিন এসেছে।

অর্থাৎ এতদিন যা দলাদলি করেছ তো করেছ, এখন ওসব বন্ধ করে ঐক্যবদ্ধ হও। কিন্তু যত আবেদনই করুন না কেন এই দলাদলি হতে কংগ্রেস কোনদিনই মুক্ত হতে পারে নি।

ইতিমধ্যে বৃটিশ পার্লিয়ামেন্ট ভারতে একটা নতুন শাসনবিধি পর্যালোচনা করবার জন্যে জন সাইমনের নেতৃত্বে এক কমিশন নিয়োগ করেছে। সুভাষচন্দ্র তথা কংগ্রেসের সামনে এক বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের সুযোগ এসে গেল। তা সাইমন কমিশন বয়কট।

কেন সাইমন কমিশন

১৯২২ সালে গান্ধী একতরফাভাবে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করার পর কংগ্রেস দীর্ঘদিন আর কোনও আন্দোলন করেনি। গান্ধী-দাশ চুক্তির মধ্যে দিয়ে গান্ধী প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে সরে গিয়ে খাদি, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের মত 'সমাজ সংস্কার মূলক' কাজে মন দিলেন, সারা ভারতে কংগ্রেস নেতৃত্ব এসে পড়ল মতিলাল নেহরু, চিত্তরঞ্জন দাশের মত স্বরাজ-পন্থীদের হাতে। এরা আইনসভায় যোগ দিয়েছিলেন। স্বরাজপন্থীদের যা কিছু লম্ফঝম্ফ, যা কিছু বৃটিশ-বিরোধিতা সবই ঐ আইনসভার চৌহদ্দিতে সীমাবদ্ধ ছিল। আগেই দেখেছি যে চিত্তরঞ্জন বৃটিশের বিরুদ্ধে একটাও গণ-আন্দোলন গড়ে তোলেন নি। সারা ভারতেই স্বরাজীদের ছিল এক অবস্থা। যারা বলেন যে গান্ধী আপোসপন্থী আর চিত্তরঞ্জন প্রবল বিপ্লবী তারা স্পষ্টতই এড়িয়ে যান যে বরদোলিতে পশ্চাদপসারণের পর দেশজুড়ে কংগ্রেসের পক্ষে আবার আন্দোলন তৈরী করতে পেরেছিলেন ঐ গান্ধীই, কংগ্রেসের অন্য কেউ নয়। কিন্তু সেটা দীর্ঘ আট বছর পর। স্বরাজ্যপন্থীরা এই বলে আইনসভায় ঢুকেছিল যে তারা সেখানে যাচ্ছে বৃটিশ সরকারকে সুবিধে করে দেবার জন্যে নয়। বরং আইনসভায় ঢুকে তারা তা অচল করে দেবে। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে দেখা গেল যে সরকারী স্নেহধন্য নেতার দলও তৈরী হয়ে গেছে। অনেকে সরকারে যোগ দিয়ে মন্ত্রী হবার জন্যে লালায়িত হয়ে উঠল। নেতারা তাদের রুখতে পারল না। আর শুরু হল প্রচন্ড দলাদলি। না চিত্তরঞ্জন, না যতীন্দ্রমোহন, না সুভাষচন্দ্র-কেউই এই দলাদলির কাদা ছোড়াছুড়ি থেকে হাত সাফ রাখতে পারেন নি। তো স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে ১৯২৭ সালে যখন কংগ্রেস ইংরেজবিরোধী কোন আন্দোলনে না গিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটিতে ব্যস্ত, সেই সময়ে কেন বৃটিশ শাসকেরা ভারতের নতুন শাসনবিধি তৈরী করার জন্যে এক কমিশন তৈরী করতে গেল। নিশ্চয়ই দেশে এবং বিদেশে কিছু নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল।

১৯২২ সালের অসহযোগ আন্দোলন থেকে ন্যক্কারজনক পিছু-হঠার পর দীর্ঘদিন কংগ্রেস আর কোন আন্দোলন না করলেও ভারতের কৃষক-শ্রমিকেরা চুপ করে বসে থাকে নি। অসহযোগ আন্দোলনের মূল শক্তিই ছিল ভারতের শ্রমিক-কৃষক। বস্তুতঃ, শ্রমিক-কৃষকের স্বতঃস্ফূর্ত যোগ দানের জন্যেই গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন একতরফাভাবে বন্ধ

করে দিয়েছিলেন। তবু ভারতের শ্রমজীবী মানুষের লড়াই থেমে থাকে নি। গোটা স্বাধীনতা আন্দোলন পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে যখনই কংগ্রেস সাময়িক নির্জীবতায় ভুগেছে তখনই চাষী-মজদুরের লড়াই স্বতঃস্ফূর্ত গতিতে এগিয়েছে। আবার উল্টো দিক থেকে বলা যায় যে যখনই শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠেছে তখনই কংগ্রেস নানা আন্দোলন কর্মসূচী নিয়েছে। সরকারী প্রচারমাধ্যম এবং জাতীয়তাবাদী খবরের কাগজেরা দেশের মানুষের সকল দৃষ্টি ওদিকেই আকর্ষণ করিয়েছে। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস আন্দোলনের রাশ টেনে ধরে সমস্ত আন্দোলন-প্রচেষ্টাকে বানচাল করে দিয়েছে। এবারেও তার ব্যতিক্রম ছিল না। ১৯২২ থেকে ২৭ সালের এই কংগ্রেসী কর্মদ্যোগের বন্ধ্যাত্বের যুগে তাই পরাধীন ভারতের গণ-আন্দোলনের দীপশিখা জ্বালিয়ে রাখল একমাত্র চাষী-মজুরের দল।

১৯২২ থেকে ২৪ সাল অবধি গোদাবরীর উপত্যকার এক জনগোষ্ঠী রাম্পার কৃষকেরা জঙ্গী কৃষক আন্দোলন করে। প্রায় আড়াই হাজার বর্গমাইল এলাকা কার্যত এক স্বাধীন জনগোষ্ঠীর বিচরণ ভূমিতে পরিণত হল। বহু অর্থ ব্যয়ে বহু প্রচেষ্টায়, মালাবার বিশেষ পুলিশবাহিনী আর আসাম রাইফেলস্ দিয়ে এই বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত দমন করা হয়। ১৯২৪ এর ৬ মে বিদ্রোহের নেতা আল্লুরি সীতারাম রাজু ধরা পড়লেন। কয়েকদিন পরে সরকারী খবরে জানানো হল যে রাজু পুলিশের হাত থেকে পালানোর চেষ্টা করে গুলিতে নিহত হয়েছে। এখন তো আমরা দেখি স্বাধীন ভারতের শাসনকর্তারা ইংরেজদের কাছ থেকে এসব বিদ্যে ভালরকমই রপ্ত করেছে।

পুরো ১৯২০-র দশক জুড়ে রাজস্থানের কৃষকেরা ব্যাপক সামন্ত বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলে। শান্তিপূর্ণ আন্দোলন এমন ব্যাপকতা পেল যে ১৯২৫ এর মে মাসে আলোয়ার রাজ্যের নিমুচানায় পুলিশ এক নির্মম গণহত্যা সংগঠিত করল। ১৫৬ জন কৃষক পুলিশের গুলিতে শহীদ হলেন। আহত হলেন ছ'শোরও বেশি। এই ভয়ঙ্কর গণহত্যার কথা আজকের মানুষকে জানানো হয় না। স্কুল-কলেজের পাঠ্য ইতিহাসে পড়ানো হয় না। এভাবে ভারতে কৃষক-শ্রমিকের লড়াইয়ের ঐতিহ্য ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। বাংলা, বিহারেও তীব্র কৃষক আন্দোলন হয়েছিল। বিশের দশকের মাঝামাঝি বাংলার ময়মনসিংহ, পাবনা, নদীয়া, ঢাকা, খুলনায় বর্গাদারদের আন্দোলন হল। এই আন্দোলন মূলত ছিল জমিদারদের বিরুদ্ধে। বৃটিশ সরকারের পুলিশ আর জমিদারদের লেঠেল একসাথে অত্যাচার নামিয়ে এসব আন্দোলন ভাঙে। না গান্ধীপন্থী কংগ্রেস, না স্বরাজ্যপন্থী চিত্তরঞ্জন-সুভাষচন্দ্র——কেউই বর্গাদারের পাশে এসে দাঁড়ায় নি। বরং তাদের সমর্থন ছিল ঐ জমিদারদের দিকে। না থেকে উপায় নেই কারণ বাংলার কি গান্ধীপন্থী কংগ্রেস কি স্বরাজ্যদল সবই চলত জমিদারদের অর্থানুকূল্যে। জমিদারদের অনেকেই ছিল কংগ্রেস বা স্বরাজ্যদলের সদস্য।

কৃষকদের একমাত্র সেই আন্দোলনের প্রতি কংগ্রেস ছিল সহানুভূতিশীল যেখানে সরকারী খাজনা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন হচ্ছে। কারণ, এই খাজনা বৃদ্ধির ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল জমিদার আর ধনী কৃষকেরা। ধনী কৃষক মিরাসদার যেখানে বেশি সেই তাঞ্জোরে আন্দোলন খানিকটা সফল হয়। অন্ধ্রে এন. জি. রঙ্গা ধনী কৃষকদের স্বার্থে প্রতিষ্ঠা করলেন রায়ত সমিতি। এরকমই এক কৃষক আন্দোলনে যোগ দিলেন টি প্রকাশন আর কোণ্ডা ভেঙ্কটাপ্পায়্যারের মত খ্যাতিমান কংগ্রেস নেতারা।

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের কলকারখানায় শ্রমিকেরাও তাদের ন্যায্য দাবী-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করেছিল। কিন্তু জাতীয়তাবাদী নেতারা যেসব জায়গায় নেতৃত্বে ছিল সেখানে

আন্দোলনের রাশ টেনে ধরা হতে থাকল। বিশেষতঃ ভারতীয় মালিকানাধীন কলকারখানায় এই নেতারা আন্দোলনের পেছন হতে ছুরি মেরেছিল। সরকারীভাবে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছিল যে শ্রমিক আন্দোলন ধীরে ধীরে কমে আসছিল। রয়াল কমিশন অব লেবারের (১৯৩১) হিসাব অনুযায়ী ১৯২১ সালের সর্বাধিক ৩৭৬ টা ধর্মঘটের জায়গায় ১৯২৪ থেকে ২৭ সালের মধ্যে বছরে গড় ধর্মঘট হয় ১৩০ টা। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে ১৯২২ সালে যেখানে শ্রমদিবস নষ্ট হয়েছিল ৩১ লক্ষ, সেখানে ১৯২৪ সালে ৮৭ লক্ষ এবং ১৯২৫-এ ১ কোটি ২৫ লক্ষ শ্রমদিবস নষ্ট হয়েছিল। শুধু শ্রমদিবসের হিসাবেই নয়, এই ধর্মঘটগুলোর আক্রমণ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা, শ্রমিক-চেতনা, গভীরতা, স্থায়িত্ব ছিল আগেকার ধর্মঘটগুলোর চেয়ে অনেক বেশী। সবচেয়ে বড় ধর্মঘটগুলো হয় বোম্বের কাপড়ের মিলগুলোতে। ১৯২৪ এর আন্দোলন কিছুদিন চলার পর মালিকদের সাথে সামান্য বোঝাপড়ার ভিত্তিতে ব্যাপটিস্টা এবং এন এম যোশীর মত নেতৃত্ব ধর্মঘট প্রত্যাহারের পরামর্শ দিলেও শ্রমিকেরা আন্দোলন চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। সংগ্রামী আন্দোলন ততদিন পর্যন্ত চলেছিল যতদিন না শ্রমিকেরা না খেতে পেয়ে আধমরা হয়ে পড়ে। এই বীরত্বপূর্ণ আন্দোলন সাময়িক পরাজিত হলেও যোদ্ধা শ্রমিকেরা এক উল্লেখযোগ্য জয় ছিনিয়ে আনতে পারল পরের বছরেই। বস্ত্রশিল্পের সংকট এই অজুহাত দেখিয়ে মিলমালিকেরা শ্রমিক মজুরী শতকরা ১১.৫ ভাগ কমিয়ে দিল। এর প্রতিবাদে ধর্মঘট শুরু হল। কোনও লোভ, নিপীড়নের কাছে এ ধর্মঘট মাথা নোয়ালো না। শেষ পর্যন্ত ১৯২৫-এর ১ ডিসেম্বর সরকার দেশীয় শিল্পের উপর হতে অন্তঃশুল্ক তুলে নিল এবং মালিকেরা মজুরী-ছাঁটাই প্রত্যাহার করে নিল। দেশীয় বস্ত্রশিল্পের উপর বৃটিশ সরকার অন্তঃশুল্ক বসিয়েছিল সেই ১৮৯৪ সালে। এই দীর্ঘ ৩১ বছর ধরে কংগ্রেস প্রচণ্ড চেষ্টা চালিয়েও তা তুলতে পারে নি। এর মাত্র মাস তিনেক আগে আইনসভায় এই কর রদ করার প্রস্তাব গৃহীত হলেও ভাইসরয় তাতে ভেটো দিয়ে নাকচ করে দেন। কিন্তু বস্ত্রশিল্প——শ্রমিকদের আন্দোলনের ধাক্কায় তা রদ হয়ে গেল। এছাড়াও বোম্বের বস্ত্রশিল্প-শ্রমিকেরা তাদের মজুরীও কিছুটা বাড়িয়ে নিতে পেরেছিল। ১৯২৭ সালে কলকাতায় বস্ত্রশিল্প শ্রমিকের গড় মাসিক মজুরী যেখানে ছিল ১৯·৬০ টাকা, সেখানে একজন বোম্বাইয়ের বস্ত্রশ্রমিকের মাসিক গড় মজুরী ছিল ৩৪·৫৬ টাকা। (*অমিয় বাগচী—— ভারতে বেসরকারী বিনিয়োগ*)। আবার ১৯২৫-এর এপ্রিল——জুন মাসে উত্তর-পশ্চিম রেলওয়েতে এক বিশাল ধর্মঘট হয়।লাহোরের এক মিছিলে শ্রমিকেরা নিজেদের রক্তে রাঙানো এক লাল পতাকা নিয়ে রাস্তায় ঘোরে। মাদ্রাজের বিভিন্ন কারখানাতেও আন্দোলন সংগঠিত হয়। ১৯২৭-এর ফেব্রুয়ারী ও সেপ্টেম্বরে খড়গপুর রেলওয়ে ওয়র্কশপে ধর্মঘট হল।

এর আগেও বৃটিশ শাসনে কৃষক-কারিগরদের বিদ্রোহ-আন্দোলন হয়েছে। কিন্তু এবারের এই আন্দোলনগুলোকে তারা অত্যন্ত ভীত হয়ে গুরুত্ব দিল। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের পর বৃটিশ শাসকেরা চাষী-মজুরদের যে কোন আন্দোলনকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে চাইল। এবং তাদের এধারণা সত্যি ছিল যে সেসময়ের কৃষক-শ্রমিকের আন্দোলন রুশ-বিপ্লব থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছিল।যদিও সোভিয়েত রাশিয়ার ঘটনাবলী তখন ভারতবাসী সঠিকভাবে জানতেও পারত না, তবু ইংরেজদের তীব্র রুশ-বিদ্বেষ, কমিউনিস্টদের নিয়ে প্রবল কুৎসা, সাধারণ মানুষকে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি সহানুভূতিশীল করে তুলেছিল। আম-জনতার ইংরেজদের প্রতি ঘৃণা এতই প্রবল ছিল যে বৃটিশের কমিউনিস্ট নিন্দায় সকলের এই ধারণা হল যে সোভিয়েত রাশিয়াই একমাত্র শক্তি যারা ইংরেজকে জব্দ করতে পারে। উত্তর ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কৃষক আন্দোলনের নেতা বাবা

রামচন্দ্র ১৯২৫-এর নভেম্বরে 'কৃষকের প্রিয় নেতা' হিসাবে লেনিনের নাম করেন এবং বলেন——'রাশিয়ায় ছাড়া কৃষকরা এখনও দাসই হয়ে আছে' *(মজিদ সিদ্দিকি ——উত্তর ভারতে কৃষিকেন্দ্রিক বিক্ষোভ)*। এই কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্ব কমিউনিস্টদের হাতে ছিল না, তবুও বাবা রামচন্দ্রের উক্তি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় রাশিয়ার বিপ্লব এদের এক অনুপ্রেরণার কেন্দ্রস্থল ছিল। ভারতের কমিউনিস্টরা একেবারে প্রথম থেকেই শ্রমিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল এবং কখনও কখনও নেতৃত্বও দিতে পেরেছিল। আগে উল্লিখিত বোম্বাইয়ের বস্ত্র-শ্রমিকদের ধর্মঘটে তাদের একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। সুভাষচন্দ্রের লেখা 'দ্য ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল' বইতেও তার স্বীকারোক্তি আছে। কিন্তু কৃষকদের মধ্যে কমিউনিস্টদের সংগঠন বেশ কম ছিল।

চাষী-মজদুর-সাধারণ মানুষের মধ্যে কমিউনিস্টদের প্রভাবে বিশ্বের পয়লা নম্বর সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বৃটিশ-রাজ তখন কমিউনিজম আতঙ্কে ভুগছে। মন্টেগু এবং চেমসফোর্ড তাদের রিপোর্টে লিখেছিলেন—— " রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লব ভারতে রাজনৈতিক চেতনার জাগরণকে দ্রুততর করেছে"। বিশেষত ১৯২০ সালে মস্কোতে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের দ্বিতীয় কংগ্রেসে বিশ্বের উপনিবেশগুলো সম্বন্ধে লেনিনের থিসিস গৃহীত হবার পর বৃটিশ-সাম্রাজ্য প্রমাদ গুণল। ভারত সরকারের গোয়েন্দা প্রধান লিখলেন—— "বাংলাদেশ এবং যুক্তপ্রদেশের কিষাণসভা ও রায়ত সভা সরাসরি বলশেভিকদের বন্ধু। কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টন করে দেওয়ার বলশেভিক নীতি ভারতের জনসাধারণকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।"(*কে. সেসিল——বলশেভিজম ইন ইন্ডিয়া*)। ভারত যেহেতু তাদের প্রধানতম উপনিবেশ সেখানে বৃটিশ সরকার ব্যাপক ব্যবস্থা নিয়েছিল। ভারতে তাদের কেন্দ্রীয় ইনটেলিজেন্স ব্যুরোকে নতুনভাবে ঢেলে সাজালো। মজার ব্যাপার যে ভারতে কমিউনিষ্ট আন্দোলন শুরু হবার আগে থেকেই তার মোকাবিলা করার জন্য ইংরেজ সরকার প্রস্তুত ছিল। তারই ফলশ্রুতিতে ১৯২৩-এ পেশোয়ার ষড়যন্ত্র মামলা, ১৯২৪-এ কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা এবং পরে ১৯২৯-এ মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা। কিন্তু এই দমন-নিপীড়নের চেয়েও মোক্ষম অস্ত্র ইংরেজ প্রয়োগ করতে চাইল। এর আগে যত শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন হয়েছে তা থেকে বৃটিশ শাসনকে উদ্ধার করেছে ধনী-মধ্যবিত্তদের জাতীয়তাবাদী দলগুলো। এবারেও ইংরেজ তাদের শরণাপন্ন হল। যে কংগ্রেস মৃত-প্রায়——রাজনীতি ছেড়ে যারা চরকা, মাদক-বর্জন, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ নিয়ে ব্যস্ত, তাদের প্রাণসঞ্চার করার ব্যবস্থা হল। যে স্বরাজ্য দলকে দুর্বল করতে সুভাষ বসু, সত্যেন মিত্র ও অন্যান্যদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হল। এর আগেই সুভাষচন্দ্র জেলে থাকতে ৪ এপ্রিল ১৯২৭-এ এক চিঠিতে লিখেছিলেন যে তিনি বলশেভিক হতে চান না। তাকে মুক্তিদান ইংরেজদের পক্ষে বিফলে যায় নি। জেল থেকে বেরিয়েই তিনি অত্যন্ত প্রচন্ডতার সাথে মার্কসবাদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার শুরু করলেন। অবস্থা এমন জায়গায় পৌঁছেছিল যে প্রাদেশিক কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটির সভায় মুজফফর আহমেদ (তখন কংগ্রেস প্রাদেশিক কমিটির সদস্য) তাকে প্রকাশ্যে তর্কযুদ্ধের আহ্বান জানিয়েছিলেন। সন্ত্রাসবাদী রাজবন্দী ছাড়া কংগ্রেসের সব কর্মীকেই বৃটিশ সরকার মুক্তি দিল। সাইমন কমিশনের মাধ্যমে বৃটিশ শাসক ভারতীয় ধনীদের প্রতিনিধি কংগ্রেস আর কোনও কোনও জায়গায় মুসলিম লীগের হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে চাইল। কারণ তারা জানত এই দু'টো দলকে শক্তিশালী করতে পারলে চাষী-মজুরদের আন্দোলন সম্পর্কে তাদের ভাবনার কিছু নেই।

কিন্তু কংগ্রেস ঠকে শিখেছে। আইনসভায় ঢুকে স্বরাজ্যপন্থীদের কি হাল তারা

ভালরকমই দেখেছে। খোদ স্বরাজ্যপন্থীরাই তখন চিত্তরঞ্জনের সৃষ্ট বেঙ্গল-প্যাক্ট আর আইনসভার ফাঁস গলা থেকে নামাতে পারলে বাঁচে। সুতরাং কংগ্রেস বৃটিশ ফাঁদে পা দিল না। সাইমন কমিশনে একজনও ভারতীয় নেই, এই অজুহাতে সাইমন কমিশন বয়কটের ডাক দিল। এরই ফাঁকে লিবারেল দলের তেজবাহাদুর সপ্রু আর কংগ্রেসের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ঘনশ্যাম দাস বিড়লা ইংল্যান্ড ছুটলেন যদি তদ্বির করে কমিশনে ঢোকা যায়। কিন্তু কমিশনটা ছিল পার্লিয়ামেন্টারি, তা তৈরী করা হয়েছিল কেবলমাত্র বৃটিশ পার্লিয়ামেন্টের সদস্য নিয়ে, স্বভাবতই তাদের সেখানে ঠাঁই হল না। ফিরে এসে তারা সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে তারস্বরে গলা ফাটাতে লাগলেন।

শ্রমিক-চাষীর আন্দোলনকে প্রতিহত করার জন্যই নিযুক্ত হয়েছিল সাইমন কমিশন। বাহ্যত তাদের সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছিল, কারণ কংগ্রেস তা গ্রহণ করে নি। কিন্তু কংগ্রেস কমিশনের বিরুদ্ধে জোরদার আন্দোলন শুরু করার পর স্বাভাবিকভাবেই আম-জনতা এই আন্দোলনে ভিড়ে পড়ল। সাইমন কমিশন-বিরোধী বিপুল চিৎকারে শ্রমজীবী মানুষের কণ্ঠস্বর ক্রমেই চাপা পড়তে লাগল। সেদিক থেকে সাইমন কমিশন স্থাপন ইংরেজদের দিক থেকে দারুণ সফলই হয়ছিল। আর কংগ্রেস ঠিক এটাই চেয়েছিল। একদিকে কংগ্রেসের পালে হাওয়া লাগল, আর একদিকে মেহনতী মানুষের আন্দোলনকে ক্ষীয়মান করা গেল।

দীর্ঘ ছ'বছর কংগ্রেস আন্দোলন থেকে দূরে সরে আইনসভার চোরাগলিপথে ঘুরে মরেছে। সাইমন কমিশন তাকে বাঁচিয়ে দিল। সুভাষচন্দ্রের ভাষায়—'একটি শুভ মুহূর্তে সাইমন কমিশনকে নিয়োগ করা হয়েছিল, এবং দেশবাসীর উৎসাহ জাগিয়ে তুলতেও এর ফল হয়েছিল আশ্চর্যজনক।' *(দ্য ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল)*। সুভাষচন্দ্র সাইমন কমিশন বয়কট আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিন্তু শুধুমাত্র কমিশনকে বয়কট করলেই আন্দোলন দানা বাঁধবে না। তাই তার সাথে যোগ করা হল বিদেশী দ্রব্য বয়কট আর স্বদেশী আন্দোলন। বঙ্গভঙ্গের সময়কার সেই অস্ত্র তখনও মোটেই পুরনো হয় নি। বরং হয়ে উঠেছে আরও বেশি কার্যকর, আরও ধনিক স্বার্থবাহী।

সুভাষচন্দ্র ও স্বদেশী আন্দোলন

আমরা আগেই দেখেছি যে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের দিনগুলোতে জাতীয় কংগ্রেস কিভাবে ভারতের উদীয়মান শিল্পপতিদের স্বার্থে এক বিশাল বিদেশী পণ্য বয়কট আন্দোলন সংগঠিত করেছিল। ১৯২৮ বা তার পরবর্তী দিনগুলোতেও এই আন্দোলন একতরফাভাবে ভারতীয় শিল্পপতিদের অন্ধ সেবা ছাড়া আর কিছু ছিল না। এবারও বিদেশী দ্রব্য বর্জনে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের আগ্রহই দেখা গেল সমধিক। গান্ধীসহ সব নেতারা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই একে সমর্থন করেছিলেন। যে গান্ধী গোটা আন্দোলনে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে মুখ খোলেন নি তিনিই ১৬ ফেব্রুয়ারী ১৯২৮ ইয়ং ইন্ডিয়া পত্রিকায় লিখলেন "আমার কাছে এদেশে বিদেশী দ্রব্যের অর্থই হল বিদেশী সরকার।" সুভাষচন্দ্র মাদ্রাজ কংগ্রেসে যোগ না দিয়ে বাংলা জুড়ে প্রচারে বেরোলেন। জেলায় জেলায় বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গ ভ্রমণের মধ্যে দিয়ে তিনি তিনটে উদ্দেশ্য সাধন করলেন। এক তো প্রদেশ জুড়ে কংগ্রেসের নেতৃত্বে এক আন্দোলন গড়ে তোলা, দ্বিতীয়তঃ বিদেশী পণ্য বয়কট আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় শিল্পপতিদের আস্থা অর্জন করা, তৃতীয়তঃ বাংলা কংগ্রেসে তার প্রতিদ্বন্দ্বী যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত যিনি নিজেই পূর্ববঙ্গের অধিবাসী—

পূর্ববঙ্গে তার প্রভাব খর্ব করা। সুভাষচন্দ্র জেল থেকে ছাড়া পাবার অব্যবহিত পরে বোম্বাইয়ের বিখ্যাত বস্ত্র-শিল্পের মালিক অম্বালাল সরাভাই তার সাথে শিলং গিয়ে দেখা করেন। সরাভাই যখন কলকাতায় ফেরেন তিনি তখন শিলং থেকে তার বৌদিকে সরাভাই পরিবারকে চায়ের নিমন্ত্রণ করার জন্যে চিঠি লেখেন।

কংগ্রেসের সাথে শিল্পপতিদের গাঁটছড়া অবশ্য নতুন কথা নয়। অম্বালাল সরাভাই খোদ গান্ধীর সাবরমতী আশ্রমে মোটা টাকা ঢেলেছেন। ১৯২১ সালের তিলক স্বরাজ ফান্ডের এক কোটি টাকার মধ্যে বোম্বাইয়ের মিলমালিকেরা দিয়েছিল ৩৭.৫ লক্ষ টাকা। *(সুমিত সরকার—মডার্ণ ইন্ডিয়া)*। সুভাষচন্দ্রও বিভিন্ন সময়ে শিল্পপতিদের কাছ থেকে ফান্ড জোগাড় করেছেন। এছাড়াও সুভাষচন্দ্রকে ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যে নিয়মিত টাকা জুগিয়েছেন নাড়াজোলের জমিদার দেবেন্দ্রলাল খাঁ, কুমার বিশ্বনাথ রায়, পাইকপাড়ার বিমল সিংহ, ময়মনসিংহের মহারাজা এবং শ্রীরামপুরের গোস্বামী জমিদাররা। *(সুধী প্রধান—সুভাষচন্দ্র, ভারত ও অক্ষশক্তি)*। কংগ্রেসে আরও অর্থের যোগানদারেরা ছিলেন ঘনশ্যাম দাস বিড়লা, যমুনালাল বাজাজ (ইনি আবার দীর্ঘদিন এ. আই. সি. সি. সদস্য ছিলেন), পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাসের মত ভারতীয় বণিকেরা। গান্ধী তো শহরে শহরে বিড়লাদের আতিথ্য গ্রহণ করতেন। যেমন জিন্না থাকতেন মুসলমান শিল্পপতি ইস্পাহানীর আশ্রয়ে। অম্বালাল সরাভাইয়ের বোন অনুসূয়া বেন আবার ছিলেন গান্ধীর একান্ত অনুগামিনী। শিল্পপতিদের এই অনুকম্পার প্রতিদান কংগ্রেসকে প্রতি পদক্ষেপে দিতে হয়েছে। স্বয়ং সুভাষচন্দ্র পর্যন্ত কংগ্রেসের সঙ্গে তার মতবিরোধের সময় অভিযোগ করেছিলেন—"সরকারি নেতাদের প্রতিক্রিয়াশীল কর্মনীতি এবং পুঁজিবাদী স্বার্থের সহিত তাঁহাদের যোগসাজশ এই-সব মানুষকে এতদিন দূরে সরাইয়া রাখিয়াছে। ভারতের আধ ডজন শহরে বিশিষ্ট ক্রোড়পতির প্রাসাদ কংগ্রেসের নেতাদের সরকারি কর্মকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে।" *(২৭ জুলাই ১৯৩৯ সংবাদপত্রে দেওয়া বিবৃতি)*।

হার্ডিঞ্জ হোস্টেলের সঙ্গে কথা বলে সুযোগমত তাকে সেখানে পৌঁছে দিতে গিয়ে জানলাম ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীসহ বেশ কয়েকজন দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং-এ আছেন। দাঙ্গার খোঁজখবর নিচ্ছেন। হোস্টেলের ছেলেরা অনুরোধ করায় তাদের কয়েকজনের সঙ্গে সেখানে গেলাম প্রায় বেলা বারোটা নাগাদ। ডঃ শ্যামাপ্রসাদের (তখন হিন্দু মহাসভার প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি) নির্দেশে মেডিকেল কলেজে দাঙ্গা পরিস্থিতির বিবরণ দিচ্ছি। আরও পাঁচ-ছয়জন আছেন, সবাইকে চিনি না। এতদিন পরে তাঁদের নাম মনে করতে পারছি না। সাড়ে বারোটা নাগাদ হঠাৎ দেখি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় আমাকে নিবৃত্ত করলেন এই বিবরণ দেওয়া থেকে। আমার সামনেই বললেন তিনি বিড়লাকে ফোন করেছেন কলকাতার পরিস্থিতি জানিয়ে। বিড়লাজিকে বলেছেন গান্ধীজিকে রাজী করাতে, যাতে তিনি অন্তত নীতিগতভাবে পাকিস্থানকে মেনে নেন। গান্ধীজি রাজী হলে বিড়লাজি যেন ইস্পাহানী সাহেবকে দিয়ে মিঃ জিন্নাকে অনুরোধ করেন সুরাবর্দী সাহেবকে নির্দেশ দিতে মিলিটারির আশ্রয় নিয়ে দাঙ্গা নিবারণ করতে। মিঃ জিন্নার অনুরোধ ছোটলাট নিশ্চয়ই

মেনে নেবেন। ডঃ মুখার্জী সমগ্র বঙ্গদেশ ও পাঞ্জাব পাকিস্তানে যাবার আশঙ্কা প্রকাশ করলে ডাঃ রায় জানালেন, বিড়লাজিকে বলা আছে ইস্পাহানী সেরকম কোনও কৌশল করলে বিড়লাজির ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কে তাঁর যে কয়েক কোটি টাকা বেনামীতে আছে, তা হাতছাড়া হবে। এরূপ হুঁশিয়ারিতে ইস্পাহানী মিঃ জিন্নাকে পাকিস্তানের এলাকা একটি কমিশন ঠিক করবে এই প্রস্তাবে রাজী করাতে পারবেন বলে তাঁর বিশ্বাস। (এখানে উল্লেখ্য, পরবর্তীকালে ১৯৪৭ সালের ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকারে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে ডঃ মুখার্জীও মন্ত্রী হন)। এইসব চলাকালীন আবার ডাঃ রায়ের কাছে ফোন এল। কিছুক্ষণ পর প্রায় বেলা ১টায় তিনি ফিরে এসে ঘোষণা করলেন উল্লিখিত পরস্পরের সাথে কথা হয়েছে এবং বেলা ১-১৫ মিনিটে মার্শাল আইন জারি করে মিলিটারি রাস্তায় নামছে। হঠাৎ আমার দিকে নজর পড়ায় আমি কী করে ফিরব জিজ্ঞাসা করায় আমি এজরার হাসপাতালের দিকের রেলিং টপকে ঠিক সময়ে পৌঁছে যাব বলে বেরিয়ে পড়লাম। যথাসময়েই হাসপাতালে ফিরে আসতে পেরেছিলাম, ঘটনার বিবরণ কেউ বিশ্বাসও করেননি। কিন্তু মিলিটারি পূর্বোক্ত সময়ে নামল, গুলি-গোলা চলতে থাকল। বর্ষীয়ান চিকিৎসক ডাঃ পূর্ণেন্দু ঝা'র বিবরণ থেকে পরিষ্কার যে ভারত ভাগ হবে কিনা, ভাগ হলে কিভাবে হবে তা ঠিক করে দিচ্ছে বিড়লা, ইস্পাহানীর মত শিল্পপতিরা। আর ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় নেতারা তা ভৃত্যের মত মেনে নিচ্ছে।

যাইহোক আমরা বিদেশী পণ্য বয়কটের কথায় আবার ফিরে যাই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ভারতীয় শিল্পপতিদের কাছে এক সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে এল। ভারতে বৃটিশ নীতির যে মূল পদ্ধতি অর্থাৎ এদেশ থেকে কাঁচামাল বৃটেনে নিয়ে যাওয়া আর বৃটেন থেকে উৎপাদিত পণ্য নিয়ে এসে ভারতের বাজারে বিক্রি——যুদ্ধের অশান্ত দিনগুলোতে তা সম্ভব হল না। তাই ভারতেই বেশ কিছু শিল্প স্থাপন করতে হল। যুদ্ধে বৃটিশ পুঁজিও বেশ খানিকটা ক্ষতিগ্রস্থ হবার ফলে ভারতীয় পুঁজিকে সুযোগ দিতে হল। এতে ভারতীয় শিল্পপতিদের ক্ষোভ কিছু প্রশমিত হল। আবার যুদ্ধের সময়ে বৃটেনের মিলগুলোতে উৎপাদিত পণ্য বেশিরভাগটাই যুদ্ধের প্রয়োজনে লেগে যাওয়ায় ভারতে রপ্তানি করা সম্ভব হয়ে উঠল না। ভারতের চাহিদা পূরণে এগিয়ে এল আমেরিকা ও জাপান। বৃটিশ দেখল ভারতের বাজার আমেরিকা বা জাপানের খপ্পরে পড়লে তা বরাবরের জন্যে হাতছাড়া হবার ভয় রয়েছে। তার চেয়ে বরং ভারতীয় শিল্পপতিদের সেই সুযোগ দেওয়াই নিরাপদ। *(জন বিউক্যাম্প——ব্রিটিশ ইম্‌পিরিয়ালিজম ইন ইন্ডিয়া)*। সব মিলিয়ে ভারতীয় পুঁজির বিকাশের রাস্তা খুলে গেল। যুদ্ধের আগে ভারতে ব্যবহৃত কাপড়ের শতকরা ৭০ ভাগ আসত ইংল্যান্ড থেকে আর ভারতের কলগুলোতে তৈরী হত শতকরা মাত্র ২৮ ভাগ। যুদ্ধের পর বৃটেন থেকে কাপড় আসতে থাকে শতকরা ৩৫ ভাগ আর ভারতে উৎপন্ন কাপড়ের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়াল শতকরা ৬৫ ভাগ। যুদ্ধের সুযোগে টাটা আয়রণ ও স্টীল কম্পানিও যথেষ্ট লাভবান হল। যুদ্ধ চলাকালীন পাটের ফাটকাবাজিতে বেশ কিছু পাট ব্যবসায়ী মোটা টাকা নাফা করে পাটশিল্পে তা বিনিয়োগ করে। যুদ্ধের ঠিক পরেই জি ডি বিড়লা আর স্বরূপচন্দ হুকুমচন্দ কলকাতার কাছেই পাটকল চালু করে। ভারতীয় পুঁজি প্রায় বৃটিশ পুঁজির সাথে টক্কর দেবার মত অবস্থায় দাঁড়াল।

ভারতীয় মিলমালিকদের এই চমৎকার লাভজনক সময়ে সুভাষচন্দ্র তাদের আস্থা অর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তার মতে——

গত কয়েক বৎসর যাবৎ বৃটেন হইতে আমদানি ধীরে ধীরে কমিয়া যাইতেছে। ইহার

পরিমাণ ১৯২৩-২৪ সালে শতকরা ৫৮ ভাগ ছিল, বর্তমানে তাহা কমিয়া হইয়াছে শতকরা ৪৮ ভাগ। এই সময় প্রবল বয়কট আন্দোলন করিতে পারিলে উহা প্রকৃতই কাজের মত কাজ হইবে। *(৩ মে ১৯২৮ পুণায় ষষ্ঠ মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক সম্মেলনে ভাষণ)*

তিনি বংলাদেশজুড়ে ঘুরে ঘুরে স্বদেশী পণ্যের প্রচার এবং স্বেচ্ছাসেবকদের সংগঠিত করতে লাগলেন। তিনি কুষ্ঠিয়ায় মোহিনী মিল পরিদর্শন করলেন এবং এই কুষ্ঠিয়াতে একটা স্বদেশী বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে তুলতে চাই বলে আশা প্রকাশ করলেন। এই মোহিনী মিলের প্রতি সুভাষের একটা বিশেষ দুর্বলতা ছিল তা আমরা পরে দেখবো।

এইভাবে নির্বিচারে বিদেশী পণ্য বর্জন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করেন নি। এর আগে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু ছ'মাসের মধ্যে তিনি নিজেকে সরিয়ে নেন। এবারের স্বদেশী আন্দোলন কিন্তু তিনি একেবারেই সমর্থন করলেন না। তিনি নানা লেখায় এর বিরোধিতা করলেন। তবে তিনি এর বিরোধিতা করেছিলেন কারণ এটা ভারতীয় পুঁজিপতিদের স্বার্থবাহী ——তা নয়। তিনি প্রধানতঃ এই আন্দোলনের সংকীর্ণতা, মৌলবাদী মনোভাব আর এর সাম্প্রদায়িক চরিত্রের জন্যে বিরোধিতা করলেন। স্বদেশী আন্দোলনে সমর্থন আদায়ের জন্যে সুভাষ রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়েছিলেন (গান্ধীও একসময় চেষ্টা করেছিলেন)। কিন্তু সমর্থন মেলে নি। এরপর যখন সিটি কলেজের রামমোহন হলে সরস্বতী পূজো করার অধিকার নিয়ে সুভাষচন্দ্র ছাত্রদের আন্দোলনে মদত দিচ্ছিলেন সেই সময় রবীন্দ্রনাথ একটি বিবৃতিতে ধর্মনিরপেক্ষতার স্বার্থে সিটি কলেজে সরস্বতী পূজো (যা এতদিন হয় না) করার বিরুদ্ধে মত দেন। ক্ষুব্ধ সুভাষ বলেন——

রবিবাবু এবং মি. এণ্ডরুজ এই ব্যাপারে আসিয়া পড়িয়াছেন দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় ব্যক্তির নিরপেক্ষ থাকাই সংগত ছিল। কিছুদিন পূর্বে যখন আমরা তাঁহাকে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করিতে আহ্বান করিয়াছিলাম, তখন তিনি অস্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন কেন এই ব্যাপারে তাঁহাকে ডাকা হইল এবং কেনই বা তিনি আসিলেন, বুঝি না। *(১৯ জুন ১৯২৮ এ্যালবার্ট হলে ভাষণ)* মতের অমিল হলে সুভাষ কাউকেই ছাড়তেন না।

এই সময় বাংলার কমিউনিস্টেরা. সেসময় যারা ওয়ার্কার্স এণ্ড পিজান্টস্ পার্টির মধ্যে কাজ করছিলেন তারা এই স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধিতা করেন এবং শ্রেণীসংগ্রামের পক্ষে মতপ্রকাশ করেন। তাদের প্রতি ক্ষুব্ধ সুভাষ বলেন যে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকল শ্রেণী স্বরাজ লাভের জন্যে সংগ্রাম করবে। এর মধ্যে যারা শ্রেণী সংগ্রামের কথা বলে তারা বিদেশী শাসকের স্বার্থে কাজ করে। তার ভাষায়——

বর্তমানে খোলাখুলিভাবে শ্রেণীসংগ্রামের কথা প্রচার করিয়া এবং তাহাকে বাস্তবে রূপ দিবার প্রচেষ্টা চালাইয়া আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা চলিতেছে। আমি ইহাকে জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে অপরাধ বলিয়া মনে করি। একশ্রেণীর ভারতীয় যাহাদের কমিউনিস্ট মতাবলম্বীও বলা যাইতে পারে তাহাদের কার্লমার্কস ও বাকুনিনের মতবাদ বদহজম হইবার ফলে ইহা করিতেছেন। *(৩ মে ১৯২৮ পুণায় ষষ্ঠ মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক সম্মেলনে ভাষণ)*

কমিউনিস্টদের পক্ষ থেকে এর জবাবে বলা হল——

ভারতে জাতীয় মুক্তির প্রকৃত সংগ্রামে যদি আমাদিগকে প্রবৃত্ত হইতে হয় তা হলে

শুধু যে বৃটিশ ধনিকগণের সহিত আমাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হবে তা নয়, ভারতীয় ধনিক ও ভারতীয় জমিদারগণের সহিতও আমাদের একটা সংঘর্ষ হবে। ভারতীয় ধনিক আর বৃটিশ ধনিক যদিও এ যাবৎ এক আসনে আসীন হয়নি, তথাপি তারা ক্রমশই সমস্বার্থে বিজড়িত হয়ে পড়েছে। কাজেই ভারতীয় ধনিকগণও আমাদের পরিপূর্ণ স্বাধীনতার পরিপন্থী হয়ে উঠবে। বৃটিশ ধনিকগণের অর্থনীতিক স্বার্থ অব্যাহত থাকবে অথচ আমরা রাষ্ট্রনীতিক স্বাধীনতা লাভ করব, এমনটা কিছুতেই হতে পারে না। কাজেই, তাদের সাথে সমস্বার্থে জড়িত ভারতীয় ধনিকগণের স্বার্থও আমাদের পরিপূর্ণ স্বাধীনতার দ্বারা বিপন্ন হবে। আর তাদের স্বার্থ বিপন্ন হলে তাদের সহিত সংঘর্ষ না হয়ে যাবে না। মোটকথা, কি শ্রমিক আন্দোলন, কি কৃষক আন্দোলন, এক শ্রেণীর দেশীয় লোকদের সহিত সংঘর্ষ হবেই হবে। জনগণের আন্দোলন কখনো এমন একটা শ্রেণী আন্দোলনের (মিঃ বসু ও ডাক্তার দাসের কথায় জাতীয় আন্দোলনের) মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে পারে না যার দ্বারা জনগণের হাতে না আসবে কোনো রাষ্ট্রীনীতিক অধিকার, না হবে তাদের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন। (*মুজফ্‌ফর আহমদ—গণবাণী ১৯ জুলাই ১৯২৮*) কিন্তু সুভাষচন্দ্র তার স্বমতে অটল থাকলেন যে আগে শিল্পপতি-জমিদার-চাষীমজুর সবাই মিলে স্বরাজ হাসিল করতে হবে। পরে শ্রমিক-কৃষকের উন্নতির কথা ভাবা যাবে। তিনি হরিশচন্দ্র সিংহের সাহায্যে একটা বই প্রকাশ করেছিলেন যার নাম—বয়কট অব ব্রিটিশ গুডস্। এতেও তিনি লিখলেন যে ইংরেজ তাড়াতে হলে ধনীদের সাহায্য আতি প্রয়োজনীয়।

সেইসময় ভারতীয় মিলমালিকেরা শ্রমিকদের কম মজুরী দিয়ে বেশি সময় কাজ করিয়ে প্রচুর মুনাফা করছিল। সেইসব কারখানায় শ্রমিকেরা জঙ্গী আন্দোলন করলে সুভাষের বক্তব্য ছিল—"মালিকেরা ভারতীয় হইলে তাহাদের বুঝাইয়া তাহাদেরই দেশবাসী অপর এক শ্রেণীর প্রতি আপসসুলভ এবং সহানুভূতিসম্পন্ন মনোভাব গ্রহণ করাইবার জন্য আমাদের সর্বপ্রকারে সচেষ্ট হইতে হইবে।" *(৩ মে ১৯২৮ পুণায় মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক সম্মেলনের ভাষণ)*। অর্থাৎ ভারতীয় শিল্পপতিদের ব্যাপারে গান্ধী আর সুভাষচন্দ্রের মধ্যে কোনও বিরোধ নেই। গান্ধী বলেছেন যে ধনীরা দেশের সম্পদের অছি হিসাবে থাকবে। তারা গরীবদের প্রয়োজন অনুযায়ী তা থেকে দেবে। আর সুভাষচন্দ্র বলছেন মিলমালিকদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাদের সহানুভূতি আদায় করতে হবে। গোটা ১৯২৮ সাল জুড়ে তিনি বাংলার জেলায় জেলায় ঘুরে প্রচার করেছেন—"বিলাতী ক্রয় করার ফল দেশের লোককে হত্যা করা"। বলেছেন—"আপনার প্রতিবেশীর বুকে ছোরা বসাইয়া দেওয়া যদি পাপ হয় তবে বিদেশী বস্ত্র পরিধান করা আরো বেশি পাপ"। আসলে তিনি যতই বড় বড় কথা বলুন না কেন কার্যত গান্ধীর অনুসৃত রণকৌশলের বাইরে তিনি তখনও এক ইঞ্চিও যেতে পারেন নি। তিনি আরও বলেছেন—"বহু মিল-মালিকও আমাদের জানাইয়াছেন কাটতি বাড়িলে তাহারা শতকরা ৪০ হইতে ৫০ গুণ পর্যন্ত উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে পারিবে"। (৩ *মে ১৯২৮ পুণায় ভাষণ*)। এর আগের বিদেশী পণ্য বর্জন আন্দোলনের সময় দেশীয় মিলমালিকেরা চাহিদা অনুযায়ী বাজারে কাপড় দিতে পারে নি। এবার আর তার অভাব হবে না, শিল্পপতিরা প্রস্তুত। তবে একথা বলার সময় তিনি চিন্তা করলেন না যে এই বাড়তি ৪০-৫০ শতাংশ কাপড় আসবে কোথা থেকে। রাতারাতি নিশ্চয় মিল-সুতাকল গজিয়ে উঠবে না। এই বাড়তি উৎপাদন আসবে শ্রমিককে আরও বেশি খাটিয়ে, বেশি নিপীড়নের মধ্যে দিয়ে। কংগ্রেসী নেতারা যে তাতে কোন প্রতিবাদ করবে না। মিলমালিকেরা জেনে গিয়েছে।

কংগ্রেস নেতাদের কাছ থেকে সবুজ সংকেত পেয়ে ভারতীয় শিল্পপতিরা শ্রমিক শোষণ বহুগুণ বাড়িয়ে দিল। বিদেশী কম্পানিগুলোর চাইতে অনেক কম মজুরি দিয়ে নিজেরা মুনাফার পাহাড় বানিয়ে চলল। দেশী কারখানাগুলোর যেমন ছিল মজুরী কম, তেমনি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। কি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে এইসব স্বদেশী কারখানায় শ্রমিকেরা কাজ করত তার এক মর্মস্পর্শী বিবরণ পাওয়া যায় সোমনাথ লাহিড়ীর লেখায়। তার জেঠতুতো দাদা 'বুড়োদা' কাজ করতেন এক নামজাদা স্বদেশী কারখানায়। কর্তৃপক্ষ এত জবরদস্ত স্বদেশী যে কংগ্রেসের ডাকা হরতালে কারখানা বন্ধ রাখত। পুলিশের লাঠির ঘায়ে আহত হওয়ায় সাতদিন ছুটিও মঞ্জুর করেছিল। সেই কারখানায় জুতোর কালি তৈরী করার নাইট্রো-বেনজিন উৎপাদন শুরু হল। তারপরের ঘটনা——

আমরা সবাই একটু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম। নাইট্রো-বেনজিন এক ধরনের বিষ ধীর গতিতে শরীরের উপর ক্রিয়া করে। বুড়োদাকে সবাই বললাম, সাবধানে কাজ করো। কোম্পানির কাছে উপযুক্ত এপারেটাস দাবী করো।

বুড়োদা দাবী করেছিলেন, তাঁর সহকর্মীরাও কেউ কেউ তাঁর হয়ে দাবী করেছিল। কিন্তু কোম্পানি শোনে নি। ম্যানেজার হেসে বলেছিলেন নাইট্রো-বেনজিন আবার বিষ, মশা আবার পাখি! স্বদেশী জুতোর জন্যে স্বদেশী কারখানার কেমিস্ট বুড়োদা হপ্তার পর হপ্তা ধরে দিনরাত বিষের ধোঁয়ার মধ্যে কাজ করে গেলেন। না করলে চলবে কি করে, নতুন স্বদেশী মাল দিয়ে বিদেশী নাইট্রো-বেনজিনের বাজার দখল করার সুযোগ এসেছে।

একদিন সন্ধ্যায় একটু দেরীতেই বুড়োদাদের বাড়ীতে পৌঁছেছি, দেখি বুড়োদার সাইকেলখানা নিচেই পড়ে, অন্যদিনের মত দোতলায় নেই। ঘরে গিয়ে তাঁর চেহারা দেখে চমকে উঠলাম। মুখটা হলদে হয়ে গেছে, অতি কষ্টে শ্বাস নিচ্ছেন।

তখনই সবাই মিলে নিয়ে গেলাম আর জি কর হাসপাতালে। কিন্তু বৃথা, দিনের পর দিন ধরে, নাইট্রো-বেনজিনের বিষক্রিয়ার ফলে সেদিন মধ্যরাত্রেই তাঁর মৃত্যু হল। *(সোমনাথ লাহিড়ী রচনাবলী)* প্রায় সব ভারতীয় মালিকানাধীন কারখানার চেহারাই ছিল মোটামুটি এইরকমই। আর কংগ্রেস নেতারা স্বদেশী মন্ত্রের নামে এর থেকে চোখ ফিরিয়ে রইলেন।

তবু স্বদেশী কাপড়ের দাম বিলাতী কাপড়ের চেয়ে বেশি। লোকে কিনবে কেন। সুভাষচন্দ্র আবেদন জানালেন——"প্রথম প্রথম আমাদের বেশি মূল্য দিতে হইতে পারে, কিন্তু পরে উহা সস্তা পড়িবে।' (২৬ *ফেব্রুয়ারী ১৯২৮ খিদিরপুর ভূ-কৈলাস রাজবাড়ীতে ভাষণ)*। সুভাষচন্দ্র জানতেন এবং স্বীকার করেছিলেন——"একবার আমরা পূর্ণরূপে বিদেশী বস্ত্র বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে মিলমালিকদের হাতের মুঠোয় নিজেদের তুলিয়া দিব এবং তাহা ঘটিবার পূর্বে আমাদের বুঝিতে হইবে আমাদের প্রতি তাহাদের আচরণ কী হইবে।" *(৩ মে ১৯২৮ পুণায় ভাষণ)।* এ সত্ত্বেও তিনি নিজেদের মিলমালিকদের হাতের মুঠোয় তুলে দিয়েছিলেন। কারণ কংগ্রেসের পক্ষে এর বাইরে যাওয়া সম্ভবই ছিল না। না গান্ধী, না জওহর, না সুভাষ——কেউই এর ব্যতিক্রম নন।

এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার উল্লেখ করলে শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি জাতীয় নেতৃবৃন্দের মনোভাব পরিষ্কার হয়ে যাবে। পরিষ্কার হয়ে যাবে শিল্পপতিদের সাথে চিত্তরঞ্জন-গান্ধী-সুভাষচন্দ্রের সম্পর্ক। জামসেদপুরের টাটা আয়রন এ্যান্ড স্টীল কোম্পানি ভারতে দেশীয় শিল্পপতিদের একটা বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান। ১৯২০ সালে শ্রমিক ধর্মঘটের সময় বাংলার কংগ্রেস নেতা সুরেন্দ্রনাথ হালদার 'জামসেদপুর লেবার এ্যাসোসিয়েশন' তৈরী করেন।

ধর্মঘটের দিনে জে এল এ কোন সংগ্রামী ভূমিকা পালন করে নি। আবার ১৯২২ সালে যখন শ্রমিকেরা স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট করে, জে এল এ শ্রমিকদের অন্যান্য ন্যায্য দাবী দাওয়াকে অবহেলা করে এই ধর্মঘটকে ইউনিয়নের স্বীকৃতি আদায়ের কাজে লাগাতে চায়। তারা কর্তৃপক্ষকে চাপ দিয়ে এক সালিশী বোর্ড বসাতে সফল হল। চিত্তরঞ্জন দাস এবং সি এফ এ্যান্ডরুজ হলেন এই বোর্ডের প্রধান। টাটা স্টীলের বড় হয়ে ওঠার মূলে চিত্তরঞ্জনের অবদান সমধিক। ১৯২৪ সালে আইনসভায় ইস্পাত সংরক্ষণের আইন পাশ করানোর ফলে টাটাদের ব্যবসার দিগন্ত খুলে গিয়েছিল। সুতরাং টাটাদেরও কংগ্রেসের উপর গভীর কৃতজ্ঞতা ছিল। তাদের সাথে কংগ্রেসের যোগসাজশে সি এফ এ্যান্ড্রুজকে সভাপতি করে ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দেওয়া হল। ইউনিয়ন মালিকের এত প্রিয়পাত্র ছিল যে ইউনিয়নের চাঁদা শ্রমিকের মাইনে থেকে কম্পানি কেটে নিত। ১৯২৫ সালে গান্ধী জামসেদপুরে এলে মালিকপক্ষ তাকে দারুণ সম্বর্ধনা জানায়। প্রত্যুত্তরে গান্ধী পুঁজি আর শ্রমের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য শ্রমিক আর মালিক দু'তরফ থেকেই উদ্যোগ নিতে বলেন। ঐ বছরই তিনি আমেদাবাদে বস্ত্র শ্রমিকদের কাছে আবেদন করেছিলেন তারা যেন বাণিজ্যিক মন্দার পর্বে তাদের নিয়োগকর্তাদের লজ্জায় না ফেলে। (গান্ধীর শিক্ষা বিফলে যায়নি। এখন তাবড় কমিউনিস্ট নেতাদের মুখে একই বুলি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে)। কিন্তু এত করেও শেষরক্ষা করা গেল না। ১৯২৮ সালে কারখানায় প্রবল আন্দোলন শুরু হল। শেষে কর্তৃপক্ষ কারখানা লক-আউট ঘোষণা করলে এ্যান্ড্রুজ সুভাষচন্দ্রকে ইউনিয়নের সভাপতি হতে অনুরোধ করলেন। সুভাষচন্দ্র নেতৃত্ব নিয়েও বিশেষ সুবিধা করতে পারেন নি। প্রকৃতপক্ষে জামসেদপুরে তার ব্যর্থ নেতৃত্বের দরুন তার সুনামহানিই হয়েছিল। কিন্তু শিল্পপতি মহলে তার মোটেই সুনামহানি হয় নি। ১৬ জুলাই ১৯২৯ সালে পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাসকে লেখা জি ডি বিড়লা এক চিঠিতে সুভাষ সম্বন্ধে মন্তব্য করেন—

মিস্টার বসুকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় নি।..............আমি এই ভরসা দিতে পারি, যখনই প্রয়োজন তখনই টাটা আয়রন এ্যান্ড স্টিল ওয়ার্কসকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে মিস্টার বসুর উপর আস্থা রাখা যেতে পারে, অবশ্য যদি তার সঙ্গে ঠিকমতো ব্যবহার করা হয়। যখন আমরা তাঁদের সঙ্গে কাজ করি তখন তাঁদের মানসিকতা আমাদের অনুধাবন করা উচিত। *(ঠাকুরদাস পেপার্স, এফ এন ৪২)*

সত্যি ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতাদের মানসিকতা সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন শিল্পপতি জগতের প্রবাদপুরুষ ঘনশ্যাম দাস বিড়লা।

কলকাতা কংগ্রেস—জাতীয় রাজনীতিতে সুভাষের প্রভাব বৃদ্ধি

১৯২৭ এর নভেম্বরে সুভাষচন্দ্র বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেসে সভাপতি হবার পর ডিসেম্বরে মাদ্রাজে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হল। তিনি এই কংগ্রেসে যোগ দেন নি। মাদ্রাজ কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন দীর্ঘদিন ইউরোপে কাটিয়ে আসা জওহরলাল নেহেরু। ঐ বছরই তিনি ব্রাসেলসে অনুষ্ঠিত ঔপনিবেশিক নিপীড়ন ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। তার আমেজ মনের মধ্যে কাজ করেছিল। তিনি মাদ্রাজ কংগ্রেসে বামপন্থীদের তোলা স্বাধীনতার প্রস্তাব সমর্থন করে জোরালো বক্তৃতা করলেন। সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব পাশ হয়ে যায়। বিষয় নির্বাচনী সভায়, স্বাধীনতা প্রস্তাবের পক্ষে অধিকাংশের মত দেখে গান্ধী মাদ্রাজে উপস্থিত থাকলেও কংগ্রেসে যোগ

দেন নি। ঐ কংগ্রেসেই সুভাষচন্দ্র আর জওহরলালকে সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়। এরপরই সুভাষচন্দ্র বাংলার জেলায় জেলায় ঘুরে কংগ্রেসের মতাদর্শ প্রচার করতে থাকেন। এই বক্তৃতাগুলোতে গান্ধীর প্রতি তার দ্বিধাহীন আনুগত্যই প্রকাশিত হয়েছিল। এর মধ্যে মার্চ মাসে হাওড়া কর্পোরেশন নির্বাচনে কংগ্রেস এই প্রথম জিততে পারল। কিন্তু ২ এপ্রিল কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচনে সুভাষচন্দ্র বিজয়কুমার বসুর কাছে হেরে গেলেন। কিন্তু তিনি দমলেন না, পুরোদমে তার কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন।

ঐ বছরই বাংলার আইনসভায় বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে সংশোধনী প্রস্তাব আনা হয়। পুরনো আইন অনুযায়ী কৃষক যদি তার জমি বিক্রি, দান, হস্তান্তর ইত্যাদি করত তাহলে জমিদারকে সেলামি দিতে হত। আইনসভায় মুসলমান সদস্যেরা এই সেলামি দেবার বিপক্ষে ছিল। তাদের বক্তব্য ছিল যেহেতু জমিদারেরা জমির কোন উন্নতি করে না, সেই জন্য তাদের কোন সেলামি দেওয়া হবে না। উল্টোদিকে সরকার আর কংগ্রেস শতকরা ২০ টাকা সেলামি দেবার পক্ষে মতপ্রকাশ করে। ইউরোপীয় সদস্যরা ছিল শতকরা ১০ টাকা সেলামি দেবার পক্ষে। আগের আইনের আর একটা ক্ষতিকর দিক ছিল যে জমি কেনাবেচার ক্ষেত্রে জমিদারকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল। ভোটাভুটির সময় দেখা গেল জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আর হেমেন্তকুমার সরকার ছাড়া কংগ্রেসের আর সব সদস্য জমিদারদের পক্ষে ভোট দিলেন। এই ঘটনার পর ক্ষুব্ধ ফজলুল হক কৃষক-প্রজা পার্টি স্থাপন করেন। জাতীয়তাবাদী নেতা মৌলানা আক্রাম খাঁন বিরক্ত হয়ে কংগ্রেস ছেড়ে কৃষক-প্রজা পার্টিতে যোগ দেন। এর পর কংগ্রেস যে দুর্বল হয়ে পড়ে অবিভক্ত বাংলায় কোনদিন আর শক্তি অর্জন করে উঠতে পারে নি। পরবর্তীকালে বাংলায় যে মুসলিম লীগ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল তার বীজও এই ঘটনার মধ্যেই অঙ্কুরিত হয়েছিল।

মাদ্রাজ কংগ্রেসে স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হলেও কংগ্রেস নেতৃত্ব তা মেনে নেয়নি। কংগ্রেস শেষ হবার পর গান্ধী বললেন যে এ প্রস্তাব তাড়াহুড়ো করে রচনা করা হয়েছে এবং এটা গ্রহণ করা হয়েছে পরিণামের কথা না ভেবেই। স্বাধীনতার প্রস্তাব থেকে অব্যাহতি পেতে কংগ্রেসের ছুতোর অভাব হল না। সাইমন কমিশনের জবাব হিসাবে মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে একটা কমিটি তৈরী করা হল পাল্টা সংবিধান তৈরী করার জন্যে। নেহেরু কমিটি বেশ কয়েকবার বৈঠক করে এক শাসনবিধি তৈরী করল। তার মূল বক্তব্য হল ভারতের শাসনতন্ত্রেব ভিত্তি হবে ডেমিনিয়ান স্টেটাস। অর্থাৎ ইংরেজদের অধীনে থেকে ভারতবাসীর স্বশাসন। এই কমিটিতে মতিলাল নেহেরু ছাড়াও নয়জন সদস্য ছিলেন। সুভাষচন্দ্র ছিলেন তার অন্যতম। রিপোর্টে একমাত্র এন এম যোশী ছাড়া সকলেই সই করেছিলেন। পুরো বছর জুড়ে সভায় সভায় পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলে সুভাষচন্দ্র দিব্যি নেহেরু রিপোর্টে সই করে দিলেন। ১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসে মতিলাল নেহেরুর সভাপতি হবার কথা। মতিলাল বললেন যদি তার রিপোর্ট কংগ্রেসে গৃহীত হয় তবেই তিনি সভাপতি হবেন। সুতরাং মতিলাল নেহেরুর কংগ্রেস সভাপতি হওয়ার অর্থই হচ্ছে মাদ্রাজ কংগ্রেসে গৃহীত স্বাধীনতা প্রস্তাবের অক্কা পাওয়া। তবু সুভাষচন্দ্র মতিলাল নেহেরুকে ১৮ জুলাই পাঠানো চিঠিতে লিখলেন—

আপনি যদি কোনো কারণে কংগ্রেস সভাপতি হইতে রাজী না হন, তাহা হইলে বাংলার মানুষেরা যে কি পরিমান হতাশ হইবে তাহা বুঝানো অসম্ভব।...........দেশের বর্তমান অবস্থা যেরূপ এবং ১৯২৯ সাল জাতির নিকট যেরূপ গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিবে

তাহার বিচারে আপনাকে ছাড়া আর কাহাকেও সভাপতিরূপে ভাবিতে পারি না। মতিলাল সভাপতি হতে চান নি কারণ তিনি জানতেন গান্ধীর ইচ্ছা ছিল জওহরলালকে সভাপতি করা। আর ঠিক হয়তো সেই কারণেই সুভাষচন্দ্র মতিলালকে সভাপতি হওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করেন।

কলকাতা কংগ্রেসে বিষয় নির্বাচনী সভায় সুভাষচন্দ্র ডোমিনিয়ান স্টেটাসের প্রস্তাব সমর্থন করলেন। স্বভাবতই যারা তাকে পূর্ণ স্বাধীনতার একনিষ্ঠ সমর্থক হিসাবে জানতেন তারা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন। সুধী প্রধান সুভাষচন্দ্রের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর একজন কর্মী ছিলেন। তাকে মাদ্রাজের প্রখ্যাত নেতা শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের কাজে সাহায্য করার জন্যে নিয়োগ করা হয়েছিল। শ্রী আয়েঙ্গার ছিলেন জওহর-সুভাষের গড়া ইন্ডিপেনডেন্স লীগের সভাপতি। সুধী প্রধান লিখেছেন——

বিষয় নির্বাচনী সভা থেকে ফিরে আসবার পর ওঁরা (শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার ও সত্যমূর্তি——লেখক) বেশ চিৎকার করেই আমাকে বললেন যে বাংলার কংগ্রেসীরাই পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব বানচাল করেছে। আমি ওঁদের বাসস্থান থেকে ফিরে পার্কসার্কাস ক্যাম্পে এসে সংবাদটি সুভাষচন্দ্রের গোচরে আনলাম। কিন্তু ইতিমধ্যে 'যুগান্তর' বিপ্লবী গোষ্ঠীর হরিকুমার চক্রবর্তী বিষয়টি বিপ্লবীদের নজরে এনেছেন এবং ঐ রাত্রেই বি পি সি সি-র মিটিং ডেকে সুভাষচন্দ্রকে রাজী করিয়েছেন পরের দিন প্রকাশ্য অধিবেশনে একটি সংশোধন প্রস্তাব আনার। *(সুভাষ চন্দ্র, ভারত ও অক্ষশক্তি)*

সে সময়কার আর একজন প্রত্যক্ষদর্শী যদুগোপাল মুখোপাধ্যায় তার লেখা 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি' বইতে এই ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। সুভাষচন্দ্রের আর একজন ঘনিষ্ঠ সহকারী নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তীও সেসময়ে সুভাষচন্দ্রের পাশেপাশেই থাকতেন। তার লেখায় দেখি——কংগ্রেসের আগের দিন। ওয়ার্কিং কমিটির সভা বসেছে। সভায় নেহেরু কনষ্টিটুশ্যান পেশ করা হল। পন্ডিত মতিলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ-শাসনতন্ত্র রচনা করা হয়েছিল। এবং এর মুখ্য আদর্শ ছিল ডোমিনিয়ন স্টেটাস। আর তারই জন্যে ইংরেজের কাছে আবেদন। কমিটির অন্যান্য সভ্যের সঙ্গে সেদিন সুভাষচন্দ্রও নেহেরু কমিটির রিপোর্টে সই করেছিলেন।

সভাশেষে নেতা ফিরে এলেন নিজের শিবিরে। অগুনতি সহকর্মী সেখানে অপেক্ষা করছিল তুমুল আলোচনা হল। বিচার হল প্রস্তাবের। *(নেতাজী : সঙ্গ ও প্রসঙ্গ, ১ম খণ্ড)* কিন্তু সুভাষ বাংলার কংগ্রেস কর্মীদের মতের বিরুদ্ধে যেতে পারলেন না। বিশেষতঃ যতীন্দ্রমোহনের সাথে তার টক্কর তখনও অব্যাহত ছিল। সুতরাং কংগ্রেস কর্মীদের দাবীর কাছে তাকে মাথা নোয়াতেই হল।

গভীর রাত্রি। প্রত্যুষের বাকি নেই। বাঙলার নেতা সুভাষ উঠে দাঁড়ালেন, সহকর্মীদের সম্মুখে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করলেন নিজের ভুল। ঢাকবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করলেন না নিজের দুর্বলতা।

জীবনের এই প্রথম হয়তো মোহ জেগেছিল, ক্ষণিকের মোহ। বৃহৎ আর মহৎ নেতৃত্বের সম্মুখে হয়তো সেদিন দ্বিধাও দেখা গিয়েছিল। কিন্তু সকল দ্বিধা, বাধা আর দুর্বলতা কাটিয়ে স্বরূপ প্রকাশ পেতে সময়ও লাগল না একটু। কণ্ঠ কাঁপল না, চরণ টলল না। *(নেতাজী : সঙ্গ ও প্রসঙ্গ——১ম খণ্ড)।*

দলীয় কর্মীদের চাপে সুভাষচন্দ্র অবস্থান পাল্টালেন। পরের দিন কংগ্রেস অধিবেশনে

তিনি সংশোধনী প্রস্তাব এনে পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখলেন। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এ-হেন মতবদল দেখে গান্ধী স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। ক্ষুব্ধ গান্ধী তার ভাষণে বললেন——স্বাধীনতা স্বাধীনতা বলে চিৎকার করলেই স্বাধীনতা মেলে না। যারা নিজেদের পিতামাতা, ভাইবোন, দলীয় নেতাদের বিশ্বাস করতে পারে না, যারা চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে নিজেদের কথায় এক থাকতে পারে না (তারা) স্বাধীনতার কথা বোলো না। *(ইন্ডিয়ান কোয়ার্টারলি রেজিস্টার ১৯২৮, Vol. III)*

কলকাতা কংগ্রেসে সুভাষ পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে বক্তব্য রেখেছিলেন এ কথা সব সুভাষ-জীবনীকারই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এর পেছনের নেপথ্য কাহিনী সকলেই ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে গেছেন। রাষ্ট্রীয় নেতাদের জীবনকাহিনী যদি জনসাধারণের কাছে তুলে ধরাটা জাতীয় কর্তব্য হয় তাহলে তথ্য গোপন করাটাও তাহলে জাতির বিরুদ্ধে অপরাধ বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। যাইহোক ভোটে সুভাষচন্দ্রের সংশোধনী পরাজিত হল। জওহরলাল সংশোধনীর সপক্ষে বক্তৃতা দিলেও ভোটের সময় গা-ঢাকা দিলেন।

কলকাতা কংগ্রেসে আর একটা ব্যাপার যা দেখে বাংলার দর্শক খুব পুলকিত হয়েছিল তা হল সুভাষচন্দ্রের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। তাদের পোশাক-আশাকে খানিকটা সামরিক ঢং আনার চেষ্টা করা হয়েছিল। সামরিক কায়দায় এক-একজনকে মেজর, ক্যাপ্টেন ইত্যাদি পদও দেওয়া হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র স্বয়ং হলেন জি ও সি, জেনারেল অফিসার কমান্ডিং। ফরওয়ার্ড পত্রিকার কভারে তার সামরিক (!) বেশে ছবিও ছাপা হল। স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে আবার অশ্বারোহী বাহিনী ছিল। কংগ্রেস সভপতি মতিলাল নেহেরুকে নিয়ে আড়ম্বরপূর্ণ শোভাযাত্রা হয়েছিল। "রাঙাকাকাবাবু সামরিক পোশাকে একটি মোটরগাড়ির উপর দাঁড়িয়ে বেটন হাতে শোভাযাত্রা পরিচালনা করেছিলেন। সে এক অবিস্মরনীয় দৃশ্য——" *(শিশিরকুমার বসু——বসু-বাড়ী)*। গান্ধী অবশ্য এই বাহিনীকে ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন 'পার্কসার্কাসের ফিলিপস সার্কাস'। কিন্তু এত সাজগোছ, এত আয়োজন, তার উপযুক্ত কাজ মেলে কই। কাজ মিলল অবশেষে। বিশ হাজার শ্রমিকের (যাদের মধ্যে বেশিরভাগই বন্ধ চটকলের শ্রমিক) এক দৃপ্ত মিছিল কংগ্রেস অধিবেশনে যেতে চাইল। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী বেটন হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। অনেক শ্রমিক রক্তাক্ত হল। কিন্তু মিছিল বাধা মানল না। দৃঢ় পায়ে এগিয়ে গেল প্যান্ডেলের দিকে। অবস্থা বেগতিক দেখে সভাপতি মতিলাল শ্রমিকদের অধিবেশনস্থলে আসতে অনুমতি দিলেন। শ্রমিকদের দাবী ছিল কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব নিক। কংগ্রেস নেতারা তাদের প্রবোধ দিয়ে গরম গরম বক্তৃতা দিলেন। শ্রমিকেরা শান্তিপূর্ণভাবে ফিরে গেলেন।

কোন কোন লেখক (সুভাষচন্দ্র প্রসঙ্গে——তরুণ রায়, অনীক পঁচিশ বছর, প্রবন্ধ সংকলন) এই ঘটনাটাকে নস্যাৎ করে দিতে চেয়েছেন। ১৯৭১ এর ২০ মার্চ দেশব্রতী পত্রিকায় 'সুভাষ বোস প্রসঙ্গে' সরোজ দত্তের বক্তব্যের বিরোধিতা করতে গিয়ে শ্রীরায় 'লাঠি চালানোর কোন লিখিত প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না' বলে লিখেছেন। সরোজ দত্ত এই ঘটনার রেফারেন্স হিসেবে মুজফফর আহমেদের বিবরণের কথা লিখেছিলেন। অনীক পত্রিকার লেখক মুজফফর আহমেদের 'আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি' বইটার উল্লেখ করে লিখেছেন যে এতে লাঠি চালানোর কথা নেই। কিন্তু তিনি আর একটু যত্নশীল হলেই দেখতে পেতেন যে মুজফফর আহমেদের 'সমকালের কথা' বইতে এই লাঠি চালনার কথা স্পষ্টভাবে বিবৃত করা আছে। আর একজন সুপরিচিত নেতা সরোজ মুখোপাধ্যায় কলকাতা কংগ্রেসে ছিলেন একজন কংগ্রেস ডেলিগেট। তার লেখা 'ভারতের

কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা' বইটাতে লাঠির আঘাতে শ্রমিকদের রক্তাক্ত হওয়ার ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ আছে। যাইহোক, কোন রাজনৈতিক মিছিলের উপর কোন রাজনৈতিক দলের আক্রমণের ঘটনা ভারতবর্ষে এই প্রথম। এখন এরকম ব্যাপার আখছারই দেখতে পাওয়া যায়। এসবের হাতেখড়ি ১৯২৮ সালে গড়া সুভাষ-বাহিনীর এই কীর্তিটি।

কলকাতা কংগ্রেসে গান্ধীর কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা হারাবার পর সুভাষচন্দ্র বাংলায় নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করার দিকে মন দিলেন। কারণ বাংলার গান্ধীবাদীদের কাছে হটে যাওয়ার বেশ বড় রকমের সম্ভাবনা দেখা দিল। তিনি গোটা বাংলাদেশ ঘুরে ঘুরে বিদেশী পণ্য বয়কট আর স্বদেশী প্রচার করতে লাগলেন। এর সাথে ছিল জেলায় জেলায় নিজের গোষ্ঠীকে সংহত করা। উল্টোদিকে সেনগুপ্ত গোষ্ঠীও চুপচাপ ছিল না। ফলে এক একটা জেলায় একাধিক সমাবেশ হতে থাকল। দুই গোষ্ঠীর পরস্পরের বিরুদ্ধে খবরের কাগজে বিবৃতির লড়াইও কম হল না। লড়াই কতটা প্রকট ছিল তা বোঝার জন্যে একটা জেলা যুব সম্মেলনে সুভাষ বসুর বক্তৃতার একটু নমুনা দিই—

এখানে দলাদলি সৃষ্টি হয় বিভিন্ন ব্যক্তিকে আশ্রয় করে। নতুন পুরাতন দাদার গন্ডি ক্রমে ক্রমে বেড়েই চলেছে; এবং একই শক্তি পরস্পর-বিরোধী আবর্তের সৃষ্টি করেছে। মুখে এদের দেশোদ্ধারের বড়ো বড়ো বুলি। কিন্তু কাজে দেখতে পাই, এদের দেশের কাজ মানে পরস্পরের কুৎসা রটানো ও পরস্পরের শত্রুতা সাধন।.........হাওড়ার কোনো C. I. D officer কে বলতে শুনেছি, "যদি আর দুই-চারটে conference হাওড়ায় হয়, তবে আর আমাদের কাজ থাকে না।" *(হাওড়া যুব সম্মেলনে পঠিত ভাষণ)*

এই গোষ্ঠী লাড়াই-এ সুভাষচন্দ্র বাসন্তীদেবীর সমর্থন চাইলেন। ১৬ জুলাই ১৯২৯ বাসন্তীদেবীকে একটা চিঠিতে লিখলেন—

মা, আজ আমাকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করিও। আমি জানি, তোমার আশীর্বাদ দিবানিশি অযাচিতভাবে আমার উপর বর্ষিত হইতেছে; তথাপি আমি বলিতেছি, আজিকার দিনটা আশীর্বাদ করিও; এ আশীর্বাদের আর একটা অর্থ আছে। 'আর একটা অর্থটা কি—অনুচ্চারিত থাকলেও বুঝতে অসুবিধা হয় না। সামান্য ভোটের ব্যবধানে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে হারিয়ে সুভাষচন্দ্র সভাপতি হলেন। বাংলা কংগ্রেসের ত্রিমুকুটের দুটি, বঙ্গীয় আইনসভার দলনেতা আর প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষচন্দ্রের করায়ত্ব হল। বাকি রইল কলকাতার মেয়রের পদ। সেটার জন্যে তাকে আরও দশ মাস অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে জাল ভোট আর কারচুপির অভিযোগ আনা হয়েছিল। এ আই সি সি থেকে মতিলাল নেহেরুকে বাংলায় পাঠানো হল তদন্ত করার জন্যে। যদিও মতিলালের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সম্পর্ক অত্যন্ত ভালো ছিল, তবু সুভাষের ভয় ছিল যে তার নির্বাচন বাতিল হয়ে যাবে। বাসন্তীদেবীকে লেখেন—

এখন আমাদের dispute পন্ডিত মতিলালের হাতে। যদিও আমরা elecction-এ অন্যায় কিছু করিনি। তবুও কেন যেন আশঙ্কা হচ্ছে যে পন্ডিতজী সেনগুপ্তকে সমর্থন করে, Sylhet-এর B. P. C. C.-র এবং A. I. C. C.-র নির্বাচন নাকচ করবেন। *(৯ ডিসেম্বর ১৯২৯-এ লেখা চিঠি)*

না, মতিলাল নেহেরু এক্ষেত্রে সেনগুপ্তকে সমর্থন করেন নি। সুভাষচন্দ্র প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি থাকলেন।

বঙ্গীয় কংগ্রেসে বিরোধ তীব্র

কলকাতা কংগ্রেসে স্বাধীনতার প্রস্তাব ভোটে পরাজিত হলেও ফলাফল ছিল ১৩৫০-৯৭৩। তার মানে স্বাধীনতার পক্ষে বেশ বড় একটা জনমত ছিল। তার উপর শ্রমিক, ছাত্র, যুবকদের আশা-আকাঙ্খাকে কংগ্রেস আর উপেক্ষা করতে পারছিল না। এরপর থেকে ভারতীয় শিল্পপতিরাও যে ধীরে ধীরে ইংরেজ থেকে আলাদা হতে চাইছিল তা আমরা পরে দেখাব (গান্ধী-সুভাষ বিরোধ কোথায়—পরিচ্ছেদে)। তাই গান্ধী নিতান্ত বাধ্য হয়েই ঘোষণা করলেন যে ১৯২৯ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে বৃটিশ শাসকেরা যদি স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে ইতিবাচক সাড়া না দেয় তাহলে তিনি 'ইন্ডিপেনডেন্সওয়ালা' হয়ে যাবেন। গান্ধীর ঘোষণায় দেশজুড়ে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। আর গান্ধী মন দিলেন অন্যতম ইন্ডিপেনডেন্সওয়ালা জওহরলালকে ট্যাঁকে গুঁজতে। সত্যিই লাহোর কংগ্রেসে স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হল। প্রস্তাবক আর যে সে কেউ নন—স্বয়ং মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে কি এমন ঘটনা ঘটল যার ফলে গান্ধী পর্যন্ত ভোল পালটে স্বাধীনতার দাবী তুললেন!

১৯২৯ এর ৮ এপ্রিল হিন্দুস্থান সোশালিস্ট রিপাবলিকান আর্মি'র সদস্য ভগৎ সিং এবং বটুকেশ্বর দত্ত দিল্লীতে আইনসভা চলাকালীন সেখানে বোমা মেরে ধরা পড়েন। শুধু ধরা পড়া নয়, তারপর পুলিশ হেপাজতে বন্দী থাকাকালীন এবং বিচারের সময় তাদের আপসহীন নির্ভীক আচরণ দেশের মানুষের কাছে এক উজ্জ্বল আদর্শ হিসাবে দেখা দেয়। সন্ত্রাসবাদী বলে চিহ্নিত করা হলেও এরা ছিলেন মূলত সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী, বরং সমাজতন্ত্রবাদী। বিচার চলাকালীন ভগৎ সিং ঘোষণা করেছিলেন যে তার কাছে বিপ্লব মানে বোমা পিস্তলের অর্চনা করা নয়। বরং বিপ্লব বলতে তিনি বোঝেন সমাজের সর্বাত্মক পরিবর্তন, যার পরিণাম হবে বিদেশী ও ভারতীয় দুই পুঁজিবাদেরই উৎখাত ও সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা। ফাঁসীর জন্য অপেক্ষারত এই তরুণ সে যুগের সন্ত্রাসবাদীদের মত জেলে বসে একমনে গীতাপাঠ বা ঈশ্বর উপাসনায় মন দিলেন না, জেলে বসে লিখলেন যুক্তিনিষ্ঠ নাড়া দেওয়া এক বিশ্লেষণী প্রবন্ধ 'কেন আমি নাস্তিক'। তার বাবা অজিত সিং যিনি নিজে ছিলেন একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী, যখন বড়লাটের কাছে ছেলের প্রাণভিক্ষা করে এক আবেদনপত্র লিখলেন তা জানতে পেরে ভগৎ সিং নিজের বাবাকে তিরস্কার করে এক চিঠি লিখলেন। এইসব ঘটনা ভারতবাসীকে একটা ঝাঁকুনি দিল।

এই লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা চলার সময় বন্দীরা সকল বিচারাধীন বন্দীদের ন্যায্য অধিকার নিয়ে জেলখানায় অনশন ধর্মঘট করলেন। এদের অন্যতম ছিলেন যতীন্দ্রনাথ দাস। এই অনশন ধর্মঘটের প্রভাব গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। বৃটিশ শাসকেরা ধর্মঘটীদের সাথে ভালো ব্যবহার করলেও সমস্ত বিচারাধীন বন্দীদের ক্ষেত্রে তাদের দাবী মানল না। স্বাস্থ্যের কারণে একে একে সকলে ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নিলেও যতীন দাস তা করলেন না। টানা দীর্ঘ ৬৪ দিন বীরত্বপূর্ণ অনশনের পর তিনি শহীদ হলেন। এত বড় একটা ঘটনাতেও কংগ্রেস নেতৃত্ব বিন্দুমাত্র আলোড়িত হল না। মহাত্মার এক ভক্ত যিনি শহীদের বন্ধু ছিলেন এই ঘটনার বিষয়ে তাঁর নীরবতার কারণ জানতে চেয়ে তাঁকেও একটি চিঠি দেন। মহাত্মা এই মর্মে উত্তর দেন যে, মন্তব্য প্রকাশ করা থেকে তিনি ইচ্ছে করেই বিরত রয়েছেন, কারণ মন্তব্য প্রকাশ করতে হলে, বিরুদ্ধ মন্তব্য করতে তিনি বাধ্য হতেন (*সুভাষচন্দ্র বসু— দ্য ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল*)। প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেস নেতৃত্ব জানতেনই না যে

জেলে সন্ত্রাসবাদী বা কমিউনিস্ট বন্দীদের প্রতি কি রকম ব্যবহার করা হয়। জেলে কংগ্রেস নেতারা আক্ষরিক অর্থেই জামাই-আদরে থাকতেন। একটু নমুনা দিই——

সেনগুপ্তের কাছে গেলাম। শুয়ে ছিলেন আরাম-চেয়ারে। বারান্দায়। হাতে একখানা ডিটেকটিভ উপন্যাস। লাফিয়ে উঠলেন চেয়ার থেকে। হাত ধরে বসালেন পাশের চেয়ারে। উচ্ছ্বসিত হাসি আর কথা ছিটকে পড়ল চারদিকে। ঠোঁটে-চাপা চুরুটের শেষটুকু বাইরে ছুড়ে দিয়ে বলে উঠলেন—— " এত দেরি করে এলেন যে বড়?"

যেন আসাটা আমার ইচ্ছাধীন, আর দেরি হওয়াটাও আমার গাফিলতি। জিজ্ঞেস করে বসলেন ——" কী খাবেন বলুন?"

"খাবো! এখন? কিন্তু—— " কে শোনে আমার কথা।

টেনে বার করলেন বাক্স থেকে একটা আইসক্রীম সোডা। (*নেতাজী : সঙ্গ ও প্রসঙ্গ, ১ম খন্ড*) এ-সব সংলাপ যেন কোন জমিদার বাগানবাড়ীতে বসে তার বন্ধুর সাথে কথা বলছে। কিন্তু অবাক হবেন না——এর ঘটনাস্থল অত্যাচরী, ভয়ংকর, নির্মম ইত্যাদি বৃটিশ জেল। আর গান্ধী, জওহরলাল, সুভাষচন্দ্রের মত নেতাদের তো কথাই নেই। একাধিক ফালতু (স্বল্প সাজাপ্রাপ্ত আসামী) এদের কাছে চাকরের কাজ করত। সুভাষচন্দ্রের ফালতুকে তার পা-গা টিপে দিতে হত।

যতীন্দ্রনাথ দাস আগে সুভাষচন্দ্রের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে ছিলেন। সুভাষচন্দ্র এই মৃত্যুকে অন্যসব নেতার মত অবহেলা করেন নি। অনশনের সময় প্রতিবাদ করেছিলেন। যতীন দাসের মৃত্যুর পর তার মরদেহ নিয়ে তিনি কলকাতায় এক বিশাল মিছিল বার করলেন। নানা জায়গায় সভাও করলেন। এ আন্দোলনের সূবাদে পাঞ্জাবে গিয়েও কয়েকটি সভায় বক্তৃতা করেছিলেন।

১৯২৯ সালের অরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা——মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা। এই সময়ে মূলত কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে বোম্বের সুতাকল শ্রমিকেরা এক বীরত্বপূর্ণ ধর্মঘট করে যাচ্ছিল। মালিকেরা পোষা দালাল আর গুন্ডা ব্যবহার করেও যখন এ ধর্মঘট ভাঙতে পারল না তখন বৃটিশ পুলিশ নেতাদের গ্রেপ্তার করল। তাদের বিচার করবার জন্যে মীরাটে নিয়ে যাওয়া হল কারণ, সেখানে আন্দোলন হওয়ার ভয় কম ছিল। এছাড়া মীরাটের আদালতে কোনও জুরীর ব্যবস্থা ছিল না। নেতারা বন্দী হলেও সংগ্রাম থেমে থাকল না।

এই সব দমন পীড়নের মধ্যে বড়লাট আরউইন কংগ্রেস আর অন্যান্য ধনিক শ্রেণীর দলগুলোর নেতাদের কাছে ছোট একটা টোপ দিলেন। বললেন যে বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে তিনি দায়িত্ব পেয়েই জানাচ্ছেন যে ১৯১৭ সালের ঘোষণার মধ্যেই যা নিহিত রয়েছে——ভারতের শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতির স্বাভাবিক পরিণতি হল স্বায়ত্ত শাসন লাভ। আর সাইমন কমিশনের সুপারিশমত লন্ডনে একটা গোল-টেবিল বৈঠক হবে। এতেই কংগ্রেসের মহারথীরা আহ্লাদে আটখানা। কোথায় রইল স্বাধীনতার প্রস্তাব, কংগ্রেস এক ইস্তেহার লিখে আরউইন প্রস্তাবকে স্বাগত জানালেন। প্রমুখ সব নেতাই তাতে সই করলেন। সুভাষচন্দ্র তাতে সই তো করলেনই না উল্টে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পদত্যাগ করলেন। তিনি, পাঞ্জাবের সৈফুদ্দিন কিচলু আর পাটনার আব্দুল বারি মিলে গোল-টেবিল বৈঠকে বসার বিরোধিতা করে পাল্টা ইস্তাহার প্রকাশ করলেন। জওহরলালও প্রথমে নেতাদের চাপে কংগ্রেসের প্রস্তাবে সই করলেও পরে এর প্রতিবাদে ওয়ার্কিং

কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন। গান্ধী আর মতিলাল বুঝিয়ে সুজিয়ে সুভাষচন্দ্র এবং জওহরলালকে পদত্যাগ প্রত্যাহার করালেন। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যে সুভাষচন্দ্র আবার পদত্যাগপত্র পেশ করলেন। এবারকার অভিযোগ——কিছুদিন পরেই যে লাহোর কংগ্রেস অধিবেশন, সেখানে বাংলা থেকে তার অনুগামীদের প্রতিনিধি করা হচ্ছে না। এবারেও তাকে বুঝিয়ে নিরস্ত করা হল। ডিসেম্বরের লাহোর কংগ্রেসে আর অত-সব ঝামেলার দরকার হল না। গান্ধীর ইচ্ছায় সুভাষ আর আয়েঙ্গারকে ওয়ার্কিং কমিটি থেকে ছেঁটে বাদ দিয়ে দেওয়া হল। আর গান্ধী হাতে ধরে রাষ্ট্রপতির সিংহাসনে বসালেন (তখন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট পদকে রাষ্ট্রপতি বলা হত) সুভাষচন্দ্র যার সাথে গাঁটছড়া বেঁধে গান্ধীর বিকল্প নেতৃত্ব গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন সেই জওহরলালকে। লাহোর কংগ্রেসের হীরো গান্ধীই। একদিকে তিনি ভারতের রাজনীতির আকাশে দুই উদীয়মান তারাকে একসাথে মিলতে না দিয়ে একটাকে পকেটে পুরে নিলেন, অন্যদিকে স্বয়ং স্বাধীনতার প্রস্তাব তুলে বিপ্লবী সাজলেন।

তার প্রতি কংগ্রেস নেতৃত্বের এ-হেন অন্যায় সুভাষচন্দ্রকে মুখবুজে হজম করে নিতে হল। লাহোর কংগ্রেস থেকে ফিরে বাংলায় তিনি কোন বিকল্প আন্দোলন গড়ে তুললেন না। তার ভাষায়—— ' মতভেদ হইয়াছে সত্য, কিন্তু সেই মতভেদ কার্যক্ষেত্রে নয়। কংগ্রেসের নির্দিষ্ট কার্যতালিকা অনুসারে কাজ করিতে হইবে।' বরং বাংলা কংগ্রেসে তার দৃঢ় নেতৃত্ব স্থাপনে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করলেন। কারণ নতুন ওয়ার্কিং কমিটিতে তিনি নিজে বাদ পড়লেও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত তাতে ছিলেন। এতে বাংলার গোষ্ঠী রাজনীতিতে সেনগুপ্ত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। যাইহোক, এর মধ্যেই ব্যাপক ধর-পাকড় শুরু হয়ে গেল। সুভাষচন্দ্র, সেনগুপ্ত সমেত দুই গোষ্ঠীর নেতারাই গ্রেফতার হলেন।

এদিকে গান্ধী ভারতবর্ষে জনতার আকাঙ্খার চাপে লাহোর কংগ্রেসে স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করলেও সে ফাঁস গলা থেকে তড়িঘড়ি খুলতে উদ্যোগী হলেন। ১৯৩০এর ৩০ জানুয়ারী তার ইয়ং ইন্ডিয়া পত্রিকায় এক বিবৃতিতে এগারো দফা দাবী সম্বলিত এক দাবীপত্র প্রকাশ করলেন। একে তিনি 'স্বাধীনতার সারমর্ম' (Substance of Independence) বলে চিহ্নিত করলেন। অথচ এই দাবীগুলোর মধ্যে স্বাধীনতা তো দূরস্থান ডোমিনিয়ন স্টাটাসের কথাও ছিল না। শুধু তাই নয় ২ মার্চ গান্ধী বড়লাট আরউইনকে যে চিঠি দেন তাতে তিনি বড়লাটকে আশ্বস্ত করে লেখেন——"স্বাধীনতা প্রস্তাব আপনার দেওয়া ডোমিনিয়ন স্টাটাস প্রস্তাবের পক্ষে বিপজ্জনক কিছু নয়। কারণ দায়িত্বপূর্ণ বৃটিশ কূটনীতিকরা তো বলেছেনই ডোমিনিয়ন স্টাটাস কার্যত স্বাধীনতাই।" কিন্তু বৃটিশ সরকার গান্ধীর দাবীতে কোনও কর্ণপাত করল না। বাধ্য হয়ে গান্ধী দেশজুড়ে আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দিলেন। গান্ধীর বিরুদ্ধে প্রবল অভিযোগ ছিল যে তিনি হিংসার ধূয়ো তুলে আন্দোলন থামিয়ে দেন। তাই তিনি এবার আগেই বলে রাখলেন হিংসাত্মক শক্তিগুলোকে সংযত রাখার সম্ভাব্য সব রকম চেষ্টা করা হবে, তথাপি এবার আইন অমান্য শুরু হলে একজন অমান্যকারীও সুস্থ বা জীবিত থাকলেও তা বন্ধ করা হবে না। বহু প্রচারিত ডান্ডী অভিযানের মধ্যে দিয়ে আইন অমান্য শুরু হল। সারা দেশে এক অভূতপূর্ব উন্মাদনা দেখা দিল। এমনকি দূর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাঠানরাও আব্দুল গফফর খাঁনের নেতৃত্বে বিরাট সংখ্যায় আইন অমান্য অহিংস আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল।

এই দেশজোড়া আইন অমান্য আন্দোলনের মধ্যেই সেপ্টেম্বর মাসে সুভাষচন্দ্র জেল থেকে ছাড়া পেলেন। কিন্তু বাংলার কংগ্রেস কর্মীদের তখন আন্দোলনে মনোনিবেশ করার

সময় নেই। কলিকাতা মেয়র নির্বাচনে সেনগুপ্ত-সুভাষচন্দ্র মুখোমুখি। শেষ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্র জয়ী হলেন। কিন্তু গোষ্ঠীকোন্দল থামল না। সদ্যমুক্ত মতিলাল নেহেরু এলেন বিবাদ মেটাতে। সারা দেশে কংগ্রেস যখন আইন অমান্য আন্দোলন করছে, বাংলায় কংগ্রেস তখন নিজেদের মধ্যে মারামারি করছে। এই সময়ের কথা বলতে গিয়ে সুভাষচন্দ্র ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল বইতে লিখেছেন——

আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হলে বাংলায় ঐ আন্দোলন চালাবার জন্য জন্ম হল দুটি কমিটির। কয়েক মাস পর যখন কলকাতার মেয়র নির্বাচনের সময় এলো তখন একটি দল বিদায়ী মেয়র স্বর্গত শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তকে দাঁড় করালো এবং অন্য দলটির পক্ষ থেকে দাঁড় করানো হল লেখককে এবং আমারই জয় হল। এই সব বিরোধের ফলে কংগ্রেসের মর্যাদা অনেক হ্রাস পেয়েছিল।

সুভাষচন্দ্র দু'চারটে কথায় বিবরণ দিলেও এই কোন্দলে বিবৃতির লড়াই, পাল্টা সভা থেকে হাতাহাতি কোনটাই বাদ পড়ে নি। এবং দুটো গোষ্ঠীই এতে সমান কৃতিত্ব দেখিয়েছিল। তবে ১৯২৭ সাল থেকে এই গোষ্ঠী লড়াইয়ে সেনগুপ্ত তার থেকে অধিক কৌশলী সুভাষের কাছে বরাবরই হার মেনেছেন। এবং এই গোষ্ঠী কোন্দল কোন সময়ই কোনও আদর্শের ভিত্তিতে ছিল না—— ছিল ক্ষমতা দখলের দ্বন্দ্ব। অথচ সুভাষচন্দ্র যা করেছেন সবই আদর্শের জন্য আর বিরোধীপক্ষরা ছিল ক্ষমতালোভী এরকম ভাবেই চিহ্নিত করা হয়েছে। মেয়র হবার পর এলবার্ট হলে বঙ্গীয় জনসংঘ আয়োজিত এক সভায় সুভাষচন্দ্র সেনগুপ্ত সম্পর্কে বললেন——

কিন্তু সভাপতিপদে (তিনি নিজে তখন সভাপতি——লেখক) যিনিই বসুন না কেন দলীয় শৃঙ্খলা তাহাকে বজায় রাখিতেই হইবে। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যিনিই বিদ্রোহ ঘোষনা করিবেন তিনি যত জনপ্রিয় বা খ্যাতনামা হোন-না কেন কঠোর ভাবে তাঁহাকে দমন করিতেই হইবে। হায়, তখন কি তিনি জানতেন যে কয়েক বছর পরে এই কথাগুলো তার দিকেই ফিরে আসবে!

মেয়র হয়ে সুভাষচন্দ্র বেশী দিন জেলের বাইরে থাকতে পারলেন না। সে সময় গান্ধী, জওহরলাল, প্যাটেল প্রমুখ সব কংগ্রেস নেতাই জেলে। ১৯৩১ এর ২৬ জানুয়ারী কংগ্রেসের ডাকা স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের মধ্যে দিয়ে আইন অমান্য করে সুভাষচন্দ্রসহ বাংলার প্রায় সব নেতারাই জেলে গেলেন। কিন্তু জেলে বেশী দিন থাকতে হল না। এরমধ্যে গান্ধী বড়লাটের সাথে এক চুক্তি করে ফেলেছেন যেটা গান্ধী-আরউইন প্যাক্ট নামে বিখ্যাত। এই চুক্তির ফলে গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন। বদলে মিলল কংগ্রেসকে নিয়ে একটা গোল-টেবিল বৈঠক করার আশ্বাস, বিলাতী পণ্যের দোকানে পিকেটিং করার অধিকার, রাজবন্দীদের মুক্তি। তবে কেবলমাত্র কংগ্রেসীরাই মুক্তি পেল। না সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে ধৃত বন্দী, না মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় ধৃত কমিউনিস্টরা——এদের মুক্তি মিলল না। গান্ধী-আরউইন প্যাক্ট হল ৮ মার্চ। ঐ দিনই সুভাষ জেল থেকে ছাড়া পেলেন।

সুভাষচন্দ্র গান্ধী-আরউইন প্যাক্টকে সমর্থন করেন নি। জেলমুক্ত হয়ে তিনি কয়েকটি সভায় খোলাখুলি বললেনও। সন্ত্রাসবাদী এবং শ্রমিকনেতা যারা বন্দী হয়ে আছেন তাদের মুক্তির দাবীও তুললেন। এদিকে আর কয়েক দিন পরেই করাচীতে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন। তাতে যোগ দেবার আগে গান্ধীর সাথে একটা সমঝোতায় আসার জন্যে তিনি বোম্বাই রওনা হলেন। সেখানে গান্ধীর সাথে খোলাখুলি আলোচনাও হল। এর পর

গান্ধীর সাথে ট্রেনে রওনা হলেন করাচীর পথে। দুজনের এই ট্রেনভ্রমণ সুভাষের পক্ষে বেশ দূরপ্রসারী হয়েছিল। প্রথমতঃ এই একসাথে যাত্রার মধ্যে দিয়ে সুভাষ গান্ধীর জনপ্রিয়তা এবং জনসাধারণের মধ্যে তার প্রভাব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হলেন। দ্বিতীয়তঃ দীর্ঘ সময় একসাথে থাকায় দুজনের মধ্যে একটা সুসম্পর্ক এবং বোঝাপড়া তৈরী হল। বস্তুতপক্ষে ১৯৩৮ সালে সুভাষচন্দ্রের কংগ্রেস সভাপতি হবার ভিত্তিভূমি তৈরী হয়েছিল এখান থেকেই।

করাচী কংগ্রেসের ঠিক আগে বৃটিশ সরকার ভগৎ সিংকে ফাঁসী দিল। এই ঘটনা সারা ভারতবর্ষকে শোকে ক্ষোভে স্তম্ভিত করে দিল। কিন্তু এর আঁচ করাচী কংগ্রেসে লাগল না। সামান্য একটা শোকপ্রস্তাব নিয়ে ব্যাপারটার ইতি করে দেওয়া হল। সাথে অবশ্য হিংসাত্মক সব কাজকর্মকে নিন্দাও করা হল। গান্ধীর সাথে সুভাষের এক অলিখিত চুক্তি হয়ে গিয়েছিল। ঠিক হল কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি গান্ধীর অনুগত থাকবেন, অন্যত্র তিনি বিপক্ষে মত প্রচার করে জনমত গঠন করতে পারবেন। তাই হল——করাচী কংগ্রেসে গান্ধীকে পুরোপুরি সমর্থন করে অন্যত্র ভাষার তুবড়ি ছোটালেন। জওহরলালের কথা তো বলাই বাহুল্য। এই কংগ্রেসে গান্ধী-আরউইন চুক্তি অনুমোদন করা হল। প্রস্তাবিত গোল-টেবিল বৈঠকে কংগ্রেস যোগ দেবে ঠিক হল। আর একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার যে সদ্য নির্বাচিত সভাপতি বল্লভভাই প্যাটেল আগের কংগ্রেসের স্বাধীনতা প্রস্তাব থেকে সরে এসে তার বক্তৃতায় আবার সেই স্বায়ত্তশাসনের দাবীই জানালেন। চুক্তিমত সুভাষ সবই মুখ বুজে মেনে নিলেন। আবার করাচী কংগ্রেস থেকে ফিরে পরবর্তী ভাষণগুলোতে তিনি কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবগুলোর তীব্র নিন্দা শুরু করলেন। কংগ্রেস অধিবেশনে কেন তিনি তা সমর্থন করেছিলেন, তার পক্ষে যে যুক্তিগুলো খাড়া করলেন তা সত্যিই অদ্ভুত——

করাচীতে বামপন্থীদের সম্মুখে তিনটি পথ খোলা ছিল। প্রথমত, তাহার খোলাখুলিভাবে চুক্তি-প্রস্তাবের বিরোধিতা করিতে পারিত এবং সফলও হইত; দ্বিতীয়ত, চুক্তি-প্রস্তাব বাতিল করিতে সচেষ্ট হইয়া বিফল হইতে পারিত; তৃতীয়ত, সরাসরি বিরোধিতা হইতে বিরত থাকিতে পারিত। চুক্তি সমর্থনের প্রশ্নে তাহারা কংগ্রেসকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া সপক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা সংগ্রহ করিতে পারিলে, তাহা নেতৃত্বের প্রতি অনাস্থার সামিল হইয়া তাহাদের পদত্যাগে বাধ্য করিত। সমর্থন-প্রস্তাব কংগ্রেসে বাতিল হইলে, আইন-অমান্য আন্দোলন পুনরুজ্জীবিত করিবার দায়িত্ব তাহাদের উপর বর্তাইত। কংগ্রেসের দ্বিধাবিভক্তির এবং সংগ্রাম হইতে নেতৃবৃন্দের সরিয়া যাইবার পর তাহাদের বিপদসংকুল অবস্থায় পড়িতে হইত। এই পদ গ্রহণ করিয়া তাঁহারা চূড়ান্ত স্ববিরোধিতার সম্মুখীন হইতেন। *(১৬ এপ্রিল ১৯৩১ লাহোরের ব্র্যাডল হলে ছাত্রসভায় ভাষণ)।* তা গান্ধী-আরউইন চুক্তির বিরোধিতা করে জিতে গেলে না হয় এত বড় বিপদ হত, এই চুক্তির বিরোধিতা করে তা কংগ্রেসে গৃহীত না হলে (যে সম্ভাবনাই ছিল ষোল আনা) কি হত? সুভাষের সহজ উত্তর——

তাঁহাদের (সুভাষচন্দ্র সহ তথাকথিত বামপন্থীদের——লেখক) বিরোধিতা সত্ত্বেও চুক্তিটি অনুমোদিত হইতে পারিত। নিঃসন্দেহে তাহা মহাত্মা গান্ধী এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বিজয় হইলেও, সেই দ্বিধা-বিভক্তি কংগ্রেসকে দুর্বল করিয়া দিত। *(পূর্বোক্ত ভাষণ)*

তার মানে কংগ্রেসে কোন প্রস্তাবের বিপক্ষে পাল্টা প্রস্তাব দিলেই কংগ্রেস দুর্বল হয়ে যাবে। অথচ সুভাষচন্দ্র নিজে এর আগে তা করেছেন। কিন্তু এবার তিনি তা করলেন না, কারণ তার মতে বৃটিশ সরকার কংগ্রেসে ভাঙ্গন তৈরী করার জন্যে ভগৎ সিংকে ফাঁসী

দিয়েছে। তার উপর মতানৈক্য হলে তা ইংরেজদের ফাঁদে পা দেওয়া হত।

কংগ্রেস-সদস্যদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির মতলবেই যে কর্তৃপক্ষ এই ব্যবস্থা (ভগৎ সিং-এর ফাঁসি——লেখক) গ্রহণ করিয়াছিলেন অন্তদৃষ্টি সম্পন্নরাই তাহা অনুধাবন করিবেন। কিন্তু কংগ্রেসকে দ্বিধাবিভক্ত না করিয়া তাঁহারা (সুভাষচন্দ্ররা——লেখক) সপ্রমাণ করিয়াছেন যে সংগ্রামের মধ্যেও তাঁহারা ঐক্যবদ্ধ থাকিতে পারেন। *(ঐ একই ভাষণ)* সুতরাং কংগ্রেস অধিবেশনে নেতাদের প্রস্তাব চোখ বুজে মেনে নিয়ে অন্যত্র সভায় সভায় তার তীব্র নিন্দা করে সুভাষচন্দ্র নেতৃত্ব এবং জনসাধারণ সবার কাছেই ভাল থাকলেন। এর ফলও মিলল হাতে হাতে। জুন মাসে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় তিনি সদস্য না হয়েও আমন্ত্রণ পেলেন। তাছাড়া সুভাষ-সেনগুপ্ত বিরোধে ওয়ার্কিং কমিটি সুভাষের পাশে দাঁড়াল।

১৯৩০ থেকে ৩৪ সাল কংগ্রেসের জাতীয় নেতৃত্বের আপোসমুখী মনোভাব আর বঙ্গীয় নেতাদের ইংরেজ-বিরোধিতা শিকেয় তুলে নিজেদের মধ্যে কাদা ছোড়াছুড়ি বাংলায় যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে গভীর হতাশার সৃষ্টি করেছিল। মধ্যবিত্ত হিন্দু যুবকেরা ফের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের দিকে ঝুঁকলেন। সবচেয়ে বীরত্বপূর্ণ আর সংগঠিত লড়াই ছিল সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুঠ এবং এক অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা। এছাড়াও একের পর এক সাহসী যুবকেরা বেশ কিছু গুপ্তহত্যা সংগঠিত করলেন। এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বাধীন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের রুদ্ধ ঘরে সভায় বসে বসে কিছু প্রস্তাব নেওয়া ছাড়া আর কিছুই করনীয় ছিল না। কারণ বাংলায় তারা এমন কিছু আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে নি যে যুবকেরা তার প্রতি আকৃষ্ট হবে। আবার হিংসাত্মক ঘটনা যত বাড়তে থাকল বৃটিশ সরকারের দমন পীড়ন তত কঠোরভাবে বাংলায় নেমে এল। চট্টগ্রামে পুলিশ প্রচণ্ড অত্যাচার চালাতে থাকল। ঢাকা, কলকাতা সর্বত্র রাষ্ট্র তার নির্মম পেষণ চালাতে লাগল। গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে দীর্ণ কংগ্রেস তার বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে পারল না। শত শত যুবক যখন জেলে, বাংলার কংগ্রেস তখন নিজেদের মধ্যে লড়াইতে ব্যস্ত। এমনকি বন্দীমুক্তি দাবী নিয়ে কলকাতায় একই দিনে পৃথক দু'টি সভাও হয়েছিল। মেয়র নির্বাচনের কৌশলী সুভাষের কাছে পরাজয়ের পর সেনগুপ্ত-গোষ্ঠীও প্রত্যাঘাত হানতে আরম্ভ করল। বঙ্গীয় কংগ্রেসের ব্যাপারে এ আই সি সি-কে বারবার হস্তক্ষেপ করতে হল। এটা সুভাষচন্দ্রের কাছে, যিনি সর্বভারতীয় কংগ্রেসের একজন নেতা হতে চাইছেন——খুবই মর্যাদাহানিকর মনে হতে লাগল। বিরোধীরা তার বিরুদ্ধে দালালি, ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ পর্যন্ত তুলল। চারিদিক হতে ব্যর্থতায় বাধ্য হয়েই ১৯৩১ এর ১৮ সেপ্টেম্বর তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি পদ থেকে এবং কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান থেকে পদত্যাগ করলেন। কিন্তু ধুরন্ধর সুভাষ দেশবাসীকে জানালেন যে তিনি কংগ্রেসে দলাদলি বন্ধ করার স্বার্থেই পদত্যাগ করেছেন। পদত্যাগপত্রের শেষ কটা লাইনে লিখলেন——

আমার আত্মত্যাগের ফলে যদি বাংলাকে বাঁচানো যায়, আমি সেই মূল্য দিতে আনন্দবোধ করিব এবং আমার দেশবাসী যদি তাহার পরিবর্তে তাহার হৃদয়ের কোনায় আমাকে একটু স্থান দেন, আমি যথোপযুক্তভাবের অপেক্ষাও বেশি নিজেকে পুরস্কৃত বোধ করিব। ব্যর্থতাকে ঢেকে কিভাবে মহান থাকা যায় সে কৌশল গান্ধীর কাছ থেকে তিনি ভালই রপ্ত করেছিলেন।

গোল-টেবিল বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্যে গান্ধী লণ্ডনে পৌঁছলেন ১৯৩১ এর ১২

সেপ্টেম্বর। আর গোল-টেবিল বৈঠক সেরে দেশে ফিরলেন ২৮ ডিসেম্বর। দীর্ঘদিন চলা এই বৈঠক কংগ্রেসের কাছে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। গান্ধী স্বায়ত্তশাসনের দাবী তুললেও হিন্দু-মুসলমান-নিম্নবর্ণ আর দেশীয় রাজ্যগুলোর অধিকার ইত্যাদি নিয়েই বৈঠকে অচলাবস্থা সৃষ্টি হল। বৈঠক ব্যর্থ হলেও ইউরোপে গান্ধী তার নিজের ভাবমূর্তি বেশ উজ্জ্বল করেই ফিরলেন। আবার শূন্যহাতে ২৮ ডিসেম্বর তিনি যখন বোম্বাই বন্দরে নামলেন তখন এক বিশাল জনতা তাকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্যে উপস্থিত ছিল। যেন গান্ধী দেশের জন্যে স্বাধীনতা ঘোষণার সনদ নিয়ে ফিরছেন। ঐদিন বিকেলে আজাদ ময়দানের জনসভায় তার কথা শোনার জন্যে দুই লক্ষ জনতা জড়ো হল। গান্ধীর ব্যাপারই আলাদা। যখন তিনি আন্দোলন প্রত্যাহার করতেন এমন সূক্ষ্ম কৌশলে তা করতেন দেশবাসী মনে করত যে এটা গান্ধীর একটা জবরদস্ত নতুন চাল। ব্যর্থতাকে ঢেকে নিজের ইমেজকে ঠিক রাখার ব্যাপারে গান্ধীর জুড়ি নেই।

আর সব নেতার মত সুভাষচন্দ্রও বোম্বাই ছুটেছিলেন গান্ধীর সাথে দেখা করতে। ২৯ ডিসেম্বর ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে গান্ধীর উপর ভার দেওয়া হল বড়লাটের সাথে দেখা করে আলোচনা করার জন্যে। ১৯৩২ এর পয়লা জানুয়ারী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি আইন আমান্য আন্দোলনের ডাক দিল। দোসরা জানুয়ারী বড়লাট জানালেন আইন-অমান্যের হুমকির মুখে তিনি গান্ধীর সাথে দেখাই করবেন না। ইংরেজ শাসকেরা কংগ্রেসের আন্দোলনের দৌড় বুঝে নিয়েছে। তারা ব্যাপক ধর-পাকড় শুরু করল। গান্ধীর সাথে দেখা করে বোম্বাই থেকে কলকাতা ফেরার পথে কল্যাণ স্টেশনে পুলিশ সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করল। তাকে মধ্যপ্রদেশের সিওনি জেলে পাঠানো হল। একমাস পরে শরৎ বসুকে গ্রেপ্তার করা হলে তাকেও ঐ একই জেলে রাখা হয়। সিওনি জেলের অবস্থা ছিল বাংলার সেন্ট্রাল জেলগুলোর চেয়ে অনেক বেশি খারাপ। সেখানে দুই ভাই-ই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্যে তাদের জব্বলপুর জেলে পাঠানো হল। সেখান থেকে সুভাষচন্দ্রকে প্রথমে মাদ্রাজ পরে উত্তরপ্রদেশের ভাওয়ালী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়। ১৯৩২ এর ডিসেম্বরে তাকে চিকিৎসার জন্যে লক্ষ্ণৌ-এর বলরামপুর হাসপাতালে আনা হল। তার মধ্যে যক্ষার লক্ষণ মিলল। সুভাষচন্দ্রের মেজবৌদি বিভাবতী বসু দিল্লীতে দৌড়াদৌড়ি করে অনুমতি আনলেন। ভারত সরকার ব্যক্তিগত ব্যয়ে চিকিৎসার জন্যে ইউরোপে যেতে দিতে রাজী হয়েছে। ১৯৩৩ এর ২৩ ফেব্রুয়ারী সুভাষচন্দ্রকে ইউরোপের পথে এস এস গাঙ্গে জাহাজে তুলে দেওয়া হল। জাহাজে উঠিয়ে বৃটিশ সরকার তাকে কারাবাস থেকে মুক্তি দিল।

ইউরোপে সুভাষচন্দ্র

ভারতে যারা সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতেন তারা সবসময়েই চেষ্টা করতেন ইউরোপের সাথে যোগাযোগ করবার। তারা উন্নত ধরনের অস্ত্র যোগাড় করতেন ইউরোপ থেকে। এছাড়া সেসময়ের অস্থির ইউরোপ ছিল পৃথিবীর সব প্রান্তেরই বিপ্লবীদের কর্মশালা। লড়াই-এর নতুন কৌশল, নতুন নতুন দার্শনিক ভাবধারা—এসব শিখতে বিপ্লবী কর্মীরা যেতেন ইউরোপে। সর্বোপরি গোটা ইউরোপ তখন ছিল সমাজতান্ত্রিক চিন্তার এক উৎসস্থল। ইংরেজ শাসকেরা তাই চাইত না ভারতীয়রা ইউরোপে থাকে। সেজন্য সহজে অনুমতি মিলত না। তবু সুভাষ সহজেই ইউরোপ যাবার অনুমতি পেলেন। আসলে সুভাষচন্দ্র জওহরলালের মত কংগ্রেস নেতাদের ইউরোপ যাবার ক্ষেত্রে কোন

সমস্যাই ছিল না। তার উপর সুভাষ তো ঘোর বলশেভিক-বিরোধী। এর আগে জেল থেকে ছাড়া পাবার প্রশ্নে তিনি সেই ১৯২৭ সালেই লিখেছিলেন—

যদি আমার বলশেভিক এজেন্ট হবার ইচ্ছে থাকত, তবে আমি সরকার বলা মাত্রই প্রথম জাহাজে ইউরোপ যাত্রা করতাম। সেখানে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের পর বলশেভিক দলে মিশে সমগ্র জগতে এক বিরাট বিদ্রোহ ঘোষণা করার উদ্দেশ্যে প্যারিস থেকে লেলিনগ্রাদ পর্যন্ত ছোটাছুটি করতাম; কিন্তু আমার সেরকম কোন ইচ্ছা বা আকাঙ্খা নেই। *(৪ এপ্রিল ১৯২৭ বর্মার জেল থেকে শরৎ বসুকে লেখা চিঠি)* সুতরাং সুভাষচন্দ্র ইউরোপ গেলে ইংরেজদের কোন লোকসান নেই। তার ইংল্যান্ডে যাবার ক্ষেত্রে নাকি নিষেধ ছিল। পরবর্তীকালে শিশির কুমার বসু দেখিয়েছেন যে তার বৃটেনে যাবার কোন বাধা প্রকৃত পক্ষে ছিল না। তিনি তা বুঝতে পারেন নি। *(বসু-বাড়ী)*

সুভাষ বসু ইতালিতে পৌঁছুলে ইতালি সরকারের পক্ষ থেকে তাকে সম্বর্ধনা দেওয়া হল। মনে রাখতে হবে যে সুভাষ তখনও সর্বভারতীয় নেতা হয়ে উঠতে পারেন নি। তবু তাকে ইতালির মত শক্তিশালী দেশের পক্ষ থেকে খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। আসলে তারা ভারতবর্ষের রাজনীতির হালহকিকৎ জানত। সুভাষ যে ফ্যাসিবাদের একজন সমর্থক এ তথ্য তাদের অজানা ছিল না। অনেক বক্তৃতাতেই তিনি ফ্যাসিবাদের জোর প্রশংসা করেছেন। ইতালির ফ্যাসিস্ট সরকারের হিসেব ছিল ভারতীয় রাজনীতিতে সুভাষচন্দ্রের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল। ভারতের সর্বোচ্চ নেতৃত্বে তাদের সমর্থক একজন থাকবে এটা তাদের খুবই কাম্য ছিল। মুসোলিনি বিভিন্ন দেশের বিখ্যাত ব্যক্তিদের সাথে আলাপ করে তাদের মন জয় করবার চেষ্টা করতেন। এর আগে রবীন্দ্রনাথকে ভুল বুঝিয়ে তাঁর প্রশংসা আদায় করেছিলেন। পরে অবশ্য রোমা রঁল্যার মাধ্যমে ভুল বুঝতে পেরে তিনি তা সংশোধন করেছিলেন। সুভাষচন্দ্রের ইউরোপ ভ্রমণের সময় মুসোলিনি তাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করলেন। তার এ প্রচেষ্টা সফলও হয়েছিল। ইউরোপ থাকাকালীন সুভাষের সঙ্গে কয়েকবার আলাপ-আলোচনা হল। এর ফলাফল অনেক সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। পরবর্তীকালে সুভাষ যে অক্ষশক্তিতে যোগ দিয়েছিলন, তার পটভূমির সূচনা এখান থেকেই।

এছাড়াও ১৯৩৩ এর ডিসেম্বরে মুসোলিনি রোমে স্থাপন করলেন ওরিয়েন্টাল ইনসটিটিউট। এর উদ্দেশ্য ছিল এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী মহলে প্রভাব বিস্তার করা। এই প্রচেষ্টা মুসোলিনির বরাবরই ছিল। ভারতের শান্তিনিকেতনে ইতালিয় বুদ্ধিজীবী তুচ্চির মাধ্যমে রীতিমত একটা ফ্যাসীবাদ সমর্থকদের গোষ্ঠী তৈরী করেছিলেন। হিটলার আর মুসোলিনী একই নৌকার যাত্রী হলেও এদিক থেকে ছিলেন বিপরীত মনোভাবাপন্ন। হিটলার এশিয়া, আফ্রিকাবাসী বা অন্যান্য অশ্বেতকায়দের বর্বর এবং ঘৃণ্য মনে করতেন এবং নেহাৎ প্রয়োজন ছাড়া পারতপক্ষে এদের কাছে ঘেঁসতেন না। ওরিয়েন্টাল ইনসটিটিউটের উদ্বোধনী বক্তৃতাতেও মুসোলিনি বললেন যে, যারা বলেন যে ইউরোপ আর এশিয়া কখনও মিলতে পারে না তারা ভুল বলেন (হিটলার এরকম বলতেন)। রোম অতীতে ইউরোপ দখল করলেও এশিয়ার সথে তার বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক ছিল। আর অতীতে যেমন রোম ছিল এশিয়া আর ইউরোপের মিলনস্থল, তেমনি ভবিষ্যতেও তা থাকবে। *(১২ জানুয়ারী ১৯৩৪ Mrs. Vetter কে লেখা সুভাষচন্দ্রের চিঠি)*। আসলে মুসোলিনি হিটলারের চেয়ে অনেক বেশি ধুরন্ধর ছিল। তার লক্ষ্য ছিল বিশাল এশিয়া গ্রাস করার দিকে। এই সভাতে সুভাষচন্দ্রও বক্তৃতা দিয়েছিলেন। মুসোলিনির সাথে সম্পর্কও গাঢ় হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র কিন্তু একেবারেই ব্যর্থ হয়েছিলেন জার্মানির সাথে সম্পর্ক স্থাপনের

ক্ষেত্রে। এর আগে তিনি নাৎসীদের দার্শনিক গুরু নিৎসের যতই জয়গান করুন বা জার্মান অর্থনীতিবিদ সিলভিং গেসেলের অর্থনীতির যতই প্রশংসা করুন——জার্মান শাসকের দৃষ্টিতে তিনি ঘৃণ্যই থেকে গেছেন। হিটলার তার আত্মজীবনী 'মাইন ক্যাম্ফ'তে বারবার ইংরেজদের প্রশংসা করেছেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উপহাস করেছেন এশিয়ার 'মাদারি খেলুড়ে' বলে। হিটলার স্পষ্টত বলেছেন যে ইংরেজরা নিজে থেকে ধ্বংসপ্রাপ্ত না হলে ভারতীয়রা কোনকালেই ইংরেজ তাড়াতে পারবে না। সর্বোপরি হিটলারের তখনও স্থির নিশ্চিত ধারণা ছিল যে সাম্রাজ্য ভাগাভাগিতে বৃটেনের সঙ্গে তার একটা রফা হয়ে যাবে। সুতরাং সুভাষচন্দ্র মোটেই পাত্তা পেলেন না। চেষ্টা করেও মন্ত্রীপর্যায়ের একজনের সাথেও দেখা করার সুযোগ মিলল না। তবে ইউরোপে থাকাকালীন তিনি সেখানকার ছোট ছোট দেশগুলোতে অবাধে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাদের নেতাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। এখানে তিনি বুঝতে পারলেন ভারত সম্পর্কে ইউরোপের মানুষদের ধ্যানধারণা কতই অল্প। তাই বারবার তিনি ভারতীয় নেতাদের জানাতে লাগলেন যে ইউরোপে কংগ্রেসের প্রচার কতই জরুরী।

এর মধ্যে বৃটেনের এক প্রকাশক সংস্থা লরেন্স এ্যান্ড উইশার্ট-এর সাথে এক চুক্তি হয়েছিল যে তিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন নিয়ে একটা বই লিখবেন। এর জন্যে তিনি অগ্রিম টাকাও নিয়েছিলন। ১৯৩৪ সালের জুন মাসে লেখা শুরু করলেন তার বিখ্যাত বই 'দ্য ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল'। বইটা মূলত ইংল্যান্ড আর আমেরিকার পাঠকদের কথা চিন্তা করেই লেখা হয়েছিল *(রবীন্দ্রনাথকে লেখা সুভাষচন্দ্রের চিঠি)*। সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন বইটার ভূমিকা কোন একজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব লিখে দেন। তাই তিনি রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখেছিলন বার্নাড শ কিংবা এইচ জি ওয়েলেস'কে অনুরোধ জানাতে। রবীন্দ্রনাথ উত্তরে লিখলেন——

বার্নাড শ'কে আমি ভালোমতো জানি; তোমার বইয়ের পূর্বভাষণ লেখবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করতে আমি সাহস করি নে। করলেও ফল হবে না এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তোমার পাণ্ডুলিপিখানির এক কপি তুমি নিজেই তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেখতে পার। এতদিনে সংবাদপত্র যোগে নিশ্চয় তিনি তোমার পরিচয় পেয়েছেন। ক্ষুব্ধ সুভাষ নিজেই বইয়ের ভূমিকা লিখলেন। বইটা প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই বৃটিশ সরকার ভারতে তা নিষিদ্ধ করল। ইউরোপে কিন্তু বেশ সমাদর পেল। সুভাষচন্দ্র অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বইটা উপহার দিলেন।

এই ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল লিখতে গিয়েই সুভাষচন্দ্র এমিলি শেঙ্কলকে তার সেক্রেটারি নিয়োগ করেন। কাজের মধ্য দিয়ে তাদের মধ্যে গভীর প্রেম সম্পর্ক গড়ে উঠল। এর আগে সুভাষ বহুবার বলেছিলেন তিনি জীবনে বিয়ে করবেন না। এবং নারীর সাথে একজন পুরুষের প্রেম-সম্পর্কে ভাবতেন 'আগুন নিয়ে খেলা'। তরুণ বয়সে তো রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অনুসারী হয়ে ঘোর সংযমী হতে গিয়ে বেশ সমস্যায় পড়ে গিয়েছিলেন। যাইহোক যৌবনের শেষ পর্যায়ে তিনি নরনারীর প্রেমের তাৎপর্য বুঝতে পারলেন।

ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল নিয়ে তার ব্যস্ততা শেষ হতে না হতে দেশ থেকে খবর এল যে বাবা জানকীনাথ বসু গুরুতর অসুস্থ। তড়িঘড়ি বিমান ধরে করাচি হয়ে দমদমে পৌঁছুলেন ৪ ডিসেম্বর ১৯৩৪। তার আগের দিনই জানকীনাথের মৃত্যু হয়েছে। সুভাষ আর শরৎ গৃহবন্দী অবস্থাতেই শ্রাদ্ধ করলেন। শ্রাদ্ধ বেশ ধুমধাম করেই হল। শ্রাদ্ধ হয়ে যাবার পর ১৯৩৫ এর ২০ জানুয়ারী পৌঁছুলেন ইতালির নেপলসে।

এদিকে ভারতবর্ষের পরিস্থিতি দ্রুত পাল্টাচ্ছে। সেই ১৯৩২ এর শেষদিক থেকে গান্ধী জেলে বসেই বুঝতে পারছিলেন যে তার আইন অমান্য আন্দোলনের আবেদন ক্রমেই ফিকে হয়ে আসছে। তিনি বাধ্য হয়ে ছুতো খুঁজতে লাগলেন। পেয়ে গেলেন এক ছুতো—ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ। গান্ধী তথাকথিত নিচুজাত এবং অস্পৃশ্যদের ত্রাতা হয়ে বসলেন। তিনি এদের নতুন নাম রাখলেন 'হরিজন'। সেই থেকে আজ অবধি ভারতবর্ষের এক বিপুল সংখ্যক মানুষ এই কলঙ্কজনক নাম বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন। ১৯৩২ এর ২০ সেপ্টেম্বর তিনি তথাকথিত নিচুজাতের আলাদা নির্বাচকমণ্ডলীর বিষয় নিয়ে 'আমরণ-অনশন' শুরু করলেন। ব্যস, আইন অমান্য-টমান্য সব মাথায় উঠল। নেতাদের সকল ব্যস্ততার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠল গান্ধীর মূল্যবান 'জীবনরক্ষা'। তাবড় জাতীয়তাবাদী খবরের কাগজগুলো এই নিয়েই মেতে উঠল। 'পুণা-চুক্তি'র মধ্যে দিয়ে কংগ্রেসের 'বর্ণহিন্দু আর অস্পৃশ্য' নেতারা একটা সমঝোতায় এলেন। গান্ধী অনশন ভাঙলেন: কংগ্রেস নেতা আর জাতীয়তাবাদী কাগজের ভাষায়—'দেশ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল'। যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলনের সমাপ্তি ঘোষণা করেছিলেন ১৯৩৪ এর এপ্রিল—কিন্তু তার অনেক আগেই ঠান্ডা জল ঢেলে দিয়েছিলেন ১৯৩৩ এর মে মাসে যখন তিনি আন্দোলন স্থগিত রাখলেন। সুভাষচন্দ্র তখন ভিয়েনায়। আর এক প্রবীন কংগ্রেসী বিঠলভাই প্যাটেলও তখন ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য ভিয়েনায় ছিলেন। সেখান থেকে দু'জনে একটা যৌথ বিবৃতি দিলেন যা বসু-প্যাটেল ইস্তেহার নামে পরিচিত। এতে তারা গান্ধী নেতৃত্বের প্রতি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। এতদিন সুভাষ কখনও গান্ধীর নেতৃত্বকে সরাসরি আক্রমণ করেননি। প্রবীন নেতার সংস্পর্শে এই প্রথম তা করতে সাহস করলেন।

আমাদের সুস্পষ্ট অভিমত রাজনৈতিক নেতা হিসেবে গান্ধীজী ব্যর্থ হয়েছেন। সুতরাং নতুন নীতি ও নতুন পন্থায় কংগ্রেসের আমূল সংস্কারের সময় এসেছে।এই পুনর্গঠনে প্রয়োজন নেতৃত্বের পরিবর্তন। (*বসু-প্যাটেল ইস্তেহার*)। এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় হল বসু এবং প্যাটেল দুজনেই গান্ধীকে নেতৃত্ব থেকে সরানোর আহ্বান করছেন। এরপর অবশ্য প্যাটেল বেশিদিন বাঁচেন নি। মৃত্যুকালে তাঁর সঞ্চিত লক্ষাধিক টাকা দেশের কাজে লাগানোর জন্য সুভাষচন্দ্রকে উইল করে দিয়ে যান। কিন্তু পরে তার ভাই বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা বল্লভভাই প্যাটেল উইলের অসঙ্গতি দেখিয়ে আদালতে মামলা করেন যার ফলে সুভাষচন্দ্র এ টাকা পান নি। ব্যাপারটা খুব মজার, লক্ষ টাকার জন্যে দুই 'প্রাতঃস্মরনীয়' দেশনেতা কোর্টে গুঁতোগুঁতি করছেন।

শুধু বসু-প্যাটেল ইস্তেহারেই নয় ১০ জুন লন্ডনে ভারতীয়দের সর্বদলীয় সম্মেলনে সুভাষচন্দ্র যে লিখিত ভাষণ পাঠিয়েছিলেন, তাতে তিনি আক্ষরিক অর্থে গান্ধীকে তুলোধোনা করলেন—

আমাদের সেনাধ্যক্ষ বারংবার অনশনের ফলে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। অথবা তাঁহার মন ও বিচার কতগুলি আত্মনিষ্ঠ কারণে মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছে। এই কারণগুলি বাহিরের লোকের পক্ষে বোঝা অসম্ভব। এই বক্তৃতায় সুভাষ নতুন একদল নেতৃত্ব তৈরীর আহ্বান জানালেন যারা প্রতিষ্ঠিত নেতাদের তাড়াবেন—

যত দুঃখ ও ত্যাগই জড়িত থাকুক না কেন, তাহা অস্বীকার করিয়া একদল সংকল্পদৃঢ় নরনারী ভারতের মুক্তি সাধনের জন্য দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিবে। এই হইবে আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ।.........

ভবিষ্যতের এই দলটির কর্তব্য হইবে ভারতীয় জনসাধারণের প্রাক্তন নেতাদের সঙ্গে সকল প্রকার সম্পর্কচ্ছেদ। কেননা এই নেতারা গ্রেট ব্রিটেনের বিরুদ্ধে পরবর্তী মারাত্মক সংগ্রামের পর্যায়ে প্রয়োজনীয় আদর্শ নীতি, কার্যসূচী ও কৌশল অবলম্বন করিতে সমর্থ হইবেন এমন কোনো সম্ভাবনা নাই। সর্বোপরি তিনি লিখলেন——

১৯৩১ এর দিল্লী চুক্তি ভুল ছিল।......... পরিস্থিতির ট্রাজেডি হইতেছে যে লোকগুলি কার্যকরী ভাবে এই স্থূল বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে পারিতেন তাঁহারাও কারান্তরালে নিরাপত্তার সঙ্গে আবদ্ধ রহিলেন। এর চেয়ে আর কত খোলাখুলিভাবে গান্ধীকে 'বিশ্বাসঘাতক' বলা যেতে পারে?

১৯৩৪ সালে লেখা ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল বইয়ের লাইনে লাইনে গান্ধীর প্রতি প্রকাশ পেল অনাস্থা। শুধু তাই নয়, এই বইটার ভূমিকা লিখতে তিনি কেন রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করছেন না, তা জানিয়ে রবীন্দ্রনাথকে লিখলেন——

আপনি নিজে সম্প্রতি মহাত্মাজীর অন্ধভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন অন্ততঃপক্ষে আপনার লেখা পাঠ করিলে সেরূপ ধারণা মানুষ স্বভাবতঃ পোষণ করিতে পারে। এরূপ অবস্থায় মহাত্মাজীর সমালোচনা আপনি বরদাস্ত করিতে পারিবেন কিনা আমি জানি না। (৩ *আগস্ট ১৯৩৪ ভিয়েনা থেকে রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠি*)। ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল বইতে শুধু গান্ধীর সমালোচনাই ছিল না, এমনকি গান্ধীর বিরুদ্ধে যে সব জনশ্রুতি চালু ছিল সেগুলোকেও সুভাষচন্দ্র তার বইতে স্থান দিয়েছিলেন।

সিংহাসনের হাতছানি

সুভাষচন্দ্র ইউরোপে থাকাকালীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ দিকে মোড় নিল যে তিনি দেশে ফেরার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠলেন। আইন অমান্য আন্দোলনের ন্যক্কারজনক আত্মসমর্পণের ফলে গান্ধীর জনপ্রিয়তা একেবারে তলানিতে ঠেকল। সাধারণ মানুষ কংগ্রেসের নেতৃত্বের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ল। বিশেষতঃ যুবসমাজের কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল কংগ্রেসের কাছ থেকে পাওয়ার আর কিছুই নেই। এমত অবস্থায় ১৯৩৩ সালে নাসিক জেলে একদল অপেক্ষাকৃত তরুণ নেতা যাদের মধ্যে ছিলেন অশোক মেহতা, জয়প্রকাশ নারায়ণ, মিনু মাসানি, অচ্যুত পট্টবর্ধন, ইউসুফ মেহের আলি, এক সভায় মিলিত হলেন। এরা ঠিক করলেন তারা কংগ্রেসের মধ্যে একটা সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী হিসেবে কাজ করবেন এবং কংগ্রেস নেতৃত্বকে বাধ্য করবেন বামপন্থী দিশায় চলতে। এটাই সাংগঠনিক চেহারা পেল পরের বছর মে মাসে পাটনায় এক সম্মেলনে যেখানে নরেন্দ্র দেবের সভাপতিত্বে আনুষ্ঠানিকভাবে তৈরী হল কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি। এই দল যেমন একদিকে শ্রেণী সংগ্রাম, জমিদারী বিলোপের কথা বলত, আবার জাতীয়তাবাদী চিন্তাও ছিল এদের একটা বৈশিষ্ট্য। সর্বোপরি এরা কখনই কংগ্রেসের বাইরে এসে কৃষক-শ্রমিকের দল হিসেবে কাজ করার সাহস দেখান নি। নেতৃত্বের প্রশ্নেও গান্ধীর প্রভাবের বাইরে আসার ক্ষমতাও এদের ছিল না। তবুও এরা কংগ্রেসের ক্ষয়ে যাওয়া মর্যাদা কিছুটা উদ্ধার করতে পেরেছিল। আবার ১৯৩৪ সাল থেকে নিষিদ্ধ হওয়া কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা সোসালিস্টদের মধ্যে থেকে কাজ করার এবং নিজেদের প্রভাব বাড়ানোর সুযোগ পেয়েছিল। জওহরলাল নেহরু কংগ্রেস সমাজবাদী পার্টির সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে

চলতে লাগলেন। তিনি তার বহু-প্রচারিত সমাজতান্ত্রিক কথাবার্তা আরও খোলাখুলি বলার সাহস পেলেন।

আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হল। আইন অমান্য আন্দোলনের শোচনীয় ব্যর্থতার পর কংগ্রেস নেতৃত্ব আবার আইন সভার দিকে ঝুঁকল। এছাড়া তাদের আর কোনো উপায় ছিল না। এই ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে ভারতীয় শিল্পপতিরা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিল ওসব আন্দোলন-টান্দোলন দিয়ে বৃটিশ শাসনকে নতি স্বীকার করানো যাবে না। তার চেয়ে আইনসভার মাধ্যমে চাপ দিয়ে বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে কিছু সুযোগ সুবিধা আদায় করা হোক। ইতিমধ্যে কংগ্রেস নেতৃত্বের উপর তারা নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব স্থাপন করতে পেরেছে। সুতরাং কংগ্রেসের আর গতি নেই। তাছাড়া মাঝারি সারির নেতারা মন্ত্রীত্ব কিম্বা আইন সভার সদস্য পদের জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। তাদেরকে বাগে আনাও সম্ভব ছিল না। অতএব ১৯৩৪ এর মে মাসে পাটনায় এ আই সি সি-র সভায় কংগ্রেসের কাউন্সিলে ঢোকবার প্রস্তাব পাশ হল। স্বয়ং গান্ধী তা অনুমোদন করলেন। এই সময় কংগ্রেস ছিল নিষিদ্ধ সংগঠন। তবু কি প্রস্তাব গৃহীত হতে যাচ্ছে জেনে সরকার সভায় কোন বাধাই দিল না। এবং প্রস্তাব গৃহীত হবার পরপরই কংগ্রেসের উপর নিষেধাজ্ঞা উঠে গেল।

সুযোগ বুঝে বৃটিশ শাসকেরা ভারতীয় নেতাদের আরও কিছু ক্ষমতার ছিটেফোঁটা দিতে উদ্যোগী হল। অনেক তর্কবিতর্কের পর ১৯৩৫ সালে বৃটিশ পার্লিয়ামেন্ট নতুন আইন আনল——গভর্ণমেন্ট অব ইন্ডিয়া এ্যাক্ট। কিন্তু এই আইন ভারতের রাজনৈতিক দলগুলোর আশা-আকাঙ্খার কাছ দিয়েই গেল না। স্বাধীনতা তো দূরস্থান কংগ্রেসের ন্যূনতম চাহিদা ডোমিনিয়ান স্টাটাসও দেওয়া হল না। সমস্ত অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক ক্ষমতা রাখা হল বড়লাটের হাতে। কেবলমাত্র প্রাদেশিক মন্ত্রীসভাগুলোর ক্ষমতা আগের তুলনায় আরও বাড়ানো হল যদিও তা খর্ব করার সমস্ত আইনানুগ সুযোগ প্রদেশ গভর্ণরের হাতে থাকল। কংগ্রেস, লিবারেল, মুসলিম লীগ সকলেই একবাক্যে এ আইনের বিরোধিতা করল। কিন্তু যেখানে কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না সেখানে যা মিলছে তাই বা কম কিসের। বড় বড় নেতাদের না হয় ক্যাবিনেট, এ, আই, সি, সি-র সদস্যপদ এসব আছে। কিন্তু মাঝারি আর বিভিন্ন প্রদেশের নেতারা কি বুড়ো আঙুল চুষবে! সুতরাং কংগ্রেস যে কার্যত ১৯৩৫-এর 'ভারত সরকার' আইন মেনে নির্বাচনে লড়বে এটা বুঝতে কারো বাকি থাকল না।

সুভাষচন্দ্র দেখলেন যে তার সামনে বড় একটা সুযোগ এসেছে। তিনি যখন দেশ ছেড়েছিলেন তখন গান্ধীর জনপ্রিয়তা ছিল তুঙ্গে। এখন সেখানে ভাটার টান। কংগ্রেসে এখন বামপন্থীরা অনেক বেশি সংহত অনেক বেশি শক্তিশালী। তিনি দেশে ফিরলে এই বামপন্থীদের সমর্থন পুরোপুরি পাবেন। তার অবর্তমানে এই সুযোগটা জওহরলাল নিয়ে নিচ্ছেন। তিনি গভীর মনোযোগের সাথে কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টির কার্যাবলী লক্ষ্য রাখছিলেন। ১৯৩৫এর ১৫ মার্চ ইউনাইটেড প্রেসের কাছে এক বিবৃতিতে তিনি বলেন——

আমি মনে করি কংগ্রেস সোশালিস্ট পার্টির নিজের মধ্যেই একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি নিহিত আছে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ভিতরকার অগ্রনী চিন্তার লোকজনদের (র‍্যাডিকালদের) তাঁহারা নিজেদের পক্ষাভিমুখী করিতে পারিয়াছে এবং যদি সঠিক আদর্শ ও কর্মপন্থার ভিত্তিতে সঠিক পথে আগাইয়া যায় তাহা হইলে ভারতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি একটি অপ্রতিরোধ্য ভূমিকা গ্রহণ করিবে।

সুভাষচন্দ্র নিজেই একজন বামপন্থী, একজন র‍্যাডিকাল—অন্তত তার নিজের মতে। সুতরাং সোস্যালিস্ট দল তাকে সমর্থন করবেই। তাই তিনি যে কোন মূল্যে দেশে ফেরার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠলেন।

সুভাষচন্দ্র যখন তার গলব্লাডারের স্টোন অপারেশন করিয়ে ভিয়েনাতে ছিলেন জওহরলাল তার অসুস্থ পত্নীর চিকিৎসার জন্যে ইউরোপে গিয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র তার সাথে দেখা করলেন, নিয়মিত চিঠিতে যোগাযোগও রাখতে লাগলেন। অসুস্থ স্ত্রীর চিকিৎসার প্রয়োজনে তিনি সবরকম সাহায্য করতে প্রস্তুত তাও জানালেন। তিনি যখন জানতে পারলেন জওহরলাল কংগ্রেস সভাপতি হতে চলেছেন তখন জওহরলালকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে তাকে কংগ্রেসের কাজে সবরকম সহায়তা করতে চান বলে উল্লেখ করলেন। সুভাষচন্দ্র বুঝেছিলেন যে আবার তাকে কংগ্রেসে উপযুক্ত জায়গা পেতে হলে জওহরলালের সহায়তা ছাড়া উপায় নেই। তিনি কিছুদিন আগে ইন্ডিয়ান স্ট্রাগলে লেখা বিরূপ মন্তব্য ভুলে জওহরলালকে তার "দাদার মত" সম্মান দিতে শুরু করলেন। ৪ মার্চ ১৯৩৬ অস্ট্রিয়ার বাগাস্টাইন থেকে লেখা চিঠিতে জওহরলালকে জানালেন—

তোমার সাথে কথাবার্তা বলে চলে আসার পর আমার মনে হচ্ছে তোমাকে যা বলেছিলাম তা নিয়ে আমার একটা বিবৃতি দেওয়া দরকার। কারণ দেশে ফেরার পর আমার জেল হতে পারে আর আমার মনে হয় কিছু লোক আমার মতামত জানতে আগ্রহী। যত দ্রুত সম্ভব আমি বিবৃতিটি দিতে চাই। এবং বলতে চাই যে আমি তোমাকে পূর্ণ সমর্থন করছি।

ভারতের শীর্ষনেতাদের মধ্যে একমাত্র তুমিই কংগ্রেসকে প্রগতির পথে নিয়ে যেতে পারো। তোমার অবস্থাটা এমনই যে মহাত্মা গান্ধী আর কারও চাইতে তোমার উপরই নির্ভরশীল। তুমি নিজেকে ততটা দুর্বল ভেবো না যতটা তুমি নও। গান্ধীজী কখনই এমন কিছু করবেন না যাতে তোমাকে হারাতে হয়।

আমি যদি লক্ষ্ণৌ আসতে পারি আমি সম্পূর্ণভাবে তোমার কাজে লাগবো। (*জওহরলাল নেহেরু—বাণ্ড অব ওল্ড লেটার্স*)

কিন্তু সেসময় হঠাৎ বজ্রপাতের মতন সুভাষ পেলেন ভিয়েনার বৃটিশ কনসালের চিঠি—বিদেশ মন্ত্রক থেকে পাওয়া এক আদেশ অনুযায়ী আমি আপনাকে জানাতে চাই যে আপনি ভারতে ফিরতে চান বলে সংবাদপত্রে যে বিবৃতি দিয়েছেন তা ভারত সরকারের নজরে এসেছে। সরকার আপনাকে পরিষ্কার জানাচ্ছে যে দেশে ফিরলে আপনি গ্রেপ্তার হবেন। সুভাষচন্দ্র জানতেনই যে দেশে ফিরলে তাকে গ্রেপ্তার করা হবে। কিন্তু দেশে ফেরার সুযোগ হাতছাড়া করতে তিনি রাজী নন। ভিয়েনার বৃটিশ কনসাল মি. টেলারের এই চিঠিটা তিনি অস্ত্র হিসাবে কাজে লাগালেন। দেশে-বিদেশে বিশিষ্ট নাগরিক ও সংগঠনকে চিঠির প্রতিলিপি পাঠিয়ে এর বিরুদ্ধে একটা জনমত তৈরী করতে চাইলেন। জওহরলালকে চিঠির প্রতিলিপি পাঠিয়ে তিনি নির্দেশ দিতে অনুরোধ করলেন যে তিনি এখন কি করবেন। কৌশলী সুভাষ জানতেন জওহরলাল তাকে দেশে ফিরতে বারণ করতে পারবেন না। আবার বারণ না করলে দেশে ফিরে তিনি গ্রেপ্তার হলে কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে জওহরলাল তার দায়িত্ব এড়াতে পারবেন না। ১৩ মার্চ লেখা এই চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন—

তুমি ছাড়া এখানে একজনও নেই এবং বোধ হয় দুনিয়ায় এমন কেউ নেই যার সাথে

আমি ব্যাপারটা আলোচনা করতে পারি। আমার ইচ্ছা এই হুমকি অগ্রাহ্য করে দেশে ফেরা। এখানে একমাত্র বিবেচ্য কিসে জনতার স্বার্থ রক্ষিত হবে। আমার ব্যক্তিগত কোন ব্যাপার নেই, আমি জনস্বার্থে যেটা ভালো সেটাই করতে পারি। কিন্তু বহুদিন জনগণের কাছ থেকে দূরে আছি,তাই আমার পক্ষে বোঝা অসুবিধা কোনটা ঠিক। তুমিই আমাকে এই পশ্নে উপদেশ দিতে পারো। আমি জানি, এ ব্যাপারে মতামত দেওয়া কঠিন। কিন্তু এটা ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, তুমি একজন গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী হিসেবে একজন রাজনৈতিক কর্মীকে সঠিক উপদেশ দেওয়া থেকে বিরত থাকতে পার না।

তোমাকে এ হেন বিপদে ফেলার ক্ষেত্রে আমার একমাত্র জোর যে আমি অন্য যে কারও চেয়ে তোমার উপর আস্থা রাখি। আমার আত্মীয়দের মতামত জেনে লাভ নেই কারণ তারা এটা জনতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে পারবেন না। সুতরাং তোমার মতামতের উপর নির্ভর করা ছাড়া আমার আর কোন উপায় নেই। এই চিঠি তুমি ২০ তারিখের মধ্যে পেয়ে যাবে। চিঠি পেয়ে সাথে সাথে আমাকে তার করবে। যাতে আমি রোম থেকে ২ এপ্রিল কে এল এম-এর প্লেন ধরতে পারি। সুভাষচন্দ্রের এই কৌশল অত্যন্ত কার্যকরী হয়েছিল। দেশে ফেরার সাথে সাথে তাকে গ্রেপ্তার করা হলে একদিকে যেমন অনেক বিদেশী বুদ্ধিজীবী প্রতিবাদপত্র পাঠিয়েছিলেন অন্যদিকে কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল তার মুক্তির দাবিতে প্রত্যক্ষ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন।

ইউরোপ থেকে দেশে ফেরার সময় সুভাষচন্দ্র আর একটা কাজ করলেন। তিনি এক বিবৃতিতে নিজেকে সমাজতন্ত্রী বলে পরিচয় দিয়ে ধনতন্ত্রকে প্রচন্ড আক্রমণ করলেন। যে সুভাষ দু'বছর আগেও সমাজতন্ত্র ভারতের গ্রহণীয় আদর্শ নয় বলেছিলেন——বলেছিলেন ভারতবর্ষে ঘটবে সমাজবাদ আর ফ্যাসিবাদের সমন্বয়, তিনিই নিজেকে সমাজতন্ত্রী বলেছেন। কংগ্রেস সোসালিস্ট দল এবং অন্যান্য বামপন্থী দলের সমর্থন পেতে এটা জরুরী ছিল। ১৯৩৬ এর ৮ এপ্রিল বোম্বেতে পৌঁছুতেই সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করা হল। ক্ষেত্র প্রস্তুতই ছিল। তীব্র প্রতিবাদ শুরু হল। হবু কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল খবরের কাগজে এক বিবৃতি দিয়ে বললেন——"সারা দেশ জুড়ে যে অবাধ আর তীব্র দমন নীতির একাধিপত্য চলছে, সুভাষচন্দ্রের গ্রেপ্তার তার নবতম ও সর্বাপেক্ষা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।" শুধু তাই নয় ১০ মে সুভাষচন্দ্রের মুক্তির দাবীতে সারা দেশে "সুভাষ দিবস" পালনের ডাক দেওয়া হল। আবার এর সাথে সাথে জওহরলালের উদ্যোগে Indian Civil Liberties Union গড়া হল। রবীন্দ্রনাথ হলেন তার প্রেসিডেন্ট আর সরোজিনী নাইডু কমিটির চেয়ারপারসন। খানিকটা রাজনৈতিক কারণে আর খানিকটা সুভাষচন্দ্রের অসুস্থতার দরুন গভর্ণমেন্ট তাকে জেল থেকে ছেড়ে কার্শিয়াং-এ মেজদা শরৎ বসুর বাড়ীতে গৃহবন্দী রেখে দিল।

পুরো ১৯৩৬ সুভাষচন্দ্রের কোন কাজ থাকল না। কার্শিয়াং থেকে ঐ সময় তিনি তার ইউরোপের পুরনো বন্ধুদের সাথে চিঠি আদান প্রদান করতে থাকেন। এমেলি শেঙ্কেল-এর সাথেও ঘন ঘন পত্রালাপ চলে। জার্মানিতে সুভাষচন্দ্রের বান্ধবী কিট্টি কুর্টিকে লেখা চিঠি থেকে জানা যায় তিনি ঐ সময় ফ্রয়েডের স্বপ্ন-দর্শন নিয়ে বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করেন।

এর মধ্যে ডিসেম্বরে হয়ে গেল ফৈজাবাদ কংগ্রেস। জওহরলাল সভাপতি। এই কংগ্রেসে দেখা গেল মন্ত্রীসভায় যোগ দেওয়া নিয়ে কংগ্রেসে হামলাহামলি। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস সিদ্ধান্ত নিল যে কাউন্সিলে কংগ্রেস যোগ দেবে। মন্ত্রীসভায় যোগ দেবে কিনা তা নিয়ে আলোচনায় এমন গুঁতোগুঁতি হল যে কোন সিদ্ধান্তই নেওয়া গেল না। আগের

সব বড় বড় কথা ভুলে কংগ্রেস নির্বাচনে অংশ নিল আর ফলও করল খুব ভালো। এগারোটার মধ্যে পাঁচটা প্রদেশে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল আর বোম্বাই প্রদেশে প্রায় তার কাছাকাছি। এরপরই সুভাষচন্দ্রকে সরকার মুক্তি দিল ১৯৩৭ এর ১৭ মার্চ।

মুক্তি পেয়েই সুভাষচন্দ্র তার পুরনো পদ অর্থাৎ প্রদেশ সভাপতির পদে বসলেন। বাংলায় কংগ্রেস ভোটে জিততে পারে নি, সবচেয়ে বেশী আসন পেয়েছিল ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা পার্টি। কিন্তু সরকার গঠনের মত শক্তি তাদের ছিল না। ফজলুল হক চাইলেন কংগ্রেস তাকে সমর্থন করুক। কিন্তু কংগ্রেস সংগঠনের মূল শক্তি ছিল জমিদারেরা আর কৃষক-প্রজা পার্টি ছিল মূলত জমিদার বিরোধী কৃষকদের পার্টি (অবশ্যই তা ক্ষেত-মজুর, ভূমিহীন বা বর্গাদারদের সংগঠন ছিল না)। সুতরাং কংগ্রেস কৃষক-প্রজা পার্টিকে সমর্থন করল না। ফজলুল হক বাধ্য হয়ে মুসলিম লীগ আর অন্যান্য দলগুলোর সাহায্য নিলেন। পরবর্তীকালে দেখব এখান থেকে মুসলিম লীগ বাংলায় তার শক্তি সংহত করে এবং অবিভক্ত বাংলায় কংগ্রেস কখনও আর ক্ষমতার স্বাদ পায় নি। বাংলা কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য কংগ্রেস সভাপতি জওহরলালের হস্তক্ষেপ চাইলেন। জওহরলাল সরাসরি জানিয়ে দিলেন যে নির্বাচনের মাধ্যমে সভাপতি ঠিক হোক। যাইহোক খানিকটা অসুস্থতার কারণে খানিকটা বিরক্ত হয়ে সুভাষচন্দ্র সব ছেড়েছুড়ে তার পুরনো বন্ধু ধরমবীর এবং তার স্ত্রীর কাছে ডালহৌসিতে চলে গেলেন।

ডালহৌসিতে সুভাষচন্দ্র মাস পাঁচেক ছিলেন। এসময়ে তিনি বেশ কয়েকটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এই ডালহৌসিতেই গান্ধী দূত পাঠালেন মিস্ শ্লেড-কে। সুভাষচন্দ্রকে গান্ধী সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি করতে চান। তার আগে বুঝে নিতে চান সুভাষের মনোভাব। সুভাষ আরও কৌশলী। তিনি মিস শ্লেডের কাছে শুনলেন সব। উত্তরে বললেন যে সামনের এ আই সি সি-র সভা কলকাতাতে করতে গান্ধীকে যেন অনুরোধ করেন। তিনি গান্ধীর কাছেই যা বলার বলবেন। গান্ধীর তখন সুভাষকে বড়ই দরকার। কলকাতাতেই বৈঠক ঠিক হল। আর গান্ধী এসে উঠলেন সদলে——আর কোথাও নয় কলকাতায় সুভাষচন্দ্রের বাড়ীতে। গান্ধী আর সুভাষচন্দ্র একান্তে কথা বললেন উডবার্ন পার্কে শরৎ বসুর বাড়ীতে। সেই আলোচনার কথা সুভাষচন্দ্র নিজে বলেছিলন তার সে সময়কার পার্শ্বচর নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তীর কাছে।

১৮-ই নভেম্বর নেতা চলে গেলেন ইউরোপে। যাবার আগের দিন রাত্রে আবার এসেছিলেন। তখন আমি অনেকটা ভালো। সেইদিনই নেতার মুখে শুনলাম গান্ধীজির সঙ্গে ওর আলোচনার কথা।

গান্ধীজি প্রথমে বলেন "বিপ্লবীদের সংস্রব তোমাকে ত্যাগ করতে হবে।" প্রত্যুত্তরে নেতা বলেছিলেন "না।"

গান্ধী এটা আশা করেননি। বিস্ময় জেগেছিল ওঁর কণ্ঠে,আর চোখেও। জিজ্ঞেস করেছিলেন "কেন?"

"তা হলে সকলের আগে আপনার সংস্রব আমায় ছাড়তে হবে বলে।" উচ্চ-হাসিতে ঘর ফেটে পড়বার উপক্রম হয়েছিল। হাসি স্তিমিত করে বলেছিলেন গান্ধী "আমি কি বিপ্লবী?"

"সবচেয়ে বড় আর বিপজ্জনক।" *(নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী——নেতাজী : সঙ্গ ও প্রসঙ্গ, ১ম খণ্ড)*। একে স্তাবকতা ছাড়া আর কি বলা যাবে! কয়েকদিন আগে যাকে

বলেছেন বিশ্বাসঘাতক, যাকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেবার আহ্বান জানিয়েছেন——আজ তাকে বলতে হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিপ্লবী। তো কী আর করা যাবে, অভীষ্ট পূরণের জন্যে এটুকু তো করতেই হবে।

"কিন্তু আমি তো হিংসায় বিশ্বাস করি নে।"

"কেউই আর করে না।" সুভাষচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে তার অনুগত 'যুগান্তর গোষ্ঠী' ভেঙে গিয়েছে। কেউ কেউ হয়েছেন গান্ধীপন্থী, অনেকেই হয়েছেন মার্কসবাদী।

এরপর মন্ত্রীত্বের প্রশ্ন। এ সম্বন্ধেও নেতার উত্তরে গান্ধী খুশি হয়েছিলেন। শুধু যুক্তিযুক্তই ছিল না নেতার বিশ্লেষণ, ছিল দূরপ্রসারী। মন্ত্রীত্ব যখন স্বীকার করা হয়েছেই, চেষ্টা করতে হবে যাতে বাকি প্রদেশগুলোতে কংগ্রেসী মন্ত্রীত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলায় হয়তো হবে না। কিন্তু আসামে? ওখানে তো কঠিন নয়। *(নেতাজী : সঙ্গ ও প্রসঙ্গ, ১ম খণ্ড)।* যে সুভাষ এতদিন মন্ত্রীসভায় যোগদানের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন, বারবার জওহরলালকে বলেছেন মন্ত্রীসভায় যোগ না দেওয়ার জন্য, নানা লেখায় আগুন ঝরিয়েছেন। আজ গান্ধীর গাজরের সামনে সম্পূর্ণ ডিগবাজী খেলেন। গান্ধী খুশি হয়েছিলেন। কারণ তাকে খুশি করার জন্যেই তো বলা। পরিবর্তে পেলেন আকাঙ্খিত সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতির পদ।

সভাপতি হচ্ছেন জেনেই সুভাষচন্দ্র পাড়ি দিলেন ইউরোপের পথে ১৮ নভেম্বর ১৯৩৭। যেতে হবে অস্ট্রিয়ায় তার প্রণয়ী এমেলী শেঙ্কেলের কাছে। কারণ তিনি প্রকাশক থ্যাকার স্পিংক-এর কাছ থেকে মোটা টাকা এ্যাডভ্যান্স নিয়েছেন এক আত্মজীবনী লেখার জন্যে। এবং সেটা লিখতে হবে অত্যন্ত দ্রুত। কলকাতার ডামাডোলে তা হবে না। এমেলী শেঙ্কেলের সহযোগিতায় নির্জনে একমাত্র তা দ্রুত সম্ভব হতে পারে। অস্ট্রিয়ায় বসে লেখা হল 'An Indian Pilgrim'। যদিও তিনি নির্দিষ্ট সময়ে তা লিখে উঠতে পারেন নি *(বসু-বাড়ী)*

সুভাষচন্দ্র আর জওহরলাল——গান্ধীর দুই তুরুপের তাস

একটা প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই ওঠে——যে সুভাষ গান্ধীনীতির ঘোর বিরোধী, গান্ধীকে যে বারবার আঘাত করেছে, বারবার বিষোদ্গার করেছে——তাকেই গান্ধী ডেকে এনে কংগ্রেস সভাপতির পদে বসালেন কেন? তাও আবার এমন সময়ে যখন সুভাষচন্দ্র সর্বভারতীয় রাজনীতিতে রীতিমত কোনঠাসা। লক্ষ্য করবার বিষয় হল এ দিকটা নিয়ে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকেরাই বলুন বা তথাকথিত ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যাকারেরাই বলুন আশ্চর্যজনক ভাবে নীরব। এ দিকটা উন্মোচিত হলে কংগ্রেস নেতৃত্বের শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত মানুষের প্রতি বিরাট প্রতারণার মুখোস খুলে যাবে।

জওহরলাল আর সুভাষচন্দ্র দুজনেই কংগ্রেসের তরুণ নেতা। দুজনেই বিলেতে শিক্ষিত। উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের অভিজাত বংশের ছেলে। দুজনেই তথাকথিত চরমপন্থী, তথাকথিত বামপন্থী। সুভাষচন্দ্র প্রথম থেকেই গান্ধী বিরোধী চরমপন্থী বলে পরিচিত দলের সাথে যুক্ত——চিত্তরঞ্জনের শিষ্য, যে চিত্তরঞ্জন গান্ধীকে মোটামুটি বানপ্রস্থে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। জওহরলালের বাবা মতিলাল নেহেরু ছিলেন চিত্তরঞ্জনের সমপর্যায়ের সর্বভারতীয় চরমপন্থী নেতা। শোনা যায় ছেলে জওহরের প্রভাবেই নাকি মতিলাল চরমপন্থী হয়েছিলেন।

সুতরাং দেশের মানুষের কাছে জওহর আর সুভাষ দুজনেরই ছিল আপসাবিরোধী সংগ্রামী ভাবমূর্তি। তার উপর দুজনেই মাঝে মাঝে এমন বিবৃতি ঝাড়তেন যা স্পষ্টতই গান্ধী চিন্তার পরিপন্থী। এই দুজনের উপর দেশের মানুষের ছিল গভীর আস্থা।

আমরা আগেই দেখেছি, গান্ধীর নেতৃত্বে গোটা দেশজুড়ে বেশ বড় বড় আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। আন্দোলন এমন একটা উচ্চতায় পৌঁছে যেত যে বৃটিশ শাসনের ভিত অবধি নড়ে উঠত। ছাত্র-যুবক, কৃষক, শ্রমিকের দল ঝাঁপিয়ে পড়ত আন্দোলনে। আর আন্দোলন যখন পরিণত রূপ পেত, সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্খা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ফেটে পড়ত, গ্রামে-গঞ্জে কারখানায় সাধারণ মানুষ নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসত——কৌশলী সন্ত গান্ধী তখনই আন্দোলনের পেছনে ছুরি মারতেন। আন্দোলন বোতলবন্দী করাই হত তার প্রথম কাজ। মানুষ দুঃখে ক্ষোভে ফেটে পড়তে চাইত। একই কৌশল বেশিদিন চালানো যায় না। মানুষের ক্ষোভ, লড়াই-এর প্রবণতা প্রকাশিত হত অন্য রাস্তায়। মধ্যবিত্ত যুবক-যুবতীরা ঝুঁকত সন্ত্রাসবাদী পথে। আর মজুর-চাষী সংগঠিত হতে চাইত নতুন পতাকার নীচে। আমরা আগেই দেখেছি ১৯২২-এর অসহযোগ আন্দোলন থেকে গান্ধীর ন্যক্কারজনক পিছু-হটার পরে বাংলা, বোম্বে, পাঞ্জাবে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ দারুণ বেড়ে গেল। একই সাথে চাষী-মজুরের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন দেশের প্রান্তে প্রান্তে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। বোম্বাই-এর বিশাল সূতাকল ধর্মঘট এবং তাদের জয় একই সাথে বৃটিশ শাসক আর ভারতীয় মিল মালিকদের বুকে কাঁপন ধরিয়ে দিল। অন্ধ্র, তামিল, বাংলা বিহারের কৃষক বিদ্রোহ একের পর এক দেখা দিল। গান্ধী দেখলেন সমূহ বিপদ। জনতাকে কংগ্রেস অভিমুখী করানোর জন্যে একটা নতুন কিছু করা দরকার। ইতিমধ্যে জওহরলাল ইউরোপ থেকে ফিরে এসেছে। এসেই এক বিরাট ক্রান্তিকারী মেজাজও দেখিয়ে ফেলেছে। ১৯২৭-এর মাদ্রাজ কংগ্রেসে স্বাধীনতার প্রস্তাব সমর্থন করেছে। গান্ধী মাদ্রাজে উপস্থিত থাকলেও বুঝেশুনে অধিবেশনে যান নি। অন্য নেতারা নিমের পাচনের মত তা গিলেছেন। জওহরলাল নেহেরু নিজে পর্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গিয়েছেন এ্যানি বেসান্তের মত প্রতিক্রিয়াশীল নেতারা পর্যন্ত তা সমর্থন করেছেন দেখে। (*জওহরলাল নেহেরু——আত্মচরিত*)। গান্ধী দেখলেন এই সুযোগ, তিনি চাইলেন ১৯২৮ সালেই জওহরলালকে কংগ্রেস সভাপতি করতে। মতিলালও ছেলেকে সুযোগ করে দিতে সভাপতিপদে দাঁড়াতে চাইলেন না। কিন্তু আগের বছরের স্বাধীনতার প্রস্তাব জলাঞ্জলি দিতে ১৯২৮ সালের কংগ্রেসে মতিলাল নেহরুর সংবিধান গৃহীত হবার দরকার ছিল। তাই শেষ পর্যন্ত মতিলাল নেহেরু কৌশল করে বললেন তার সংবিধান কংগ্রেসে গৃহীত হলে (যে সংবিধানে স্বাধীনতার প্রস্তাব বাদ দিয়ে স্বায়ত্তশাসনের কথা আছে) তবেই তিনি কংগ্রেস সভাপতি হবেন। সুভাষসহ কোন চরমপন্থীই ট্যাঁ-ফ্যো করলেন না। করবেনই বা কি করে, সুভাষচন্দ্র নিজেই তো সংবিধানে সই করে বসে আছেন। জওহরলাল আর সুভাষচন্দ্র কিন্তু বসে রইলেন না। তারা কখনও একসাথে কখনও আলাদা আলাদা ছাত্র-যুবকদের সভায় সভায় বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছেন। আর কোনও বক্তৃতাতেই কোন নরম কথা নেই। আবার একথা ভাবলে ভুল হবে দু'জনেই একমত একজোট। দু'জনে একসাথে কাজ করলেও পারস্পরিক ঈর্ষা এবং উচ্চাকাঙ্খার দ্বন্দ্ব কম ছিল না। কংগ্রেসে স্বাধীনতা প্রস্তাব গৃহীত হতে চাপ সৃষ্টি করার জন্যে ১৯২৮ সালে দুজনে তৈরী করলেন Independence for India league। গান্ধী আর দেরি করলেন না। ১৯২৯ সালে অন্য নেতাদের বাধা না মেনেই জওহরলালকে কংগ্রেস সভাপতি করলেন। তিনি এক তীরে দুই পাখি মারলেন। প্রথম তো এই মানিকজোড়কে আলাদা করলেন, দ্বিতীয় কংগ্রেসের বামপন্থী সংগ্রামমুখী ভাবমূর্তি রাখলেন।

১৯৩১-৩৪ এর আইন অমান্য আন্দোলনের সময় একই ইতিহাস দেখা গেল। ধাপে ধাপে গান্ধী আন্দোলনকে ক্ষতবিক্ষত করে হত্যা করলেন। এমনকি কংগ্রেস আইনসভায় যোগ দিয়ে সরকারি ফাঁদে পা দিল। আবার জনসাধারণের মধ্যে হতাশা দেখা দিল। আবার শ্রমিক কৃষকের আন্দোলন গতি পেল। কংগ্রেসের মধ্যেকার তরুণ ও মেধাসম্পন্ন সেরা কর্মীরা কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক দল গড়ে তুলল। গান্ধী দেখলেন আর একবার ঝুলি থেকে বেড়াল বের করা দরকার। সমাজবাদীদের ঠেকাতে তাদের উপহার দিতে হবে সমাজবাদী নেতা। সুতরাং ১৯৩৬ সালে আবার কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল। এবারও দলের প্রবীন নেতারা গান্ধীকে বাধা দিতে চাইলেন। বুদ্ধিতে প্যাটেল, রাজেন্দ্র প্রসাদ, রাজাগোপালাচারীরা গান্ধীর ধারেকাছে আসেন না। তারা ভাবেন বামপন্থী জওহরলাল বুঝি সব তছনছ করে দেবে। কিন্তু ধুরন্ধর গান্ধী জানেন কার দৌড় কতখানি। জওহরলাল সভাপতির ভাষণ দিলেন মার্চ ১৯৩৬-এ। শুনলে মনে হবে বুঝি কোনো বামপন্থী দলের বক্তৃতা। গান্ধী তো তাই চান। ভাষণে-লিখনে দারুণ বামপন্থা, কাজে মিল মালিক জমিদারদের স্বার্থরক্ষা। ভারতীয় শিল্পপতিদের মধ্যে জওহরলাল নেহরুর এই আগমার্কা সমাজতন্ত্রী ভাষণের প্রভাব পড়েছিল। বোম্বের ২১ জন বাঘা বাঘা শিল্পপতি ক্ষেপে গিয়ে মে মাসে এক যৌথ ইস্তেহার প্রকাশ করলেন। তাতে তারা লিখলেন যে নেহরু এত সমাজতন্ত্র সমাজতন্ত্র করছেন, সে সমাজতন্ত্র তো সমস্ত রকমের ধর্ম, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরোধী এক ভয়ঙ্কর বিপদ। রাজনীতি ক্ষেত্রে যেমন ধুরন্ধর গান্ধী, শিল্পপতি মহলে তেমনি ধুরন্ধর বিড়লা। ঘনশ্যাম দাস বিড়লা এক চিঠিতে এই ২১ শিল্পপতিকে ধমকে দিয়ে লিখলেন——"কোন সম্পত্তিশালী ব্যক্তির পক্ষে, সে যে সম্পত্তি হাতছাড়া হওয়ার বিরোধী, একথা বলাটা অত্যন্ত মোটাদাগের ব্যাপার।" তিনি আরও লিখলেন যে একথা বলাটা তাদের উপরই ছেড়ে দেওয়া উচিত 'যারা সম্পত্তি ত্যাগ করেছে' আর 'আমরা যদি তাদের হাত শক্ত করতে পারি। তাহলেই সবদিক রক্ষা হবে।' *(ওয়ালচন্দ্র হীরাচন্দ্রকে ২৬ মে ১৯৩৬ জে. ডি. বিড়লার চিঠি। ঠাকুর দাস পেপারস, এফ এন ১৭৭)* মোদ্দা কথা জওহরলালের কথায় অত ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আর এক শিল্পপতি পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস ২০ এপ্রিল বিড়লাকে জানিয়েছিলেন——"জওহরলালের ভালো কাজ সম্বন্ধে আমার কোনোকালেই কোনো সন্দেহ নেই, আমার শুধু মনে হয় তাকে ঠিকপথে রাখতে গেলে বেশ Nursing করতে হবে।" এখানে সত্যি কথা বলতে, Nursing কথাটার বাংলা দিতে পারলাম না। এটা এতই অর্থবহ কথা যে এর অর্থ——'যত্ন আত্তি' হতে পারে, 'তোষামোদ করা' হতে পারে. 'ঘুষ-দেওয়া' হতে পারে, আবার 'মগজ-ধোলাই'ও হতে পারে।

কিন্তু জওহরলালের ঐ সমাজতন্ত্রের অমৃতকথা গান্ধীর পক্ষেও বেশিদিন হজম করা সম্ভব হল না। তিনি জওহরকে একটু কড়কে দিতে চাইলেন। ১৯৩৬ সালের ২৯ জুন জওহরলাল গান্ধীর ওয়ার্ধার আশ্রম থেকে পাঠানো একটা চিঠি পেলেন। চিঠি নয় পদত্যাগপত্র——লিখেছেন ওয়ার্কিং কমিটির বাঘা বাঘা সাত সদস্য। এবং এই পদত্যাগপত্র স্বয়ং গান্ধীকে দেখিয়ে তার অনুমোদন নিয়েই পাঠানো হয়েছিল। পদত্যাগপত্র পেয়ে জওহর হতবাক——

প্রিয় জওহরলালজি,

আপনার ও আমাদের মধ্যে সুস্পষ্ট মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের পর আপনি আমাদের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনীত করেছেন। আমরা ভেবেছিলাম আমরা

মতপার্থক্যের বিষয়গুলিকে পরিহার করে সহমতের বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে চলব। আমাদের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে চেষ্টার কোন ত্রুটি হয় নি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এমন কোন মীমাংসায় আসা সম্ভব হল না যাতে দুটি বিপরীত সত্তা একসাথে কাজ করতে পারে বা একই সুরে কথা বলতে বারে। কংগ্রেস আজও সমাজতন্ত্রের নীতি গ্রহণ করে নি। এমত অবস্থায় কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট যদি সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যায় ও প্রচারে মুখর হয়ে ওঠেন, আমরা মনে করি, এর ফলে দেশের অমঙ্গল ঘটবে এবং আমরা বিশ্বাস করি যে স্বাধীনতা সংগ্রামের পথে এ কাজ দারুন বাধা সৃষ্টি করবে। দেশের সামনে স্বাধীনতা সংগ্রামের চেয়ে আর কোন বড় আদর্শ নেই, থাকা উচিতও নয়।

আপনি সম্ভবত মনে করেন কখনও কখনও প্রকাশও করেছেন যে ওয়ার্কিং কমিটি আপনার মনঃপূত হয় নি। ওটা আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনাকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের ধারণা ঠিক উল্টোটি। আপনার উপর জোর করে এটা চাপানো হয়েছে একথা আমাদের জানা নেই। যাইহোক, কমিটি আপনার পছন্দ হয় নি। যে কমিটিকে আপনি একটা বোঝা বলে মনে করেন তাকে বয়ে বেড়ান, তা আমরা চাই না। অপরদিকে আমরা মনে করি, এই অবস্থায় সামনের নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় সংগঠনের ভার নিতে আমরা সম্পূর্ণ অপারগ।

সেইজন্য, আমরা নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বেও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পদত্যাগ করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা বিশ্বাস করি গভীর বিবেচনার পর আমরা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি তাতে আপনার উপর, আমাদের নিজেদের উপর সর্বোপরি দেশের স্বার্থের প্রতি সুবিচারই করা হবে।

স্বাক্ষর

রাজেন্দ্র প্রসাদ, সি রাজাগোপালাচারী, জয়রামদাস দৌলতরাম,

যমুনালাল বাজাজ, বল্লভভাই প্যাটেল, জে বি কৃপালিনী ও এস বি দেব।

সাথে সাথে জওহরলাল ছুটে গেলেন গান্ধীর কাছে। পদত্যাগীরা তো ছিলেনই। এখনকার দিনের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতারা যা করে থাকে——মানুষকে বিপদে ফেলে আবার নিজেই ত্রাণকর্তা বন্ধু সাজা, গান্ধী তাই করলেন। মিটিয়ে দিলেন সব। আর 'সমাজতন্ত্রের ভূত'ও জওহরলালের মাথা থেকে চিরতরে নেমে গেল। জওহরলাল বহাল তবিয়তে রয়ে গেলেন দক্ষিণপন্থী ওয়ার্কিং কমিটির বামপন্থী বিপ্লবী প্রেসিডেন্ট।

জওহরলাল প্রেসিডেন্ট হওয়াতে দেশের মানুষের যে আশা-আকাঙ্খা জাগরুক হয়েছিল তা মিইয়ে যেতে বেশি দেরি হল না। মানুষ প্রবলভাবে আশাহত হল। গান্ধীর কাছেও জওহরলালের প্রয়োজন আপাতত ফুরলো। জওহরলালের বামপন্থী রস নিংড়ানোর পর, আর কচলালে আসলি তেতো বেরিয়ে পড়বে। গান্ধী চাইলেন জনতাকে ধোঁকা দিতে আরও বিপ্লবী আরও বামপন্থী সুভাষচন্দ্রকে ঝুলি থেকে বার করতে। ইউরোপে থাকাকালীন জওহরকে লেখা সুভাষের কাকুতি-মিনতি গান্ধীর নজর এড়ায় নি। তিনি এও লক্ষ্য করেছিলেন যে ইদানিং সুভাষের বক্তব্যে আর আগেকার মত গান্ধী বিরোধিতা নেই। ১৯৩৭ এর ১ নভেম্বর বল্লভভাই প্যাটেলকে লেখা এক চিঠিতে গান্ধী লিখলেন যে——"যদিও সুভাষচন্দ্র একেবারেই নির্ভরযোগ্য নয়, তবু সে ছাড়া কংগ্রেস সভাপতি হওয়ার মত অন্য কেউ নেই।" *(এম কে গান্ধী——ওয়ার্কস্ Vol. LXVI)*। সুতরাং সুভাষচন্দ্র বিনা বাধায় সর্বসম্মতিতে সভাপতি মনোনীত হলেন। এবার দেখা যাক পরাধীন ভারতের সবচেয়ে দুই

কৌশলী, সবচেয়ে ধূরন্ধর দুই রাজনৈতিক নেতা গান্ধী-সুভাষের মুখোমুখি লড়াই কোন পথে যায়!

কংগ্রেসের সেরা সভাপতি——সুভাষচন্দ্র

একদিকে কমিউনিস্ট সহ কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টির পূর্ণ সমর্থন অন্য দিকে গান্ধীসহ রক্ষণশীল নেতাদের সমর্থন, সর্বোপরি দেশের কোটি কোটি মানুষের নতুন করে আশায় বুক বাঁধা——এত সমর্থন নিয়ে এর আগে কেউ কংগ্রেস সভাপতি হতে পারেন নি। তার উপর ভারতবর্ষের প্রায় সবকটা প্রধান প্রদেশে কংগ্রেসের মন্ত্রীসভা। এগারোটা প্রদেশের মধ্যে সাত-সাতটা প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী কংগ্রেসী। (তখন প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রী বলা হত)। ক্ষমতার স্বাদে কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যাও বেড়েছে প্রচুর। ১৯৩৬এ কংগ্রেস সদস্য সংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ, ১৯৩৭ এ লাফিয়ে বাড়ল ৩১ লক্ষ আর ১৯৩৮ সালে তা পৌঁছাল ৪৫ লক্ষে। মোটকথা কংগ্রেসের এত বড় সুসময়ে এত সমর্থন নিয়ে এর আগে কেউ সভাপতি হতে পারেন নি।

হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণে সুভাষচন্দ্র যথারীতি সমাজতন্ত্র, জমিদারী-প্রথা বিলোপ, ভূমি-সংস্কার, শ্রমিক কল্যাণ, ইত্যাদির কথা বললেন। সাথে সাথে ভারতীয় শিল্পপতিদের আশ্বস্ত করলেন এই বলে যে——"এই দেশের নাগরিকদের সঙ্গে সমান শর্তে বিদেশীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অনুমতি দান রীতিমত অনৈতিক।" তিনি ১৯৩১ সালে ইয়ং ইন্ডিয়াতে গান্ধীর লেখা একটা প্রবন্ধের লাইন তুলে বললেন——"ভারতীয় স্বার্থ এবং ইংরাজ কিংবা ইউরোপীয় স্বার্থের মধ্যে কোনো বৈষম্য না করিতে বলার অর্থ হইল ভারতীয় ক্রীতদাসত্ব চিরস্থায়ী করা। দৈত্য ও বামনের মধ্যে সমান অধিকারের অর্থ কি?" তার মানে কংগ্রেস শাসনে দেশীয় শিল্পপতিরা সংরক্ষণের সুযোগ নিয়ে মুনাফা করতে পারবে——সভাপতি সুভাষ এ গ্যারান্টি দিলেন।

কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতারা যেমন বাঘা বামপন্থী জওহরলালকে সভাপতি বানিয়ে যা যা চেয়েছিল তাই করিয়ে নিয়েছিল সুভাষচন্দ্রকে সভাপতি বানিয়েও হরিপুরায় কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিল। প্রথমতঃ হরিপুরা কংগ্রেসে প্রস্তাব পাশ হল যে——কংগ্রেস হিংসায় বিশ্বাসী রাজবন্দী নিয়ে 'বাড়াবাড়ি' করার বিরোধী। যে সুভাষ এতদিন রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীতে নানা আন্দোলন করে এসেছেন, প্রকৃতপক্ষে বাংলায় তার জনপ্রিয়তার মূল কারণ এটাই——তিনি কোনো বাধা দিলেন না। শুধু তাই নয়, বন্দীমুক্তির দাবীতে যুক্তপ্রদেশে গোবিন্দবল্লভ পন্থ আর বিহারে শ্রীকৃষ্ণ সিং-এর মন্ত্রীসভা যে পদত্যাগ করেছিল এই অধিবেশনের পরে তারা দিব্যি তা তুলে নিলেন। আর অবিলম্বে সকল রাজবন্দীর মুক্তির বদলে লাট তার ইচ্ছা অনুযায়ী মুক্তি দেতে পারেন——এই নীতিই বহাল থাকল। আর একটা বিষয় কংগ্রেস নেতৃত্বকে খুব ভাবাচ্ছিল। ১৯৩৬ থেকেই সারা ভারতজুড়ে কিষাণ সভার নেতৃত্বে জোরালো কৃষক আন্দোলন হচ্ছিল। এইসব আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন মূলত সোসালিস্ট, কমিউনিস্ট এবং কংগ্রেসের এমন অংশের লোকেরা যারা ছিলেন জমিদারবিরোধী। এই আন্দোলনগুলোর মধ্যে দিয়ে ক্রমশই সোসালিস্ট এবং কমিউনিস্টরা তাদের ভিত মজবুত করছিল। এমনকি ১৯৩৭ এর অক্টোবর থেকে কিষান সভা লাল ঝান্ডাকেই তাদের পতাকা করে নেয়। হরিপুরায় কংগ্রেস এক প্রস্তাব আনল। তাতে বলা হল যে——কংগ্রেস কৃষকদের অধিকারকে স্বীকার করে। কংগ্রেস নিজেই

কৃষকদের প্রধান সংগঠন। সুতরাং কংগ্রেসকে স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করাই সংগঠনগুলোর কাজ হওয়া উচিত। প্রস্তাবে দেশের সমস্ত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে নির্দেশ দেওয়া হল যাতে কিষান সভাগুলো এমন কোন কাজ না করে যা কংগ্রেসের নীতিবিরোধী——সে বিষয়ে সঠিক ব্যবস্থা নিতে। আরও একটা প্রস্তাব দক্ষিণপন্থীরা দিব্যি পাশ করিয়ে নিল। দেশীয় রাজ্যগুলোতে কৃষকদের উপর রাজা-নবাবদের শোষণ ছিল আরও অনেক বেশি। সেখানকার কৃষকেরা বারবার বিক্ষোভে ফেটে পড়তে চাইছিল। কিন্তু যেহেতু সেখানে কংগ্রেসের ভালো সংগঠন ছিল না, নেতৃত্ব বামপন্থীদের হাতে চলে যেতে পারে তাই প্রস্তাব নেওয়া হল যে——দেশীয় রাজ্যগুলোতে যে কংগ্রেস কমিটি আছে তারা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নির্দেশ অনুসারে চলবে। কিন্তু কংগ্রেসের নামে কোন আন্দোলন চালাতে পারবে না। সুভাষচন্দ্রের সব বেস্টসেলার জীবনীকার তার হরিপুরা ভাষণ নিয়ে খুব লাফালাফি করেন কিন্তু হরিপুরা কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবগুলো নিয়ে কোন উচ্চবাচ্য করেন না। সুভাষ যে শুধু এই প্রস্তাবগুলো মেনে নিয়েছিলেন তা নয়, তিনি সভাপতির ভাষণে এর প্রসারিত রূপ দিলেন। ট্রেড ইউনিয়ন এবং কিষাণ সভার আন্দোলন সম্পর্কে বললেন——

আমি ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ও কিষানসভাগুলির মতো সংগঠন এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সহিত তাহাদের সম্পর্কের উল্লেখ করিতেছি। এই প্রশ্নে দুটি বিরোধী চিন্তাধারা আছে যাঁহারা কংগ্রেসের বহির্ভূত যে-কোনো সংগঠনের নিন্দা করেন তাঁহারা এবং যাঁহারা এরূপ সংগঠনের পক্ষপাতী তাঁহারা। আমার নিজের অভিমত এই যে আমরা এই-সব সংগঠনকে অবজ্ঞা করিয়া কিংবা নিন্দা করিয়া তাহাদের অবলুপ্তি ঘটাইতে পারি না। আমার আশঙ্কা এই যে আমরা পছন্দ করি কিংবা না করি ইহাদের অস্তিত্বের সঙ্গে আমাদের নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া লইতে হইবে। একমাত্র প্রশ্ন হইল কংগ্রেস ইহাদের সহিত কিরূপ আচরণ করিবে। যে জাতীয় কংগ্রেস রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য গণ-সংগ্রামের সংগঠন, স্পষ্টতই এই-সব সংগঠন কখনই তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকা পালন করিবে না। সুতরাং ইহাদের উচিত কংগ্রেসী আদর্শ ও কর্মপদ্ধতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়া এবং কংগ্রেসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কাজ করা। ইহা সুনিশ্চিত করার জন্যে বহুসংখ্যক কংগ্রেস কর্মীদের ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষক সংগঠনগুলিতে অংশ গ্রহণ করা উচিত। *(হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণ)*। তার মানে, কংগ্রেসে যারা বামপন্থী আছেন তারা শ্রমিক, কৃষকদের সংগঠনকে চান, কিন্তু দক্ষিণপন্থীরা তা চান না। 'বামপন্থী' সুভাষের ইচ্ছা হল এই সব সংগঠনগুলোতে বেশি বেশি করে কংগ্রেসের লোকজন ঢুকিয়ে নিয়ে সেগুলো দখল করে নেওয়া। তারপর এগুলোকে কংগ্রেস নেতৃত্বের ইচ্ছা অনুযায়ী চালাতে কোন অসুবিধাই হবে না। এত বিশাল আর সর্বাত্মক পরিকল্পনা তাবড় দক্ষিণপন্থীরাও করে উঠতে পারে নি।

কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে সুভাষচন্দ্রের আর একটা দুর্ধর্ষ কাজ আসামে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা গঠন। আসাম প্রদেশে কোন দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় নি। কংগ্রেসের আসন সংখ্যা অন্য দলগুলোর চেয়ে বেশি ছিল। কিন্তু নেহেরু আমলের নীতি ছিল কোন প্রদেশে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে মন্ত্রীসভা গড়া হবে না। তাই আসামে ছিল শাহদুল্লা-র কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস সভাপতি হয়েই অন্যরকম ভাবলেন। এর পর যা ঘটল তার পুনরাবৃত্তি এখন রাজ্যে রাজ্যে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়। কংগ্রেস সভাপতি সুভাষ আসামে গেলেন। চলল ব্যাপক দল ভাঙাভাঙির খেলা। বাধ্য হয়ে

মুখ্যমন্ত্রী শাহদুল্লা পদত্যাগ করলেন। ঐ দিনই সন্ধ্যায় আসামের কংগ্রেস নেতা গোপীনাথ বরদোলই গভর্ণরের সাথে দেখা করে নতুন মন্ত্রীসভা গড়ার দাবী পেশ করলেন। যারা অন্য দল ভেঙে কংগ্রেসে আসতে চায় তাদেরকে নিরাপদে রাখা হল। সুভাষচন্দ্র অভিযোগ করলেন——

কংগ্রেস কোয়ালিশন দলে যোগ দিতে আগ্রহী বলিয়া সন্দেহ করা হইতেছে এরূপ কয়েকজন আইন-সভা সদস্যকে কড়া পাহারায় রাখা হইয়াছে এবং ইহা ছাড়া ভীতি প্রদর্শনও চলিতেছে। যাঁহারা কংগ্রেস কোয়িলিশন দলে যোগ দিতে পারেন তাঁহাদিগকে ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে গত কয়েকদিন ধরিয়া শিলং-এ বহুসংখ্যক বাহিরের লোক আমদানি করা হইয়াছে। এই বহিরাগতদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে স্পীকার এবং সরকারী কর্মচারীদের কাছে অভিযোগও করা হইয়াছে। (*১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮ কংগ্রেস সভাপতির বিবৃতি*)। আবার বরদোলই-এর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণের দিন পিছিয়ে দেওয়ার জন্যে তিনি গভর্ণরের সমালোচনা করলেন। আজকের দিনে যে রাজনৈতিক নেতারা আয়ারাম গয়ারাম করে মন্ত্রীসভা ভাঙেন নতুন মন্ত্রীসভা গড়েন তাদের লজ্জা পাবার কিছু নেই। তারা আক্ষরিক অর্থেই সুভাষচন্দ্রের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন।

শুধু তাই নয়, সুভাষচন্দ্রের সন্দেহ হল যে আসামের চা বাগানের মালিকেরা পুরো ঘটনাটায় কংগ্রেসকে মদত না দিয়ে শাহদুল্লাকে মদত দিচ্ছে। তাই তিনি হুমকি দিলেন——

আসামের কংগ্রেস দল আজ প্রশাসনের ভারপ্রাপ্ত এবং এই দল চা-কর সমিতি-সহ সকল সংখ্যালঘুদের প্রতি নিরপেক্ষ আচরণে ও ন্যায়বিচারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই দল আইন-সভার সকল গোষ্ঠীর প্রতি বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করিয়া দিয়াছে। এই সদিচ্ছার পরেও যদি আসামের ইউরোপীয়গণ বিনা প্ররোচনায় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, তাহা হইলে ফলাফলের পূর্ণ দায়িত্ব হইবে তাঁহাদের। আসামের চা-কর সমিতি কি চান? আমি তাঁহাদিগকে ধীর ভাবে চিন্তা করিতে বলি। (*২২ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮ শ্রীহট্টে এ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের কাছে বিবৃতি*)

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অন্য নেতারা প্রথমে সুভাষের উদ্যোগে সায় দেন নি। তবে তা কোন আদর্শগত কারণে নয়, তারা ভেবেছিলেন যে এ মন্ত্রীসভা টিকবে না। কিন্তু যখন মন্ত্রীসভা সত্যি সত্যিই টিঁকে গেল তারা অত্যন্ত পুলকিত হলেন এবং সুভাষকে তার প্রাপ্য বাহবা দিলেন।

কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র গান্ধীর প্রতি আনুগত্যের একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখলেন। মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রীসভায় প্রবল গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ছিল। তার সাথে যোগ হল ভাষাভিত্তিক গোষ্ঠীতন্ত্র। মধ্যপ্রদেশের মারাঠী মুখ্যমন্ত্রী (তখন প্রধানমন্ত্রী বলা হত) ডঃ এন বি খারে-এর বিরুদ্ধে পদত্যাগ করলেন হিন্দিভাষী রবিশঙ্কর শুক্ল, ডি পি মিশ্র গোষ্ঠী। (কারণ, দুর্নীতির অভিযোগে এদের বিরুদ্ধে ডঃ খারে তদন্ত কমিশন বসিয়েছিলেন)। গান্ধীসহ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ছিলেন রবিশঙ্কর শুক্ল'র পক্ষে। ডঃ খারে-কে সাবরমতী আশ্রমে ডেকে এনে একটা স্বীকারোক্তি লিখিয়ে নেওয়া হল। সুভাষচন্দ্রসহ ওয়ার্কিং কমিটির নেতাদের সামনে গান্ধী নিজহাতে তার সাথে আরও কিছু লিখে-কেটে যোগ বিয়োগ করে দিলেন। খারেকে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে রবিশঙ্কর শুক্লকে মুখ্যমন্ত্রী করা হল। ডঃ খারে কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটির এ সিদ্ধান্ত মেনে নিলেন না। এ ঘটনার ফলে সুভাষচন্দ্রের যে দক্ষিণপন্থী বিরোধী ভাবমূর্তি ছিল তা বেশ ধাক্কা খায় এবং তাকে আত্মপক্ষ সমর্থন

করে এক দীর্ঘ বিবৃতি দিতে হয়। পরে ডঃ খারে এক স্মৃতিচারণায় একথা লিখেছিলেন যে সুভাষচন্দ্র তাকে ব্যক্তিগত ভাবে সমর্থন করেছিলেন কিন্তু তখন সুভাষ গান্ধীর হাতের পুতুল হয়ে গিয়েছিলেন। ডঃ খারে সুভাষচন্দ্রকে এক চিঠিতে এই বলে সাবধান করে দিয়েছিলেন যে, যেভাবে খারেকে গান্ধীর স্বৈরতান্ত্রিকতার শিকার হতে হল, তেমনভাবে সুভাষকেও একদিন শিকার হতে হবে। তার এ ভবিষ্যৎবাণী কতটা সঠিক হয়েছিল তা আমরা পরের অধ্যায়ে দেখাব। যে যে কথা বলে সুভাষচন্দ্র খারেকে অপসারণের যুক্তি দেখিয়েছিলেন ঠিক সেই কথাগুলোই তার নিজের দিকেই ফিরে এসেছিল।

জওহরলালকে সভাপতি করে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বকে যেটুকু অসুবিধার সামনে পড়তে হয়েছিল সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে সেটুকুও ছিল না। একের পর এক শ্রমিক-কৃষক স্বার্থের বিরুদ্ধে শিল্পপতি জমিদারদের পক্ষের কাজ তারা করিয়ে নিতে পারল। ১৯৩৭ এর প্রাদেশিক নির্বাচনে কংগ্রেস যে প্রদেশগুলোতে ক্ষমতায় আসতে পেরেছিল তা ঐ শিল্পপতি জমিদারদের টাকাতেই। বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় পার্লিয়ামেন্টারি বোর্ডে বিড়লা দিয়েছিলেন ৫ লাখ টাকা, আর বিহারে কংগ্রেস কমিটি যে টাকা তুলেছিল তার ৩৭ হাজার টাকার মধ্যে এক ডালমিয়াই দিয়েছিল ২৭ হাজার টাকা (*সুমিত সরকার—মডার্ণ ইন্ডিয়া*)। সুতরাং শিল্পপতিদের স্বার্থ কংগ্রেসকে দেখতেই হবে। দিকে দিকে যে শ্রমিক আন্দোলন হচ্ছিল তার রাশ টেনে ধরাই হল কংগ্রেসের প্রধান কাজ। তবুও শেষরক্ষা হচ্ছিল না। শ্রমিকেরা বেশি বেশি করে বামপন্থী ইউনিয়নের পতাকাতলে সামিল হচ্ছিল। খোদ গান্ধীর ঘাঁটি আমেদাবাদে বামপন্থীরা ক্ষমতাশীল হয়ে উঠল। সুতরাং মিলমালিকদের তুষ্ট করতে আর শ্রমিকদের ঠান্ডা করতে কমিউনিষ্টদের শক্ত ঘাঁটি বোম্বাইতে কংগ্রেস সরকার ১৯৩৮ এর নভেম্বরে বোম্বাই শ্রমবিবাদ আইন আনল। এই আইনে মালিক লক-আউট করলে কোন শাস্তি ছিল না, কিন্তু বেআইনী ধর্মঘটের জন্যে ছ'মাসের জেলের ব্যবস্থা করা হল। সর্বোপরি শ্রমিক আন্দোলনের উপর বাধ্যতামূলক শালিসি চাপানোর ব্যবস্থা রাখা হল আইনে। কংগ্রেস ছাড়া সব দল এমনকি মুসলিম লীগ পর্যন্ত এই আইনের বিরোধিতা করল। আইনের প্রতিবাদে ৬ নভেম্বর বোম্বাইতে এক লক্ষ শ্রমিকের সমাবেশে কংগ্রেসপন্থীরা যোগ দিল না। এই অক্টোবর মাসেই কংগ্রেস মন্ত্রীসভা ধর্মঘট ভাঙ্গার জন্যে যুদ্ধকালীন ভারতরক্ষা আইন প্রয়োগ করল যদিও কোন যুদ্ধ সেসময় ছিল না। বিপ্লবী জওহরের মনে হল বোম্বাই আইনটা 'মোটের উপর ভালোই' (*মার্কোভিট্স—ইন্ডিয়ান বিজিনেস্ এ্যান্ড ন্যাশনাল পলিটিক্স্ ফ্রম ১৯৩১ টু ১৯৩৯*) আর এক বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র ব্যক্তিগতভাবে প্যাটেলের কাছে মৃদু প্রতিবাদ করলেও এটাকে নিয়ে বেশিদূর যেতে রাজী হলেন না। কংগ্রেস ইতিহাস লেখক পট্টভি সীতারামাইয়া সার্টিফিকেট দিয়েছেন—

সুভাষবাবু কংগ্রেসের মধ্যে কথা-না-কওয়া প্রেসিডেন্টদের মধ্যে অন্যতম। পুরো বছর সভাপতিত্বের মধ্যে তিনি কতবার ওয়ার্কিং কমিটির সভায় কথা বলেছেন তা আঙুলে গুনে বলা যায়। (*পট্টভি সীতারামাইয়া—দ্য হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস, Vol. II*)

একটামাত্র বিষয়ে সুভাষচন্দ্রের সাথে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মতভেদ হল তা বাংলার মন্ত্রীসভা নিয়ে। সুভাষচন্দ্র চাইলেন আসামের কায়দায় বাংলার মন্ত্রীসভা দখল করে নিতে। কিন্তু বাংলা আইনসভায় কংগ্রেসের সদস্যসংখ্যা সাকুল্যে মাত্র ৫৩। কিন্তু সুভাষ দমবার পাত্র নন। কারণ ঐ সময় বাংলার মন্ত্রীসভাকে ফেলবার সুভাষচন্দ্রের খুব

প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। বাংলায় তখন ছিল ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা পার্টির মন্ত্রীসভা। এই পার্টির মন্ত্রীসভা গঠনের ছোট একটা ইতিহাস আছে। ১৯৩৬ সালে কৃষক প্রজা পার্টি আবুল মনসুর আহমেদ, শামসুদ্দীন আহমেদ, নৌশের আলি-এর মত অপেক্ষাকৃত র‍্যাডিকাল নেতাদের প্রভাবে তারা কর্মসূচি নেয় যে——বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী লোপ করা হবে, কৃষিজমির উপর খাজনা কমানো হবে এবং সকলের জন্যে প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক করা হবে। না মুসলিম লীগ, না কংগ্রেস——কারও পক্ষেই এ কর্মসূচী হজম করা সম্ভব ছিল না। কারণ বাংলায় দুই দলেরই মূল স্তম্ভ ছিল জমিদার শ্রেণী। ভোটে দেখা গেল কংগ্রেসকে হারিয়ে কৃষক-প্রজা পার্টি বাংলায় একক বৃহত্তম দল হয়েছে। যদিও মন্ত্রীসভা গড়ার মত সংখ্যাগরিষ্ঠতা তাদের ছিল না। মুসলিম লীগের ফল খুব খারাপ হল। ফজলুল হক নিজে মুসলিম লীগের বড় নেতা খাজা নাজিমুদ্দীনকে হারালেন। কৃষক-প্রজা পার্টি কংগ্রেসের সাথে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা করতে চাইল। আলোচনায় বসা হল। কংগ্রেস চাইল নতুন মন্ত্রীসভা রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীকে সর্বোচ্চ প্রাথমিকতা দিক। কৃষক-প্রজা পার্টির বক্তব্য ছিল এই প্রশ্নে ছোটলাট ভেটো দিলে কার্যত মন্ত্রীসভার পতন হয়ে যেতে পারে। তারা চাইল কৃষক প্রজাসত্ব আইনের সংস্কারকে সর্বোচ্চ প্রাথমিকতা দিতে। এতে আবার কংগ্রেসের ঘোর আপত্তি। সুযোগ বুঝে মুসলিম লীগ তখন কৃষক-প্রজা পার্টিকে সমর্থন জানাল। কৃষক-প্রজা পার্টি ক্ষমতায় এসে প্রজাসত্ব আইনের সংশোধনী আনল। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার কৃষক-প্রজা পার্টি মেহনতী কৃষক, ভাগচাষী, ক্ষেত-মজুরের দল ছিল না। এরা ছিল বড়চাষী মধ্যচাষীদের স্বার্থরক্ষাকারী একটা দল। তবুও এরা মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেসের মত জমিদারদের স্বার্থবাহী দলও ছিল না। ফলে ১৯৩৮ সালের প্রজাস্বত্ব সংশোধনীটা ছিল প্রচলিত আইনের চেয়ে অনেক বেশি কৃষক স্বার্থবাহী। এই সংশোধনীর ফলে রায়ত ও কোর্ফা প্রজা জমি দান, বিক্রি, হস্তান্তরের অধিকার পায়। জমিদারের সেলামী উঠিয়ে দেওয়া হয়। জমিদারের জায়গায় শরিক অগ্রাধিকার (pre-emption) পায়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংশোধনী ছিল কৃষি সুদের হার টাকায় দু আনা থেকে কমিয়ে এক আনায় নামিয়ে আনা হল এবং জমিদারদের খাজনা বৃদ্ধির অধিকার দশ বছরের জন্যে স্থগিত রাখা হল।

অনুরূপ একটা সংশোধনী ১৯২৮ সালে সুভাষচন্দ্র বসু এবং শরৎ চন্দ্র বসুর নেতৃত্বে কংগ্রেসের বিরোধিতার জন্য আইনসভায় পাশ হতে পারে নি। এবার কিন্তু বাধা দেওয়া গেল না। সুভাষচন্দ্র সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হয়েও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সভাপতির পদ ছাড়েন নি, মেজদা শরৎচন্দ্র বসু আবার আইনসভায় কংগ্রেসের দলনেতা। আইনসভায় সুবিধা হবে না বুঝে দুই ভাই নতুন কৌশল নিলেন। তারা বন্দীমুক্তি নিয়ে কৃষক-প্রজা পার্টির বিরুদ্ধে বিপুল আন্দোলন শুরু করলেন। ঘটনা ক্রমেই অন্যদিকে মোড় নিল। অবিভক্ত বাংলার কৃষকদের অধিকাংশই মুসলমান। আর কংগ্রেস এবং সন্ত্রাসবাদী রাজবন্দীদের বেশিরভাগই হিন্দু। ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমান বিরোধ হিসাবে প্রতিস্থাপিত হতে লাগল। এতে কংগ্রেসের কোন লাভ হল না, কৃষক-প্রজা পার্টি তো ক্ষতিগ্রস্ত হলই। মুসলিম লীগ ব্যাপারটা থেকে ফয়দা তুলে বাংলার মাটিতে নিজেদের ভিতকে দৃঢ় করতে থাকল। বাংলা কংগ্রেসের উপর জমিদারদের চাপ বাড়ছিল। ফলে কংগ্রেস নেতারা সরকার পক্ষের বেশ কয়েকজন সদস্যকে ভাঙ্গালেন। ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮ কলকাতার কুমারটুলি পার্কে সুভাষচন্দ্রের দেওয়া বক্তৃতা অনুযায়ী সরকার বিরোধী পক্ষে সদস্যসংখ্যা ৫৩ থেকে ১১১ জনে আনা গেল। কিন্তু কংগ্রেস কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব রাজী হল না। তার মানে এই নয় যে ওয়ার্কিং কমিটি কৃষক-প্রজা পার্টির কাজকে সমর্থন

করেছিল বা তার খুব আদর্শবান ছিল। তারা মন্ত্রীসভা ভাঙ্গতে চায়নি কারণ তারা বুঝতে পেরেছিল এতে মুখ পুড়বে, শেষ রক্ষা হবে না। ১৮ ডিসেম্বর সুভাষকে পাঠানো চিঠিতে গান্ধী লেখেন——

বর্তমান মন্ত্রীসভাকে যে উৎখাত করা উচিত নয় সে বিষয়ে আমি আগের চেয়ে অনেক বেশি সুনিশ্চিত। পরিবর্তন করে আমরা কোন কিছু লাভ করব না এবং সম্ভবত মন্ত্রীত্বে কংগ্রেস সদস্যদের ঢুকিয়ে বেশকিছু লোকসান করব। স্বভাবতই সুভাষচন্দ্র এটা মেনে নিতে পারলেন না। তাঁর ক্ষোভ জানিয়ে তিনি গান্ধীকে চিঠি দিলেন।

সামগ্রিকভাবে কৃষকদের প্রতি এই যার মনোভাব, তার সভাপতিত্বে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব যে কৃষক বিরোধী পদক্ষেপগুলো নেবে এতে আর আশ্চর্য কী। ১৯৩৭-৩৮ সালে কৃষক আন্দোলন খুব জোরদার হয়ে ওঠে। এমন একটা অবস্থায় পৌঁছেছিল যে বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেসকে আদেশ জারী করতে হয়েছিল যে কংগ্রেকর্মীরা যেন কৃষকসভার আন্দোলনগুলোতে যোগ না দেয়। শেষ পর্যন্ত ১৯৩৮ এর সেপ্টেম্বরে এ আই সি সি-র সভায় কমিউনিস্টদের শ্রেণী-সংগ্রামের আদর্শকে নিন্দা করে একটা প্রস্তাব আনা হল। প্রস্তাবের উত্থাপক ভুলাভাই দেশাই এবং প্রস্তাবকে সমর্থন করলেন স্বয়ং গান্ধী। আর সভাপতি সুভাষচন্দ্র! ভালো ছেলের মত চুপটি করে বসে রইলেন। ঐ সভাতেই প্রদেশে প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলোকে 'জান-মান বাঁচানোর জন্যে যে কোন ব্যবস্থা' নেওয়ার ঢালাও অনুমোদন দেওয়া হল। আর নিন্দা করা হল 'কংগ্রেসি সমেত সেই লোকদের..........নাগরিক অধিকারের নামে যারা হত্যা, অগ্নি সংযোগ, লুঠ আর হিংসাত্মক পদ্ধতিতে শ্রেণীসংগ্রামের কথা প্রচার করে। অর্থাৎ এ আই সি সি-র বিচারে খুন, লুঠ এইসব আর শ্রেণীসংগ্রামের প্রচার করা——একই ধরনের অপরাধ। এই প্রস্তাব গৃহীত হলে যখন কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের সদস্যরা এবং অন্যান্য বামপন্থীরা প্রতিবাদে সভা ত্যাগ করেন তখন গান্ধী বললেন যে ওরা কংগ্রেস ছেড়ে একেবারেই চলে গেলেই পারেন। আর বামপন্থী সভাপতি সুভাষচন্দ্র, তিনি নীরব অনুমোদনে বসে রইলেন। তাই পরবর্তীকালে গান্ধীর সাথে সুভাষচন্দ্রের বিরোধে সমাজতন্ত্রী আর কমিউনিস্টেরা সুভাষকে সমর্থন করলেও তার উপর পরিপূর্ণ আস্থা কোনদিনই রাখতে পারেন নি।

সব মিলিয়ে গোটা ১৯৩৮ সালে কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র বিনা বিবাদে কৃতিত্বের সঙ্গে সগৌরবে নেতৃত্ব করলেন। কংগ্রেসের চরম দক্ষিণপন্থী ইতিহাস লেখক পট্টভি সীতারামাইয়া পর্যন্ত প্রশংসা করে লিখলেন——

কিছু কিছু ব্যাপারে তাঁর নিজস্ব মত ছিল কিন্তু তা আলোচনায় জোরালোভাবে বলতেন না এবং কোনো বিতর্কে কোন এক পক্ষে যেতেন না। এরকম নয় যে অন্য নেতাদের সাথে তাঁর মতানৈক্য হত না, কিন্তু কখনই তাতে অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় নি। গোটা বছরটা কেটেছে একেবারে মসৃণভাবে। *(পট্টভি সীতারামাইয়া——দ্য হিস্ট্রি অব দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস. Vol.-II)* আর গান্ধী! পরম তৃপ্তিতে চরকা কাটছেন। ভারতের জনতাকে বোকা বানাতে দুই বিপ্লবী তার ঝুলিতে——যখন যাকে দরকার বার করবেন। বিচক্ষণ গান্ধী সে সময়কার সুভাষকে কিভাবে মূল্যায়ন করেছেন ১৯৩৮ এর ২৫ জুন রাজকুমারী অমৃত কাউরকে লেখা তার চিঠিতে পরিষ্কার ধরা পড়ে——

সুভাষ এখন ওয়ার্ধায়। দেখতে হয়েছে যেন ছবির মত সুদর্শন। তার সবচেয়ে বেশি যা প্রয়োজন ছিল সেই পছন্দমত কাজ সে পেয়েছে। তাই সে সুখী। *(এম কে গান্ধী——ওয়ার্কস. Vol.-LXVII.)*

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে সবচেয়ে ধুরন্ধর, সবচেয়ে কর্তৃত্বকারী ব্যক্তিত্বের কি চমৎকার সঠিক সুভাষ-মূল্যায়ন!

কে সর্বোচ্চ নেতা——গান্ধী-সুভাষ দ্বৈরথ

প্রত্যাশা অনুযায়ী সব ঠিকঠাক চলা ১৯৩৮ সাল শেষ হয়ে গেল। ১৯৩৯ এর ২৯ জানুয়ারী এ আই সি সি-তে নতুন কংগ্রেস সভাপতি ঠিক হবার কথা। গান্ধীর পছন্দ আবুল কালাম আজাদ। কিন্তু যখন প্রদেশে প্রদেশে কংগ্রেসের মন্ত্রীসভা, ইংরেজরা ভারতশাসনের ক্ষেত্রে নতুন ছাড় দিতে প্রস্তুত, সুভাষচন্দ্র নিজেই নানা বক্তৃতায় বলেছেন—— স্বরাজ আর দূরে নয়, সেসময় সুভাষ সভাপতির পদ ছাড়তে রাজী ছিলেন না। ঘরও গুছিয়ে ফেলেছিলেন। তার দ্বিতীয়বারে সভাপতি পদে মনোনয়নের জন্যে প্রভাবশালী লোকের সব সুপারিশ গান্ধীর কাছে যেতে থাকল। এমনকি বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা শান্তিনিকেতন গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে বুঝিয়ে তাঁকে দিয়ে গান্ধীর কাছে অনুরোধপত্র পাঠালেন। (ডঃ মেঘনাদ সাহা সুভাষচন্দ্র কং-সভাপতি থাকাকালীন গঠিত প্লানিং কমিশনের অন্যতম সদস্য ছিলেন। প্লানিং কমিশন সম্পর্কে অন্য অধ্যায়ে লেখা হবে)। রবীন্দ্রনাথের চিন্তার ক্ষেত্রে অবশ্য তখন বাঙ্গালী জাগরণের বিষয়টাই বেশি ঘুরছিল। সুভাষচন্দ্রকে আবার কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট করতে চাইছিলেন ঐ বাঙালীয়ানার দৃষ্টিতেই। ১৯৩৯ সালের ১৯ জানুয়ারী সুভাষচন্দ্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি থেকে এটাই স্পষ্ট হয়।

কল্যাণীয়েষু,

আগামী কংগ্রেসে তোমাকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রকাশ্য সমর্থন করবার জন্যে আমার কাছে উপরোধ এসে পৌঁচেছে। আমার বক্তব্য তোমাকেই জানিয়ে রাখছি। এ সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করবার পূর্বেই আমি মহাত্মাজী ও জওহরলালকে চিঠি লিখেছিলেম বোধ হয় জানো। তারপরে তার ফলের হিসাব রাখা আমার কাজ নয়।.......

আজ বাংলাদেশ দুর্বল। আমার ইচ্ছা কোনো যোগ্য লোককে বাংলা প্রদেশের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব দিয়ে নির্বিচারে তার চারদিকে সমস্ত বাঙালিকে সম্মিলিত করা হয়। সেই মিলনে বললাভ করে আর একবার বাংলা আপন শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করতে পারবে। নাট্যশালায় তোমাকে সম্বর্ধনার যে সংকল্প করেছি তার মূল কথাটি এই। কংগ্রেসের ভিতর দিয়ে যে ইচ্ছা আকার নেবে এ ইচ্ছা তার চেয়ে গভীর এবং অকৃত্রিম। এর পরিচয় পেয়েছিলুম বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনে তখন বাংলা নিজের অভিপ্রায়কে যে রকম সম্পূর্ণ শক্তিতে প্রকাশ করেছিল ভাবতবর্ষের ইতিহাসে তেমন আর কখনো ঘটে নি। সেই উপলব্ধিকে আর একবার জাগানো চাই, এবং এই প্রচেষ্টায় তোমাকেই আশ্রয় করব। আর সকল পথ ছেড়ে এই পথেই প্রবৃত্ত হতে ইচ্ছা করি এই আমার মনের কথা তোমাকে বললুম। বস্তুতপক্ষে সুভাষচন্দ্রের এই দ্বিতীয়বারের নির্বাচনে বাংলায় এক বাঙালী জাগরণের মনোভাবই সুকৌশলে চাগিয়ে তোলা হয়েছিল। শুধু রবীন্দ্রনাথই নন, হিন্দু বাঙালীমাত্রই ছিল একই উন্মাদনার শরিক।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যে সুভাষ গোটা ১৯৩৮ সাল জুড়ে সভাপতি হিসাবে দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের একেবারে বশংবদ আচরণ করলেন তাকেই গান্ধী তাড়াতে ব্যস্ত হলেন কেন ? একথা সত্যি সুভাষচন্দ্র সভাপতি থাকতে ভারতীয় জমিদার-পুঁজিপতি, এবং তাদের

প্রতিনিধি দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের কোনও অসুবিধাই হয় নি বরং সুভাষকে সামনে রেখে বিরোধীদের ঠান্ডা করে সব কাজ গুছিয়ে নিয়েছিলেন। তবুও গান্ধীর ঝুলি থেকে আর একটা তাস বার করার দরকার হয়ে পড়েছিল। কংগ্রেস সভাপতি থাকাকালীন মুসলিম লীগের সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্যে সুভাষ জিন্নার সাথে দীর্ঘ সময় ধরে চিঠি চালাচালি করেছিলেন। দুজনে একান্তে আলোচনাতেও বসেছিলেন। কিন্তু কোন ফল বার করতে পারেন নি। প্রকৃতপক্ষে না সুভাষ, না জওহরলাল, না স্বয়ং গান্ধী কেউই জিন্নার সাথে আলোচনায় বিশেষ সুবিধা করতে পারেন নি। তখন গান্ধী তার নতুন অস্ত্র বার করতে চাইলেন——কংগ্রেসের মুসলমান প্রেসিডেন্ট। এতে জিন্নার পাশে কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে আজাদকে দাঁড় করাতে পারলে জিন্না যে ভারতের মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি—— একথাটা জোর দিয়ে বলতে পারবে না। ভারতীয় মুসলমানেরাও সমর্থনের ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়বে। ধূর্ত গান্ধীর এই ছিল চাল। দ্বিতীয় কারণটা আরও গুরুতর। গান্ধী লক্ষ্য করছিলেন সভাপতি সুভাষ নীরবে গান্ধীপন্থীদের তার কাঁধটা বন্দুক রাখার জন্য ব্যবহার করতে দিচ্ছেন বটে কিন্তু তলে তলে কংগ্রেসের নেতৃত্ব দখল করার জন্যে ঘুঁটি সাজাচ্ছেন। কংগ্রেসের সংগঠন ছিল একেবারে ঢিলেঢালা। সুভাষচন্দ্র অনেক আগে থেকেই জার্মানির নাৎসীদের মত কিংবা ইতালীর ফ্যাসিস্টদের মত এক কঠোর শৃঙ্খলিত দলের জন্যে ওকালতি করে আসছিলেন। কংগ্রেসের ঢিলেঢালা সংগঠনের সুযোগ নিয়ে সুভাষচন্দ্র নীচু তলাতে তার অনুগতদের যথেষ্ট সংহত করেছিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি কতটা তাতে সফল হয়েছিলেন তার পরিচয় মেলে সভাপতি নির্বাচনে, যেখানে তিনি গান্ধীর মনোনীত প্রার্থীকে হারিয়ে দিলেন। যাই হোক, এর পূর্বাভাষ লক্ষ্য করেই গান্ধী সুভাষকে সরাতে উদ্যোগী হলেন।

আবুল কালাম আজাদ ছিলেন আবার একটু দুর্বল প্রকৃতির, রাজনৈতিক মারপ্যাঁচে তুলনায় একটু কম পটু। তিনি যখন দেখলেন সভাপতি হতে গেলে নির্বাচনে লড়তে হবে, এবং সে লড়াইটা সহজ হবে না——তিনি দাঁড়াতে চাইলেন না। গান্ধী তখন ঠিক করে ফেলেছেন সুভাষকে সরাতেই হবে। তাই পট্টভি সীতারামাইয়া সই। গান্ধী এমন একটা ভাব দেখালেন যেন তিনি এ সবের উর্দ্ধে। কারণ তার সেনাপতিরাই যথেষ্ট, কংগ্রেসের সব দীর্ঘদিনের বাঘা বাঘা নেতা। সুভাষচন্দ্র যদিও সভাপতি হিসাবে বামপন্থীদের প্রতি যথেষ্টই বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন, তবুও কংগ্রেস সমাজবাদী দল, বেআইনী কমিউনিস্টরা যারা তখন ন্যাশনাল ফ্রন্ট নামে কাজ করছিল——সব বামপন্থীরাই সুভাষচন্দ্রের পিছনে এসে দাঁড়াল। প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয়বারের কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে সুভাষচন্দ্রের নাম প্রথম প্রস্তাব করেন সমাজতন্ত্রীরা। আর প্রথম তা সমর্থন করে কমিউনিস্টদের পত্রিকা 'ন্যাশন্যাল ফ্রন্ট'। এই নির্বাচনে সুভাষচন্দ্র তার সপক্ষে ভোট দিতে বলেন এই বলে যে তিনি বৃটিশ সরকারের দেওয়া ফেডারেল প্রস্তাবের বিরোধী, কিন্তু দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব তার পক্ষে। যদিও এ আই সি সি সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে কংগ্রেস দল ফেডারেল প্রস্তাবের বিরুদ্ধে——কিন্তু লন্ডনের একটা পত্রিকায় ভুলাভাই-এর এক মন্তব্য ছাপা হয়েছিল যে কংগ্রেস প্রস্তাবটা গ্রহণ করার কথা বিবেচনা করছে। পরে কংগ্রেসের সমস্ত বড় নেতাই বললেন যে ভুলাভাই-এর বক্তব্য বিকৃত করে ছাপা হয়েছে এবং কংগ্রেস নিশ্চিতভাবে ফেডারেল প্রস্তাব অগ্রাহ্য করছে। তবুও সুভাষচন্দ্রের প্রচারের মূল অস্ত্র ছিল এটাই।

১৯৩৯ সালের ২৯ জানুয়ারীর নির্বাচনে দেখা গেল সুভাষচন্দ্র ১৫৮০-১৩৭৫ ভোটে

জিতেছেন। দীর্ঘ ১৫ বছর আগে চিত্তরঞ্জনের পর এই প্রথম কংগ্রেসী রাজনীতিতে গান্ধী নেতৃত্বের পরাজয়। সুভাষ শিবিরে উল্লাসের বন্যা বয়ে গেল। কিন্তু সে উল্লাস থেমে যেতে বাধ্য হল গান্ধীর এক বিবৃতিতে। ৩১ জানুয়ারী বরদোলি থেকে গান্ধী বিবৃতিতে জানালেন——

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু তার প্রতিদ্বন্দ্বী ডঃ পট্টভি সীতারামাইয়াকে হারাইয়া চূড়ান্তভাবে জিতিয়াছেন। আমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে আমি তাঁহার দ্বিতীয়বারের নির্বাচনের বিরোধী ছিলাম, কেন তাহা এ স্থলে বলিতে চাহি না।....তবু আমি তাঁহার জয়ে আনন্দিত। মৌলানা সাহেব যখন তাঁহার নাম প্রত্যাহার করিয়াছিলেন তখন যেহেতু আমি উদ্যোগ লইয়া ডঃ পট্টভিকে তাঁহার নাম প্রত্যাহার করিতে দিই নাই, এই পরাজয় প্রকৃতপক্ষে তাঁহার নয় আমারই। এবং আমার ব্যক্তিগত কি মূল্য আছে যদি আমার সুনির্দিষ্ট নীতি ও কর্মসূচী না বহাল থাকে। আমার নিকট পরিষ্কার যে, আমি যে নীতি ও কার্যপদ্ধতির পক্ষে, অধিকাংশ ডেলিগেটদের তাহাতে আস্থা নাই। আমি এই পরাজয়ে আনন্দিত।....সুভাষবাবু দক্ষিণপন্থীদের (তাঁহার ভাষায়) অনুমোদনে প্রেসিডেন্ট না হইয়া ভোটের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট হইয়াছেন, এক্ষণে তিনি বিনা বাধায় তাঁহার নীতি ও কর্মসূচী অনুযায়ী চলিবার সুযোগ পাইলেন। শুধু তাই নয় গান্ধী তার বিবৃতিতে সরাসরি গান্ধীপন্থীদের কার্যত কংগ্রেস ত্যাগ করতে বললেন——যাই হোক সুভাষবাবু দেশের শত্রু নন। তিনি দেশের জন্য যথেষ্ট কষ্ট ভোগ করিয়াছেন। তাঁহার মতে তাঁহার নীতি ও কর্মসূচীই সবচেয়ে প্রগতিশীল ও দুঃসাহসিক। বিরোধীরা কেবল তাঁহার পূর্ণ সাফল্য কামনা করিতে পারেন। তাঁহারা যদি ইহার সহিত তাল মিলাইয়া চলিতে না পারেন, তাঁহাদের কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া আসিতে হইবে। তাহা করিলে ক্ষমতাসীনদের শক্তিবৃদ্ধি হইবে। কোন কারণেই কেহ যেন বাধা সৃষ্টি না করেন। যদি সহযোগিতা সম্ভব না হয়, নীরব থাকিবেন। আমি সকল কংগ্রেসসেবীকে স্মরণ করাইতেছি যে যাহারা কংগ্রেস মনোভাবাপন্ন হইয়াও কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের বাহিরে আছেন তাঁহারা কংগ্রেসের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। সুতরাং যাঁহাদের কংগ্রেসের ভিতরে থাকিতে অসুবিধা বোধ হইতেছে তাঁহারা কোন বিদ্বেষের মনোভাব না লইয়া বরং আরও ভালোভাবে কংগ্রেসের সেবা করিবার জন্য বাহির হইয়া আসিতে পারেন। ঠিক যেমনভাবে ১৯২২ সালে গয়া কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জনের প্রস্তাব পরাজিত হওয়ার পর চিত্তরঞ্জন সভাপতির পদ ত্যাগ করে আলাদা স্বরাজ্য দল তৈরী করে গান্ধীপন্থীদের জয়ের আনন্দ মিইয়ে দিয়েছিলেন। আজ সতেরো বছর পর গান্ধী চিত্তরঞ্জনের ভাবশিষ্যের উপর সেই বদলা নিলেন। সুভাষচন্দ্র এতোটা হবে কল্পনাও করতে পারেন নি। তিনি গান্ধীকে অনুনয় বিনয় করে এক বিবৃতি দিলেন। এতে তিনি জানালেন যে তিনি গান্ধীকে গভীর শ্রদ্ধা করেন, গান্ধীর মোটেই পরাজয় হয় নি ইত্যাদি ইত্যাদি।

গান্ধীর বিবৃতির এই অংশগুলো সব প্রবন্ধকারই অল্পেবিস্তর আলোচনা করেছেন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় গান্ধীর ঐ বিবৃতিরই একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়ে তারা নীরব। ঐ একই বিবৃতিতে গান্ধী বলেছিলেন——

দুই পক্ষের মধ্যে একটি বিষয়ে মতৈক্য আছে, সেটি কংগ্রেস সংগঠনের আভ্যন্তরিক শুদ্ধি বজায় রাখিবার ইচ্ছা। হরিজন পত্রিকায় আমার নিবন্ধগুলিতে আমি দেখাইয়াছি যে কংগ্রেস একটি নীতিহীন সংগঠনে পরিণত হইতেছে এবং তাহা এই অর্থে যে ইহার খাতাপত্রে বিপুলসংখ্যক ভুয়া সদস্যের নাম তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। কয়েক মাস ধরিয়া একই কথা বলিতেছি। এইসব ভুয়া সদস্যদের ভোটের জোরে যাহারা ডেলিগেট নির্বাচিত হইয়াছেন পরীক্ষা করিয়া দেখিলে অনেকেই ডেলিগেট পদটি হারাইবেন।

এখানে স্পষ্টতঃই গান্ধী অভিযোগ করছেন যে, সুভাষচন্দ্র অনেক ভুয়া ডেলিগেটদের ভোটে জিতেছেন। এই অভিযোগের অনেকটা সত্যতা ছিল। সুভাষচন্দ্রের জয়ের পিছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা ছিল বাংলার ডেলিগেটদের। বাংলা থেকে সবচেয়ে বেশি ডেলিগেট ভোট দিয়েছিল। সেখানে সুভাষ পেয়েছিলেন ৪০৪ ভোট এবং ড. পট্টভি পেয়েছিলেন ৭৯ টি। (*মিত্র— ইন্ডিয়ান এ্যানুয়াল. রেজিস্টার I, ১৯৩৯*)। মজার ব্যাপার হয়েছিল যে বাংলার ডেলিগেটদের আসল রসিদ বই হারিয়ে গিয়েছিল এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি (যে কমিটির প্রেসিডেন্ট স্বয়ং সুভাষ) ডেলিগেটদের নকল রসিদ দেয়। তার ভিত্তিতেই ডেলিগেটরা ভোট দেবার টিকিট পায়। এছাড়াও বাংলার ডেলিগেটদের যাতায়াতের ভাড়াও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই অভিযোগ সঠিক হলেও স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে এরকম কারচুপি কি গান্ধীপন্থীরা করত না। একশোবার করত। পার্থক্য এটাই, এই নির্বাচনে কারচুপির মাত্রায় গান্ধীপন্থীরা সুভাষপন্থীদের কাছে হেরে গিয়েছিল। রাগটা সেখানেই। এরপর আমরা দেখতে পাব ত্রিপুরীতে কংগ্রেস অধিবেশনে আগে থেকে তৈরি থাকা গান্ধীপন্থীরা কিভাবে সুভাষপন্থীদের ভোটে হারিয়ে দেয়।

গান্ধীর এরকম বিবৃতির পর সুভাষ স্থির থাকতে পারলেন না। ছুটে গেলেন গান্ধীর আশ্রমে। গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা হল, কিন্তু মীমাংসা হল না। তাছাড়াও বিপদ এল অন্যদিক থেকে। সুভাষচন্দ্র গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ত্রিপুরী কংগ্রেস অধিবেশনের প্রস্তুতি হিসেবে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসার কথা ছিল ২২ ফেব্রুয়ারী। তিনি ২১ ফেব্রুয়ারী এক তারবার্তায় গান্ধী এবং প্যাটেলকে জানালেন অধিবেশন পর্যন্ত ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক স্থগিত রাখতে কারণ তিনি উপস্থিত থাকতে পারবেন না। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা মনে করলেন এটা তাদের প্রতি সুভাষচন্দ্রের বিশ্বাসহীনতা। প্রকৃতপক্ষে তাই-ই। গান্ধীপন্থীরা একযোগে সুভাষচন্দ্রের কাছে তাদের পদত্যাগপত্র পাঠালেন। পদত্যাগপত্রখানা ওয়ার্ধা থেকে লেখা হয়েছিল এবং গান্ধীর তাতে অনুমোদন ছিল। গান্ধীর অনুমোদন ছাড়া এত বড় একটা পদক্ষেপ নেওয়ার হিম্মৎও তাদের ছিল না। এ পদত্যাগপত্রও সুভাষের কাছে একটা অপ্রত্যাশিত ধাক্কা ছিল। কিন্তু তিনি তখন নিরুপায়। আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

১৯৩৯ এর মার্চে মধ্যপ্রদেশের ত্রিপুরীতে বসল কংগ্রেস অধিবেশন। সুভাষ অসুস্থ শরীরে মা এবং পরিবারের আরও কয়েকজন সদস্যের সাথে ত্রিপুরী এলেন। দাদা শরৎচন্দ্র তো ছিলেনই। (সভাপতি হয়েই সুভাষচন্দ্র দাদাকে কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক সংস্থা ওয়ার্কিং কমিটিতে ঢুকিয়ে নিয়েছিলেন)। সভাপতি পদের নির্বাচনে সুভাষচন্দ্রের শ্লোগান ছিল—ফেডারেল প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা। কিন্তু গান্ধীপন্থী নেতারা বারবার ঘোষণা করেছেন যে তারাও ফেডারেল প্রস্তাবের ঘোর বিরোধী। সুতরাং এবার তিনি শ্লোগান রাখলেন—স্বাধীনতার জন্য ইংরেজকে ছ'মাস সময় দিয়ে চরমপত্র দান। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ ছিল এক অবাস্তব দাবী। তবুও সুভাষ জনপ্রিয় দাবী সামনে রেখে উৎরে যেতে চাইলেন। উল্টোদিকে দক্ষিণপন্থী নেতারা রাখলেন কুখ্যাত 'গোবিন্দবল্লভ পন্থ প্রস্তাব'। প্রস্তাবে বলা হল গান্ধীর ইচ্ছেমত গান্ধীর আজ্ঞাবাহী ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে হবে। এবারের ভোটাভুটিতে সুভাষ হেরে গেলেন। দক্ষিণপন্থীরা এবারে তৈরী ছিলেন, আর সুভাষ-শিবিরে ছিল ভাঙন। কংগ্রেস সমাজবাদী দল ভোটাভুটিতে অংশ নিল না, যদিও দলের নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ কার্যত পন্থ প্রস্তাব সমর্থন করলেন। নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা সমাজবাদী দলে থেকে কাজ করতেন। তাদের নেতারা সমাজবাদী দলের সিদ্ধান্ত

মেনে নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নিচুতলার সদস্যরা বিশেষত বাংলার কমিউনিস্টরা সমাজবাদী দলের সিদ্ধান্ত মানলেন না এবং তারা পন্থ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিলেন। কিন্তু শেষরক্ষা হল না, পন্থপ্রস্তাব গৃহীত হল। গান্ধীর নামে জয়ধ্বনি উঠল——'হিন্দুস্থানকী হিটলার মহাত্মাজীকা জয়'। গান্ধী নিজে ত্রিপুরীতে উপস্থিত ছিলেন না। সব ব্যবস্থা পাকা করে হাত ধুয়ে বসে রইলেন দূরে রাজকোটে। অসুস্থ সুভাষ চলে গেলেন বিহারের জিয়ালগোরায় তার দাদার বাড়ীতে স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্যে।

জিয়ালগোরা থেকে সুভাষচন্দ্র গান্ধীর সাথে যোগাযোগ করতে উদ্যোগী হলেন। তিনি চাইলেন গান্ধীর সাথে আলাপ-আলোচনা করে দু'জনের কাছেই গ্রহণযোগ্য একটা রফায় আসতে। কিন্তু গান্ধী অনড়। সুভাষের তারবার্তার উত্তরে ২৪ মার্চ ১৯৩৯ তিনি লিখলেন——

আমি জানি না জাতীয় কাজে আত্মনিয়োগ করার মতো তুমি কতটা সুস্থ আছো। যদি তুমি তা না হও — তোমার নিকট একমাত্র নিয়মতান্ত্রিক যে পথ খোলা আছে, তাহাই গ্রহণ কর।

গোদা বাংলায়, পদত্যাগ কর। কিন্তু সুভাষের প্রস্তাব ছিল ভিন্ন। ২৫ মার্চ তিনি চিঠিতে লিখেছেন যে তার নিজের মনোনীত সাতজন আর বল্লভভাই প্যাটেলের মনোনীত (ব-কলমে গান্ধীর মনোনীত) সাতজনকে নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা হোক। সাধারণ সম্পাদক রাখা হোক সুভাষের পক্ষের আর কোষাধ্যক্ষ করা হোক প্যাটেলের পছন্দমাফিক। সম্ভবত এই সময় গান্ধীর মনে হয়েছিল যে সুভাষ বেশ চাপের মধ্যে আছে। এখন তাকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে মগজ-ধোলাই করতে পারলে আবার সে গান্ধীর তাঁবেতে চলে আসবে। তাই ২৭ মার্চ গান্ধী পাঠালেন এক মজার টেলিগ্রাম————

আমি তোমাকে এখানে আসিবার এবং আমার সহিত বসবাস করিবার পরামর্শ দিতেছি। আমি তোমাকে সেবা করিয়া সুস্থ করিবার ভার গ্রহণ করিতেছি। সাথে সাথে, তোমার সহিত ধীরে ধীরে সমস্তই আলোচনা করিব।

এর উত্তরটা গেল আরও চমকপ্রদ। উত্তর সুভাষের নয়। সুভাষের দাদা ডাঃ সুনীল বসু-র। সুভাষের খারাপ শারীরিক অবস্থায় কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়।

এই টেলিগ্রামটা গান্ধীর গালে চপেটাঘাতের মতোই লাগল। মনে হয় সুভাষকে গান্ধী এটাই শেষ একটা সুযোগ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সুভাষ ভেবেছিলেন গান্ধীকে চাপ দিয়ে একটা মীমাংসায় আসা যাবে এবং গান্ধী এমন একটা ওয়ার্কিং কমিটি করে দেবেন যাতে সুভাষের অনুগত লোকও কিছু থাকবে। কিন্তু ডাঃ সুনীল বসুর টেলিগ্রাম পাওয়ার পর গান্ধী যে চিঠিটা লিখলেন তার সুর আগের চিঠিগুলোর চেয়ে আলাদা——

প্রিয় সুভাষ,

আমি গতরাত্রে সুনীলের পাঠানো টেলিগ্রামটি পাইয়াছি। এই উত্তরটি লিখিবার জন্য আমি আমার প্রাতঃকালীন উপাসনার পূর্বেই শয্যা হইতে উঠিয়াছি।

পাঠক, লক্ষ্য করুন রাত্রে টেলিগ্রামটি পেয়ে উত্তর দেবার জন্যে পরের দিন ভোরবেলায় ঘুম থেকে ওঠার নির্ধারিত সময়ের আগেই গান্ধী উঠে পড়েছেন।

যখন তুমি বিবেচনা কর যে পন্থের প্রস্তাবটি অসাংবিধানিক এবং ওয়ার্কিং কমিটি সম্বন্ধে যে অংশে লিখিত হইয়াছে তাহা অবৈধ তাহা হইলে তো তোমার পথ পরিষ্কার। তোমার কমিটি নির্বাচনে কোন বাধাই নাই।

ফেব্রুয়ারী মাসে তোমার সহিত আমার সাক্ষাতের পর হইতে আমি নিশ্চিত হইয়াছি যে মূলনীতিতে বিরোধ আছে, এবং বিরোধ যে আছে তাহাতে দু'জনেই একমত হইয়াছিলাম, সেইক্ষেত্রে বহুদলীয় কমিটি ক্ষতিকর হইবেই। সুতরাং তোমার কর্মনীতির পিছনে এ আই সি সি-র অধিকাংশের সমর্থন আছে ধরিয়া তুমি কেবলমাত্র তোমার মতাবলম্বীদের লইয়া ওয়ার্কিং কমিটি গঠন কর।

গান্ধী আবার সেই ভুয়ো ভোটারদের কথা তুলে বুঝিয়ে দিলেন যে তুমি সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সভাপতি সে বড়াই কোরো না।

যাহা আমাকে সর্বাপেক্ষা উদ্বিগ্ন করে যে এই কংগ্রেস ডেলিগেটমণ্ডলী ভুয়া। সুতরাং সংখ্যাগুরু আর সংখ্যালঘুর যা অর্থ হওয়া উচিত, তা বোঝায় না।

তিনি এমন ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে চিঠির শেষে পুনশ্চ লিখে লিখলেন——

পুনশ্চঃ এ ব্যাপারে আমি খুব বেশি যুক্ত নই, সেইজন্য আমাদের এই পত্রালাপ প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু তুমি যদি অন্যরূপ বিচার কর তাহা হইলে ইহা প্রকাশ করিতে আমার অনুমতি রহিল। (*৩০ মার্চ ১৯৩৫ গান্ধীর লেখা চিঠি*) স্বভাবতঃই সুভাষচন্দ্র একটু ঘাবড়ে গেলেন। তিনি জানতেন গান্ধীপন্থীদের বাদ দিয়ে তিনি কংগ্রেস চালাতে পারবেন না। প্রকৃতপক্ষে সেটা তার উদ্দেশ্যও নয়। তিনি চান দক্ষিণপন্থীরাও তার নেতৃত্ব মেনে নিক। সুভাষচন্দ্র একেবারে নরম হয়ে গেলেন। গান্ধীকে জবাব দিলেন অত্যন্ত অনুনয়ের সাথে——-

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে আজ কংগ্রেসের প্রধান দুইটি দলের (অথবা ব্লকের) মধ্যে বিরাট মতপার্থক্য দেখা দিয়াছে। কিন্তু আপনি চেষ্টা করিলে এ ব্যবধান এখনো দূর করা যায়। আমার রাজনৈতিক বিরোধীদের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু আমি 'ক্ষমা করিতে ও ভুলিতে' রাজী এবং ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামে একসাথে কাজ করিতে প্রস্তুত।

শুধু তাই নয়, তিনি গান্ধীকে সন্তুষ্ট করতে লিখলেন——

যখন আমাদের পক্ষের কথা বলি তখন আমি কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টিকে বাদ দিয়াই বলি। ত্রিপুরীতে আমরা বুঝিতে পারিলাম ওরা সংখ্যায় কত কম। দলের বড় নেতারা যাহাই করুন না কেন সমাজবাদী পার্টির একটি বড় অংশ ভাঙ্গিয়া আমাদের সাথে চলিয়া আসিবে। কোন সন্দেহ নাই আপনি অপেক্ষা করুন ও দেখুন। (পরে অবশ্য সুভাষ গান্ধীকে লিখেছিলেন তার এ ধারণা সত্য হয় নি—— লেখক)।

এই সমাজবাদী দল সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র একসময় ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। আজ যখন মতে মিলল না তখন তিনি একে ভেঙে গান্ধীর পায়ে উপহার দিতে চাইলেন। পন্থ প্রস্তাব সম্পর্কে আগের মূল্যায়ন থেকেও তিনি সরে এলেন। আগে বলেছিলেন পন্থ প্রস্তাব অসাংবিধানিক ও অবৈধ। এই চিঠিতে সুভাষ লিখলেন——

পন্থপ্রস্তাব সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গীর কথাই ধরুন। আমার ব্যক্তিগত চিন্তার এক্ষেত্রে কোন মূল্য নাই। জনস্বার্থে প্রায়ই আমাদিগকে নিজেদের ব্যক্তিগত অনুভূতিকে চাপিয়া রাখিতে হয়। পূর্বেই বলিয়াছি বিশুদ্ধ সাংবিধানিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে পন্থ প্রস্তাব যাহাই হউক না কেন, একবার কংগ্রেসে যখন গৃহীত হইয়াছে, আমি মনে করি ইহা আমি মানিতে বাধ্য। কিন্তু গান্ধী আর সুযোগ দিতে নারাজ। তিনি সুভাষকে ছেঁটে ফেলতে বদ্ধপরিকর। ২ এপ্রিল দিল্লী থেকে তারবার্তা পাঠালেন সুভাষচন্দ্রকে:

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু, জিয়ালগোরা

তোমার চিঠির উত্তর ডাকে দিয়াছি। তোমাকে আমার পরামর্শ এই যে পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে এবং দুইটি বিপরীত চিন্তাধারার কারণে তোমার নীতির পরিপূরক নিজস্ব ওয়ার্কিং কমিটি তোমার অবিলম্বে গঠন করা উচিত। তুমি নিজের নীতি ও কর্মসূচী প্রণয়ন করিয়া তাহা এ আই সি সি-তে পেশ কর। যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাও তাহা হইলে বিনা বাধায় তোমার নীতি রূপায়ণ করিতে পারিবে। আর যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাও, তোমার পদত্যাগ করা উচিত হইবে! এবং তখন তুমি নতুন সভাপতি নির্বাচিত করিবার জন্য এ আই সি সি-কে আমন্ত্রণ জানাইবে। সততা থাকিলে আমি গৃহযুদ্ধের ভয় করি না। (সুভাষচন্দ্র লিখেছিলেন সমমতাবলম্বী ওয়ার্কিং কমিটি করা হলে কংগ্রেসে গৃহযুদ্ধ বেধে যাবে — লেখক)। ভালোবাসা নিও। বাপু।

একেবারে চাঁচাছোলা কথা। তেমনই স্বৈরতান্ত্রিক। কংগ্রেসের নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে কার্যত পদত্যাগই করতে বলা হচ্ছে কারণ এ. আই. সি. সি. তে গান্ধীই পাল্লাভারি। গান্ধীর সমস্ত অহিংসা, সমস্ত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের মুখোশ খুলে গেল। কখন, না যখন দেখলেন তার নেতৃত্ব চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড়িয়েছে। গান্ধী ভালই জানতেন সুভাষ যদি এই বিপদ কোনক্রমে উৎরে যায় তাহলে নেতৃত্ব আর কোনদিনই তিনি ফিরে পাবেন না। আর তার অভিভাবক. জমিদার-শিল্পপতিদের প্রধান আস্থাভাজন হতেও সুভাষের বেশি সময় লাগবে না। গান্ধী তাই সুভাষকে নগ্নভাবে আক্রমণ করলেন।

বেচারি সুভাষ! ধুরন্ধর গান্ধীর কাছে কূট-কৌশলের খেলায় তিনি হেরে গেলেন। কিন্তু ইতিহাস সুভাষের কাছে ফিরে এলো। তিনি ইতিহাসকে যা দিয়েছিলেন, তাকেই সময় তা ফিরিয়ে দিল। পাঠক, আমি আপনাদের নিয়ে যাব সতেরো বছর আগে। ১৯২২ সালের ২৮ নভেম্বর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভায় চিত্তরঞ্জন দাশ সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্বাচিত হলেন। কিন্তু সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হল। চিত্তরঞ্জনের মনোমত প্রার্থী ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ শাসমল আর গান্ধীপন্থীদের প্রার্থী তরুণ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ (ইনিই পরে হয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী)। ভোটে শাসমলকে হারিয়ে প্রফুল্লচন্দ্র জিতলেন। সেদিনও নির্বাচনের এই ফলকে চিত্তরঞ্জন-গোষ্ঠী মেনে নেয় নি। পরের দিন প্রাদেশিক কংগ্রেসের কর্মপরিষদ থেকে চিত্তরঞ্জন-গোষ্ঠীর সুভাষচন্দ্র বসু, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, হেমপ্রভা মজুমদার, সূর্যকান্ত সোম, বসন্তকুমার মজুমদার, একযোগে পদত্যাগ করলেন। খোদ চিত্তরঞ্জনও সভাপতির পদ ত্যাগ করলেন। ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে সাপ্তাহিক 'বাংলার কথা' পত্রিকায় চিত্তরঞ্জন লিখলেন——-

তাঁরাই এখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ তাই কাজকর্ম চালাবার ভার তাঁদের উপর ছেড়ে দেওয়াই সঙ্গত। বঙ্গীয় কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্য আমার মতের সমর্থক কিন্তু সভার দিন তাঁরা পৌঁছতে পারেন নি। যাই হোক, এখন সংখ্যাগরিষ্ঠতা যারা পেয়েছেন তাঁরা একমনে কাজ করুন; তাঁদের সমমত হওয়া দরকার, নতুবা কাজ চালানো যাবে না। আমি তাই সভাপতির পদ ত্যাগ করছি।

ঠিক যে যুক্তিতে, যে কৌশলে, যে ভাষায়, চিত্তরঞ্জন তরুণ প্রফুল্লচন্দ্রের নির্বাচনকে অনৈতিকভাবে বানচাল করলেন——আজ সতেরো বছর বাদে দেখা গেল হুবহু একই যুক্তি, একই ভাষা, একই কৌশল। শুধু অবস্থানগুলো গিয়েছে পাল্টে। কিন্তু অবাক হবার কিছুই নেই। এগুলো ছিল স্বাধীনতার আগেকার কংগ্রেসের পক্ষে একেবারে স্বাভাবিক ব্যাপার। কোন

কংগ্রেস নেতাই এর থেকে আলাদা কিছু নয়। অথচ মজার ব্যাপার হল তাবড় লেখকেরা সুভাষচন্দ্রের উপর গান্ধীর স্বৈরচারী ব্যবহারের প্রতি যতটা সোচ্চার, ঠিক ততটাই লুকিয়ে রাখেন প্রফুল্ল ঘোষের প্রতি চিত্তরঞ্জন-সুভাষচন্দ্রের এই আচরণ।

যাই হোক, অন্য কোন উপায় না দেখে সুভাষচন্দ্র গান্ধীর সাথে আরও চিঠিপত্র আদান-প্রদান করলেন। কিন্তু কোনও সুরাহা হল না। গান্ধী অনড়। ১৭ এপ্রিল তিনি যে টেলিগ্রামটা পাঠালেন——

এ. আই. সি. সি.-র মিটিং ২৮ শে করিও, উপস্থিত থাকিব। তোমার উপর কমিটি চাপানো আমার পক্ষে অসম্ভব। তুমি নিজে যদি গঠন না করিতে পারো এ. আই. সি. সি. বুঝিবে। বহুমতের ক্যাবিনেট আমার কাছে অসম্ভব মনে হয়।

এখন গান্ধীর সাথে মুখোমুখি কথা বলা ছাড়া আর উপায় নেই। সুভাষ নানাভাবে চেষ্টা করতে থাকলেন। কলকাতায় এ আই সি সি বৈঠকের অব্যবহিত আগে সোদপুরে গান্ধীর সঙ্গে নিভৃতে চারঘন্টা ধরে আলোচনা হল। কিন্তু কোন ফল হল না, হবার কথাও নয়। ১৯ এপ্রিল ১৯৩৯ এ.আই.সি.সি. মিটিং-এ সুভাষচন্দ্র পদত্যাগ করলেন। শেষ হল তার রাজনৈতিক জীবনের একটা অধ্যায়।

গান্ধী-সুভাষ বিরোধ কোথায়

আমরা এখন একটা বহু আলোচিত বহু বিতর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি। এতকাল জেনে এসেছি, গান্ধী আর সুভাষের মধ্যে দারুণ বিরোধ। গান্ধী আর তার দলবল জওহরলাল সমেত সদাসর্বদাই চেষ্টা করে এসেছেন প্রতি পদে পদে সুভাষের প্রভাব খর্ব করতে, যেন দেশকে নেতৃত্ব দিতে না পারেন। মুখে অহিংসার কথা বললেও সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে আচরণের বেলায় দেখা গেছে এদের হিংস্র কুটিল মূর্তি। আর সুভাষ, শত আক্রমণের মুখে অবিচল, নির্ভীক, আদর্শবাদী এক দেশপ্রেমিক। গান্ধী-জওহরলালের কাছে দেশপ্রেমটা বড় কথা নয়, তারা যা করেছেন নিজেদের স্বার্থে, বড়জোর নিজেদের গোষ্ঠীর স্বার্থে। আম বাঙালীর কাছে মোটামুটি এই ছবিটাই তুলে ধরা হয়েছে। অনেকটা ঠিক কমিকসের গল্পের মতো কিংবা মহাকাব্যের দানব বনাম মহামানবের গল্পের মতো। তাবড় তাবড় বাঙালী লেখকেরা আবেগ-ঘন ভাষায় বর্ণনা করেছেন গান্ধী আর গান্ধীপন্থী নেতারা এক একজন কতবড় বদমাইশ আর সুভাষচন্দ্র একজন কতবড় দেশপ্রেমিক। (বর্তমান গ্রন্থকারের একসময় পেশাগত কারণে বেশ কিছু সাধারণ পাঠাগারের সাথে যোগাযোগ ছিল। সেই সূত্রে বলতে পারি)—— যে কোন সাধারণ গ্রন্থাগারের সুভাষ সম্বন্ধীয় যে কোন বই নিন। দেখবেন তার পাতায় পাতায় লেখা রয়েছে গান্ধী আর গান্ধীপন্থী নেতাদের নামে পাঠককৃত নানা কুশ্রী মন্তব্য। বলা যায়——এগুলো বিকৃতমনা পাঠকদের কাজ। এ ব্যাখ্যা অতি সরলীকৃত। আসলে ঐসব বইতে অত্যন্ত চাতুর্যের সাথে তাদের চরিত্র এমনভাবে চিত্রিত করা হয়েছে যে পাঠক উত্তেজিত হয়ে ওঠে। চটুল ভাষার বর্ণনায় সরলমতি পাঠককে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত করে তোলা হয়েছে। গান্ধী আর গান্ধীপন্থী নেতাদের উপর সৃষ্টি করা হয়েছে তীব্র ঘৃণা আর সুভাষচন্দ্রের প্রতি অন্ধভক্তি। আবেগে আপ্লুত কোন কোন মানুষ লিখে ফেলেছেন এরকম অশোভন উক্তি। সাধারণ বাঙালী মানসে একটা একপেশে ধারণা গেঁথে দেওয়া হয়েছে। এমন পাঠক খুঁজে পাওয়া শক্ত যে এই ধারণা থেকে মুক্ত হতে পারে। এত গন্ডায় গন্ডায় বই লেখা হয়েছে কিন্তু কোথাও

যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করে গান্ধী-সুভাষ বিরোধের মূল্যায়ন করা হয় নি। বিশিষ্ট বামপন্থী লেখক সুধী প্রধান তার তথ্যসমৃদ্ধ 'সুভাষচন্দ্র, ভারত ও অক্ষশক্তি' বইতে সুভাষ মূল্যায়নের চেষ্টা করেছেন (তিনি অবশ্যই উপরোক্ত লেখককুলের মধ্যে পড়েন না) । তিনিও গান্ধী-সুভাষ বিরোধের কারণকে 'ভৌগোলিক' বলে চিহ্নিত করেছেন। এই বিরোধকে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিচার করেন নি।

গান্ধী-সুভাষ বিরোধের আসল রূপটা খুঁজে বার করতে হলে গান্ধীর সাথে চিত্তরঞ্জনের বিরোধের স্বরূপটা চিহ্নিত করতে হবে। কারণ,সুভাষচন্দ্র নিজেও বারবার বলেছেন তিনি চিত্তরঞ্জনের ভাবশিষ্য। আমরা এর আগেই সে বিরোধের আসল চেহারাটা নির্ধারণের চেষ্টা করেছি 'নরমপন্থী ও চরমপন্থী' এবং 'গান্ধী——মেলাবেন তিনি মেলাবেন' অধ্যায়দু'টিতে। সেখানে আমরা দেখেছি নরমপন্থীরা হলেন সরাসরি সমাজের উঁচুতলা থেকে আসা নেতৃত্ব যারা জমিদার-শিল্পপতিদের প্রতিনিধি। এরা এমন সব পরিবার থেকে আসতেন যারা আর্থিকভাবে বৃটিশরাজের উপর নির্ভরশীল। স্বাভাবিকভাবেই তারা বৃটিশ শাসনের সাথে কোনরকম সংঘাতে যেতে চাইতেন না। তারা ছিলেন আবেদন-নিবেদন রাজনীতিতে আস্থাশীল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নওরোজি, ফিরোজ শাহ মেহতা, রমেশ দত্ত, গোখলে——এরা ছিলেন নরমপন্থী। ক্রমেই বৃটিশ রাজত্বে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত একটা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি হল। এদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন স্বাধীন পেশায় নিযুক্ত যেমন—— ওকালতি, ডাক্তারি, মাস্টারি ইত্যাদি। এরা পেশাগতভাবে ইংরেজদের উপর নির্ভরশীল ছিলেন না বরং ইংরেজদের সাথে তাদের অনেক সময় পেশাগত দ্বন্দ্ব ছিল। দেশের মধ্যে বেকারি, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, মহামারী ইত্যাদি কারণে ধীরে ধীরে দারুণ অসন্তোষের সৃষ্টি হল এবং নরমপন্থী নেতৃত্বের পক্ষে সম্ভব হল না দেশের মানুষের আশা আকাঙ্খার প্রতিনিধি হয়ে ওঠা। অপেক্ষাকৃত গরম নেতাদের উদ্ভব হল যারা মধ্যবিত্তের স্বার্থরক্ষায় আগ্রহী। এদের বলা হত চরমপন্থী। বালগঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন, মতিলাল—— এরা হলেন চরমপন্থী। আমরা আগেই দেখেছি ঐতিহাসিক কারণেই কিভাবে গান্ধী নেতৃত্বের সৃষ্টি হল যিনি মধ্যবিত্তদের দাবী-দাওয়া নিয়ে লড়তে পারবেন আবার জমিদার-শিল্পপতিদেরও স্বার্থরক্ষা করবেন। এই গান্ধীর সাথে চিত্তরঞ্জন-মতিলালের বিরোধ দেখা দিল।

চিত্তরঞ্জন এবং মতিলাল দু'জনেই ছিলেন ব্যারিস্টার. দুজনেই ওকালতি করে বহু টাকা রোজগার করেছিলেন। চিত্তরঞ্জন তার জীবনের শেষ পর্যায়ে কংগ্রেস রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন এবং প্রথম থেকেই ছিলেন বাংলা কংগ্রেসের প্রধান। ১৯২০-২২ সালের অসহযোগ আন্দোলন থেকে গান্ধীর একতরফা পিছু-হটার পর চিত্তরঞ্জন নেতৃত্ব কেড়ে নিতে এগিয়ে এসেছিলেন। এবং চিত্তরঞ্জন আর মতিলাল মিলে গান্ধী-দাশ চুক্তির মাধ্যমে গান্ধীকে সাময়িক রাজনৈতিক বানপ্রস্থেও পাঠাতে পেরেছিলেন। চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর দায়িত্ব পড়ল মতিলাল আর সুভাষচন্দ্রের কাঁধে। কিন্তু ধুরন্ধর গান্ধী তার ঘর গুছিয়ে নিয়েছিলেন। মতিলাল আর জওহরলাল পিতাপুত্রকে কব্জা করে নিলেন। গান্ধীর নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করার মত একমাত্র থাকলেন সুভাষচন্দ্র।

এখন, গান্ধীর সঙ্গে সুভাষের বিরোধ কি ব্যক্তিগত ক্ষমতা দখলের লড়াই না দু'জনের আদর্শগত দ্বন্দ্ব। গান্ধী আর সুভাষ দুজনেই বলেছেন-এ দ্বন্দ্ব আদর্শগত লড়াই। গান্ধীর দৃষ্টিতে দ্বন্দ্বটা এরকম যে গান্ধী যে কোন মূল্যে অহিংসায় বিশ্বাসী। তিনি অহিংসা জলাঞ্জলি দিয়ে অন্য কোনভাবে কার্যোদ্ধার চান না। আর সুভাষ মনে করেন কৌশল হিসাবে অহিংসা গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু অহিংসা যেক্ষেত্রে কার্যকর নয় সেখানে

প্রয়োজনে হিংসার সাহায্যও নিতে হতে পারে, যা গান্ধী একেবারেই চান না। আবার সুভাষের দৃষ্টিভঙ্গীতে গান্ধী হচ্ছেন আপোসমুখী। তিনি সংগ্রামের চেয়ে ইংরেজদের সদিচ্ছার প্রতি বেশি নির্ভর করেন। এবং ইংরেজ যখন কোন বিপাকে পড়ে তখন তাকে চাপ দিয়ে কার্যকর কিছু আদায় করেন না। আর সুভাষ নিজে আপোসহীন। তিনি যে কোন মূল্যে ভারতের স্বাধীনতা চান এবং তার কাছে স্বাধীনতা মানে ইংরেজদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ। এই হচ্ছে সুভাষের মতে গান্ধীর সাথে তার বিরোধের মূল কারণ।

প্রথমে আমরা গান্ধীর মতটা নিয়েই আলোচনা করব। একথা ঠিক সুভাষচন্দ্র নানা সভা-বক্তৃতায়-লেখায় অহিংসার যত জয়গানই করুন না কেন তিনি অহিংসাকে একটা কৌশল হিসেবেই নিয়েছিলেন এবং প্রয়োজনে অস্ত্র গ্রহণেও তার কোন আপত্তি ছিল না। এটা তার ভবিষ্যৎ জীবনেও আমরা দেখেছি। কিন্তু একথা কি সব গান্ধীপন্থীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য নয়। জওহরলাল থেকে প্যাটেল এরা কি অহিংসাকে কৌশল হিসাবে নেন নি। তা যদি না হবে তবে কেন গান্ধী বারবার বলেছেন অহিংসার শ্রেষ্ঠ পূজারীরা একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের বাইরে রয়েছেন? কেন তিনি ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের সময় তাবড় তাবড় গান্ধীবাদী নেতাদের বাদ দিয়ে বিনোবা ভাবেকে মনোনীত করলেন ? কেন তিনি ডান্ডি অভিযানের সময় কংগ্রেস নেতাদের না ডেকে বাছা বাছা আশ্রমবাসীকে সঙ্গে নিলেন ? আর গান্ধী নিজে, তিনি কি নিজে কর্মে চিন্তায় অহিংস ? তিনি কেন বারবার প্রতিশোধস্পৃহ হয়েছেন, কেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সেনা সংগ্রহে বেরিয়েছিলেন, কেন আইন অমান্য আন্দোলনের সময় বলেছিলেন——এবার আন্দোলন সহিংস হলেও তা বন্ধ করব না ? চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর গান্ধী যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে বাংলার কংগ্রেসের সর্বেসর্বা করেছিলেন। যতীন্দ্রমোহনের সাথে সুভাষচন্দ্রের গোষ্ঠীকোন্দলে যুগান্তর গোষ্ঠীর সন্ত্রাসবাদীরা সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন করেছিলেন। আর অনুশীলনী গোষ্ঠীর সন্ত্রাসবাদীরা ঢুকে গিয়েছিলেন গান্ধীবাদীদের দলে। (অনুশীলনী আর যুগান্তর গোষ্ঠীর মধ্যে দারুণ রেষারেষি ছিল——খুনখারাবিও ঘটে যেত)। কই অহিংসার পূজারী গান্ধী তখন তো তাদের নিতে অস্বীকার করেন নি। গান্ধী নিজে স্বীকার করেছিলেন যে কংগ্রেসের আন্দোলন অহিংস ছিল না।

বস্তুতপক্ষে, ভারতবর্ষে আমরা অহিংসার যথোপযুক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারি নি। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমরা এ যাবৎ যে এত কিছু লাভ করেছি, সে-সব হিংসা-অহিংসার মিশ্রণেই পেয়েছি। *(হরিজন——২০ এপ্রিল ১৯৪০)* গান্ধীর আদর্শ পুরুষ ছিল রাম। গুলি খাওয়ার মুহূর্তেও তিনি উচ্চারণ করেছিলেন——হে রাম। রাম মহাকাব্যের কোন অহিংসবাদী চরিত্র ? আসলে গান্ধীও অহিংসাকে কৌশল হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন——আদর্শ হিসেবে নয়। ইতিহাসের ঐ বিশেষ সময়ে একাধারে জমিদার-মিলমালিকের স্বার্থ সুরক্ষিত রেখে শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে অহিংস আন্দোলনের কোন জুড়ি ছিল না। তাই অহিংস আন্দোলন বিশ্বে এত অভিনব, সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ায় তাই গান্ধীর এত কদর। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এ বিষয়ে গান্ধী আর সুভাষের কোন আদর্শগত দ্বন্দ্ব ছিল না।

সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিতে গান্ধী আপোসমুখী। তিনি মোক্ষম সময়ে ইংরেজকে বিব্রত করতে চান নি। বারবার কংগ্রেস অধিবেশনে পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব এনেছেন। একেবারেই সঠিক অভিযোগ। গান্ধী বরাবরই জনতার আশা-আকাঙ্খার বর্শামুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সুভাষ, তিনি নিজে কি করেছেন ? কিন্তু না, সুভাষের প্রসঙ্গে যাবার আগে এ বিষয়ে তার পূর্বসূরী——সুভাষচন্দ্র

যাদের উত্তরাধিকার বহন করছেন সেই চরমপন্থী নেতাদের ভূমিকা কি ছিল তা আমরা দেখব। অন্যতম চরমপন্থী নেতা বিপিন চন্দ্র পাল ইংল্যান্ডে থাকাকালীন বলেছিলেন——-"ভগবান যদি আমায় একদিকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভারত দিতে চান এবং অন্যদিকে বৃটিশ জাতিসমূহের মধ্যে স্বায়ত্তশাসনশীল ভারত দেন——আমি নিঃসন্দেহে পরের প্রস্তাবটি গ্রহণ করব"। আর এক বিখ্যাত চরমপন্থী নেতা বাল গঙ্গাধর তিলক ১৯১৯ সালে অমৃতসর কংগ্রেসে যোগ দিতে ইংল্যান্ড সফর শেষে ভারতে এলেন। তিনি বৃটেনে কথা দিয়েছিলেন যে সংস্কার আইন মেনে নেবেন। দেশে ফিরে যখন দেখলেন যে দেশের রাজনৈতিক বাতাবরণ মোটেই তা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নয়. তখন তিনি বললেন যে সংস্কার আইন মোটেই সন্তোষজনক নয়। কিন্তু তা সত্বেও ট্রেনে করে অমৃতসর যাওয়ার পথে গঙ্গাপুর রেল স্টেশন থেকে বৃটেনের সরকারের কাছে একটা টেলিগ্রাম করলেন। 'ভারতের জনসাধারণের তরফ' থেকে করা এই টেলিগ্রামে তিনি ভারত সংস্কার আইন পাশ করার জন্যে বৃটেনের রানী এবং সরকারকে অভিনন্দন জানালেন। আর এক চরমপন্থী নেতা চিত্তরঞ্জন দাশ তা বলেছেনই যে স্বরাজের কোন সংজ্ঞা হয় না, স্বরাজ উপলব্ধির ব্যাপার। জনসাধারণের মগজকে ঘুলিয়ে দিতে তিনি গান্ধীর চেয়ে কম পটু মোটেই ছিলেন না। তাছাড়া ফরিদপুর বঙ্গীয় কংগ্রেস সম্মেলনে ডোমিনিয়ন স্টেটাসের পক্ষে তার খোলাখুলি ওকালতির কথা তো আগেই বলেছি। ১৯২০ সালে যখন হসরত মোহানি আমেদাবাদ কংগ্রেসে প্রথম স্বাধীনতার প্রস্তাব তুললেন তখন কোনও চরমপন্থী তাকে সমর্থন করেন নি। এর পর থেকে প্রতিটা কংগ্রেসে বামপন্থীরা স্বাধীনতার প্রস্তাব তুলেছেন. কিন্তু চবমপন্থীদের সমর্থন মেলে নি। ১৯২৭ সালে মদ্রাজ কংগ্রেসে জওহরলাল নেহেরু স্বাধীনতার প্রস্তাব সমর্থন করলেন এবং তা পাশও হয়ে গেল। তাতে নেহেরুর কি মনস্তাপ। আত্মজীবনীতে নেহেরু তা লিখেছেন। শেষে গান্ধীর কাছে অনুতাপ প্রকাশ করে তবেই শান্তি। ১৯২৮ এর কলকাতা কংগ্রেসের কথা আগেই লিখেছি। সেখানে বিষয় নির্বাচনী সভায় গান্ধীর মতে সায় দিয়ে পরে কর্মীদের চাপে সুভাষচন্দ্র অধিবেশনে সংশোধনী এনে স্বাধীনতার দাবী আনলেন। হোক চাপে পড়ে, তবু তো আনলেন। কিন্তু ১৯২৯ এর ১ জুলাই সুভাষচন্দ্রের একেবারে নিজস্ব পত্রিকা 'ফরোয়ার্ড'-এ লন্ডন লেখকের কলমে যা লেখা হল, তাতে এই স্বাধীনতা প্রস্তাব তোলার আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দিহান না হয়ে পারা যায় না।

যারা ভেবে থাকেন যে ভারতের চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন তাঁদের পক্ষে বুঝে নেওয়া মোটেই কষ্টকর হবে না যে যদি ভারতবর্ষ আপনার চেষ্টায় স্বাধীনতা লাভ করতে চায়, তাহলে বৃটেন ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্যে সম্মুখে অগ্রসর হতে পারে।

বুঝুন ব্যাপারখানা, স্বাধীনতার প্রস্তাব তোলা হয়েছিল এইজন্যে যে যাতে স্বায়ত্ত-শাসন পাওয়া যায়। ফড়ে যেমন যে দাম পেতে চায় তার চাইতে বেশি দাম চেয়ে বসে, সেইরকম দর কষাকষির জন্যে একটু বেশিই চাওয়া হল। আসল লক্ষ্য সেই ডোমিনিয়ান স্টেটাস। গান্ধীর সাথে মতের কোনও মূল পার্থক্য পাওয়া যাচ্ছে কি! কিন্তু স্বাধীনতার প্রস্তাব কংগ্রেসে আসতেই থাকল। পরের বছর গান্ধী স্বয়ং স্বাধীনতার প্রস্তাব আনলেন। পরে ঢোক গিললেন, আবার করাচি কংগ্রেসে স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাবে ফিরে যাওয়া হল। কিন্তু এর পর থেকে কংগ্রেসের দাবীই হয়ে দাঁড়াল পূর্ণ স্বাধীনতা। সহজেই বলা যায় যে বামপন্থীদের বারবার তোলা স্বাধীনতা প্রস্তাব, সুভাষের প্রবল চাপ কংগ্রেস নেতৃত্বকে

বাধ্য করল পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করতে। ব্যাপারটা মোটেই অত সহজ নয়। গান্ধী সে পাত্রই নন। জনতার স্বতঃস্ফূর্ত দাবীকে কি করে বিপথে চালিত করতে হয়, সবচেয়ে পিছু হটাকে কিভাবে জনতাকে মনে করাতে হয়——এ গান্ধীর এক নয়া চাল, জমিদার-শিল্পপতি তোষণকেও কিভাবে এক নতুন আন্দোলন বলে মনে করাতে হয়——গান্ধী তাতে সিদ্ধ হস্ত। সেই গান্ধীর কংগ্রেস যখন বলছে ভারতের লক্ষ্য স্বাধীনতা, তখন তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যটা ধরা দরকার। আর তা ধরতে পারলেই পাওয়া যাবে গান্ধী সুভাষের আসল বিরোধটা কোথায়।

ভারতে ইংরেজ-সৃষ্ট চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফল জমিদার-শ্রেণী। আর এই জমিদার এবং ইংরেজের সংস্পর্শে থাকা বেনিয়াদের মধ্যে থেকে তৈরী হয়েছে ভারতের শিল্পপতিরা। এই শিল্পপতিরা ইংরেজদের ছত্রছায়ায় থেকে শিল্প স্থাপন করেছে, ইংরেজদের ছত্রছায়াতেই এদের বাড়বাড়ন্ত। আর কংগ্রেস একেবারে জন্ম থেকেই দেশীয় জমিদার শিল্পপতিদের স্বার্থে বৃটিশ শাসকের উপর এক চাপদানকারী সংস্থা হিসেবে তার ভূমিকা পালন করে এসেছে। কংগ্রেস কোনসময়েই জমিদার-মিলমালিক বিরোধী পদক্ষেপ নেয় নি। যা কর্মসূচী নিয়েছে সব তাদেরই স্বার্থে। গান্ধী একেবারে গোড়া থেকেই দেশীয় ধনীদের একান্ত আস্থাভাজন। চিত্তরঞ্জন সেক্ষেত্রে তার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠছিলেন। আমরা আগেই দেখেছি চিত্তরঞ্জন কিভাবে জমিদারদের স্বার্থে কাজ করছেন, কিভাবে আইনসভায় ইস্পাত সংরক্ষণের জন্য লড়াই করে টাটাদের স্বার্থ রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের অকাল মৃত্যু গান্ধীর রাস্তাকে নিষ্কন্টক করে দিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ভারতীয় শিল্পের আরও বেশি বাড় বাড়ন্ত শুরু হল। কিন্তু ভারতীয় মিল-মালিকেরা বৃটিশের সাথে মোটেই সম্পর্ক বিচ্ছেদ চায় নি। তারা চেয়েছিল বৃটিশ-রাজ তাদের আরও বেশি সুযোগ সুবিধা দিক। এই মিল-মালিকদের মুখপত্র কংগ্রেস তাই এই সময়ে পূর্ণ স্বাধীনতা চায় নি, চেয়েছে ডোমিনিয়ান স্টেটাস। এতে যেমন জমিদার কারখানা-মালিকেরা খুশী হবে, তেমনি মধ্যবিত্তদের অগ্রণী অংশ আইনসভার সদস্য হয়ে মন্ত্রী হয়ে ক্ষমতা ভোগ করবে। স্বরাজ্য দল আইন সভায় যোগ দিয়ে এই ভূমিকাই পালন করেছিল। কিন্তু শিল্পপতি-জমিদারদের স্বার্থরক্ষায় গান্ধীর জুড়ি নেই। গান্ধী এক একটা আন্দোলন করেছেন, ভারতবর্ষ উত্তাল হয়েছে—— গান্ধী আন্দোলন বন্ধ করেছেন। কিন্তু লাখো জনতার আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে লাভবান হয়েছে ধনী আর মধ্যবিত্তেরা। একেকটা আন্দোলনেব পব দেশীয শিল্পপতিরা বিশেষ সুবিধা পেয়েছে, মধ্যবিত্তরা বেশি রাজনৈতিক ক্ষমতার স্বাদ পেয়েছে।

কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হল ১৯২৯সালের পর থেকে। গোটা ইউরোপে এক বিশাল অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিল। এই মন্দায় বৃটেন ক্ষতিগ্রস্ত হল সবচেয়ে বেশি কারণ সেই ছিল বিশ্বে সবচেয়ে বড় রপ্তানিকারক। বৃটিশ শিল্পের প্রাণকেন্দ্র লাঙ্কাশায়ার যে অবক্ষয়ের মধ্যে পড়ল আর কোনদিন তা থেকে সেরে উঠতে পারে নি। এই মন্দার আঁচ ভারতীয় শিল্পের উপর লাগলেও অন্যদিক থেকে বৃটিশ পুঁজির এই দুঃসময়ে ভারতীয় শিল্পপতিদের সামনে নতুন সম্ভাবনার সুযোগ খুলে গেল। ভারতীয় অর্থনীতিকে বৃটিশ পুঁজির পক্ষে আর বেঁধে রাখা সম্ভব হল না। ভারতীয় পুঁজি হয়ে দাঁড়াল অনেক বেশী স্বাধীন অনেক বেশী শক্তিশালী। প্রকৃতপক্ষে বৃটিশ শাসন থেকে ভারত রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হওয়ার অনেক আগে থেকেই ভারতীয় পুঁজি বৃটিশ অধীনতা থেকে মুক্তি পেয়েছিল। বিদেশী শিল্পসংস্থাগুলোও পুঁজির ক্ষেত্রে ভারতের এই স্বাধীন হওয়ার প্রবণতাকে লক্ষ্য করে ভারতীয় পুঁজির সাথে গাঁটছড়া বেঁধে শিল্প স্থাপনে এগিয়ে এল। ১৯৩৩-এ মেটালবক্স, লিভার ব্রাদার্স এবং

১৯৩৬-৩৭-এ ইম্পিরিয়াল কেমিক্যালস, ডানলপ-এর মত বহুজাতিক কম্পানি ভারতে শিল্পস্থাপন করল।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় পুঁজির এই জয়লাভ, তাকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও বৃটিশ অধীনতা থেকে মুক্ত হতে উদ্বুদ্ধ করে তুলল। বস্তুত, পুঁজির বিকাশের জন্য তা অবশ্য-প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ল। সেই আকাঙ্খারই প্রতিফলন ঘটল তাদের প্রতিনিধিস্থানীয় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে। কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ভারতের স্বাধীনতার দাবীতে সোচ্চার হয়ে উঠল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে মুসলমান শিল্পপতিরা ছিল তুলনায় ছোটমাপের। অবিভক্ত ভারতে প্রতিষ্ঠিত শিল্পপতিদের সাথে তারা এঁটে উঠতে পারবে না। ভারত থেকে একটা অংশ কেটে নিলে সেখানে তারা একচেটিয়া ব্যবসা করতে পারবে। পাকিস্থান সৃষ্টিতে মুসলমান শিল্পপতিদের এটাই ছিল অনুপ্রেরণা।

সুতরাং ১৯৩৯ সালে যখন সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয়বারের জন্য কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট হলেন, ইংরেজকে ভারত ছেড়ে চলে যেতে বলা হবে কিনা তা নিয়ে কোন মতদ্বন্দ্ব ছিল না। মতভেদ ছিল স্বাধীন ভারতে কার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে তা নিয়ে। গান্ধীর না সুভাষের। এ লড়াইতে অনেক আগে থেকেই দু'জনেই পাশে পেতে চেয়েছিল জওহরলালকে। কারণ জওহরলালকে পেলে জেতাটা সহজ। কিন্তু জওহরলালের হিসাবটা ছিল অন্য। তিনি জানেন সুভাষচন্দ্র নিজেই স্বাধীন ভারতের সর্বময় কর্তা হবেন। অন্যদিকে গান্ধী নিজে কিং হওয়ার চেয়ে কিং-মেকার হতেই বেশি আগ্রহী। সেখানে জওহরলালের চেয়ে আর কেই বা বেশি পছন্দসই হতে পারেন। তিনি গান্ধীর পক্ষেই রয়ে গেলেন।

গান্ধীর সাথে সুভাষের বিরোধ না ছিল হিংসা-অহিংসার জন্যে, না ছিল আপোসমুখী-আপোসহীন নীতির দ্বন্দ্ব। এ ছিল দুই নেতার ক্ষমতা দখলের লড়াই। এতে জেতার জন্যে দুই নেতাই গোষ্ঠীবাজী করেছেন, নানা অনৈতিক উপায় অবলম্বন করেছেন, কারচুপি করেছেন, জনতাকে বিভ্রান্ত করেছেন। এক কথায় গান্ধী-সুভাষ বিরোধকে বলা যায় যে দুই নেতার ভারতীয় শিল্পপতি-জমিদারদের কাছে আস্থাভাজন হবার লড়াই।

সুভাষচন্দ্র কি কংগ্রেসে সংগ্রামী ধারা

সুভাষচন্দ্র ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক উজ্জ্বলতম চরিত্র হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছেন। বলা হয়, কংগ্রেসের মধ্যে আপোসহীন সংগ্রামের ধারা তারই দ্বারা পরিচালিত। ইতিহাসের যারা নাকি বস্তুবাদী ব্যাখ্যাকার তারাও বলেন যে সুভাষচন্দ্র ভারতীয় বুর্জোয়াদের মধ্যে প্রগতিশীল অংশ। কিন্তু আজ যখন নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গীতে তার কার্যাবলী বিশ্লেষণ করা হচ্ছে, তবে কেন এতোদিনকার ভাবমূর্তি ভেঙে খান খান হয়ে যাচ্ছে? কেন ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ভারতের শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থরক্ষার প্রেক্ষিতে সুভাষচন্দ্রকে গান্ধী-জওহরলাল-প্যাটেলের সাথে এক সারিতে বসিয়ে দিচ্ছে? কেন নিরাসক্ত দৃষ্টিতে বিচার করলে তার আপোসহীনতা তার প্রগতিশীলতার পর্দা-ফাঁস হয়ে পড়ছে ?

সুভাষচন্দ্র রাজনৈতিক জীবন শুরু করলেন ১৯২১ সালে। মাঞ্চুরিয়ায় বিমান দুর্ঘটনা ঘটেছিল ১৯৪৫ সালে। আর কংগ্রেস ছাড়লেন বা ছাড়ানো হল ১৯৩৯ সালে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে তার চব্বিশ বছর রাজনৈতিক জীবনের আঠারোটা বছরই কেটেছে কংগ্রেসে। এই আঠারো বছরে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসে সম্পাদক হয়েছেন, দীর্ঘদিন সভাপতি

থেকেছেন, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সম্পাদক হয়েছেন, তিনি জাতীয় কংগ্রেসের সর্বোচ্চ পদ রাষ্ট্রপতি পর্যন্ত হয়েছেন (তখন জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতিকে রাষ্ট্রপতি বলা হত)। দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেসকে সেবা করার জন্যেই তার এই ক্রম-উত্থান। যে জাতীয় কংগ্রেস সৃষ্টি হয়েছিল ইংরেজদের দ্বারা, স্বয়ং বড়লাটের পৃষ্ঠপোষকতায়—— যে জাতীয় কংগ্রেস ছিল ভারতীয় শিল্পপতি-জমিদারদের প্রতিনিধি সংগঠন, যাদের অঙ্গুলিহেলন ছাড়া কংগ্রেসের এক ইঞ্চিও অন্য রাস্তায় হাঁটার উপায় ছিল না—— সেই ভারতীয় ধনিকদের সেবা না করেই কি সুভাষ কংগ্রেসের সর্বোচ্চ পদ পর্যন্ত উঠতে পেরেছিলেন? ধনিক সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা না করেই কি তিনি কংগ্রেসের এতসব গুরুত্বপূর্ণ পদে কৃতিত্বের সাথে কাজ করতে পেরেছিলেন? তিনি যদি এমন কাজই করতেন যা ভারতের চাষী-মজুর-সাধারণ মানুষের স্বার্থ বহন করে তাহলে কংগ্রেসে কখনই তার এতটা উত্থান ঘটতে পারে না। তথাকথিত বস্তুবাদী লেখকেরা, ইতিহাসের বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যাকারেরা কি করে এই সরল সত্যটা এড়িয়ে গেলেন, এ ভারি আশ্চর্যের কথা।

তেইশ বছরের এক তরুণ বিদেশী শাসকের লাঞ্ছনায়-শোষণে-অপমানে ক্ষুব্ধ হয়ে দেশ থেকে ইংরেজ হটানোর দৃঢ় ইচ্ছা নিয়ে কংগ্রেসে ঢুকলেন। নিশ্চয় এ ধারণা নিয়ে নয় যে তাকেও গোষ্ঠীবাজি করতে হবে, নির্বাচনে কারচুপি করতে হবে, ধনীদের কাছ থেকে হাত পেতে টাকা নিতে হবে। কিন্তু ইতিহাসের শিক্ষা এই যে কোন ব্যক্তি যত সৎ যতই দৃঢ় চরিত্রের হোক না কেন——যে রাজনৈতিক দল শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থবাহী নয়, সেই সংগঠনে কোন মানুষই তার চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং মানবিক মূল্যবোধগুলো ধরে রাখতে অবশ্যই পারে না। হয় তাকে সেই দল থেকে বেরিয়ে যেতে হয় নতুবা নিজেকে সেই দলের মত করে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। সুভাষচন্দ্রও তার ব্যতিক্রম হতে পারেন না। তার প্রমাণ আমরা আগের অনুচ্ছেদগুলোতে বারে বারে পেয়েছি। আরও কিছু ঘটনাকে আমরা খতিয়ে দেখি।

রাজনীতিতে সুভাষচন্দ্রের হাতেখড়ি চিত্তরঞ্জনের কাছে। বাংলায় তখন গান্ধীপন্থীদের উপর চিত্তরঞ্জনের আধিপত্যের প্রচেষ্টা চলছে। ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক সুভাষ সেই রাজনীতির ঘোরপ্যাঁচে পড়লেন। তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নানা কূটকৌশলে ঘায়েল করতে চিত্তরঞ্জন ছিলেন সকলের সেরা। এ ব্যাপারে কোন অনৈতিক কাজেও তার হাত কাঁপত না। তার কাছে শিক্ষানবীশ সুভাষকেও ওসব কাজে তিনি বারবার ব্যবহার করেছেন। এর আগেই আমরা বলেছি ১৯২৪ সালে বেঙ্গল প্যাক্টের সময় কিভাবে চিত্তরঞ্জন সুভাষচন্দ্রকে ব্যবহার করেছিলেন। ঐ সিরাজগঞ্জ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনেই ইংরেজদের দেওয়া ফাঁসিতে মৃত গোপীনাথ সাহার প্রশংসা করে একটা প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু ইংরেজরা চিত্তরঞ্জনকে ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে কি করে ঐ প্রস্তাব পাল্টালো তা শুনুন হেমন্তকুমার সরকারের জবানিতে। আর সুভাষ এ কাজে তার অনন্য সহকারী।

হঠাৎ সুভাষের টেলিগ্রাম পেয়ে কলকাতায় ফিরে এলাম। সুভাষ একটি বিবৃতি সই করার জন্য আমাকে দেখালো। সিরাজগঞ্জে গোপীনাথ সাহা সম্বন্ধে যে মন্তব্যটির খসড়া আমি নিজে হাতে করেছিলাম, দেখলাম এটা তা থেকে ভিন্ন। তখনকার ইউরোপীয়ান এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ভিলিয়ার্স সাহেব নাকি দেশবন্ধুর সঙ্গে দেখা করে বলেছেন যে, গোপীনাথ সম্বন্ধে প্রসংশাসূচক মন্তব্যটা একটু নরম করলেই, লাট-লিটন Devolution rules Govt. of India Act অনুসারে শাসন ক্ষমতা স্বরাজ্যদলের হাতে দেবেন। দেশবন্ধু এমন লোককে দিয়ে বিবৃতিটিতে আমার সই করালেন যার কাছে 'না' বলতে

পারা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। কেবল সই করার আগে একবার সুভাষকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি বলছো এটা সই করতে? সুভাষ নির্বিকারচিত্তে বললো, হ্যাঁ। আমি সই করে দিলাম।..........তখনও প্রফেসারির গন্ধ গায়ে একটু একটু আছে, পরিবর্তিত বিবৃতি সই করে, সুভাষ করতে বললো দেখে, আমার আর ক'দিন ঘুম হয়নি (*হেমন্তকুমার সরকার সুভাষের সঙ্গে বারো বছর*)। সামান্য ক্ষমতার আশায় চিত্তরঞ্জন আর সুভাষচন্দ্র প্রাদেশিক কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবও পাল্টে ফেললেন। সে সময়ে স্টেটসম্যান পত্রিকা কিন্তু সম্পাদকীয়তে পুরো ঘটনাটা ফাঁস করে দিয়েছিল।

বঙ্গীয় আইনসভায় সেসময়ে স্বরাজ্যদলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না। গভর্ণমেন্টকে ভোটে হারাতে দলনেতা চিত্তরঞ্জন অনেক সময়ই কিছু নির্দল মুসলমান সদস্যকে টাকা দিয়ে পক্ষে নিয়ে নিতেন। চিত্তরঞ্জনের এক পার্শ্বচর এবং একান্ত বিশ্বাসভাজন সাতকড়িপতি রায়ের কথা থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়——"বল্লেন দেশবন্ধু, কাউন্সিলে বসে কয়েকজন মুসলমানের জন্যে এত নোংরা ঘাঁটতে হয়েছে যে গা ঘিন ঘিন করে" (*প্রণব——মাসিক পত্রিকা. পৌষ* ১৩৭২)। ভারতীয় রাজনীতিতে এখন যা চলছে চিত্তরঞ্জন অনেক কিছুরই পথিকৃৎ হিসেবে দাবী করতে পারেন।

১৯২৩ এ সুভাষচন্দ্র বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক নিযুক্ত হন। কিন্তু গোষ্ঠীকোন্দল এমন ছিল যে এর জন্যেও তাকে কম কাঠখড় পোড়াতে হয় নি।

২০ জুন ১৯২৩ সুভাষচন্দ্র আব্দুল মতিন চৌধুরীকে লেখেন---এখন আবার ভাবছি, যে-সব সদস্য বি,পি,সি,সি'র সভায় যোগ দিতে আসবেন, তাঁদের পথখরচা বাবদ কিছু টাকা পাঠাতে পারলে ভাল হয়। অবশ্য তাঁরা এখানে আসার পরেও সেটা দেওয়া যেতে পারে। এই পরিস্থিতিটি আপনি অনুগ্রহ করে ভেবে দেখবেন, এবং কোনো সদস্যের সমর্থন পাওয়ার আশা থাকলে আপনি তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসতে পারেন। সভার অন্যান্য বিষয় নিয়ে কিছু ভাববার নেই। কাকে নিয়ে আসা উচিত আপনি ভেবে দেখবেন। একটাই কথা শুধু, আমরা এমন কাউকে আনতে চাইনা যে আমাদের বিরুদ্ধে ভোট দেবে। পরিষ্কার কথা, যারা আমাদের ভোট দেবে বেছে বেছে তাদের আনুন। তাদের পথ খরচার টাকাও দিয়ে দেওয়া হবে। ভোট পাওয়ার জন্যে পথখরচার টাকা দেওয়া পরে কংগ্রেসের রেওয়াজ হয়ে গিয়েছিল।

বঙ্গীয় আইন সভা নির্বাচনে ২৪ পরগণা কেন্দ্রটি বহু মানুষের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পড়েছিল। ঐ কেন্দ্রে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে কংগ্রেসের সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে লিবারেল দলের ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের। চিত্তরঞ্জন বিধান রায়ের পক্ষ নিলেন। সুভাষচন্দ্রের উপর দায়িত্ব দেওয়া হল বিধান রায়ের পক্ষে নির্বাচন পরিচালনার। এই ভোটের প্রচারে দেখা গেল সুরেন্দ্রনাথের বিরোধীরা একজন মহিলাকে ভাড়া করে সভায় সভায় বক্তৃতা দেওয়াচ্ছে। সেই মহিলা প্রত্যেকটা সভায় প্রকাশ্যে জনতাকে শোনাতে লাগলেন যে তাদের রাষ্ট্রগুরু একজন কিরকম যৌনবিকৃত মানুষ। সেসব বর্ণনাও বাদ গেল না (*বিমলানন্দ শাসমল—— স্বাধীনতার ফাঁকি*)। অনেকে এখনকার রাজনীতি নীতি-বিবর্জিত বলে আক্ষেপ করে থাকেন। তখনকার রাজনীতির একটু উদাহরণ দিলাম। আসলে এখনকার তখনকার ব্যাপার নয়, ধনিক শ্রেণীর রাজনীতি চিরকালই নীতি-বর্জিত। যতদিন সমাজে ধনিক শ্রেণীর রাজনীতির একাধিপত্য থাকবে ততদিন রাজনীতিতে নীতি-নৈতিকতা পদদলিত হতে বাধ্য।

স্বরাজ্যদল কলকাতা কর্পোরেশনে ক্ষমতা পাওয়ার পর চিত্তরঞ্জন হলেন মেয়র আর সুভাষচন্দ্র চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার। এই সময়ে কর্পোরেশনে দুর্নীতি স্বজন-পোষণ তো কমেই নি বরং বেড়েছিল। "অমৃতবাজার" পত্রিকায় সে যুগের নামকরা নেতা বিপিনচন্দ্র পালের লেখাগুলো পড়লে তো রীতিমত আঁতকে উঠতে হয়। তবে কর্পোরেশনের সি ই ও হিসাবে সুভাষচন্দ্রের অনন্য কীর্তি কাশীপুরের মেথর ধর্মঘট বানচাল করা। তার কর্মকুশলতা দেখে কলকাতার বাবু নাগরিকেরা অত্যন্ত মোহিত হয়ে গিয়েছিলেন। অনীক পঁচিশ বছর—— প্রবন্ধ সংকলনে তরুণ রায় 'সুভাষচন্দ্র প্রসঙ্গে' লিখেছেন—— " কিন্তু বিশের দশকে কলকাতায় যে দু'টি মাত্র ধাঙর ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়েছিলো, সেই দু'টিরই সংগঠক মুজফফর আহমদের বিবরণে দেখা যাচ্ছে, কোনোটিতেই ধাঙড়দের মার-ধর করা হয়নি, সুভাষ তখন কর্পোরেশনের কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন না, এবং এমন কি দ্বিতীয় ধর্মঘটটিতে তিনি নিজে ধর্মঘটের পক্ষে বক্তৃতা করেন।" শ্রীরায় জেনে উঠতে পারেন নি যে ১৯২৪ এ কাশীপুরে মেথর ধর্মঘট হয়েছিল কিন্তু মুজফফর আহমেদ তার সংগঠক ছিলেন না। তবে হ্যাঁ, সত্যিই ১৯২৮ সালের মেথর ধর্মঘটকে সুভাষচন্দ্র সমর্থন করেছিলেন। শুধু তাই নয় এই ধর্মঘটের নেতা হিসাবে যখন প্রভাবতী দাশগুপ্তা আর মুজফফর আহমেদ গ্রেফতার হলেন তখন সুভাষচন্দ্র তাদের মুক্তির দাবীতে সভা পর্যন্ত করেছিলেন। মুজফফর আহমেদ পর্যন্ত তার এই মতিভ্রম দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। শুধু তাই নয় ১৯২৮ এর ১৬ জুলাই কর্পোরেশনের এক বিশেষ সভায় তিনি মেথরদের সমর্থনে মেয়রের পদত্যাগ পর্যন্ত দাবী করলেন। ঐ সভায় তিনি বললেন——

কর্পোরেশনের কর্তারা এবার মেথর ধর্মঘট সম্বন্ধে যে ভাবে কাজ করিয়াছেন তাহার প্রতিবাদ করিবার মত জোর ভাষা আমার নাই। এরূপ অবস্থা নূতন নহে; ১৯২৪ সালে এইরূপ অবস্থারই উদ্ভব হইয়াছিল, কিন্তু তাহার প্রতিকারের জন্য পুলিশ কমিশনারের সাহায্য গ্রহণ করা হয় নাই। পাশব-শক্তি প্রয়োগ করা হয় নাই, কৌশলে ও আপসে ধর্মঘটের মীমাংসা হইয়াছিল। ১৯২৪ সালে যে পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছিল, এবার প্রধান কর্মকর্তা তাহা ভাবিয়াও দেখেন নাই।

কিন্তু কি সেই কৌশল ১৯২৪ সালে নেওয়া হয়েছিল যার জন্যে সুভাষচন্দ্রের এত গর্ব। সেবারের ধর্মঘট বানচাল করবার জন্যে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক নামানো হয়েছিল। সেই স্বেচ্ছাসেবকেরা নিজেরাই জঞ্জাল পরিষ্কার করেছিল। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মেথরদের ধরে পেটানোও হয়েছিল। এর আগে ইংরেজরা বহু ধর্মঘট ভাঙার জন্যে পুলিশ দিয়ে মজুরদের উপর অনেক অত্যাচার করেছে। কিন্তু রাজনৈতিক দলের কর্মীদের দিয়ে ধর্মঘট ভাঙার অভিনব কৌশলটি একান্তভাবে সুভাষেরই আবিষ্কার। এখনকার ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলোর তার কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত কারণ এ বিদ্যেটা তার কাছ থেকেই তারা শিখেছে।

কিন্তু কোন সে কারণ যার জন্যে আগেরবার নির্মম-কূট হাতে ধর্মঘট-ভাঙা সুভাষ চার বছর বাদে মেথরদের পরম বন্ধু হয়ে গেলেন। তার কারণ চারবছর আগে কর্পোরেশনের মেয়র ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাস আর তার সি ই ও সুভাষচন্দ্র। আর ১৯২৮ সালে সেই সুভাষকেই হটিয়ে মেয়র হয়েছেন বিজয়কুমার বসু। এই মেথর ধর্মঘটকে নিয়ে মেয়রকে ল্যাজে-গোবরে করে পদত্যাগ করাতে পারলে সুভাষ ছাড়া মেয়রের পদে আর কেই-বা বসতে পারে!

১৯২৮ সালে আইনসভার ভোটে নদীয়ায় কংগ্রেস থেকে মনোনয়ন দেওয়া হল

জমিদার রণজিৎ পালচৌধুরীকে। সেখানকার কংগ্রেসকর্মীদের আশা ছিল ইন্দুভূষণ ভাদুরীকে মনোনয়ন দেওয়া হবে। গোটা নদীয়ার মানুষের সুনিশ্চিত চিন্তা ছিল রণজিৎ পালচৌধুরী কংগ্রেসকে মোটা টাকা ঘুষ দিয়ে মনোনয়ন পেয়েছেন। বাধ্য হয়ে সুভাষচন্দ্রকে নদীয়ার সভায় সভায় ঘুরে বলতে হল যে কংগ্রেস ঘুষ নেয়নি। তবে কেন রণজিৎ পালচৌধুরীকে মনোনয়ন দেওয়া হল তার যুক্তি তিনি দেখালেন ভারি সুন্দর—

কংগ্রেস শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ ভাদুড়ীকে কেন মনোনয়ন দেয় নাই এ প্রশ্নও উঠিয়াছে। তাহার প্রধান কারণ এই যে কংগ্রেসের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে কোনো ধনী ব্যক্তি আগাইয়া আসিলে কংগ্রেসকেও একজন ধনী প্রার্থী দাঁড় করাইতে হয়। *(১০ জুন কৃষ্ণনগর টাউন হলের জনসভায় ভাষণ)* ধনী জমিদারদের টাকায় চলা দলের প্রধানের পক্ষে এর বেশি আর কিই বা বলা যেতে পারে।

১৯২৩ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় গান্ধীর ডাকে যেসব আইন ব্যবসায়ী আদালত বয়কট করেছিলেন তাদের সাহায্যের জন্যে কংগ্রেস একটা ফান্ড করেছিল। কংগ্রেস নেতা শিল্পপতি যমুনালাল বাজাজের টাকায় গড়া ফান্ডের নাম রাখা হয়েছিল—বাজাজ ফান্ড। সুভাষচন্দ্র সেদিন অত্যন্ত সঠিকভাবে প্রশ্ন তুলেছিলেন যে ফান্ডটির নাম 'বাজাজ ফান্ড' কেন? 'কংগ্রেস ফান্ড' বা 'তিলক স্বরাজ্য ফান্ড' নাম দেওয়া হল না কেন? *(২৫ মে ১৯২৩ 'বিজলী' পত্রিকায় লেখা প্রবন্ধ—বাঙালীর অধঃপতন)*। ১৯৩৭ সালে সুভাষচন্দ্র ইউরোপ থেকে দেশে ফেরার পর বাংলার কংগ্রেসের কাজকর্মের জন্য ঠিক হল একলক্ষ টাকার একটা ফান্ড তোলা হবে। মজার কথা ঐ ফান্ডটির নাম কোন মৃত কংগ্রেস নেতার নামে রাখা হল না। ফান্ডের নাম রাখা হল—'সুভাষ কংগ্রেস ফান্ড'। না. এর বিরুদ্ধে কোথাও এক লাইনও লেখা হয় নি।

অভিনেতা অশোককুমার তার আত্মজীবনী 'জীবন নাইয়া'তে লিখেছেন জওহরলাল সিনেমা হলে বসেও পাবলিসিটি নেওয়ার জন্য কি করতেন, সুভাষচন্দ্র জনতার মধ্যে দিয়ে গাড়ী করে যাবার সময় কিভাবে গাড়ীতে বসে থাকা সকলকে সুভাষচন্দ্রের নামে জয়ধ্বনি দিতে বাধ্য করতেন। শিবরাম চক্রবর্তী তার আত্মজীবনী 'ঈশ্বর পৃথিবী ভালোবাসা'য় লিখেছেন যে সুভাষচন্দ্র কিভাবে তার সঙ্গীসাথীদের কথায় শিবরাম চক্রবর্তীকে পত্রিকার চাকরি থেকে ছাঁটাই করেছিলেন। এরকম অনৈতিক কাজের উদাহরণ অজস্র অজস্র দেওয়া যায়। অনুগত লোককে চাকরিতে ঢোকানো, পরিচিতজনের ছেলেকে মেডিকেল কলেজে ঢোকানো, আত্মীয়দের কাউন্সিলার বানানো (প্রমাণ রেখেই বলছি)—কিছুই বাদ ছিল না। এসব কথা বলছি তার কারণ সুভাষচন্দ্রের নানা অপকর্মকে একসাথে তুলে ধরা কিংবা নিছকই কিছু ব্যক্তি নিন্দা—তা নয়। এতকিছু তুলে ধরা এটা প্রমাণ করতে যে তৎকালীন কংগ্রেস নামক দলটির যা বৈশিষ্ট্য এবং তার নেতারা যা যা করেছেন তা থেকে কেউ ব্যতিক্রম হতে পারে না—সুভাষচন্দ্র হলেও না। তাই সুভাষচন্দ্রের একাগ্রতা, গভীর আত্মপ্রত্যয়, কর্মদক্ষতা, অফুরন্ত প্রাণ-শক্তি, ইত্যাদির মত দুর্লভ গুণ থাকা সত্ত্বেও—তা থেকে ভারতবর্ষের শ্রমজীবী মানুষ কোনভাবে উপকৃত হয় নি। বরং এই সমস্ত গুণাবলী ব্যবহৃত হয়েছে ভারতের ক্ষমতাবান জমিদার আর উদীয়মান শিল্পপতিদের স্বার্থে।

পুরনো দিনের কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এটা নির্ধারণ করা সবচেয়ে জরুরী, তখনকার সময়ের চাহিদা অনুযায়ী পরস্পর বিবাদমান শক্তিগুলোর পরিচয় কি ছিল। সেদিন যেমন একদিকে ছিল সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ-শক্তি। অন্যদিকে ছিল দীর্ঘদিন ধরে

গ্রামীণ সমাজ আর অর্থনীতির উপর প্রভুত্বকারী জমিদার এবং উদীয়মান দেশীয় শিল্পপতিদের সম্মিলিত শক্তি। এই দুই শক্তির মধ্যে বিরোধও যেমন ছিল, তেমনি সমস্বার্থে গলাগলিও কম ছিল না। আর এই সম-স্বার্থ হল, এই দুই শক্তিরই শোষণের লীলাভূমি বা কমন হান্টিং গ্রাউন্ড ছিল ভারতের কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষ। শোষণে অত্যাচারে এই মানুষেরাও বারবার বিদ্রোহ করেছে। 'জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকেরা' এর নাম কখনও দিয়েছে 'কৃষক বিদ্রোহ', কখনও বলেছে 'আদিবাসী বিদ্রোহ', কোনটাকে বলেছে 'হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে মুসলমান প্রজার বিদ্রোহ'। কিন্তু কোনও ঔপনিবেশিক শাসনে কোন একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চলের চাষীরা যখন স্থানীয় রাজা বা নবাব বা জমিদারকে কর দিতে অস্বীকার করে, যখন একটা সমান্তরাল নিজস্ব শাসন-ব্যবস্থা তৈরী করে, (এমনও দেখা গেছে যে নিজস্ব সশস্ত্র বাহিনী তৈরী করেছে)——তখন যে সে লড়াই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মহাসংগ্রামে পরিণত হয়——এ সরল সত্যটা এইসব ঐতিহাসিকেরা হয় ভুলে যান অথবা ইচ্ছে করে ভুল করেন। একটা ঔপনিবেশিক শাসনাধীন সমাজে আমরা তাকেই প্রগতিশীল শক্তি বলব যা একাধারে বিদেশী শাসন এবং দেশীয় জমিদার-মিলমালিকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করে। সুভাষচন্দ্রের সময়েই ভারতে এরকম একটা তৃতীয় শক্তি অবশ্যই ছিল তা সে যত ছোট যত অসংগঠিতই থাকুক না কেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সুভাষচন্দ্র সেদিনকার সেই শ্রমজীবী মানুষের লড়াইয়ে অংশ নেন নি, সহানুভূতিও দেখান নি। বরং ভারতীয় ধনিকদের স্বার্থে তার বিরোধিতা করেছেন। তাই আজকের একদল তথাকথিত বস্তুবাদী ব্যাখ্যাকারেরা তাকে যতই কংগ্রেসের মধ্যে প্রগতিশীল অংশ বলে চেঁচান না কেন——যুক্তিনিষ্ঠ মূল্যায়নে সুভাষচন্দ্রকে আমরা প্রগতির পক্ষে কখনই বলতে পারি না।

চতুর্থ পর্ব

ফরওয়ার্ড ব্লক

কংগ্রেস থেকে ফরওয়ার্ড ব্লক

আপ্রাণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র বুঝলেন যে গান্ধী কোনোক্রমেই আর তার সাথে সহযোগিতায় আসবেন না। তখন নেহাত বাধ্য হয়েই ১৯৩৯ এর ২৯ এপ্রিল কলকাতায় এ আই সি সি-র সভায় তিনি কংগ্রেস সভাপতির পদ ত্যাগ করলেন। জওহরলাল একটা শেষ চেষ্টা করেছিলেন যাতে মধ্যস্থতায় আসা যায়, কিন্তু কোনটাতেই কোন কাজ হল না। হবার কথাও নয়। কারণ গান্ধী আর সুভাষ-দুজনেরই চাহিদা যে এক। কংগ্রেসের উপর নিরঙ্কুশ নেতৃত্ব।

সভাপতির পদ ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেও সুভাষচন্দ্র মুহূর্তের জন্যেও বসে রইলেন না। প্রস্তুতি আগে থেকেই ছিল——কারণ তিনি এ পরিণতির কথা আগেই আঁচ করতে পেরেছিলেন। মাত্র চার দিনের ব্যবধানে ৩ মে তৈরী করলেন 'ফরওয়ার্ড ব্লক'। তিনি এই দল গড়ার জন্যে একত্রিত করেছিলেন বাংলার বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স, শ্রীসংঘের মত সন্ত্রাসবাদী ছোট ছোট দলের প্রাক্তন সদস্যদের, বাংলার কংগ্রেসে তার নিজস্ব অনুগামীদের আর বাংলার বাইরে বিভিন্ন প্রদেশের এমন সব কংগ্রেস কর্মীদের যারা উচ্চতম নেতৃত্বের প্রতি নানা কারণে ক্ষুব্ধ। এরাই হলেন সুভাষচন্দ্রের ভাষায়——কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী অংশ। 'ফরওয়ার্ড ব্লক' স্থাপন করা হল কংগ্রেসের থেকে আলাদা কোন নীতি বা কর্মসূচী নিয়ে নয়। কারণ সুভাষচন্দ্র নিজেও একান্তভাবে কংগ্রেসের নীতিতেই বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি পরিষ্কার বললেন——

'ফরোয়ার্ড ব্লক' কংগ্রেসেরই মধ্যে একটি ব্লক হিসাবে থাকিবে। কেবলমাত্র যাঁহারা কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্য তাঁহারাই ইহার সদস্য হইতে পারিবে। সেইজন্য এই ব্লক কংগ্রেসের বর্তমান সংবিধান এবং কর্মসূচী অপরিবর্তিত অবস্থায় মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবে।

(২১ জুন ১৯৩৯ বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রথম অধিবেশনের পূর্বদিন জনসভায় প্রদত্ত ভাষণ)

তো যদি কংগ্রেসের নীতি আর কর্মসূচী অপরিবর্তিতভাবেই মেনে চলবে, তাহলে আলাদা

করে ফরোয়ার্ড ব্লক করা কেন? কংগ্রেস কি দোষ করল! তারও উত্তর মেলে সুভাষচন্দ্রের আর এক বক্তৃতায়——

দক্ষিণপন্থীরা সুসংবদ্ধ সংগঠন, লক্ষ্যণীয় শৃঙ্খলাপরায়ণতা এবং একজন নেতার অধীনে একযোগে কাজ করার দৃঢ় সংকল্পের মাধ্যমে পরাজয়কে পরবর্তী বিজয়ে পরিণত করিয়াছেন। রাজনৈতিক দলের পক্ষে যথেষ্ট অর্থ ও অন্যান্য উপকরণ তাহাদের হাতে ছিল অথচ সেখানে যথোচিত সংগঠনের অভাবে বামপন্থীরা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হন। বামপন্থীদের মধ্যে সমাজতন্ত্রবাদী রায়পন্থী প্রভৃতি বিভিন্ন উপদল ছিল। তাহাদের সকলকে একত্রিত করার জন্য কোনো প্রকৃত প্রয়াস করা হয় নাই। সুতরাং তাহাদিগকে স্বাভাবিক কারণেই পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল। বামপন্থীরা কোনক্রমেই ত্রিপুরীতে দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে একটা শক্ত ব্লক হিসাবে দাঁড়াইতে পারেন নাই। দক্ষিণপন্থীরা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিলেন এবং সেই কারণেই অন্য কোনো গোষ্ঠীর সহিত আপস চাহেন নাই। *(৫ জুন ১৯৩৯. ঢাকা সদরঘাট পার্কে জনসভায় ভাষণ)*

তিনি আরও বললেন——

আমরা এই দিকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিলে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সুস্পষ্ট পরিবর্তন ঘটিবে।

সেই কার্যকর ব্যবস্থাটাই হচ্ছে কংগ্রেসের মধ্যে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বাধীন একটা ব্লক। এই ব্লককে শক্তিশালী করতে হবে তার কারণ——

বামপন্থীগণ যদি দৃঢ় ব্লক হিসাবে নিজেদের সংগঠিত করিতে পারেন এবং নিজেদের সম্মানবোধ অক্ষুন্ন রাখিয়া যদি নিজেদের কর্মসূচী রূপায়ণ করিতে পারেন তাহা হইলে কংগ্রেসের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই তাঁহাদের সহিত আপস-রফার চেষ্টা করিতে বাধ্য হইবেন। *(৫ জুন ঢাকা সদরঘাট পার্কে জনসভায় ভাষণ)*

এখানে সুভাষচন্দ্র পরিষ্কার জানাচ্ছেন যে, দ্বিতীয়বার কংগ্রেসের সভাপতি হয়ে তিনি নেতাদের সাথে আপস-রফায় আসতে পারেন নি কারণ তার 'বামপন্থী ব্লক' দুর্বল ছিল। এবার তিনি তার ব্লকটিকে শক্তিশালী করবেন যাতে নেতারা তার সাথে রফায় আসতে বাধ্য হয়। তার মানে তিনি ফরোয়ার্ড ব্লক তৈরী করলেন কংগ্রেস নেতৃত্বের উপর একটা চাপদানকারী উপদল হিসেবে——যা তাকে কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতৃত্বে থাকতে সাহায্য করবে। ২১ জুন বোম্বাই-এর জনসভাতেও তিনি একই উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন যে ফরোয়ার্ড ব্লক স্থাপন ও শক্তিশালী হওয়ার ফলে——

সেই অবস্থাতে কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্লকটি তাহাদের আত্মগর্ব ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে এবং বামপন্থীদের নীতি ও প্রস্তাবগুলিকে স্বীকৃতি দিবে। তখন আমরা কংগ্রেসের দুইটি অংশের মধ্যে সম্মানজনক আপোস ব্যবস্থা করিতে পারিব।

৫ আগস্ট তার নবগঠিত উপদলটির মুখপত্র 'ফরোয়ার্ড ব্লক' সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে 'ফরোয়ার্ড ব্লক কেন?' শিরোনামে তিনি লিখলেন——

সুতরাং দক্ষিণপন্থীদের নিকট হইতে বামপন্থীদের বিভিন্নতা সৃষ্টির ও নিজেদের সংহত করার সময় আসিয়াছে। ইহা সম্পন্ন হইলে বামপন্থীরা কংগ্রেসে সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়া উঠিবেন এবং তখন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নামে স্বাধীনতা আন্দোলন পুনরারম্ভের কাজে অগ্রসর হইবেন। ইহাই আজ বামশাখার কাজ। এই কাজ সম্পন্ন করার জন্য ফরোয়ার্ড ব্লক জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

সুভাষচন্দ্রের ফরোয়ার্ড ব্লক তাই জন্মমুহূর্ত থেকেই নতুন কোন দিশা দেখাতে পারে নি। যারা দাবী করেন যে ফরোয়ার্ড ব্লক একটা বিপ্লবী সংগঠন হিসাবে জন্মগ্রহণ করেছিল তারা স্পষ্টতই এড়িয়ে যান যে এটা ছিল কংগ্রেসের মধ্যে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্ব হাসিল করবার একটা পদক্ষেপ মাত্র। এমনকি কংগ্রেস থেকে যখন তাকে কার্যত বহিষ্কৃত করা হল, পাটনায় ফরোয়ার্ড ব্লকের সভায় কংগ্রেসী ছাত্ররা যখন তাকে জুতো ইঁট ছুড়ে মারল, তখন ২৭ আগষ্ট পাটনায় বাঁকিপুর জনসভায় তিনি বললেন——

কংগ্রেসের প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্যে আমি কাহারও অপেক্ষা কম নই। যদি আমাকে কংগ্রেস বাহির করিয়া দেয় তাহা হইলেও আমি কংগ্রেসকে নিজের বলিয়া মনে করিব এবং ইহার সেবা করিতে থাকিব।

এর পরেও কি বলা যায় যে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এক বিপ্লবী দল 'ফরোয়ার্ড ব্লক' গঠন করলেন?

ভারতবর্ষের সব প্রদেশে ফরোয়ার্ড ব্লকের শাখা গড়ে তোলার জন্যে সুভাষচন্দ্র প্রদেশে প্রদেশে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তার দাবীমত 'দশ মাসে তিনি প্রায় এক হাজার সভায় অবশ্যই বক্তৃতা করেছেন'। *(দ্য ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল)*। প্রদেশে প্রদেশে এই সভাগুলোতে ভিড়ও হত খুব। গান্ধী নিজেই স্বীকার করেছিলেন যে সভাপতির পদ থেকে বিদায়ের পর সুভাষচন্দ্রের জনপ্রিয়তা আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গিয়েছিল। আসলে ভারতবাসী কংগ্রেসের ইংরেজ আর দেশীয় ধনিকদের তোষামোদী নীতির প্রতি অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ ছিল। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের ছিল গরম বামপন্থী বক্তৃতা। তার উপর সদ্য কংগ্রেস সভাপতির পদ ছুঁড়ে ফেলে বেরিয়ে এসেছেন। দেশের মানুষের নিশ্চিত ধারণা ছিল যে সুভাষের আপোসহীন মনোভাবের জন্যেই কংগ্রেস সভাপতির পদ হারাতে হয়েছে। সুতরাং তার জনসভাগুলো সফল হতে থাকল। মাদ্রাজে এরকমই একটা জনসভা চলাকালীন সুভাষচন্দ্রের হাতে একজন শ্রোতা সেদিনের সান্ধ্য খবরের কাগজটা ধরিয়ে দিলেন। শিরোনামের খবর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে। তারিখটা ছিল ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯। সুভাষচন্দ্র থামলেন না। তিনি বক্তৃতা দিয়ে দেশবাসীকে বোঝাতে লাগলেন বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজদের সমূহ বিপদ, স্বাধীনতা হাসিল করার এই উপযুক্ত সময়। যুদ্ধের সময় এই ইংরেজবিরোধী প্রচারেও ইংরেজরা তাকে গ্রেপ্তার করল না। সুভাষ জানতেনও যে তাকে গ্রেপ্তার করবে না।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন নেতা। আমরা কাঁধের ওপর ডান হাতখানা রেখে বললেন, "আমি জানি, ইংরেজ এখুনি আমাকে গ্রেপ্তার করবে না।"

"কিন্তু কেন?"

"তার ফলে কংগ্রেসের ভেতরকার গোলমাল মিটে যেয়ে, কী জানি, আবার যদি একজোটে কংগ্রেস ওর বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, এই ভয়ে।" *নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী---নেতাজী: সঙ্গ ও প্রসঙ্গ, ১ম খন্ড)*

সুতরাং সুভাষচন্দ্র সভায় সভায় বক্তৃতা চালিয়ে যেতে থাকলেন।

সুভাষচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল সমাজতন্ত্রী, রায়পন্থী, নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট যারা ন্যাশনাল ফ্রন্টের নামে কাজ করছিল——সকলেই আত্মবিলোপ করে ফরোয়ার্ড ব্লকে যোগ দিক। কিন্তু তিনি যখন দেখলেন তা সম্ভব হবে না, তখন বামপন্থী সমন্বয় কমিটি নামে একটা সংগঠন তৈরী করলেন। তিনি নিজে হলেন ঐ কমিটির আহ্বায়ক। সমন্বয় কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন——কংগ্রেস সমাজবাদী দলের জয়প্রকাশ নারায়ণ, ইউসুফ মেহের আলি, নরেন্দ্র দেব, কমিউনিস্ট পি. সি. যোশী, সোমনাথ লাহিড়ী, ভরদ্বাজ, রায়-এর দলের এম

এন রায় নিজে, কিষাণ সভার সহজানন্দ, এন জি রঙ্গা, ফরওয়ার্ড ব্লকের সত্যরঞ্জন বাক্সী, বিশ্বম্ভর দয়াল ত্রিপাঠি এবং আরও কয়েকজন। এই বামপন্থী সমন্বয় কমিটির উদ্দেশ্য হিসাবে বলা হয়েছিল যে সর্বভারতীয় কংগ্রেসকে (১) বৃটিশ সরকারকে চরমপত্র দিতে হবে, (২) আন্তর্জাতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত অবস্থার সুয়োগ নিতে হবে এবং (৩) বৃটিশ শাসন উচ্ছেদের পর ভারতকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করতে হবে। লক্ষ্যণীয় বিষয় হল এই বামপন্থী সমন্বয় কমিটিও কংগ্রেসের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। দ্বিতীয় বিষয় যেটা আরও গুরুত্বপূর্ণ যে এরা লক্ষ্য হিসাবে স্থির করলেন যে আগে ইংরেজ তাড়াতে হবে, তারপর ভারত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হবে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে এরা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে পরিণত করার ডাক দিলেন না। অবশ্য তা দিলে সুভাষচন্দ্র রাজীও হতেন না। এ বিষয়ে তার মত আমরা আগেই দেখেছি।

এর মধ্যে অবশ্য কংগ্রেস নেতৃত্বও চুপ করে বসে ছিল না, কংগ্রেসে গৃহীত সিদ্ধান্তকে পাশ কাটিয়ে ফরোয়ার্ড ব্লকের গৃহীত কর্মসূচীকে রোখার জন্যে ২৪থেকে ২৭শে জুন ১৯৩৯ বোম্বাইয়ে এ আই সি সি-র সভায় ব্যবস্থা নেওয়া হল। সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে প্রদেশ কংগ্রেসের অনুমতি ছাড়া কোনও কংগ্রেসকর্মী কোন সত্যাগ্রহে অংশ গ্রহণ করতে পারবে না। সুভাষচন্দ্র দেখলেন যে আর সংঘাত এড়াবার কোন উপায়ই নেই। তিনি এ আই সি সি-র 'অগণতান্ত্রিক' সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ৯ জুলাই সারা ভারতে বিক্ষোভ প্রদর্শনের আহ্বান জানালেন। ইংরেজ-বিরোধী কোন বিক্ষোভ নয়, সারা দেশের কংগ্রেস কর্মীরা বিক্ষোভ দেখাবেন তাদের উচ্চতম কমিটির প্রতি 'স্বৈরতান্ত্রিক' সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। স্বভাবতঃই কংগ্রেস নেতৃত্ব এটাকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিল। কংগ্রেসের তখনকার সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ জব্বলপুর থেকে তারবার্তা পাঠালেন ৬ জুলাই——

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আপনি যে ৯ জুলাই প্রতিবাদ দিবস স্থির করিয়াছেন, তাহার সম্পর্কে আপনার বিবৃতি পড়িয়া বিস্মিত হইয়াছি। আমি বিভিন্নমহলের অনুরোধক্রমে এই পত্র আপনাকে লিখিতেছি। আমার আশা, আপনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সভাপতি হিসাবে অনুগ্রহ করিয়া প্রস্তাবিত সভা-সমাবেশ ইত্যাদি বন্ধ করিয়া কংগ্রেসের শৃঙ্খলা রক্ষা করিবেন। কিন্তু কোনও কাজ হল না। ৯ জুলাই বিক্ষোভ, সভা-সমাবেশ সবই হল। কংগ্রেস নেতৃত্ব একটা এস্পার-ওস্পার করতে চাইল। রাজেন্দ্রপ্রসাদ রাঁচি থেকে ১৬ জুলাই চিঠিতে লিখলেন——

৯ জুলাই প্রতিবাদ দিবস পালিত হইবার পূর্বে আমি একটি বিবৃতিতে সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছিলাম যে কংগ্রেসের অধীন কমিটিগুলি এবং কংগ্রেসের পদাধিকারীদের কর্তব্য হইল নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি এবং কংগ্রেসে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি মানিয়া চলা এবং তাহাকে কার্যে পরিণত করা। তাহার পরিবর্তে যদি সিদ্ধান্তগুলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সংগঠিত করেন তাহা হইলে তো কংগ্রেসের পক্ষে কার্য করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। আমি ব্যক্তিগতভাবে এই রূপ কার্যকে যে শুধু শৃঙ্খলাভঙ্গকারী মনে করি তাহা নহে, এরূপ কার্যকে কংগ্রেস সংগঠনের ভবিষ্যতের পক্ষেও চরম বিপজ্জনক বলিয়া বিবেচনা করি। সুতরাং শাস্তিমূলক বা অন্য কোনরকম ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে বিষয়টি আমি ওয়ার্কিং কমিটির সম্মুখে পেশ করিব। কমিটি যেরূপ বিবেচনা করে সেরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। ইহাতে ওয়ার্কিং কমিটি এ বিষয়ে আপনার অভিমত ও আপনার নিকট হইতে এরূপ কার্যের ব্যাখ্যাও জানিতে পারিবে। আপনি এ বিষয়ে আপনার অভিমত অবিলম্বে জানাইয়া বাধিত করিবেন।

এর উত্তর সুভাষচন্দ্র পাঠালেন সাতই আগস্ট। এ সময়ে তার শিবির অনেক সংহত,

অনেক শক্তিশালী। সুতরাং নত হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। সুভাষচন্দ্র নিজের অবস্থান থেকে এক ইঞ্চিও সরলেন না। তিনি জবাবে লিখলেন——

আমি এ আই সি সি-র দুইটি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছি মাত্র। এ আই সি সি কর্তৃক গৃহীত কোন সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করার সাংবিধানিক অধিকার আমার আছে। আপনি যদি কোন সিদ্ধান্তের সপক্ষে মতামত দিবার অধিকার দান করেন, তাহা হইলে বিপক্ষে মতামত দিবার অধিকার নিষিদ্ধ করিতে পারেন না।

তিনি আরও চমৎকার যুক্তি দেখালেন——

আমরা এতদিন আরও অন্য বিষয়ের মতো বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ব্যক্তি-স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়া আসিতেছি। আমার মতে বাক্-স্বাধীনতাও ইহার মধ্যে পড়ে।..................আমার মতে এ আই সি সি-র প্রস্তাবের বিরূপ সমালোচনা করিতে না দেওয়া দেশের স্বার্থের পরিপন্থী এবং এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা আর কাহারও গণতান্ত্রিক অধিকার বাতিল করা একই ব্যাপার।

শুধু তাই নয়। কংগ্রেস কমিটির বিরুদ্ধে সভা-সমিতি করা এবং সংবাদপত্রে বিবৃতি দেওয়ার পক্ষে তার যুক্তি হল——

আমার সাথে আপনি একমত হবেন বলিয়া আশা করি যে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে স্বমতে আনিবার উদ্দেশ্যে প্রচার করিবার অধিকার আমাদের আছে। জনসভার মাধ্যমে এবং সংবাদপত্রে লেখার মাধ্যমে কংগ্রেসকর্মীদের কাছে আবেদন করা ছাড়া আমরা কিভাবে তাহা করিতে পারি? আজিকার কংগ্রেস মুষ্টিমেয় কিছু লোকের সংগঠন নয়। বর্তমানে তাহার সদস্য ৪৫ লক্ষের কাছাকাছি হইবে। আমরা সভা-সমিতি করিয়া ও সংবাদপত্রে লিখিয়াই তাহাদের নিকট আবেদন করিতে এবং আমাদের মতে লইয়া আসিবার আশা করিতে পারি।

এর সাথে সুভাষ সরাসরি রাজেন্দ্রপ্রসাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন——

শৃঙ্খলা বলিতে আপনি যে সংজ্ঞা নিরূপণ করিতেছেন আমি তাহা মানিতে পারি না। এ আমি নিজেকে একজন কঠোর শৃঙ্খলাপরায়ণ ব্যক্তি বলিয়া মনে করি এবং আমার ধারণা শৃঙ্খলার অজুহাতে আমার সুস্থ সমালোচনার মুখ বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

কংগ্রেস নেতৃত্বের পক্ষে আর হজম করা সম্ভব হল না। শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে সুভাষচন্দ্রকে তিন বৎসরের জন্যে কংগ্রেসের কোনও পদে নির্বাচনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল। এই ব্যবস্থা তার কাছে বহিষ্কারের সামিল।

সুভাষচন্দ্রের উপর কংগ্রেস 'হাই-কমান্ডের' নেওয়া এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা যেমন সেদিন তেমনই আজকের ভারতবাসী ভালোভাবে মেনে নেয় নি। এই ঘটনা তার উপর কংগ্রেস নেতৃত্বের প্রতিহিংসাপরায়ণতা হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে এসেছে। এই চিন্তার মধ্যে কিছুটা সত্যতা থাকলেও একথা ভুলে যাওয়া হয় যে এধরণের ব্যবহার সুভাষ নিজেও অন্যের উপর করেছেন। সেসময় তিনি যে সব যুক্তি, যে সব অজুহাত খাড়া করেছিলেন, সেগুলোই পরে তার দিকে ফিরে এসেছে। ১৯৩০-এ তিনি যখন বাংলা প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি, ৯ নভেম্বর কলকাতার এ্যালবার্ট হলে জনসংঘের এক সভায় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত সম্পর্কে একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন——

পরিশেষে আমি বলিব যে কংগ্রেস যে-কোনো ব্যক্তির চেয়েই বড়ো। আমি যদি কখনো কংগ্রেসকে লঙ্ঘন করিয়া আমার ব্যক্তিগত প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা করি ও কংগ্রেসের

ভিতর সকল শৃঙ্খলা নষ্ট করিয়া দিই তবে কংগ্রেস হইতে আমাকে বহিষ্কার করাই উচিত হইবে। ঘটনাক্রমে আমি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছি। আগামী নির্বাচনে অপর কেহ সভাপতি নির্বাচিত হইতে পারেন। কিন্তু সভাপতির পদে যিনিই বসুন দলীয় শৃঙ্খলা তাহাকে বজায় রাখিতেই হইবে। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যিনিই বিদ্রোহ ঘোষণা করিবেন তিনি যত জনপ্রিয় বা খ্যাতনামা হোন-না কেন কঠোরভাবে তাঁহাকে দমন করিতেই হইবে।

সময়ের পরিহাসে তাকে আজ এই সব কথাই শুনতে হচ্ছে আর উল্টোকথা বলতে হচ্ছে। আবার তিনি সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভাপতি থাকাকালীন ওয়ার্কিং কমিটি এন বি খারেকে মধ্যপ্রদেশের প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দেয় এবং পরে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়। সেদিনও ডঃ খারে তার প্রতি অবিচার হচ্ছে এই অভিযোগ আনেন। সেদিন কিন্তু সুভাষ দলীয় শৃঙ্খলা আর ওয়ার্কিং কমিটির উচ্চতর ক্ষমতার অজুহাত খারেকে দেখিয়েছিলেন। কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে সেদিন তিনি এক বিবৃতিতে জানিয়েছিলেন——

কিন্তু কোন বিবেকবান সেনাপতি বা মন্ত্রী তাঁহার প্রতি অন্যায় করা হইতেছে বা অসংগত ব্যবহার করা হইতেছে মনে করিলেও তাঁহার সরকার কিংবা তাঁহার দলের বিরুদ্ধে সারা দেশে নিন্দা প্রচার করিয়া বেড়ান না। *(ডঃ এন বি খারের কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বিষয়ে কংগ্রেস সভাপতির বিবৃতি, ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮)*

ডঃ খারে গান্ধীর বিরুদ্ধে কিছু সুনির্দিষ্ট অভিযোগ এনেছিলেন। সুভাষচন্দ্র সে বিষয়ে ঐ বিবৃতিতে লিখলেন——

যাহা সর্বাধিক দুঃখের ব্যাপার তাহা হইল মহাত্মা গান্ধীর মতো ব্যক্তির বিরুদ্ধেও কটূক্তি করা হইয়াছে। তাঁহার উদ্দেশ্যে যে সকল বিশেষণ ব্যবহার করা হইয়াছে তাহা যদি একত্রিত করা যায়, তাহা হইলে প্রত্যেক ভারতীয়ের আত্মা তীব্র বিতৃষ্ণায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবে।

শুধু তাই নয়, সাংবাদিকদের কাছে এক সাক্ষাৎকারে সুভাষ বলেছিলেন——স্বেচ্ছায় নিজের পদ ত্যাগ করিয়া অনুগত কংগ্রেসসেবীরূপে কাজ করিয়া গেলে কিছুকাল পরে আবার ডঃ খারের সম্মুখভাগে আসা কেহ ঠেকাইতে পারিত না।......................তিনি যদি এখনো কঠোর শৃঙ্খলার সহিত এই মহান জাতীয় সংগঠনের সদস্য হিসাবে কংগ্রেস ও জনসাধারণের সেবা করিয়া চলেন তাহা হইলে মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেস যেমন লাভবান হইবে, তেমনই আস্থা ও দায়িত্বের সহিত তাহারও পুনর্বাসনের পথ পরিষ্কার হইবে।

সুভাষচন্দ্রের উপর ডঃ খারের অত্যন্ত আস্থা ছিল। তিনি আশা করেছিলেন যে সুভাষ অন্তত তার পাশে দাঁড়াবেন। পরে তিনি বলেছিলেন যে সুভাষচন্দ্র ব্যক্তিগতভাবে তার প্রতি সহানুভূতিশীল থাকলেও তখন তিনি গান্ধীর হাতের পুতুল হয়ে গিয়েছিলেন। ডঃ খারে দুঃখ করে লিখেছিলেন যে একদিন সুভাষচন্দ্রকেও তাঁরই মতো কংগ্রেসের স্বৈরতান্ত্রিকতার শিকার হতে হবে। তার সেই ভবিষ্যৎবাণী আজ সঠিক প্রমাণিত হল।

শুধু সুভাষচন্দ্রকে নির্বাসিত করেই কংগ্রেস নেতৃত্ব থামল না। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটিতে সুভাষ বসু আর শরৎ বসুরাই ছিল দলে ভারি। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ভেঙ্গে দিয়ে আবুল কালাম আজাদকে সভাপতি বানিয়ে একটা এ্যাড-হক কংগ্রেস কমিটি তৈরী করে দেওয়া হল। প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ তো আগাগোড়া গান্ধীপন্থী দলে ছিলেন — তিনি সেখানেই থাকলেন। কিন্তু সবচেয়ে অবাক করলেন কিরণশঙ্কর রায় এবং বিধানচন্দ্র রায়। এরা আগে সুভাষচন্দ্রের পক্ষে থাকলেও এখন মত পালটে ঐ গান্ধীপন্থীদের এ্যাড-

হক কামাটতে ঢুকলেন। বাংলার কংগ্রেস মহলে তখন প্রবল সুভাষ-হাওয়া। লোকে কংগ্রেস কমিটিকে ব্যঙ্গ করে ঢক-ঢকি কংগ্রেস বলে ডাকতে লাগল। কিন্তু এ্যাড-হক কংগ্রেস কমিটি তৈরী করে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সুভাষের একটা বড় চাল ভেস্তে দিল। আসন্ন রামগড় কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র বাংলা থেকে ছাঁকা সাড়ে চারশো প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছিলেন যারা তাকে কিংবা তার মনোনীত প্রার্থীকে ভোট দিত। এদের প্রতিনিধিত্ব চলে গেল। এক তো সুভাষ নিজে মনোনীত হতে পারবেন না। তার পর তার পছন্দসই কাউকে ভোটে জেতাবেন সে রাস্তাও গেল বন্ধ হয়ে। সুতরাং ঠিক করলেন তিনি তার দলবল নিয়ে রামগড় কংগ্রেসে যোগ দেবেন না। কিন্তু তার বদলে তো কিছু একটা করতে হয়। হ্যাঁ, তাই করতে হবে——এমন একটা কিছু করতে হবে যে কংগ্রেস বুঝতে পারে কত ধানে কত চাল। তিনি একটা সম্মেলন ঠিক করলেন ঐ রামগড়েই, ঐ একই সময়ে——আপোস বিরোধী সম্মেলন। কংগ্রেস আপোসমুখী আর তিনি আপোসহীন——এটা এই নামের মধ্যে দিয়েই কংগ্রেস কর্মীদের ভালোমত বোঝানো যাবে। দু'টি সম্মেলন একই সময়ে হওয়াতে কংগ্রেস অধিবেশনে আসা প্রতিনিধি আর জনতা তার সম্মেলনেও যোগ দিয়ে ভিড় বাড়াতে পারবে। এর মধ্যে দিয়ে প্রভাবিত করে দলে ভারি হওয়ার সম্ভাবনাও থাকছে। কিন্তু সে আশাও পূর্ণ হল না। প্রবল ঝড় আর বৃষ্টিতে দু'টো সম্মেলনই হল সুপার ফ্লপ। লোকসান বেশি সুভাষচন্দ্রেরই। কারণ এ মুখোমুখি দ্বৈরথে তার বামপন্থী সমন্বয় কমিটি ভেঙ্গে গেল।

ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা সুভাষ

যে সুভাষচন্দ্র ছিলেন কংগ্রেসের উপর একান্তভাবে আস্থাশীল, যিনি বলেছেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কংগ্রেসের সেবা করে যাবেন——তিনিই আবার কংগ্রেসে তার কোন ভবিষ্যৎ নেই বুঝতে পেরে কংগ্রেস বিরোধী এক মঞ্চ তৈরী করার কাজে মন দিলেন। তিনি নিজেকে বামপন্থী পরিচয় দিতে চাইতেন এবং চাইতেন যে সব বামপন্থীরা তার নেতৃত্ব মেনে নিক। কিন্তু যখন তিনি কংগ্রেসের সাথে সরাসরি সংঘাতের রাস্তায় চলে এলেন তখনই তার বন্ধুরা একে একে তার কাছ থেকে সরে গেলেন। প্রথমেই হারালেন তার কংগ্রেসী বন্ধুদের। কিরণশঙ্কর রায়, বিধানচন্দ্র রায় লাফিয়ে গান্ধীর নৌকোতে উঠলেন। সুভাষচন্দ্রের একান্ত অনুগামী যুগান্তর গোষ্ঠী ভেঙ্গে ছত্রখান, বেশিরভাগই কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। অনেকে হয়েছেন কমিউনিস্ট। আমরা আগেই দেখেছি কংগ্রেস সমাজবাদী দল প্রথমে সভাপতি নির্বাচনে সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন করলেও পন্থ প্রস্তাবের উপর ভো[illegible] সময়ে নিরপেক্ষ থেকে কার্যত সুভাষকে ডোবালেন। তবুও বামপন্থী সমন্বয় [illegible] তারা ছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস থেকে নির্বাসিত সুভাষ যখন সরাসরি কংগ্রেসের বিরুদ্ধতা শুরু করলেন তখন সমাজবাদী দল সমন্বয় কমিটি ছেড়ে বেরিয়ে গেল। এম এন রায় তার আগেই বেরিয়ে গিয়েছেন। বাকি রইল ন্যাশনাল ফ্রন্ট নাম নিয়ে কাজ করা কমিউনিস্টরা। তারাও সমন্বয় কমিটি ছেড়ে দিল। এর প্রধান কারণ এই দলগুলোর সুভাষের প্রতি পুরোপুরি আস্থা ছিল না। বাংলার দলনেতা থাকাকালীন তিনি কমিউনিস্টদের উপর খড়্গহস্ত ছিলেন। আবার সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে তিনি দক্ষিণপন্থী নেতাদের কাছে বিশ্বাসভাজন হবার জন্যে বামপন্থীদের প্রতি কিরকম ব্যবহার করেছিলেন তা আমরা আগেই দেখেছি। এছাড়া সেসময় সমাজতন্ত্রী, রায়পন্থী ও কমিউনিস্টরা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াই-এ কংগ্রেসকে বাদ দিতে কোনমতেই রাজী ছিল না। (এ বিষয়ে 'সুভাষচন্দ্র ও ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন' অনুচ্ছেদে বিস্তৃত আলোচনা করব)। অবশ্য সুভাষ নিজেও কখনো কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে কোন আন্দোলনের কথা ভাবতেও পারেন নি।

এমনকি তিনি যখন তার 'আজাদ হিন্দ বাহিনী' নিয়ে যুদ্ধ করছেন, তখনও তিনি কংগ্রেসের আন্দোলন হিসাবে তা করছেন বলে ঘোষণা করেছেন। রামগড় কংগ্রেস অধিবেশনের পাল্টা একটা সম্মেলন তিনি করেছিলেন তা কেবল কংগ্রেসকে একটু দেখিয়ে দিতে। কিংবা কংগ্রেস তার সাথে একটা রফায় আসে তার জন্যে চাপ সৃষ্টি করতে। যাইহোক, শেষ পর্যন্ত তার প্রচুর 'সম্ভাবনাময়' বামপন্থী সমন্বয় কমিটি ঠেকল কেবল বিহারের সহজানন্দ আর তার নিজের ফরোয়ার্ড ব্লককে। প্রথমিক উত্তেজনার বশে যে জনতা ভিড় করেছিল তাও কমে আসতে থাকল। সুভাষচন্দ্র নতুন বন্ধুর সন্ধান করলেন।

হিন্দু মহাসভা আর মুসলিম লীগ দুটো দলের সাথেই 'বামপন্থী' সুভাষ গাঁটছড়া বাঁধার চেষ্টা করলেন। কিন্তু হিন্দুমহাসভার সাথে দর-কষাকষিতে মিলল না।

হিন্দু মহাসভার সহিত বোঝাপড়ার জন্য দুইবার চেষ্টা করা হয়। কলিকাতা পৌরসভার নির্বাচনের পূর্বে গত ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ দিকে প্রথম চেষ্টা করা হয়। দ্বিতীয় চেষ্টা করা হয় এপ্রিল (গতমাস) মাসের মাঝামাঝি সাধারণ নির্বাচনের পরে ও অল্ডারম্যান নির্বাচনের প্রাক্কালে। *(৪মে ১৯৪০ 'ফরোয়ার্ড ব্লক' দলীয় মুখপত্রে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন)* হিন্দু মহাসভার সাথে সমঝোতা না হওয়াতে সুভাষচন্দ্র প্রমাদ গুনল। কর্পোরেশন যে হাতছাড়া হয়ে যায়। কারণ মুসলিম লীগ কিছু নির্দল সদস্যকে নিয়ে কর্পোরেশন দখল করতে চলেছে।

দেশবন্ধুর পর থেকে কর্পোরেশনে একটানা চলেছে কংগ্রেসের আধিপত্য। তার হবে অবসান? ওখানে ঢুকবে যত সুবিধাবাদী ভুঁইফোড় দালাল? টাকা আর এ্যাডহক কংগ্রেসের সাহায্যে ওরা কেউ কেউ জিতেছে। ওরাই করবে কর্পোরেশনে মাতব্বরি? নেতা চিন্তিত হয়ে ওঠেন। *(নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী—নেতাজী : সঙ্গ ও প্রসঙ্গ, ১ম খণ্ড)* কর্পোরেশন হাতছাড়া হলে বিরাট চিন্তার ব্যাপার। তার সাথে জড়িত আছে দলের লোকজনের চাকরির প্রশ্ন। আজও যেমন রাজনৈতিক দলগুলো কর্পোরেশন দখল করে সেখানে গুচ্ছের দলীয় কর্মীকে নিয়োগ করে, সেদিনও তার ব্যতিক্রম ছিল না। সেদিনের সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ পার্শ্বচর প্রাদেশিক ফরোয়ার্ড ব্লকের খোদ সেক্রেটারী নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী লিখেছেন—

সত্যিই সেদিন কর্পোরেশন ছিল আমাদের মস্ত বড় হাতিয়ার। ঐ একটিমাত্র প্রতিষ্ঠান, সেখানে ইংরেজ-প্রভুত্বের হয়েছে চিরতরে অবসান। এ্যাসেমব্লী, কাউন্সিল আর সরকারী দপ্তরখানার দুয়োর যাদের কাছে ছিল চির অবরুদ্ধ, তারা স্থান পেত ওখানে। কত নির্যাতিত দেশ-সেবকের অন্নের সংস্থান হয়েছে। কত ভেঙে যাওয়া সংসার জোড়া লেগেছে ওখানকার কল্যাণে। *(নেতাজী : সঙ্গ ও প্রসঙ্গ, ১ম খণ্ড)*

সুতরাং কর্পোরেশন দখলে রাখার জন্যে সুভাষ মুসলিম লীগের সাথে মিতালী করলেন। চুক্তিমত লীগের সিদ্দিকী হলেন মেয়র আর নিজে হলেন অল্ডারম্যান। এই সমঝোতার ফলে তিনি সকল দলের কাছেই আক্রমণের বস্তু হয়ে দাঁড়ালেন। কমিউনিস্টরা নিন্দা করল সাম্প্রদায়িক দলের সাথে মিতালী করায়। আবার হিন্দু মহাসভাও তীব্রভাবে আক্রমণ করল। গান্ধীপন্থী কংগ্রেস তো ছিলই, প্রাক্তন সন্ত্রাসবাদী যারা মোটামুটিভাবে মুসলমান-বিদ্বেষী ছিলেন—সুভাষ সর্বত্রই জনপ্রিয়তা খোয়ালেন।

তিনি শ্রদ্ধানন্দ পার্কের জনসভায় নিজের অবস্থানটা পরিষ্কার করার জন্যে ঘোষণা করলেন—

মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা, কংগ্রেস, যে-কেউ, আজকের পরিস্থিতিতে সংগ্রামমুখী

ভারতবর্ষের আশা-আকাঙ্খার সমর্থনে দাঁড়াবে, বিন্দুমাত্র সাহায্য করবে আজকের এই মহাসুযোগ সদ্ব্যবহার করতে প্যাক্ট তো দূরের কথা আমি চিরজীবন তার গোলামী অঙ্গীকার করে নিতেও কুণ্ঠিত হব না। দুশো বছর ইংরেজের গোলামী করে ভারতবর্ষের মৃত্যুর পথ প্রশস্ত করেছি। ইংরেজের গোলামী নিঃশেষ করতে আমার দেশবাসীর গোলামী যদি আমাকে করতেই হয়, তা হবে আমার সহস্রবার কাম্য। সে না হয় বোঝা গেল, কিন্তু মুসলিম লীগ যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্যে ব্যাকুল, ইংরেজের গোলামী নিঃশেষ করতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, তা সুভাষ বুঝলেন কি করে? 'দ্য ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল' বইতে তিনি লিখেছেন——

এই সময় (১৯৪০ এর জুন মাসে) অন্যান্য কয়েকটি দল যেমন মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট জিন্না ও হিন্দু মহাসভার প্রেসিডেন্ট সাভারকারের সহিত এই লেখকের সুদীর্ঘ আলোচনা হয়। শ্রী জিন্না তখন কিভাবে ইংরেজদের সহযোগিতায় তাঁর পাকিস্থান পরিকল্পনাটি (ভারত বিভাগ) বাস্তবায়িত করা যায় কেবল তাই নিয়েই মশগুল ছিলেন। যদিও এই লেখক প্রস্তাব করেছিলেন যে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী শ্রীজিন্নাই হবেন, তথাপি কংগ্রেসের সাথে মিলিতভাবে সংগ্রাম করার প্রস্তাব আদৌ তাঁর মনঃপূত হয় নি। আমার মনে হয়েছিল শ্রীসাভারকারের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই এবং ভারতীয় হিন্দুরা কি করে ভারতে বৃটিশ সেনাবাহিনীতে অংশ নিয়ে সামরিক বিদ্যা শিখবে এটাই ছিল তাঁর একমাত্র চিন্তা। এই সকল আলাপচারিতা থেকে লেখক স্পষ্ট বুঝতে পারেন যে হিন্দু মহাসভা কিংবা মুসলিম লীগ কারও কাছ থেকে কিছুই আশানুরূপ প্রত্যাশা করা যায় না। তাহলেই বোঝা যায় মুসলিম লীগের সাথে সমঝোতার পেছনে কতটা ছিল গোষ্ঠীস্বার্থ আর কতটাই বা ছিল ইংরেজ বিরোধী মহাসংগ্রামের প্রেরণা।

কংগ্রেস সভাপতি হবার পরই কলকাতায় এক সুবৃহৎ কংগ্রেস-ভবন তৈরী করার পরিকল্পনা সুভাষ নিয়েছিলেন। কিন্তু সে সময় কেবলমাত্র কর্পোরেশন থেকে জমি পেয়েছিলেন। কংগ্রেস থেকে নির্বাসিত সুভাষ সেই ভবন তৈরীর উদ্যোগ নিলেন। এর জন্যে তিনি জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থসাহায্য চাইলেন। কলকাতা কর্পোরেশন থেকে সাহায্য চাইলেন এক লক্ষ টাকা। কিন্তু কর্পোরেশনের সভায় তা পাশ হতে পারে নি। সুভাষের অনুগামীরা বললেন যে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে কংগ্রেসীরা এ টাকা দিতে দিল না। পরবর্তীকালে ইতিহাস লিখিয়েরাও এই একই কথা বলেছেন। কিন্তু প্রকৃত তথ্য হচ্ছে——একাধারে সর্বভারতীয় কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন সুভাষচন্দ্রের উপস্থিতিতে কর্পোরেশনের এক সভায় দুই বিঘা জমি ৯৯ বছরের জন্যে বার্ষিক এক টাকায় ইজারা দেওয়া হয়। ঐ সভাতেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, বহুমূল্য ঐ জমিটাই শুধু দেওয়া হবে, আলাদা কোন টাকা দেওয়া হবে না। কিন্তু এক বছর পরই কর্পোরেশনের সভায় আলোচনা হয় যে কংগ্রেস-ভবনের জন্য এক লক্ষ টাকা দান করা হবে। প্রভুদয়াল হিমৎসিংকা তখন ছিলেন কর্পোরেশনের এস্টেট কমিটির চেয়ারম্যান। তিনি আগের বছরের সিদ্ধান্তের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে টাকা দেওয়ার বিরোধিতা করেন। এতে সুভাষচন্দ্র তার উপর ক্ষেপে যান। (*প্রভুদয়াল হিমৎসিংকা——সুইট্ মেমোরিজ. জয়শ্রী-সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা*) যাইহোক, এই কংগ্রেস-ভবন তৈরী করতে সিমেন্ট যুগিয়েছিল বহুজাতিক এ্যাসোসিয়েটেড সিমেন্ট কোম্পানি। ১৯৩৯ এর ১৯ আগষ্ট কংগ্রেসভবনের (রবীন্দ্রনাথ যার নাম দিয়েছিলেন——মহাজাতি সদন) ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের অনুষ্ঠানে সুভাষচন্দ্র বললেন——

আনুমানিক হিসাবে দেখা গিয়াছে যে সাজসরঞ্জামাদিসহ এই গৃহ নির্মাণে প্রায় তিন

লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। আমরা পঞ্চাশ হাজার টাকার উপকরণ সংগ্রহ করার প্রত্যাশা রাখি। সুতরাং আমরা যদি ইতিমধ্যে প্রতিশ্রুত অনুদান পাই তাহা হইলেও আমাদিগকে প্রায় আরো দুই লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে। এই গৃহ সমাপ্ত করার জন্য যত সিমেণ্ট লাগিবে এ্যাসোসিয়েটেড সিমেণ্ট কোম্পানি তাহা বিনামূল্যে সরবরাহ করিতে সম্মত হইয়াছেন। এই মহান ও গৌরবজনক কাজে আমাদের সহায়তা দানের জন্য আমি উদার জনসমাজের কাছে আন্তরিক আবেদন জানাই। বহুজাতিক কোম্পানি এ সি সি নিশ্চয়ই বিনা স্বার্থে এত টাকার সিমেণ্ট দান করে নি।

নবগঠিত ফরোয়ার্ড ব্লক দলটা চালানোর জন্যে প্রচুর টাকার দরকার ছিল। জনসাধারণ আর কত টাকা জোগাতে পারে। বাধ্য হয়ে মিল-মালিক, জমিদার, ধনীদের কাছ থেকে টাকা নিতে হত। ঐ সময় কুষ্টিয়ার মোহিনী মিলে তীব্র শ্রমিক অসন্তোষ চলছিল। মালিক ও শ্রমিক উভয়পক্ষই সুভাষচন্দ্রের মধ্যস্থতা মেনে নিতে রাজী হয়। দুই পক্ষের সাথে আলোচনা করে তিনি ২২ নভেম্বর ১৯৩৯ শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে এক বিবৃতি প্রচার করেন——

সমগ্র পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া এবং এই বিবৃতি (ম্যানেজিং এজেণ্টদের বিবৃতি) পাঠ করিয়া আমি অনুভব করি যে বর্তমান অবস্থায় তৃতীয় শিফটের কাজ চালানো যাইতে পারে না। এই অবস্থা আমাদের মানিয়া লইতে হয় এবং চালু দুইটি শিফটকে তিনটি শিফটে বিভক্ত করাও সঠিক হইবে না। এই বিরোধ জিয়াইয়া রাখিয়া এবং দুই শিফটে কাজ করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চালু রাখিয়া শ্রমিকদের কিংবা তাঁহাদের কোনো অংশের কোনো মঙ্গল হইতে পারে না। কোম্পানি যদি অসংগত মনোভাব দেখায় তাহা হইলে আমি তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত থাকিব এই মর্মে আমি ইতিপূর্বেই প্রকাশ্য ঘোষণা করিয়াছি। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে কোম্পানির মনোভাব যে অসংগত তাহা আমি বলিতে পারি না।

কি সে কারণ যার জন্যে শ্রমিকের ন্যায্য অধিকারকে নস্যাৎ করে দিয়ে মালিককে সমর্থন করা হল। শুধু তাই নয়, বিবৃতির শেষ অংশে সুভাষ বললেন——

আমার সন্দেহ নাই যে ম্যানেজিং এজেণ্টগণের বিবৃতি অনুসারে যে সুতাকল ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হইবেন তিনি যদি অনুকূল রিপোর্ট দেন তাহা হইলে তৃতীয় শিফ্ট চালু করিতে মিল-কর্তৃপক্ষের কোনো আপত্তি থাকিবে না।

বুঝুন ব্যাপারখানা, মালিক নিযুক্ত করবেন ইঞ্জিনিয়ার। মালিকের মাইনেয় পোষা সেই সদ্যনিযুক্ত ইঞ্জিনিয়ার যদি মালিকের বিরুদ্ধে রিপোর্ট দিয়ে বলে যে তিন শিফটে কাজ হোক——তাহলেই মালিক তিন শিফট চালাবে। সুভাষচন্দ্রের এই বিবৃতিতে সংগ্রামরত শ্রমিকেরা যে কি পরিমাণ হতাশ হয়েছিলেন তা আজ উপলব্ধি করা যাবে না। কিন্তু এরকম বিবৃতি না দিয়ে যে উপায় নেই——ইতিমধ্যেই ফরোয়ার্ড ব্লক তহবিলে মোটা টাকা চাঁদা পড়ে গিয়েছে যে। *(সুভাষ বোস প্রসঙ্গে——সরোজ দত্ত রচনাসংগ্রহ, ১ম খণ্ড)*

সেই সময় সুভাষচন্দ্রের সত্যিই বড় টাকার প্রয়োজন। নইলে দল চালানো যাচ্ছে না।

এই টাকা জোগাড় করতে গিয়ে কতরকম অনৈতিক কাজ করতে হয়েছিল তার একটা উদাহরণ দিই——

মধ্য কলকাতায় বিপিনদা জনপ্রিয় নেতা। তাঁর রাজনৈতিক জীবন অতি পুরাতন ও পবিত্র। রাজনীতির জন্য অনেক দুর্ভোগ তিনি ভোগ করেছেন। তিনি করপোরেশনের কাউন্সিলার হতে চাইলেন। সুভাষবাবু তাঁর বিরুদ্ধে ধনী নটবর দত্তকে দাঁড় করালেন।

সুভাষবাবুর দলের জন্য টাকার প্রয়োজন। বিপিনবাবু শক্ত লোক। তাঁর সঙ্গে সুভাষবাবু ঝঞ্ঝাট মিটিয়ে নিলেন এই বলে যে, তাঁকে অলডারম্যান করা হবে। কাজের বেলায় দেখা গেল বিপিনবাবু বাদ গেছেন, অলডারম্যান হয়েছেন সুভাষবাবু নিজে। এ সময় মোস্লেম লীগের ইস্পাহানির বড় দাপট। তাকে তুষ্ট করা হচ্ছিল। ইস্পাহানি বিপিনদাকে চান না। *(যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়—বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি)* কংগ্রেসের যেমন বিড়লা, মুসলিম লীগের তেমনি 'ইস্পাহানি'—কিংবা আরও প্রভাবশালী। এখন মুসলিম লীগের সহচর সুভাষ শিল্পপতি ইস্পাহানি যা চান না তা করেন কি ভাবে? নটবর দত্ত হঠাৎ মারা যাবার পর ঐ শূন্য জায়গায় আবার বিপিনবাবু দাঁড়ালেন।

সুভাষবাবু সে সময় জেলে। জেল থেকে তিনি বিপিনবাবুর বিরুদ্ধে আবেদন বের করলেন এবং একজন ধনীকে খাড়া করলেন। তাঁর দল বিপিনবাবুর বিরোধিতা শুরু করল। ফলে এই অসুন্দর ব্যাপারে বহুলোক মনে ব্যথা পেল, সুভাষবাবুর সমর্থকের সংখ্যায় ভাঙ্গন ধরল। বিপিনবাবু জিতলেন। লোকে পায়ে হেঁটে, ট্রামে বাসে চড়ে গিয়ে বিপিনবাবুকে ভোট দিয়ে এল। বিপিনবাবু ছিলেন সুভাষবাবুর সমর্থক। তিনি সুভাষকে ছাড়লেন। *(বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি)* এইভাবেই সুভাষ কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আর এক ধনিক গোষ্ঠীর পাল্লাতেই পড়লেন। দ্রুত সমর্থন কমে আসায় সুভাষ মুসলিম লীগকেই আঁকড়ে ধরলেন। মনে রাখতে হবে এর আগে পর্যন্ত বাংলায় মুসলিম লীগের তেমন প্রতিপত্তি ছিল না। যদিও সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ বাংলাতেই প্রথম তৈরী হয়েছিল, তবুও মুসলিম লীগ বাংলায় ছিল বরাবরই দুর্বল। কংগ্রেসেরই ছিল প্রতিপত্তি। আমরা আগেই দেখেছি সুভাষ বসু ও শরৎ বসুর তথা সামগ্রিকভাবে কংগ্রেসের জমিদার-ঘেঁষা নীতির জন্যে কিভাবে কৃষক-প্রজা পার্টির জন্ম হয়। তার পরেও মুসলিম লীগ বাংলায় শক্তিশালী হতে পারে নি। মুসলমান কৃষকদের মধ্যে প্রভাব ছিল ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা পার্টির। বসু ভাইয়েরা এই কৃষক-প্রজা পার্টির একেবারে বিরুদ্ধে ছিল। সুভাষ বসুর হাত ধরেই বাংলায় মুসলিম লীগ শক্তি অর্জন করে। কৃষক-প্রজা পার্টি ধীরে ধীরে হীনবল হয়ে পড়ে। সুতরাং বাংলায় শক্তি বৃদ্ধির জন্যে মুসলিম লীগ অবশ্যই সুভাষ বসুর কাছে ঋণী।

মুসলিম যুব সম্প্রদায়কে সংগঠিত করার জন্যে সুভাষচন্দ্র পূর্ববঙ্গ সফর করলেন। সেখানেই তিনি এমন একটা পরিকল্পনা আঁটলেন যাতে গোঁড়া মুসলমানেরাও খুব উৎসাহিত হয়। এই উদ্দেশ্যে তিনি ২৫মে ১৯৪০ ঢাকায় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে মনুমেণ্ট আপসারণের প্রস্তাব রাখলেন। তো এত কিছু থাকতে হঠাৎ মনুমেণ্ট হঠানোর জন্যে এত তোড়জোড় কেন? এই মনুমেণ্টের একটা ইতিহাস আছে। বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলার সাথে ইংরেজদের যুদ্ধের দিনগুলোতে নবাব একবার কলকাতা অবরোধ করেছিলেন। তখন বহু অসামরিক ইংরেজ যার মধ্যে নারী এবং শিশুই বেশি ছিল, একটা ছোট অন্ধকার কুঠরিতে আশ্রয় নিয়েছিল। ইংরেজ ঐতিহাসিকদের মতে নবাবের ফৌজ ঐ কুঠরির পথ বন্ধ করে দেওয়াতে ঐ সব নিরীহ ইংরেজরা প্রাণ হারায়। তারা এর নাম দিয়েছিলেন—অন্ধকূপ হত্যা। পরবর্তীকালে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকেরা এরকম কোন ঘটনা ঘটে নি বলে মতপ্রকাশ করেন। যাইহোক, ইংরেজরা ঐ সব মৃত ব্যক্তির স্মরণে একটা সৌধ নির্মাণ করেছিল। যার নাম—হলওয়েল মনুমেণ্ট। সুভাষচন্দ্র ১৯৪০ এর ৩ জুলাই 'সিরাজদৌল্লা দিবস' ঘোষণা করলেন এবং বললেন যে— মনুমেণ্টের চিহ্ন পর্যন্ত মুছে ফেলতে হবে। সুভাষের দীর্ঘ ১৯ বছরের রাজনৈতিক জীবনে বহুবার মনুমেণ্টের কাছে সভা-মিছিল করেছেন, কতবার পাশ দিয়ে গেছেন—কই ওটা সরানোর কথাতো একবারও মনে হয় নি। আজ মুসলমানদের কাছে পেতে মরিয়া সুভাষ সেই আন্দোলনের ডাক

দিলেন। আসলে তিনি নিজেও জানতেন তার দাবীটা কত অবাস্তব। রাজনৈতিকভাবে একা, ক্রমেই জনপ্রিয়তা অধোগামী, নিজস্ব দল ধীরে ধীরে মৃত্যুপথযাত্রী——এমত অবস্থায় এরকম একটা অবাস্তব আন্দোলন ছাড়া আর কী-ই বা করা যেতে পারে। যুদ্ধের সময়েও সভায় সভায় বৃটিশ বিরোধী গরম গরম কথা বলা সত্ত্বেও ইংরেজ তাকে গ্রেপ্তার করে 'শহীদ' বনবার সুযোগ দেয় নি। এবার অবশ্য সুভাষ সফল হলেন। ২ মে ১৯৪০ ভারতরক্ষা আইনে তাকে গ্রেপ্তার করা হল। সুভাষ হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

ব্যর্থতার কারণ

গভীর আত্মপ্রত্যয় আর সুনিশ্চিত সাফল্যের আশা নিয়ে সুভাষচন্দ্র ফরোয়ার্ড ব্লক তৈরী করেছিলেন। তার নিশ্চিত ধারণা ছিল ফরোয়ার্ড ব্লক এতটা শক্তিশালী হয়ে উঠবে যে কংগ্রেস নেতৃত্ব তাকে উপেক্ষা করতে পারবে না। তখন গান্ধীকে নেতৃত্ব থেকে সরতেই হবে এবং তিনিই হবেন কংগ্রেসের একছত্র নেতা। ফরোয়ার্ড ব্লক তৈরী করার পর গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে যে প্রচারাভিযান চালালেন তাতে ব্যাপক জনসমাগম দেখে তার এ ধারণা আরও সুদৃঢ় হল। মনে রাখতে হবে সর্বত্রই সভাগুলো হয়েছিল স্থানীয় কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বাধাদানের মধ্যেই। সেসময়ের জনতাও ছিল কংগ্রেসের ইংরেজ-ঘেঁষা ধনিক স্বার্থবাহী নীতির উপর তিতি-বিরক্ত। তারা সুভাষচন্দ্রের মধ্যে দিয়ে তাদের আশা-আকাঙ্খার কাজে পরিণত হওয়ার রূপ পেতে চাইল। সব মিলিয়ে জনসমাবেশগুলো দারুণ সফল হয়ে উঠল। কিন্তু জনসভায় বিশাল ভিড় জমানো এক ব্যাপার, আর একটা রাজনৈতিক দল তৈরী করে দেশের মানুষকে সংগঠিত করে বিশেষ কর্মসূচী কার্যকরী করা, সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। বিভিন্ন প্রদেশে সুভাষের সফর সাময়িক তরঙ্গ তুলতে পারলেও তা মিলিয়ে যেতে বেশি সময় লাগল না। সেই উৎসাহকে ধরে রেখে সংগঠিত করার মত বিশেষ কেউ ছিল না। প্রদেশে প্রদেশে ফরোয়ার্ড ব্লকের কার্যকরী নেতৃত্ব গড়ে উঠল না। এর আগে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের নেতা হিসাবে কৃতিত্বের পরিচয় দিলেও মনে রাখতে হবে গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস ছিল সারা ভারতব্যাপী এক সুসংবদ্ধ সংগঠন। সুভাষ সেই সংগঠিত কংগ্রেসেই নেতা হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। নতুনভাবে তাকে গড়ে তুলতে হয় নি। এবার কিন্তু পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এক প্রতিকূল পরিস্থিতিতে একটা সুসংবদ্ধ দল তিনি তৈরী করতে পারলেন না। কালক্রমে ফরোযার্ড ব্লক একান্তভাবে বাংলার একটা সংগঠনে পরিণত হল।

ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতা হিসাবে প্রথমে ও পরবর্তী সময়ে সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতার ভাব ও ভাষার পরিবর্তন লক্ষ্য করলেও দলের অবস্থাটা বুঝতে পারা যায়। ফরোয়ার্ড ব্লক স্থাপনের পর বক্তৃতাগুলোতে তিনি বারবার এর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাপ্রকাশ করেছেন। ৫ আগস্ট ১৯৩৯ ফরোয়ার্ড ব্লক দলীয় মুখপত্রের সম্পাদকীয়তে তিনি লেখেন——

ইহা (ফরোয়ার্ড ব্লক) বাঁচিয়া থাকার জন্য আসিয়াছে এবং যত দিন যাইবে ততই ইহার শক্তি বৃদ্ধি পাইবে, আমি যাহা বলিতেছি তাহাতে যাহারা সন্দেহ প্রকাশ করেন তাহারা ধৈর্য ধারণ করুন এবং কংগ্রেস ও ফরোয়ার্ড ব্লকের ভাবী ইতিহাস লক্ষ্য করুন।

সেই সুভাষচন্দ্রই আবার ১৯৪০ এর ১ ফেব্রুয়ারী কলকাতায় শ্রদ্ধানন্দ পার্কের এক জনসভায় বলতে বাধ্য হচ্ছেন——

বর্তমান অবস্থায় আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে আমাদের পক্ষে কংগ্রেসে সংখ্যাধিক্য অর্জনের আশা নাই। ইহা সত্য যে দেশে বামপন্থী শক্তিগুলি যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়াছে, কিন্তু কংগ্রেস যন্ত্র দখলের পথে আমাদের নানা অসুবিধা আছে।

এর পর থেকে আমরা তার বক্তৃতায় দেখতে পাই যে ক্রমশই নিরাশা তাকে গ্রাস করছে। কংগ্রেসের গান্ধীপন্থী নেতৃত্বের এক-একটা কূটনৈতিক চালে সুভাষ পরাজিত হতে থাকলেন। ফরোয়ার্ড ব্লক ক্রমেই হীনবল হতে থাকল। বামপন্থী সমন্বয় কমিটি থেকে সোসালিস্ট আর কমিউনিস্টেরা আগেই বেরিয়ে গিয়েছে। সুভাষচন্দ্র কার্যত একা হয়ে গেলেন। ফরোয়ার্ড ব্লকের শক্তিহীন হবার আরও একটা বিশেষ কারণ আছে। দেশের বড় বড় শিল্পপতি তখন সকলেই গান্ধীর পিছনে। কংগ্রেসেও তখন স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। সামগ্রিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে ভারতীয় শিল্পপতিরা বুঝতে পেরেছে যে আজ হোক বা কাল, ইংরেজদের হঠে যেতেই হবে। সুভাষচন্দ্রের লক্ষ্যও তো স্বাধীনতা—শিল্পপতিরা তাকে মদত দিলেন না কেন? ভারতীয় পুঁজির তখন তাড়াহুড়ো কিছু নেই। বিশ্বজুড়ে সেই অস্থির সময়ে তাড়াহুড়ো করলে তাদের পক্ষে বিপজ্জনক কিছু ঘটে যেতে পারে। দেশে শ্রমিক-কৃষকের অভ্যুত্থান ঘটে যেতে পারে। আর দেশবাসীর উপর সুভাষের চেয়ে গান্ধীর প্রভাব অনেক বেশি। গান্ধী তাদের পুরনো পরীক্ষিত মিত্র—সুভাষ তো হালের। আরেকটা মুখ্য কারণে ভারতীয় শিল্পপতিরা কংগ্রেসের ধীরে চলো নীতি খুব পছন্দ করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। যুদ্ধের বাজার ভারতীয় শিল্পপতিদের সামনে ফুলে ফেঁপে ওঠার একটা বিরাট সুযোগ এনে দিল। ভারতে তখন দেশীয় শিল্পপতিদের খুব রমরমা। বৃটিশ পুঁজি ঘর সামলাতেই ব্যস্ত। ভারতের বাজার তো বটেই দেশীয় পণ্য বিদেশে রপ্তানীর সুযোগ এসে গেল। এই 'সুসময়ে' দেশীয় পুঁজিপতিরা দেশের অভ্যন্তরে কোনরকম অস্থিরতা চাইল না। তাই শিল্পপতি মহল থেকে সুভাষচন্দ্র মদত পেলেন না। তাকে ঐ মোহিনী মিলের মত স্থানীয় ছোট পুঁজি এবং কিছু ব্যবসাদারের উপরই নির্ভর করেই চলতে হল।

অর্থসঙ্কটে নতুন দল চালানো মুশকিল হয়ে পড়ল। কংগ্রেস নেতৃত্বে থাকাকালীন সুভাষকে কখনও এরকম সংকটে পড়তে হয় নি। টাকার জন্যে নিজেকে বিশেষ মাথা ঘামাতে হয় নি। এখন অর্থের জন্যে তাকে কি ধরনের কাজ করতে হল তা আমরা আগেই দেখেছি। সে যুগের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের বিখ্যাত নেতা যদুগোপাল মুখোপাধ্যায় তার 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি' বইতে লিখেছেন—

বাংলার দুর্ভাগ্য সুভাষবাবুর অযোগ্য মন্ত্রীর মন্ত্রণা, অথবা নিজের বুঝবার দোষে বহু পরীক্ষিত, পুরাতন বন্ধুদের শত্রু করে বসলেন। আর বন্ধু করলেন তাদের যারা তাঁর বন্ধু ছিল না। নিজের দলও করলেন। টাকা দিয়ে দলরক্ষা এক বিষম ব্যাপার। মোটা টাকার দরকার। সে টাকা যোগাড় করতে অনাসৃষ্টি ঘটে গেল।

সুভাষচন্দ্রের প্রিয়তম বাল্যবন্ধু হেমন্তকুমার সরকারও অত্যন্ত দুঃখের সাথে লিখেছেন—"সহকর্মীদের অর্থের দাবী না মেটাতে পেরে সুভাষ শেষ পর্যন্ত চোখের জল ফেলে দেশত্যাগ করেছে।" (*সুভাষের সঙ্গে বারো বছর*)।

সুভাষচন্দ্র ছাড়া আর কোন যোগ্যতাসম্পন্ন নেতা দলে বিশেষ ছিল না। রাজনৈতিক দল হিসাবে ফরোয়ার্ড ব্লক কোন গণতান্ত্রিক রীতি-পদ্ধতিও মেনে চলত না। সেখানে সুভাষের মুখের কথাই ছিল আইন। তিনি কিভাবে দলের কর্মকর্তা নির্বাচিত করতেন তার একটা উদাহরণ দিই—

নেতা গাড়ী পাঠিয়ে ডেকে নিয়ে এলেন অনেক রাতে। জোড়া করতল কপালে ঠেকিয়ে একটু কী ভাবলেন। পরক্ষণেই বলে উঠলেন "এ্যাসেম্‌লী কি চলছে?"

"নাতো।" উত্তর দিলাম।

"কিন্তু দেহ? পেটের ব্যথাটা সেরেছে?"

"সামান্য আছে।"

"কাল থেকে তুমি হলে প্রাদেশিক ফরোয়ার্ড ব্লকের সেক্রেটারী। একটু কষ্ট হবে কিন্তু উপায় নেই।"

আগের সেক্রেটারী সত্যরঞ্জন বক্সী কয়েকদিন পূর্বে বন্দী হয়েছেন। *(নরেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্তী—নেতাজী ঃ সঙ্গ ও প্রসঙ্গ, ২য় খণ্ড)*

যারা বলেন গান্ধী স্বৈরতন্ত্রী, তারা ভুল বলেন না। কিন্তু গান্ধী তার নিজের সিদ্ধান্ত কৌশলে কংগ্রেসকে দিয়ে গ্রহণ করাতেন। কখনও এরকম গভীর রাতে বাড়ীতে ডেকে এনে তিনি কাউকে সেক্রেটারী বানান নি। সুভাষচন্দ্র অবশ্য বে-আইনী কিছু করেন নি। নাগপুরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লকের দ্বিতীয় সম্মেলনে তিনি দলের পদাধিকারী নির্বাচনের ক্ষমতা নিজের হাতে রাখার প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিয়েছিলেন। বস্তুতপক্ষে দল চালানোর ক্ষেত্রে এ ধরনের পদ্ধতি তার খুব প্রিয় ছিল। আমরা এর পরে দেখব, তিনি কিরকম সম্পূর্ণ একা এক কলমের খোঁচায় রাতারাতি (আক্ষরিক অর্থে) আজাদ হিন্দ সরকার তৈরী করে ফেলেছিলেন।

যারা তার সহকর্মী ছিলেন তাদের সম্পর্কেও নানা জনে নানা মন্তব্য করেছে। এবং সেসময়ে সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে বড় অভিযোগ ছিল যে তিনি তার পার্শ্বচরদের কথায় অনেক সময় অন্যদের প্রতি অবিচার করতেন। শিবরাম চক্রবর্তী তার আত্মজীবনীতে এ নিয়ে মৃদু অভিযোগ করেছেন। সুভাষচন্দ্রের আর একজন পার্শ্বচরের ঘটনা উল্লেখ করি। ১৯৪৪ সালে মালয়ের পেনাং থেকে সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষে একটি দল পাঠিয়েছিলেন যাদের দায়িত্ব ছিল তারা ভারত থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজকে খবর পাঠাবে। ডাঃ পবিত্রমোহন রায় ছিলেন তার অন্যতম সদস্য। ডাঃ রায় কলকাতায় এসে সুভাষচন্দ্রের পূর্বতন ঘনিষ্ঠদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সহযোগিতা চান। কলকাতা থাকাকালীন সুভাষচন্দ্রের এ্যাসিট্যান্ট সেক্রেটারী ছিলেন বিনোদ ব্যানার্জী। বিনোদবাবু প্রথমেই বললেন ডাঃ রায় যেন সুভাষচন্দ্রকে জানান যে তিনি সাহায্য করেছেন। পরে বিনোদবাবু কোন সহযোগিতা তো করেনেই নি উল্টে ডাঃ রায় যখন বৃটিশের হাতে ধরা পড়েন—তিনি তখন রাজসাক্ষী হয়েছিলেন। *(ডাঃ পবিত্রমোহন রায়- নেতাজীর সিক্রেট সার্ভিস)*। দেশ ছাড়ার কিছুদিন আগে সুভাষচন্দ্র যখন গৃহবন্দী ছিলেন তিনি তখন আনন্দবাজার পত্রিকার সরোজকুমার রায়চৌধুরীকে ডেকেছিলেন। সেসময় সরোজবাবু নিয়মিত তার কাছে যেতেন। সরোজবাবু লিখেছেন—

শেষের দিকে যাদের সঙ্গে তিনি কাজ করেছিলেন, তাঁদের অনেকের সম্বন্ধে ব্যক্তিগত আলোচনা এর মধ্যে হয়েছে। কিন্তু তিনি আজ অনুপস্থিত। সুতরাং সে প্রসঙ্গে আলোচনা করা উচিত নয়। এইটুকু বলতে পারি তাঁদের কারো কারো 'পরে তিনি অত্যন্ত অপ্রসন্ন হয়েছিলেন। একজনের সম্বন্ধে তিনি এমনও বলেছিলেন যে, ভদ্রলোক hundred and twenty percent মিথ্যে কথা বলেন। শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার তাঁর 'সুভাষের সঙ্গে বারো বছর' গ্রন্থের এক জায়গায় বলেছেন, 'সুভাষচন্দ্র দেশত্যাগের আগে খুব তিক্ততা নিয়েই গিয়েছিলেন।' কথাটা যে সত্য আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি। *(আমাদের সুভাষচন্দ্র—সুভাষ-স্মৃতি)*

সুভাষচন্দ্রের আর এক প্রিয়তম বন্ধু দিলীপকুমার রায়ও লিখেছেন—

"এমন কতগুলো ঘটনার পাকে সুভাষ জড়িয়ে পড়েছিল, যা তার বেদনা-কাতর অন্তরকে খুঁড়ে খাচ্ছিল। ওর হাত থেকে পরিত্রাণ পেতেই এই দুঃসাহসিকতার পথ তাকে বেছে নিতে হয়েছিল।" *(দিলীপকুমার রায়—দ্য সুভাষ আই নিউ)*

কংগ্রেস থেকে এবং নিজের দলের লোকজনদের কাছ থেকে উপর্যুপরি আঘাতের ফলে সুভাষচন্দ্র হতাশ হয়ে পড়লেন। তিনি নিশ্চিত বুঝতে পারলেন যে ভারতীয় রাজনীতিতে তার ফরোয়ার্ড ব্লক কোনও কার্যকর ভূমিকা নিতে পারবে না। অপরদিকে কংগ্রেসেও তিনি তার হারানো মর্যাদা ফিরে পাবেন না। তবুও তিনি সুভাষ। জেদী, অদম্য, প্রাণশক্তিতে ভরপুর, আশাবাদী সুভাষ। তিনি তখন নতুন সম্ভাবনার আলো দেখতে পেয়েছেন। সেটাই তার কাছে তখন একমাত্র পথ।

পঞ্চম পর্ব

দেশত্যাগ

বহির্বিশ্বের হাতছানি

দেশের মাটিতে আশার দরজাগুলো যখন একে একে বন্ধ হয়ে গেল সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টি পড়ল ভারতের বাইরে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। যুদ্ধের প্রথমদিকে জার্মানির একের পর এক বিজয় তাকে মুগ্ধ করে দিল। কোন যুদ্ধ ছাড়াই কেবলমাত্র হুমকিতেই জার্মানি পশ্চিম ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর কাছ থেকে অস্ট্রিয়া আর চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাস করবার অনুমোদন আদায় করল। কিন্তু পশ্চিমী দেশগুলোর প্রত্যাশা মতো হিটলার সেখানেই থামল না। তার বিখ্যাত ঝটিকা বাহিনী (ব্লিজক্রিগ) একে একে পোল্যান্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে, হল্যান্ড, বেলজিয়াম দখল করে নিল। এই সব দেশের সামরিক প্রতিরোধ ব্লিজক্রিগের কাছে খড়কুটোর মতো উড়ে গেল। দখলীকৃত দেশগুলোর উপর হিটলারের নাৎসী বাহিনী শুরু করল অমানুষিক অত্যাচার। ঐতিহাসিক, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, কবি— যারা ছিল এসব দেশের বৌদ্ধিক সম্পদ, তাদেরকে নির্বিচারে হত্যা করা হল। লক্ষ লক্ষ শিশু, বৃদ্ধকে অপ্রয়োজনীয় বিবেচনায় খুন করা হল। যুবকেরা লাগল দাস-শ্রমিকের কাজে। অসংখ্য যুবতীকে বলাৎকার করা হল। সারা বিশ্ব স্তম্ভিত হয়ে গেল নাৎসীদের নৃশংসতায়। বিজিত দেশগুলোর খনিজ, শিল্প, কৃষি সম্পদে বলীয়ান হয়ে জার্মানি আক্রমণ করল তখনকার এক বৃহৎ শক্তি ফ্রান্সকে। মাত্র ৩৫ দিনের যুদ্ধে ফ্রান্স সম্পূর্ণ পরাজিত হল। হিটলারের নাৎসী বাহিনীর সাফল্যে সুভাষ মোহিত হয়ে গেলেন। ১৮ জুন নাগপুরে নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লকের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে তিনি বললেন—

এই সেদিন যখন নাৎসী বাহিনী "প্যারিস চলো" বুলি মুখে লইয়া জার্মান সীমান্ত পার হইয়া হল্যান্ড ও বেলজিয়ামে প্রবেশ করিয়াছিল তখন কি কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পারিয়াছিল যে তাহারা এত শীঘ্র তাহাদের লক্ষ্যে পৌঁছিবে? আমাদের চোখের সম্মুখে যেন সামরিক সংগ্রামে একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছে।

জার্মানির এই 'অলৌকিক' বিজয়ে মুগ্ধ সুভাষ জার্মানির সমরনায়কদের প্রশংসা আর ব্রিটিশ সামরিক অফিসারদের অযোগ্যতা সম্পর্কে বললেন—

নাৎসীরা তাহাদের তরুণ সেনানায়ক ও রণকৌশলবিদ্‌দের সহায়তায় উদ্ভাবিত নূতন সামরিক যন্ত্র-কুশলতার দ্বারা এক অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটাইয়াছে। মিত্রপক্ষ নির্ভর করিতেছে তাহাদের যুদ্ধখ্যাত ও শুভ্রকেশ সেনানায়কগণের উপর, কিন্তু ইঁহারা পরিস্থিতির সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। (*১৫ জুন ১৯৪০ 'ফরোয়ার্ড ব্লক' দলীয় মুখপত্রে সুভাষচন্দ্রের লেখা সম্পাদকীয়*)

শুধু তাই নয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যে অস্ত্র বহু-নিন্দিত, সেই রাসায়নিক অস্ত্র বৃটেনের উপর জার্মান প্রয়োগ করবে সেই সম্ভাবনায় পুলকিত সুভাষ লিখলেন —

ব্রিটিশ জনসাধারণ তাঁহাদের কঠিন অধ্যাবসায় ও স্নায়বিক জোরের জন্য সুপরিচিত। তাঁহারা এখন যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছেন তাহা সম্ভবত তাঁহাদের ইতিহাসের কঠিনতম পরীক্ষা। দেখি তাঁহারা কিভাবে ইহার মুখোমুখি হন।........................

আমরা রাইকস্‌ভের (জার্মান বাহিনীর) রাসায়নিক প্রস্তুতি সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনিতাম।তাহারা কি সত্যই রাসায়নিক যুদ্ধের নূতন কুশলতা নিখুঁত করিয়াছে? যদি করিয়া থাকে তবে ভবিষ্যতে আমরা তাহার সাক্ষ্য পাইব। আর তখনই বুঝা যাইবে এই নূতন পরিস্থিতিতে মানুষের স্নায়ুর কি অবস্থা হয়। (*একই সম্পাদকীয়*)

সুভাষচন্দ্র আরো এক ধাপ এগিয়ে যুদ্ধে মিত্রশক্তি পরাজিত হলে ভবিষ্যত বিশ্বে জার্মানি, ইতালি আর সোভিয়েত রাশিয়া কিভাবে দুনিয়াটা ভাগাভাগি করে নেবে তার একটা বিবরণ দিয়ে দিলেন। (*১৫ জুনের সম্পাদকীয় এবং ১৮ জুনের নাগপুর বক্তৃতা*)। যুদ্ধে ইংরেজ হারছেই। সুতরাং ভারতকে তার সুযোগ নিতে হবে—এই হল তাঁর নিশ্চিত ধারণা। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই তিনি ভারতের বাইরে যাবার পরিকল্পনা করলেন।

একটা প্রশ্ন নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে যে তিনি ঠিক কখন বিদেশে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন।অনেকেই লিখেছেন যে ২ মে ১৯৪০ তাকে গ্রেপ্তারের পর জেলখানায় বসে সুভাষচন্দ্র বিদেশে পালানোর সিদ্ধান্ত নেন। সুভাষচন্দ্র নিজেও 'দ্য ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল' এ লিখেছেন—

মুক্তির পর (প্রেসিডেন্সী জেল থেকে নিজ বাড়ীতে অন্তরীণ থাকার সময়) লেখক প্রায় চল্লিশ দিন নিজ গৃহে ছিলেন এবং তাঁর শয়নকক্ষ ত্যাগ করেননি।এইসময়ে তিনি যুদ্ধের সামগ্রিক পরিস্থিতিটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, বিদেশে কি ঘটছে এ সম্বন্ধে ভারতীয় স্বাধীনতা-যোদ্ধাদের সরাসরি খবর সংগ্রহ এবং বৃটেনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যোগদান করে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বংসে সাহায্য করা উচিত।বিভিন্ন যে যে উপায়ে ইহা সম্ভব সেগুলি বিবেচনার পর নিজেই বিদেশ যাত্রা করা ভিন্ন আর কোনো বিকল্প তিনি খুঁজে পেলেন না। ১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাসের শেষাশেষি এক গভীর রাতে তিনি গোপনে গৃহত্যাগ করলেন।

এখান থেকে মনে হয় যেন তিনি বাড়ীতে অন্তরীণ থাকা অবস্থায় বিদেশ পালানোর পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের 'আজাদ হিন্দ বাহিনী'র বিশিষ্ট সেনানায়ক মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খান তার 'মাই মেমোরিজ অব দ্য আই এন এ অ্যান্ড ইট্‌স্ নেতাজী' বইতে লিখেছেন—

১৯৪৪ সালের জানুয়ারী মাসে নেতাজী আমাদের কয়েকজনকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। জোৎস্নার আলোয় নেতাজীসহ আমরা বসে খোশগল্প করছি। এমন সময় এক তরুণ অফিসার হঠাৎই নেতাজীকে প্রশ্ন করে বসে—ভারতবর্ষ থেকে পালিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করবার কথা তাঁর মনে কিভাবে এল?

সুভাষচন্দ্র তার উত্তরে জানিয়েছিলেন—১৯৩৫ সাল থেকেই বুদ্ধিমান যে কোন মানুষ বুঝতে পেরেছিল যে মহাযুদ্ধ আসন্ন। এ যুদ্ধে বৃটিশ জড়াবে এবং ভারতকেও তার মধ্যে টেনে নিয়ে যাবে। আর যুদ্ধ চলাকালীন ভারতীয় নেতাদের জেলে পুরে রাখবে।

নেতাজী বললেন—"আমি দেখলাম সে অবস্থায় দু'টি মাত্র পথ খোলা আছে। হয়

যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত জেলে থাকা নতুবা দেশ থেকে পালিয়ে বৃটিশের শত্রুপক্ষের সাথে মিত্রতা করে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করা।" নেতাজী বলতে থাকলেন যে শেষ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তিনি তৎকালীন পরিস্থিতি ও তাতে ভারতবর্ষের কি কর্তব্য হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য মহাত্মা গান্ধীর সাথে আলোচনা করতে যান। তিনি মহাত্মাজীকে বুঝিয়ে বললেন—যতদিন যুদ্ধ চলবে ভারতীয় নেতাদের এভাবে জেলে পচবার কোন অর্থ হয় না। এর চেয়ে ভারতবর্ষের কোন কোন নেতা যদি দেশের বাইরে গিয়ে সৈন্য সংগ্রহ করে ভারত আক্রমণ করেন, তাহলে দেশ স্বাধীন হতে পারে।

মহাত্মাজী তার উত্তরে বলেন—ভারতবর্ষ যে এই উপায়ে স্বাধীন হতে পারে, তা তিনি বিশ্বাস করেন না। নেতাজী চেষ্টা করে দেখতে পারেন, যদি সফল হ'ন মহাত্মাজীই তাঁকে সর্বাগ্রে অভিনন্দিত করবেন।

এখান থেকে পরিষ্কার যে ভারত ত্যাগের পরিকল্পনা সুভাষচন্দ্রের আগেই ছিল এবং ১৯৪০ এর জুনে যে তিনি গান্ধীর সাথে দেখা করেন তখন গান্ধীকে তার পরিকল্পনার কথা বলেছিলেন। গান্ধী নিজে এর অংশীদার হতে রাজী হন নি, কিন্তু সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পনাতে বাধাও দেন নি। এই বাধা না দেওয়ার পিছনে গান্ধীর একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। সে কথায় পরে যাচ্ছি। সুভাষচন্দ্রের সাথে জার্মান, ইতালি আর জাপানের একটা সম্পর্ক অনেক আগে থেকেও ছিল। সুধী প্রধান তার 'সুভাষচন্দ্র, ভারত ও অক্ষশক্তি' বইতে যথেষ্ট তথ্য সহকারে দেখিয়েছেন যে ১৯৩৮ সালেই সুভাষচন্দ্র ভারতস্থ নাৎসী জার্মানদের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন কিন্তু প্রত্যাশিত সাড়া পান নি। ঐ বছরই কমুনিস্ট নেতা স্নেহাংশু আচার্যের সাহায্যে তারই বালিগঞ্জের বাড়ীতে জাপানী পররাষ্ট্র দপ্তরের কিছু অফিসারের সাথে গোপনে আলাপ আলোচনা চালান। ভারত ছাড়ার আগে ১৯৪০ সালে তার বিশ্বস্ত লালা শংকরলালকে জাপানে রাসবিহারী বসু এবং জাপান সরকারের সঙ্গে আলোচনা করতে পাঠান। জাপানের একটা পরিকল্পনা ছিল যে জার্মানীকে রাজী করিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নকে তাদের দলে নিয়ে নেবে। তারপর তারা পশ্চিম ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোকে হারিয়ে তাদের দখলীকৃত উপনিবেশগুলো জার্মান, ইতালি, রাশিয়া, জাপান মিলে ভাগাভাগি করে গ্রাস করবে। এই ধরনের একটা প্রস্তাব জার্মান বিদেশ দপ্তর সোভিয়েত রাশিয়ার তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলোটভকে দিয়েছিল। কিন্তু মলোটভ রাজী হন নি। সুভাষচন্দ্র যে দেশ ছাড়ার আগে একাধিক বার বলেছেন, বৃটেন হারলে তার উপনিবেশগুলো রাশিয়াসহ অক্ষ শক্তিগুলো ভাগাভাগি করে নেবে—সম্ভবত জাপানী সরকারের অফিসারদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতেই এই ধারণা তার হয়েছিল।

সুতরাং বিশ বছর আগে একদিন যেমন সুভাষচন্দ্র ইংল্যান্ড থেকে দেশে ফিরবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন, আজও ঠিক তেমনি দেশ ছাড়ার জন্যে আকুল হয়ে উঠলেন। তিনি দেশত্যাগ করবেনই, এখন কিভাবে তা করবেন সেটাই দেখার।

দেশত্যাগের উদ্যোগ

সুভাষচন্দ্র যদি আচমকা দেশ ছেড়ে বিদেশে যান তার প্রতিক্রিয়া দেশবাসীর কাছে কিরকম হবে তা নিয়ে তিনি খুব চিন্তিত ছিলেন। তার ফরোয়ার্ড ব্লকের সদস্য ও নেতারাও ব্যাপারটাকে কিভাবে নেবে এ নিয়েও দুশ্চিন্তা ছিল। সুভাষচন্দ্র যুদ্ধের সময়ে বহু জায়গায় ইংরেজ-বিরোধী প্রবল বক্তৃতা দেওয়া সত্ত্বেও তাকে গ্রেপ্তার না করে সরকার এক

কার্যকরী চাল দিয়েছে। মারিয়া সুভাষ এবার এমনভাবে এগোলেন যাতে বৃটিশ পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়। ৩ মে ১৯৪০ তিনি মনুমেন্ট হটানোর ডাক দিলেন। উগ্র মুসলিম ধর্মান্ধ সম্প্রদায়ও তার ডাকে এগিয়ে এল। সুভাষের পরিকল্পনা মাফিকই ঘটনার গতি নির্ধারিত হচ্ছিল।

১ লা জুলাই। নেতা তার অবর্তমানে সর্দার শার্দুল সিংকে মনোনীত করলেন ফরোয়ার্ড ব্লকের সভাপতি পদে। নাগপুর সম্মেলনে এই মনোনয়ন ক্ষমতা তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। এর পরই নির্দেশনামা। ডেকে পাঠালেন দুপুরবেলা। গেলাম। ঘরে ঢুকে বসতেই বললেন ঃ "আগামীকাল আমাকে তো ধরবেই, অনেককে ধরতে পারে। পর পর কে সেক্রেটারী হবে তার একটা লিস্ট করে ফেলো।" *(নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী—নেতাজী সঙ্গ ও প্রসঙ্গ, ২য় খণ্ড)* সরকার সুভাষের পাতা ফাঁদে পা দিতে বাধ্য হল। নেহাৎ বাধ্য হয়েই ১৯৪০ এর ২ জুলাই পুলিশ ভারতরক্ষা আইনে সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করল। ধীরে ধীরে ২৯ আগস্টের মধ্যে ফরোয়ার্ড ব্লকের সকলকে বাংলা সরকার মুক্তি দিলেও তাকে আর তার একান্ত সহচর নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তীকে মুক্তি দিল না। এদিকে গান্ধীর তখন ঘোর বিপদ। যুদ্ধের সময় বৃটিশ দেশে নানা দমনমূলক আইন জারী করেছে। দেশের মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়তে চাইছে। কিন্তু গান্ধী কোনরকম অস্থিরতা সৃষ্টি করতে না দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অনেক ঐতিহাসিক একে গান্ধীর ইংরেজ-প্রীতি বলেছেন। আসলে কিন্তু গান্ধী ইংরেজ স্বার্থবাহক নন, তিনি ভারতীয় শিল্পপতিদের তল্পিবাহক। যুদ্ধের বাজারে ভারতীয় ধনিকদের যে প্রচুর মুনাফার সুযোগ এসেছে তাতে তিনি বিন্দুমাত্র বাধা সৃষ্টি হতে দিতে চান না। তাই জনতার ক্ষোভকে প্রশমিত করতে গান্ধী তার তূণ থেকে নতুন অস্ত্র বার করলেন—ব্যক্তিগত অসহযোগ। না সমষ্টিগত অসহযোগ চলবে না, হতে হবে একেবারে ব্যক্তিগত। সত্যি গান্ধী অনন্য। সুভাষচন্দ্র জেল থেকে তার ফরোয়ার্ড ব্লকের সদস্যদের সেই ব্যক্তিগত অসহযোগে যোগ দেবার জন্যে গান্ধীর কাছে অনুমতি চাইলেন। কিন্তু গান্ধী আর কোন সুযোগ দিতে নারাজ। সুভাষ কংগ্রেসের মূলস্রোত থেকে বেরিয়ে গিয়েছে, ফরোয়ার্ড ব্লক চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ, কংগ্রেসের নিরঙ্কুশ নেতৃত্বের ক্ষেত্রে তার পথের কাঁটা কেউ নেই। সেই বিপদ তিনি আর ডাকবেন না। তার উপর সুভাষের দেশ ছাড়ার পরিকল্পনা তিনি জেনে গিয়েছেন। বুঝেছেন, শীঘ্র আপদ বিদায় হবে। গান্ধী অনুমতি দিলেন না।

জেলখানায় ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে পাঁচখানা ঘরে বহাল তবিয়তে সুভাষচন্দ্র আর নরেন চক্রবর্ত্তীকে রাখা হয়েছে। তাদের উত্তম খাবার, চাকর-রাঁধুনী সবই আছে। কিন্তু তাদের পরিকল্পনা অন্য। নরেন্দ্রনারায়ণ আগে মুক্তি পেতে পারেন, তাই তাকে দরকারী কাগজপত্র বুঝিয়ে দিলেন যাতে সে মুক্ত হয়ে বিদেশে সুভাষের হয়ে যোগাযোগ করতে পারে। কিন্তু তার নিজের মুক্তি? সুভাষ পরিকল্পনা করে ফেললেন। বাংলা সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাজিমুদ্দীনকে ৩০ অক্টোবর ১৯৪০ এক চিঠিতে লিখলেন যে তার যেরকম শারীরিক অবস্থা তাতে তাকে মুক্তি দেওয়া হোক। এই চিঠি লেখার পেছনে একটা গভীর কারণ আছে।

কয়েকদিন পূর্বে হঠাৎ একদিন নেতা আমাকে বলে বসেছিলেন ঃ "এমন কোন ব্যায়রামের নাম করতে পারো, যা সহসা ডাক্তারেরা ধরতে পারে না?"

আমি সায়াটিকার নাম করেছিলাম। আরও বলেছিলাম যে, প্রাথমিক অবস্থায় অ্যাপেনডিসাইটিসও ধরা কঠিন।

এর ফলে এই দু'টো ব্যারামের লক্ষণই নেতার দেহে অনতিবিলম্বে প্রকাশ পায়।

তলপেটের ডানদিকে অসহ্য ব্যথা আর কোমরের তো কথাই নেই। উঠতে বসতে শুতে সে কী যন্ত্রণা! জেলের ডাক্তার অনেকক্ষণ ধরে টেপাটেপি করেও কিছু বুঝতে পারেন নি। *(নেতাজী : সঙ্গ ও প্রসঙ্গ, ২য় খণ্ড)*

এর পর থেকে যেখানেই সুভাষচন্দ্র চিঠি কিংবা আবেদন লিখলেন সেখানেই তার এই শারীরিক যন্ত্রণার উল্লেখ করতে ভুললেন না। একই সাথে 'পবিত্র কালীপূজার দিনে লিখিত পত্রে' তিনি প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারকে জানিয়ে দিলেন যে তিনি অনশন করছেন। মনে রাখতে হবে একই দিনে দুটো চিঠি, একটাতে উল্লেখ করলেন যে সেটা 'পবিত্র কালীপূজার দিনে লিখিত পত্র' আর একটায় তার উল্লেখ করলেন না। তার কারণ একজন হিন্দু সুপার আর একজন মুসলমান মন্ত্রী। কাকে কি ফুল দিতে হবে সুভাষ ভালই জানতেন। যাইহোক তার এই অনশনের হুমকি, অসুখের অভিনয় এবং জেলে বসে জনমতের গঠনের প্রচেষ্টা চলতে থাকল। বঙ্গীয় আইনসভায় দাদা শরৎচন্দ্র এবং ফরোয়ার্ড ব্লকের সদস্যরা গলা ফাটাতে লাগলেন। সুভাষচন্দ্রের অনশন শুরু হল। অনশনকালে তিনি কোন রকম চিকিৎসা নিতে অস্বীকার করলেন। সরকার তার দাদা ডাঃ সুনীলচন্দ্র বসুকে আনলেন চিকিৎসা করানোর জন্যে। ডাঃ বসু বললেন——অপারেশন করাতেই হবে। অবস্থা খুবই সঙ্কটজনক। অনশনের সপ্তম দিনে তাকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হল। তাকে নিয়ে যাওয়া হল এলগিন রোডের বাড়ীতে। তবে গোয়েন্দা পুলিশ সাদা পোশাকে নজরদারি চালু রাখল বাড়ীর চারদিকে। এতদিনে সুযোগ এসেছে। এখন যদি বিদেশে পালানো যায়, দেশের মানুষের কছে তার গ্রহণযোগ্যতা অনেক অনেক বেশি হবে। প্রস্তুতিও অনেক এগিয়েছে। খালি সুযোগের অপেক্ষা।

এলগিন রোডের বসু-বাড়ীতে চলল দেশ ছাড়ার পরিকল্পনা। সুভাষচন্দ্র সবচেয়ে বেশি আশঙ্কা করছিলেন বাংলার কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। একটা মতলব বার করলেন। তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার সরোজকুমার রায়চৌধুরীকে ডেকে পাঠালেন। বললেন যে তিনি কিরণশংকর রায়ের সাথে মিটমাট করে নিতে চান। সরোজবাবু যেন ব্যবস্থা করেন। সরোজবাবু ছুটলেন কিরণবাবুর কাছে। এভাবে সুভাষ এক ঢিলে দুই পাখি মারার চেষ্টা করলেন। এক, বাংলার কংগ্রেস মহলে যাতে ধারণা সৃষ্টি হয় যে তিনি আবার নতুনভাবে বঙ্গীয় রাজনীতিতে যোগ দিতে চলেছেন। দ্বিতীয়তঃ, সরোজবাবু খবরের কাগজের লোক হওয়ায় উচ্চতম মহলেও এই কথাটা চালু হয়ে যেতে পারে। এরপর আবার টাকার প্রশ্ন। বেশ কিছু টাকার দরকার। সুভাষচন্দ্র তার প্রতি সহানুভূতিশীল ধনী ব্যক্তিদের কাছে টাকা চাইলেন। সম্প্রতি, ১৯৯৫ এর 'দেশহিতৈষী' শারদ সংখ্যায় কম্যুনিস্ট নেতা স্নেহাংশু আচার্যের ডায়েরীর একটা অংশ প্রকাশিত হয়েছে। আচার্য তার ডায়েরীতে লিখেছেন যে দেশত্যাগের সময় সুভাষচন্দ্র তার কাছ থেকে দশহাজার টাকা নিয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্রের ভাইপো শিশিরকুমার বসু আবার এর প্রতিবাদ করেছেন। আমরা আগেই দেখেছি সুভাষচন্দ্র ময়মনসিংহের জমিদারদের কাছ থেকে সাহায্য নিতেন। স্নেহাংশু আচার্য হচ্ছেন ময়মনসিংহের জমিদার রাজা সূর্যকান্ত আচার্যের নাতি এবং শশীকান্ত আচার্যের ছেলে। সুতরাং তার কাছ থেকে যে সুভাষ টাকা নিতে পারেন তাতে কোন অবিশ্বাস করার কারণ নেই। শিশিরবাবুর রাগ করার হেতুও দেখি না। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা যেতে পারে যে বহু ইতিহাস-নায়কদের সমসাময়িক ব্যক্তিত্বের কাছে বা তাদের ডায়েরীতে এরকম নানা ঘটনা ও তথ্যের উল্লেখ আছে। তারা বা তাদের আত্মীয়রা এগুলো প্রকাশ করেন না এইসব মনীষীদের ভাবমূর্তির কথা ভেবে। কখনও কখনও রাজনৈতিক স্বার্থও এর মধ্যে কাজ করে। কিন্তু এরকম তথ্যগোপন দেশবাসীর কাছে বিশ্বাসঘাতকতার সামিল। এগুলো প্রকাশিত হলে আরও বহু তথ্য জানা যাবে এবং ঐতিহাসিকেরাও ঘটনার নতুন করে

মূল্যায়নের সুযোগ পাবে। যাইহোক, সুভাষচন্দ্র যে অন্তত আরও একজনের কাছে টাকা চেয়েছিলেন তা আমরা পাই সরোজকুমার রায়চৌধুরীর লেখায়—

বললেন, পরেশ কিছু টাকা দাও দিকি।

পরেশ এক-বগ্গা লোক। গম্ভীরভাবে বললেন, যদি আপনার প্রয়োজন হয় দোব, পার্টির দরকার হলে দোব না।

সুভাষচন্দ্র হাসলেন। তাঁর সেই অনবদ্য সুন্দর হাসি। পরেশের পিঠে সস্নেহে হাত বুলিয়ে বললেন, তোমার Confidence এ জীবনে আর পেলাম না। *(আমাদের সুভাষচন্দ্র......সুভাষ-স্মৃতি)* এই পরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হলেন একজন চা-বাগান মালিক।

দেশ থেকে পালিয়ে বিদেশে যাবেন, সে না হয় ঠিক হল—কিন্তু যাবেন কোন দেশে? এ নিয়েও বেশ বিতর্ক আছে। সুভাষচন্দ্রের পলায়নের সঙ্গী ভাইপো শিশিরকুমার বসু তার 'মহানিষ্ক্রমণ' বইতে লিখেছেন যে তিনি পালিয়ে জার্মানিতেই যাবেন এটা ঠিক করেই বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলেন। স্নেহাংশু আচার্যও তার ডায়েরীতে লিখেছেন— সুভাষচন্দ্র ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ত্বরান্বিত করার জন্য তাঁর দেশত্যাগের পরিকল্পনার রূপরেখা আমাকে জানালেন। সেই রূপরেখাটি কি ছিল? কোথায় যেতে চেয়েছিলেন সুভাষ? "তার নির্দ্দিষ্ট ধারণা হয়েছিল যে, তৎকালীন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বাস্তবতার নিরিখে তাঁর জার্মানীতে যাওয়াই বিধেয় কারণ তিনি মনে করেছিলেন জার্মানী বা অক্ষশক্তির অন্তর্ভূক্ত অন্য রাষ্ট্র গুলি ব্যতীত আর কোনো দেশই সেই সময় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামের সমর্থনে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসবে না।" *(দেশহিতৈষী, শারদ সংখ্যা. ১৯৯৫)*

অর্থাৎ গোড়া থেকে সুভাষচন্দ্র জার্মানিতেই যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু উত্তমচাঁদ, যিনি কাবুলে সুভাষচন্দ্রকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, তার 'সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের কাহিনী' বইতে লিখেছেন যে সুভাষ রাশিয়ায় যেতে চেয়েছিলেন। আবার কীর্তি-কিষাণ পার্টির সদস্যরা কম্যুনিস্ট মনোভাবাপন্ন ছিলেন। তাদের সদস্য আচ্চার সিং, রামকিষাণ এবং ভগৎরাম তলোয়ার যখন সুভাষচন্দ্রের দেশত্যাগে সহায়তা করেছিলেন তখন তাদের জানানো হয়েছিল যে তিনি রাশিয়া যাচ্ছেন। বর্তমানকালে যে কারণে এ বিতর্কটি দানা বাঁধে তার মূল কারণ রাজনৈতিক। সুভাষচন্দ্র দেশত্যাগ করে জার্মানিতে গিয়েছিলেন, যে জার্মানি তখন সারা বিশ্বে তার নৃশংসতা, আগ্রাসী মনোভাবের জন্যে নিন্দিত। সুতরাং সুভাষের সেখানে যাওয়ার যৌক্তিকতা হিসেবে এক শ্রেণীর প্রবন্ধকারেরা এটাই বোঝানোর চেষ্টা করেন যে তিনি সোভিয়েত রাশিয়াতেই যেতে চেয়েছিলেন, একান্ত উপয়ান্তর না দেখে তবেই তিনি জার্মানিতে যান। মনে রাখতে হবে যে তখন রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি হয়ে গিয়েছে। সুভাষচন্দ্রের তৎকালীন মন্তব্য এবং পরবর্তী কার্যকলাপ থেকে আমরা এও বুঝতে পারি যে এই চুক্তির কৌশলগত দিকটা না জার্মানির দৃষ্টিভঙ্গী থেকে, না রুশ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে, তিনি উপলব্ধি করতে পারেন নি। রুশ আর জার্মান তখন তার কাছে প্রায় সমার্থক। সুতরাং যেখানে যাওয়ার সুবিধে হবে সেখানেই যাবেন—মোটামুটি এই ছিল মনোভাব। তার উপর সোভিয়েত রাশিয়া তখনও যুদ্ধে যোগ দেয় নি, কিন্তু জার্মানির অগ্রগতি অব্যাহত। খুব শিগগিরই যে তারা ভারত সীমান্তে এসে পৌঁছবে এ বিষয়ে সুভাষ আশাবাদী। সুতরাং জার্মানিতে গেলেই কার্যোদ্ধারের বেশি সম্ভাবনা। সর্বোপরি রাশিয়া তার কাছে সম্পূর্ণ অচেনা জায়গা। উল্টোদিকে তিনি জার্মানিতে বেশ কিছুদিন থেকেছেন, বেশ কিছু নাজী কর্মকর্তার সাথে ভাল সম্পর্কও আছে। আর সিনর মুসোলিনি-.......ইতালি তো পাশেই।

দেশত্যাগ করা সুভাষচন্দ্রের সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত হয়েই গেল। এখন শুধু সময় আর সুযোগের অপেক্ষা।

অজানার অভিযাত্রী

আমরা আগেই বলেছি যে সুভাষচন্দ্র যদি মুক্ত অবস্থায় বিদেশে পাড়ি দিতেন তবে তাকে ঘিরে এত মিথ তৈরী হত না। বরং তার বিরোধীরা অনেক কুৎসা রটনার সুযোগ পেয়ে যেত। কিন্তু বৃটিশ গোয়েন্দাদের নজর এড়িয়ে দেশ ছেড়ে পালানোয় তার ভাবমূর্তি বিশাল আকার ধারণ করল। সুভাষচন্দ্র নিজে এবং তার সঙ্গী শিশিরকুমার বসু এই পলায়নকে এক দুঃসাহসিক কাজ বলে বর্ণনা করেছেন এবং একে আইরিশ স্বাধীনতা সংগ্রামী ডি ভ্যালেরার জেল থেকে পালানোর সাথে তুলনা করেছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে ডি. ভ্যালেরা পালিয়েছিলেন দুর্ভেদ্য বৃটিশ জেল থেকে, অপর পক্ষে সুভাষচন্দ্র পালিয়েছিলেন নিজের বসতবাড়ী থেকে যেখানে উপযুক্ত প্রহরী পর্যন্ত ছিল না। শিশিরকুমার বসুর বিবরণ থেকে জানা যায় যে তারা যতটা বেশি সতর্ক ছিলেন পুলিশ থেকে—— তার চেয়ে বেশি সতর্ক ছিলেন বসু বাড়ীর অন্য সব সদস্য থেকে যাতে তারা না দেখে ফেলে। তবু এই পালানোকে ঘিরে এ দেশে চালু হয়েছিল নানা আজগুবি গল্প। আসলে এদেশের মানুষ অলৌকিক ঘটনা বিশ্বাস করতে ভালোবাসে। তাদের প্রিয় নেতাকে অলৌকিক ক্ষমতাধর না বানালে শান্তি নেই। গান্ধী সম্বন্ধেও এরকম গল্প কথা চালু ছিল। সুভাষচন্দ্র নিজে লিখেছেন——"১৯২২ সালে বর্তমান গ্রন্থের লেখক যখন জেলে ছিলেন তখন জেল বিভাগে যে সব ভারতীয় ওয়ার্ডার কাজ করত তারা বিশ্বাস করতে চাইত না যে ব্রিটিশ সরকার মহাত্মাকে কারারুদ্ধ করেছেন। স্থির বিশ্বাসের সাথে তারা একথা বলত যে, যেহেতু গান্ধী একজন মহাত্মা সেজন্য তিনি যখন খুশী পাখীর রূপ ধারণ করে জেল থেকে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারেন।" (*দ্য ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল*)। অলৌকিকতায় বিশ্বাস তবে কি ভারতবাসীর মজ্জাগত? এটাই কি ভারতবাসীর সহজাত ধর্ম? আসলে তা নয়। ভারতবাসীকে কখনই সংগঠিতভাবে একটা জঙ্গী সংগ্রামে টেনে আনা হয় নি। নেতারা নিজ স্বার্থ বা নিজ শ্রেণীর স্বার্থে চলেছেন, যখন জনতাকে দরকার কাজে লাগিয়েছেন আবার যখন প্রয়োজন বুঝেছেন আন্দোলনের রাশ টেনে ধরেছেন। জনসাধারণের মধ্যে কখনো সংগ্রামী চেতনাকে জাগরূক হতে দেন নি। জনতাও তেমনি নেতাদের মুখ চেয়ে বসে থেকেছে। কখন একজন গান্ধী বা একজন অরবিন্দ তাদের অলৌকিক ক্ষমতার বলে পাকা আমের মতো টুক করে স্বাধীনতা এনে দেবে। অরবিন্দ তো পন্ডিচেরীর আশ্রমে ঢুকলেন, গান্ধীর প্রতি জনতার একটা বিরাট অংশের মোহভঙ্গ হয়েছে। প্রবল শক্তিমান ইংরেজদের কান মলে দিতে পারে এমন শক্তি দেশের বাইরে থাকলেও ভারতের মাটিতে কেউ নেই। তো মধ্যবিত্ত মানুষ পেয়ে গেল ইচ্ছাপূরণের এক অবতার। দেখো, কেমন ইংরেজদের চোখে ধুলো দিয়ে বেরিয়ে গেল? পারল বৃটিশ তাকে আটকে রাখতে? তার উপর সেই জার্মানি থেকে বেতার ঘোষণা——আমি সুভাষ বলছি। ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বাংলায় মধ্যবিত্তের 'রক্তে শিহরণ খেলে গেল'। এইবার ইংরেজ ব্যাটারা পালাবে কোথায়। একে জার্মান-জাপান, তার উপর সুভাষ। স্বাধীনতা আসবেই। ভারতবাসীর কিছু করার নেই, শুধু সুভাষ পূজো করে যাও।

এসব কথা বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে সুভাষচন্দ্রের অভিযানকে খাটো করে দেখা। সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তার দিকে তার এই প্রচেষ্টা অবশ্যই দুঃসাহসিক কাজ ছিল। তার অদম্য

মনোভাব অবশ্যই প্রশংসার দাবী রাখে। কিন্তু তাকে ঘিরে যে মিথ, যে কিংবদন্তী গড়ে উঠেছে, তা সবই সংগ্রামবিমুখ মধ্যবিত্তের ইচ্ছাপূরণের স্বপ্ন-সঞ্জাত। সে যুগেও সংগ্রামী কৃষক-শ্রমিক ছিল, কিন্তু তাদের জুটেছিল বৃটিশ পুলিশের লাঠি-গুলি আর জাতীয় নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতা।

সুভাষচন্দ্র যে ভারত ছেড়ে চলে গিয়েছিল, সবই কি তা গোয়েন্দা পুলিশের অজান্তে? কেনই বা তার পিছনে গোয়েন্দা পাহারা এত শিথিল ছিল? আসলে সুভাষ তখন ছিল বৃটিশ পুলিশের গলার কাঁটা। তার বিদেশ যাবার পরিকল্পনা সম্বন্ধে পুলিশ কিছু জেনে থাকলেও তাতে বাধা দেয় নি। যুদ্ধের সময়ে শত্রু ঘরের ভিতরে থাকার চাইতে বাইরে গিয়ে অন্য শত্রুর সাথে যোগ দেওয়া ভাল——এই বিবেচনায় তারা পালাতে দিয়ে থাকতে পারে। এই সন্দেহ আরও দৃঢ় হয় যখন দেখা যায় যে কাবুলে থাকাকালীন সুভাষচন্দ্রের হদিশ পাওয়া সত্ত্বেও তাকে বৃটিশ গ্রেপ্তার করে না। সুধী প্রধান উপযুক্ত তথ্য দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে কাবুলে বৃটিশ রাষ্ট্রদূত দিল্লীতে বৃটিশ সরকারকে সুভাষের কাবুলে উপস্থিতি সম্পর্কে জানানো সত্ত্বেও সরকার তাকে কোনরকম ব্যবস্থা নিতে নিষেধ করে। *(তথ্য সূত্র :—— ইণ্ডিয়া অফিস রেকর্ড এল/পি অ্যান্ড এস/১২/৪৮৭ এবং ক্যারো ও টাইটলালের মধ্যে চিঠিপত্রাদি)*

যাইহোক, সুভাষচন্দ্র মৌলবী জিয়াউদ্দিনের ছদ্মবেশে ১৯৪১ এর ১৭ জানুয়ারী গভীর রাতে নিজেদের পারিবারিক গাড়ীতে বেরিয়ে পড়লেন বাড়ী থেকে। সাথী ভাইপো শিশিরকুমার বসু। গাড়ী করে পরদিন পৌঁছলেন বিহারে দাদার বাড়ীতে। সেদিনই রাতের ট্রেন ধরলেন গোমো স্টেশন থেকে। এবার আর সাথে কেউ নেই—— একা অভিযাত্রী। গন্তব্য তখনও স্পষ্ট নয়।

পেশোয়ারে গিয়ে মিলিত হলেন কীর্তি কিষাণ পার্টির সাথীদের সঙ্গে। সেখান থেকে ভগতরাম তলোয়ারের সঙ্গে ছদ্মবেশে বহু কষ্ট সহ্য করে সুভাষচন্দ্র কাবুলে পৌঁছলেন ২৭ জানুয়ারী। বৃটিশ গোয়েন্দারা জেনে থাকুক বা নাই থাকুক, দেশ থেকে কাবুল পর্যন্ত ছদ্মবেশে পৌঁছানো ছিল বেশ কন্টকর। সুভাষচন্দ্র তখন ভারতবর্ষের এক জনপ্রিয় নেতা। খবরের কাগজে তার ছবি প্রায়শই প্রকাশিত হত। সুতরাং সাধারণ মানুষের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্যেও তাকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হয়েছিল। তখনকার দিনে পেশোয়ার থেকে কাবুল যাওয়ার পথও ছিল অত্যন্ত দুর্গম। কিন্তু বীরোচিত সাহসে সেই দুর্গম পথ অতিক্রম করে সুভাষ কাবুলে পৌঁছলেন। ভারতের মাটি থেকে এই তার শেষ যাত্রা। সেদিন তিনি দেশ ছেড়েছিলেন এই স্বপ্ন নিয়ে যে একদিন স্বাধীন ভারতের মাটিতে ফিরবেন বিজয়ীর বেশে। হায়! তিনি কি সেদিন জানতেন ইংরেজ চলে গেলেও ভারতের মাটিতে তার আর ফেরা হবে না।

অক্ষশক্তির সঙ্গে

সুভাষচন্দ্র কাবুলে পৌঁছেই ইংরেজবিরোধী দেশগুলোর দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা শুরু করলেন। ভগৎরাম তলোয়ার হলেন তার সহযোগী। সেসময় সুভাষ কাবুলে যার আশ্রয়ে থাকতেন সেই উত্তমচাঁদ তার 'সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান কাহিনী' বইতে লিখেছেন যে তারা তিনজন মিলে কাবুলে সোভিয়েত রাষ্ট্রদূতের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র যে পালিয়ে কাবুলে এসেছেন তা তিনি বিশ্বাস করেন নি। রুশ ভাষা না জানা থাকার দরুন তারা সবিস্তারে সব বোঝাতেও পারেন নি। এর পর উত্তমচাঁদ সোভিয়েত রাশিয়ার সাথে আর যোগাযোগ না করার কারণ হিসেবে দেখিয়েছিলেন যে

কাবুলের বিদেশী দূতাবাসগুলো পাহারা দিত আফগান পুলিশ। কিন্তু এ প্রশ্ন স্বভাবতই মনে আসে যে কাবুলস্থিত ইতালি এবং জার্মানির দূতাবাসের সামনেও তো আফগান পুলিশ পাহারা দিত, সেখানে তারা যোগাযোগ করলেন কিভাবে? আসলে মনে হয় রাশিয়া, ইতালি বা জার্মানি যে কোন ইংরেজ শত্রুভাবাপন্ন রাষ্ট্রের সাথে যোগাযোগ করাই সুভাষের উদ্দেশ্য ছিল।

ইতালির রাষ্ট্রদূত কুরোনি সুভাষের প্রস্তাবে ইতিবাচক সাড়া দিলেন। আমরা আগেই দেখেছি যে এশিয়ার ব্যাপারে ইতালির আগে থেকেই আগ্রহ আছে। তার উপর সুভাষ তাকে যে পরিকল্পনার কথা বোঝালেন তাতে তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। সুভাষচন্দ্র কুরোনিকে বোঝালেন ভারতবাসী তাকে বৈদেশিক ব্যাপারে একজন দূরদর্শী বলে মানে। যদি জার্মান বাহিনী মাত্র ৫০ হাজার সৈন্য নিয়ে ভারত-সীমান্তে হাজির হয় তাহলে সুভাষচন্দ্র ডাক দিলে দলে দলে ভারতীয় সেনা বৃটিশ বাহিনী ছেড়ে জার্মান বাহিনীতে যোগ দেবে। জোর দিয়ে বললেন যে তিনি শুধুমাত্র বেতারে প্রচার করলেই ভারতীয়রা বৃটিশ বাহিনী ত্যাগ করবে। *(ইন্ডিয়া অফিস রেকর্ড L/P& S/12/1805 & R/12/1/131)*। প্রকৃতপক্ষে সুভাষচন্দ্রের এরকম দাবী করার পিছনে ছোট্ট একটা কারণ ছিল। ১৯৪০ এর প্রথমদিকে কিছু শিখসৈন্য যারা কলকাতার আলিপুর সেনা ব্যারাকে ছিল, স্থির করে যে বিদ্রোহ করবে। এদের প্রতিনিধিরা গোপনে সুভাষচন্দ্রের বাড়ীতে দেখা করেন। সেসময় এই সেনারা সুভাষচন্দ্রের আহ্বানে বিদ্রোহ করবে এই আশ্বাস দেয়। কিন্তু পরে এই দলটাকে আম্বালায় বদলি করলে এই পরিকল্পনা ধরা পড়ে যায়। *(নলিনীকিশোর গুহ——বাংলায় বিপ্লববাদ)*। সুভাষচন্দ্রের নিশ্চিত ধারণা ছিল যে যদি কোন সেনাবাহিনী নিয়ে ভারত-সীমান্তে পৌঁছানো যায় তাহলে বৃটিশ বাহিনীর ভারতীয় সৈন্যরা দলে দলে তাতে যোগ দেবে। জার্মানিতে পৌঁছে সেখানকার পররাষ্ট্র দপ্তরকেও তিনি একই কথা বুঝিয়েছিলেন। কিন্তু তার এই ধারণা সঠিক ছিল না। পরবর্তীকালে যখন তিনি তার আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে জাপানের সহযোগে ভারত সীমান্তে এসে পৌঁছেছিলেন, বৃটিশ সেনাবাহিনী ভেঙে ভারতীয় সৈন্যরা তার দলে বড় আকারে যোগ দেয় নি। জার্মানিতে থাকাকালীন একদল যুদ্ধবন্দী ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে জার্মান সরকার সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছিল যে বৃটিশ সরকারের উপর আনুগত্য তাদের পুরোপুরি ছিল। তাদের বেশির ভাগই সুভাষচন্দ্রের কোন বক্তৃতা পর্যন্ত শোনে নি। *(জার্মান পররাষ্ট্র দপ্তর রিপোর্ট ১১ জুন ১৯৪২)*। একথা অনস্বীকার্য যে ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের প্রভাব শহরাঞ্চলে শিক্ষিত মানুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। গ্রামের কোটি কোটি নিরক্ষর নিরন্ন মানুষ তাদের কোনমতে নিজের জীবনটুকু বাঁচাতেই ব্যস্ত থাকতে বাধ্য হত। গান্ধী-জওহর-সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক খুনসুটিতে তাদের কোন আগ্রহ ছিল না। সেনাবাহিনীর জওয়ান সংগৃহীত হত মূলত ভারতের নানা উপজাতি, ক্ষেত-মজুর, দলিত জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে থেকে যাদের মধ্যে কংগ্রেসের প্রভাব ছিল নিতান্তই কম।

যাইহোক ইতালীয় রাষ্ট্রদূত কুরোনি সুভাষের পরিকল্পনায় বিশ্বাস করলেন। তিনিই জার্মান রাষ্ট্রদূত হ্যান্স পিলগারকে বুঝিয়ে রাজী করালেন বার্লিনে সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে নোট পাঠাতে। জার্মানির তখন সুভাষের মত কাউকে দরকার ছিল। তাকে জার্মানিতে পাঠানোর হুকুম হল। মস্কো থেকে ভিসা মিলল সেখান দিয়ে যাবার। সিগনর অরল্যান্ডো ম্যাজোট্টা ছদ্মনামে সুভাষ ইউরোপ রওনা হলেন। মজার কথা হল ভিসা দেবার জন্যে সোভিয়েত ইউনিয়নকে একযোগে ইতালি, জার্মানি এবং জাপান অনুরোধ করেছিল। কি এমন কারণ যার জন্যে সুভাষচন্দ্র এত মূল্যবান হয়ে গেলেন অক্ষশক্তির কাছে? এ প্রশ্নের উত্তর নিহিত আছে সেসময়ের আন্তর্জাতিক যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে।

ষষ্ঠ পর্ব

জার্মানিতে সুভাষচন্দ্র

ভারত সম্পর্কে অক্ষশক্তির আগ্রহের কারণ

১৯৪১ এর ২ এপ্রিল সুভাষচন্দ্র বার্লিনে পৌঁছলেন। এই বার্লিনে পৌঁছনোর মধ্যে দিয়ে শুরু হল তার রাজনৈতিক জীবনের নবতম দিশা। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসেও এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। পরদিনই তিনি জার্মানির পররাষ্ট্র দপ্তরের রাজনৈতিক সহ-সচিব ডঃ ওয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করলেন। ওয়ারম্যান তাকে তার প্রস্তাব লিখিতভাবে জমা দিতে বললেন। ৯ এপ্রিল সুভাষচন্দ্র তার 'অক্ষশক্তির সাথে ভারতের সহযোগিতার খসড়া প্রস্তাবটি, জার্মান সরকারের কাছে পেশ করলেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯ এপ্রিল জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী তথা নাৎসী পার্টির অন্যতম কর্ণধার রিবেনট্রপের সাথে তার এক বৈঠক হল।

এর আগে ১৯৩৩ সালে সুভাষচন্দ্র জার্মানিতে এসেছিলেন। যে দীর্ঘ তিন বছর তিনি ইউরোপে ছিলেন তার অনেকটা সময় জার্মানিতে কাটিয়েছিলেন। তখন তিনি বহু চেষ্টা করেও নাৎসী দলের কোন বড় কর্মকর্তার সাথে আলোচনা করার সুযোগ পর্যন্ত পান নি। কোন মন্ত্রী তো দূরস্থান, মাথা খুঁড়েও জার্মান সরকারের কোন গুরুত্বপূর্ণ আমলার সাথে দেখা করতে পারেননি নি। সেদিনকার জার্মান সরকারের কাছে ভারত থেকে আগত কোন নেতার এই ছিল অবস্থা। ভারত সম্পর্কে নাৎসীদের এতই ছিল অনাগ্রহ! আজ কিন্তু অবস্থাটা গেছে পাল্টে। পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্য দখলের লড়াইয়ের যুদ্ধে ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান এখন জার্মানির কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সুভাষচন্দ্র যখন জার্মানিতে পৌঁছলেন, পুরো পশ্চিম ইউরোপ হিটলারের দখলে। কেবল টিঁকে আছে ইংল্যান্ড। কিন্তু সেই টিঁকে থাকাটাও খানিকটা হিটলারের দয়ায়, খানিকটা জার্মানির নৌশক্তির অপ্রতুলতার কারণে। জার্মান বিমান বাহিনী লন্ডনসহ গোটা ইংল্যান্ডে ব্যাপক বোমাবর্ষণ করেও বৃটেনকে নত করতে পারে নি। চর্তুদিকে জলবেষ্টিত ইংল্যান্ডকে হিটলার দখল করেত পারেন নি কারণ উপযুক্ত নৌশক্তি তার ছিল না। ইংল্যান্ডে আক্রমণ চলতে থাকার মধ্যেই হিটলার সোভিয়েত রাশিয়া অভিযানের সিদ্ধান্ত নেন। সুভাষচন্দ্র যেদিন জার্মানিতে পৌঁছলেন তার অনেক আগেই সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গিয়েছে। ১৯৪০ সালের ১৯ ডিসেম্বর 'অপারেশন বারবারোসা'য় সই করেছেন তিন নাৎসী নেতা হিটলার, কাইটেল এবং জডল। এই 'অপারেশন বারবারোসা'

হচ্ছে সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ পরিকল্পনার সাংকেতিক নাম (ডাইরেকটিভ নং ২১)। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী রাশিয়া আক্রমণের দিন ধার্য করা হয়েছিল ১৫ মে ১৯৪১। সুভাষচন্দ্র এসবের কিছুই জানতেন না। তিনি জানতেন যে জার্মানি আর রাশিয়ার মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তি আছে এবং এরা একে অপরের মিত্র রাষ্ট্র। আমরা আগেই দেখেছি যে সুভাষচন্দ্র রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির কৌশলগত দিকটা ধরতে পারেন নি। তিনি যখন জার্মান পররাষ্ট্র মন্ত্রকের সাথে আলোচনা করছেন, জার্মানি তখন গোপনে রাশিয়া আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

১৯৪১ এর ১৫ মে সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণের দিন স্থির হলেও আর একটা পরিকল্পনা জার্মানি নিল যার জন্যে ঐ দিনটি পিছিয়ে দেওয়া হল। নতুন পরিকল্পনাটি প্রকৃতপক্ষে অপারেশন বারবারোসার পরিপূরক। এই পরিকল্পনাটির নাম ছিল 'বারবারোসা পরবর্তী সময়কালীন প্রস্তুতি'। ৩২ নম্বর এই পরিকল্পনাটির উদ্দেশ্য ছিল সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণের পর যুদ্ধের যে অবস্থা সৃষ্টি হবে তার মোকাবিলা করা। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী সোভিয়েত রাশিয়া অভিযান সাময়িক স্থগিত রেখে হিটলার বলকান আক্রমণ করলেন। অতি দ্রুত জার্মান বাহিনী যুগোশ্লোভাকিয়া, গ্রীস এবং ক্রীট দ্বীপ দখল করে নিল।

রাশিয়া আক্রমণের আগে ভূমধ্যসাগর অঞ্চলকে নিজের দখলে নিয়ে নেওয়াটা হিটলারের খুব প্রয়োজন ছিল। হিটলারের উদ্দেশ্য ছিল রাশিয়া আক্রমণ করলে বৃটেন ও আমেরিকা যদি রাশিয়াকে সাহায্য করেও (তার ধারণা ছিল বৃটেন আর আমেরিকা সাহায্য করবে না) তাহলে তাদের পাঠানো অস্ত্রশস্ত্র রসদ যাতে রাশিয়া না পৌঁছায় তা সুনিশ্চিত করা। আর এটা সুনিশ্চিত করতে অক্ষশক্তির যে ব্যাপক পরিকল্পনা তাতে ভারতেরও এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

গ্রীস ও ক্রীট দ্বীপ দখলের মধ্যে দিয়ে হিটলার ভূমধ্যসাগরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে নিলেন। ৩২ নম্বর পরিকল্পনা অনুযায়ী হিটলারের ইচ্ছা ছিল মধ্যপ্রাচ্যের উপর দিয়ে ভারতের পশ্চিম সীমান্তে উপস্থিত হওয়া। ১৯৪১ এর ১৭ ফেব্রুয়ারী তিনি আফগানিস্থানের মধ্যে দিয়ে ভারত সীমান্তে পৌঁছানোর একটা পরিকল্পনা তৈরী করার জন্যে তার সমর দপ্তরকে নির্দেশ দেন। এইভাবে পুরো ইউরোপ এবং পশ্চিম এশিয়া জুড়ে এমন একটা দুর্ভেদ্য প্রাচীর তৈরী করা হবে যাতে কোনরকম সাহায্য থেকে রাশিয়া বঞ্চিত হয়। এরপর আসে রাশিয়ার দক্ষিণ পূর্ব অংশের প্রশ্ন। সেখানে আছে হিটলারের মিত্র 'এশিয়ার উদীয়মান সূর্য' জাপান। হিটলারের উদ্ভাবিত 'নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থায়' বিজিত দেশগুলোর ভাগ পেতে সেও উদগ্রীব। সুতরাং ২৬ মার্চ ১৯৪১ জাপানের পররাস্ট্রমন্ত্রী মাৎসুয়োকা বার্লিনে এলেন। হিটলার তখন বলকান যুদ্ধে ব্যস্ত। সেই ব্যস্ততার মধ্যেই বিদেশমন্ত্রী রিবেনট্রপ এবং হিটলার স্বয়ং জাপানী মন্ত্রীকে বোঝালেন যে জার্মানের বিশ্বজয় সম্পূর্ণ হতে চলেছে। 'নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থা' চালু হতে আর দেরী নেই। সেই ব্যবস্থায় উপযুক্ত স্থান পেতে জাপানের অতি শীঘ্র পূর্ব এশিয়ার মার্কিন ঘাঁটিগুলোতে আক্রমণ করা দরকার। জার্মান-ইতালি-জাপান মৈত্রীর ভিত্তিই ছিল এদের সাম্রাজ্যবাদী ভূমিতৃষ্ণা মেটানো। সেই 'কালনেমির লঙ্কাভাগে' জাপানের ভাগে পড়েছিল পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া। হিটলার মাৎসুয়োকাকে বোঝালেন জাপানের নিজের ভাগ বুঝে নেবার সেই সময় উপস্থিত। "এরকম সুবর্ণ সুযোগ আর আসবে না।" এমনকি ইতালি ঘুরে মাৎসুয়োকা যখন আট দিন পরে আবার বার্লিন এলেন, হিটলার পুনরায় তার সাথে দেখা করে গায়ে পড়ে তাকে কথা দিলেন যে জাপান-আমেরিকা যুদ্ধ হলে সাথে সাথে তিনি তাতে যোগ দেবেন। *(এ্যালান বুলক--*

হিটলার)। উদ্ধত হিটলার বারবার জাপানী মন্ত্রীকে বোঝাচ্ছেন, কারণ গরজ বড় বালাই। হিটলার চান জাপান অবিলম্বে সিঙ্গাপুর দখল করে নিক। তারপর তারা বর্মার ভিতর দিয়ে ভারতের পূর্ব সীমান্তে এসে দাঁড়াবে। পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে জার্মান আর পূর্ব সীমান্ত দিয়ে জাপান এই দুই অক্ষশক্তি মিলিত হবে ভারতেব মাটিতে। আর এভাবেই রাশিয়ার চতুর্দিকে অক্ষশক্তির ঘেরা এক দুর্ভেদ্য বলয় সম্পূর্ণ হবে, যার ফলে যুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়া হয়ে পড়বে বিচ্ছিন্ন, একাকী। রাশিয়ার উত্তরে ও পশ্চিমে নরওয়ে থেকে গ্রীস, দক্ষিণে মধ্যপ্রাচ্য থেকে সিঙ্গাপুর হয়ে পূর্বে জাপান পর্যন্ত বিস্তৃত এই বলয়ের মধ্যে দিয়ে একবিন্দু সাহায্যও সোভিয়েত রাশিয়ায় পৌঁছতে পারবে না। এই ছিল হিটলারের সর্বগ্রাসী পরিকল্পনা।

যে কোন দেশ দখল করবার আগেই হিটলার সে দেশের অভ্যন্তরে তার সহযোগী খুঁজে বার করতেন। তাদের সাহায্যে সেই দেশের মধ্যে চলত অবিরাম প্রচার। হিটলার মনে করতেন ঠিকমত প্রচারেই অর্ধেক যুদ্ধ জেতা যায়। আর এ ব্যাপারে তার যোগ্য সাকরেদ গোয়েবল্‌স তো খ্যাতিতে কিংবদন্তী তুল্য। ভারতের ক্ষেত্রে হিটলারকে নতুন কোন মিত্র খুঁজতে হল না। তিনি সুভাষচন্দ্রকে কাজে লাগাতে চাইলেন। জার্মান পররাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে মধ্যপ্রাচ্য হয়ে ভারতের পশ্চিম-সীমান্তে আক্রমণের পরিকল্পনার কথা সুভাষকে জানানো হল। স্বভাবতই সুভাষ খুশী হলেন। কিন্তু জার্মানি যে সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করতে চলেছে তা তারা ঘুণাক্ষরেও জানালো না। অন্য রাস্ট্র দখল করার নাৎসীদের এই কৌশল সম্বন্ধে সুভাষ জানতেন না তা নয়। তিনি বারবার জার্মান সরকারের কাছে দাবী করলেন যে অক্ষশক্তির বিজয়ের পর ভারত স্বাধীন হবে এই ঘোষণা করা হোক। কিন্তু জার্মানি চায় তাকে দিয়ে তাদের নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে। সুভাষ চান অক্ষশক্তিকে দিয়ে ভারতের স্বাধীনতার ঘোষণা করিয়ে নিতে। এখন দেখা যাক কূটনৈতিক এই দ্বৈরথে কে জিততে পারে।

নাৎসী জার্মানি ও ভারতের স্বাধীনতার ঘোষণা

জার্মানির কাছ থেকে সাহায্য পেতে অত্যন্ত আগ্রহী হলেও সুভাষচন্দ্র জানতেন যে তার অক্ষশক্তির সাথে এই মিত্রতা ভারতবর্ষের মানুষ ভালোচোখে দেখবে না। নাৎসী জার্মানির প্রতি ভারতের শিক্ষিত মানুষ সাধারণভাবে ঘৃণা পোষণ করত। যার সহযোগিতা এবং পৃষ্ঠপোষকতা এতদিন সুভাষ পেয়ে এসেছিলেন সেই রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত নাৎসীদের প্রতি বিরূপ ছিলেন। সুতরাং জার্মানির কাছ থেকে 'ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা' পাওয়াটা সুভাষচন্দ্রের কাছে অত্যন্ত জরুরী ছিল। বস্তুত, নিজের জার্মানিতে অবস্থানকালীন পুরো সময়টাই তিনি চেষ্টা করেছিলেন যে জার্মান সরকার এই ঘোষণাটি করে——অক্ষশক্তির বিজয়ের পর ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে। তিনি জানতেন শুধুমাত্র এই ঘোষণাটি শুনলেই ভারতবাসীর কাছে জার্মানি গ্রহণযোগ্যতা পাবে এবং অক্ষশক্তির সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের এই মিলন প্রচেষ্টা প্রশংসিত হবে। ভারতবর্ষে গান্ধীও একই কাজ করছেন। তিনি বৃটিশ সরকারের কাছে দাবী করেছেন যে বৃটিশরাজ ঘোষণা করুক যে যুদ্ধের পর ভারত স্বাধীন হবে। তাহলেই ভারতবাসী খুশী মনে মিত্রশক্তির পক্ষে যুদ্ধে যোগ দেবে। কিন্তু বৃটিশ সরকার স্বাধীনতা তো পরের কথা যুদ্ধের দিনগুলোতে তাদের ক্ষমতা সংহত করতেই ব্যস্ত——স্বায়ত্তশাসনও দিতে রাজী নয়। সুভাষচন্দ্রের চিন্তা ছিল, এসময়ে যদি ভারতবাসীকে দেখানো যায় যে যেখানে ইংরেজ সামান্যতম ছাড় দিতে রাজী নয় সেখানে অক্ষশক্তি ভারতের স্বাধীনতা দিতে রাজী——তাহলে ভারতবাসী সহজেই জার্মানির প্রতি অনুরক্ত

হবে। এই আশায় তিনি জার্মান কর্তৃপক্ষের শত অপমান মুখ বুজে সহ্য করেও সখ্যতা বজায় রেখে চলতে লাগলেন।

কিন্তু হিটলারের হিসেব ছিল অন্য। তিনি চেয়েছিলেন সুভাষচন্দ্রকে দিয়ে যতটা সম্ভব ইংরেজবিরোধী প্রচার করিয়ে নিতে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা নিয়ে তার কোন মাথাব্যথা ছিল না। ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করতে তার বিশেষ আপত্তিও ছিল। প্রথম কারণ, হিটলারের আকাঙ্খিত 'নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থায়' এশিয়া আর আফ্রিকার দেশগুলোর স্বাধীন অস্তিত্বের স্থান ছিল না। তার পরিকল্পনা ছিল অক্ষ শক্তির অংশীদারেরা যুদ্ধ শেষের পর এই দেশ গুলোকে ভাগাভাগি করে নিয়ে নেবে। সুতরাং আগেভাগে স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করে ফাঁদে পড়তে হিটলার রাজী ছিল না। তবে আবার কথা দিয়ে তার খেলাপ করতে হিটলারের জুড়ি ছিল না। সুতরাং এমনতো হতে পারতো যে অক্ষশক্তি ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করল, কিন্তু যুদ্ধ জয়ের পর তা কার্যকরী করত না। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করতেই হিটলারের গুরুতর অসুবিধা ছিল।

সুভাষচন্দ্র জার্মানি যাবার মাস ছয়েক আগেই এক ইংরেজবিরোধী ভারতীয় রোমে পৌঁছেছেন। তার নাম মহম্মদ ইকবাল সেদাই। তিনি রোমে অবস্থান করে 'রেডিও হিমালয়' নামে এক বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে বৃটিশ বিরোধী প্রচার করছিলেন। আবার আফ্রিকার যুদ্ধে অক্ষশক্তির কাছে বৃটিশ সেনাবাহিনীর যে দলগুলো পরাজিত হয়ে যুদ্ধবন্দী হতো, তিনি সেই দলের মধ্যেকার ভারতীয় সৈন্যদের একত্রিত করে একটা সেনাবাহিনী তৈরী করার চেষ্টা করতেন। জার্মানিতে বসে সুভাষচন্দ্রের কাজও ছিল একই। তিনিও বেতারে ইংরেজ বিরোধী প্রচার করতেন এবং যুদ্ধবন্দী ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে একটা বাহিনী তৈরীর প্রচেষ্টা চালাতেন। কিন্তু একটা মূল বিষয়ে দুজনের মধ্যে উদ্দেশ্যগত পার্থক্য ছিল। সুভাষচন্দ্রের লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, আর মহম্মদ ইকবাল সেদাইয়ের উদ্দেশ্য ছিল আলাদা পাকিস্হান গঠন। সেদাই চাইতেন ইংরেজ-অধীনতা মুক্ত পাকিস্হান মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামিক দেশগুলোর সাথে বৃহত্তর কনফেডারেশনে যুক্ত হবে। আর সুভাষের লক্ষ্য স্বাধীন ভারত হবে অখন্ড। মজার ব্যাপার হচ্ছে, অক্ষশক্তির শিবিরে বসে একই সময় স্বাধীন ভারতের পক্ষে এবং স্বাধীন পাকিস্হানের পক্ষে প্রচার চলছিল। অক্ষশক্তির কাছে ভারত অখন্ড থাকবে, না আলাদা পাকিস্হান সৃষ্টি হবে——সে নিয়ে মাথা ব্যথা নেই। তারা চায় ইংরেজবিরোধী প্রচার। সুতরাং তারা সুভাষচন্দ্র এবং একবাল সেদাই দু'জনকেই সন্তুষ্ট রাখছিল। আবার দু'জনেই তাদের নিজ নিজ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে অক্ষশক্তির সাথে মিত্রতা রেখে চলছিল। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের দাবীমতো ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করতে অক্ষশক্তির অসুবিধা ছিল। যদি স্বাধীন ভারতবর্ষের ঘোষণা করে তাহলে একবাল সেদাই অসন্তুষ্ট হবে এবং কার্যত অক্ষশক্তির সাথে মিত্রতা ছেদ করবে। আবার সেদাই-এর দাবীমত যদি পাকিস্তান ঘোষণা করে তবে সুভাষ তা কখনোই মেনে নেবে না। অক্ষশক্তি কাউকেই চটাতে চায় নি। দু'জনকেই তার দরকার। সুতরাং জার্মানি চুপ করে থাকাটাই শ্রেয় মনে করেছিল।

ইংরেজ জাতি সম্পর্কে হিটলারের প্রচন্ড মোহ স্বাধীনতা ঘোষণা না করবার আর একটা কারণ। হিটলার আর্যরক্তের বিশুদ্ধতায় প্রচন্ড বিশ্বাসী। হিটলারের বিশ্বাস, খাঁটি নর্ডিকরাই বিশ্ব শাসন করবে। ভারতীয়দের মত বর্বর জাতিগুলো শ্রেষ্ঠ জাতির অধীনে থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। হিটলারের বিচারে জার্মান ছাড়া বিশ্বে একমাত্র ইংরেজরাই বিশুদ্ধ আর্যরক্ত বহন করছে। সুতরাং ভারতবাসী স্বাধীন থাকবে এটা হিটলার কল্পনাও করতে পারতেন না। ইংরেজ যে উপনিবেশগুলো দখল করে দীর্ঘদিন দক্ষতার সাথে

সেগুলোকে বজায় রেখেছে——এরজন্যে বিভিন্ন সময়ে হিটলার তাদের প্রশংসা করেছেন। ভারতবাসী এবং ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সম্পর্কে যেসব বিরূপ মন্তব্য তিনি তার 'মাইন ক্যাম্ফ' বইতে করেছেন, সেগুলো সংশোধিত করার জন্যে সুভাষসহ বিভিন্ন মহল থেকে তার কাছে বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি তা থেকে কখনও একচুল সরতে রাজী ছিলেন না। এছাড়া ইংরেজদের সাথে যুদ্ধ চলাকালীনও হিটলারের আশা ছিল বৃটিশের সাথে তার একটা মৈত্রী হয়ে যাবে। তিনি মনে করতেন জার্মান ও বৃটিশ দুই শ্রেষ্ঠ জাতির মধ্যে মিলন অবশ্যম্ভাবী। এই পথে তার কাছে পথের কাঁটা ছিল 'হতভাগা চার্চিলটা'। হিটলারের পরিকল্পনা ছিল যুদ্ধে ইংরেজদের কাবু করলে চার্চিল আর প্রধানমন্ত্রী পদে থাকতে পারবে না। বিরোধীপক্ষ থেকে যে প্রধানমন্ত্রী হবে তার সাথে সহজেই বোঝাপড়ায় আসা যাবে। (এ বিষয়ে বহু তথ্য-প্রমাণ আছে)। সুতরাং ইংরেজদের উপনিবেশচ্যুত করার ঘোষণা করে হিটলার আগেভাগেই সম্ভাব্য বোঝাপড়ায় বিঘ্ন ঘটাতে রাজী ছিলেন না।

একদিকে জার্মানির কাছ থেকে 'ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা' আদায়ের জন্য সুভাষের ঐকান্তিক চেষ্টা. অন্যদিকে নাৎসী জার্মান সরকারের পক্ষ থেকে 'আজ দেব, কাল দেব' করে সুভাষের সামনে গাজর ঝুলিয়ে তার কাছ থেকে নাৎসীদের কাজটুকু আদায় করবার কুমতলব——এই দুইয়ের টানাপোড়েনে সুভাষের জার্মানিতে অবস্থানের পুরো সময়টাই কেটেছে। সুভাষচন্দ্র জার্মানিতে পৌঁছবার সতেরো দিনের মধ্যে বিদেশ মন্ত্রী রিবেনট্রপ তার সাথে দেখা করলেও তারপর সুভাষকে ইচ্ছাকৃতভাবে সময় দেন নি। কারণ রিবেনট্রপ জানতেন সুভাষের সাথে দেখা হলে তিনি কি চাইবেন। সুভাষচন্দ্রের সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল হিটলারের সাথে তার একবার দেখা হলেই তিনি বুঝিয়ে রাজী করাতে পারবেন। কিন্তু হিটলার ইচ্ছাকৃতভাবে তার সাথে দেখা করেন নি। দীর্ঘ সময় জার্মানিতে অবস্থানে সুভাষচন্দ্রের সাথে হিটলার দেখা করেছিলেন একবারই। তাও সুভাষ সেখানে পৌঁছবার দীর্ঘ এক বছরেরও বেশী সময় পরে। ততদিনে সুভাষ জেনে গিয়েছেন যে জার্মানি থেকে তার পাওয়ার মতো কিছু নেই।

ফ্রি ইন্ডিয়া সেন্টার এবং ইন্ডিয়ান লিজিয়ন

বার্লিনে পৌঁছনোর সাত দিনের মাথায় সুভাষচন্দ্র জার্মান সরকারের কাছে যে 'অক্ষশক্তি ও ভারতের মধ্যে সহযোগিতার পরিকল্পনা' নামে স্মারকলিপিটি পেশ করলেন, তাতে কেবল ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণার প্রস্তাবই ছিল না। দীর্ঘ স্মারকলিপিতে আরও অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব ছিল। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল, বার্লিনে একটা 'স্বাধীন ভারত সরকার' গঠনের প্রস্তাব। এই সংগঠন বেতার প্রচারের মাধ্যমে ভারতবাসীকে বিদ্রোহ করতে আহ্বান জানাবে। সুভাষচন্দ্রের দাবীমত তার চরেরা ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে সক্রিয় রয়েছে, সেখান থেকে ভারতের সামরিক ঘাঁটিগুলোর উপরে আক্রমণের এক বিরাট পরিকল্পনা করতে হবে। তিনি আরও প্রস্তাব করেছিলেন যে ভারতের অভ্যন্তরে সেনাবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ, কারখানাগুলোতে ধর্মঘট এবং গুরুত্বপূর্ণ রেল-সেতু, কারখানার মধ্যে অন্তর্ঘাত চালাতে হবে। এর জন্যে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম জার্মানি থেকে পাঠাতে হবে। তিনি স্মারকলিপিতে আশাপ্রকাশ করলেন যে যদি মাত্র ৫০ হাজার সৈন্য নিয়েও ভারত সীমান্তে পৌঁছনো যায় তাহলে দলে দলে ভারতীয় সৈন্য বৃটিশ-বাহিনী ছেড়ে তাতে যোগ দেবে। এই সমস্ত কাজে যে অর্থ ব্যয় হবে জার্মান সরকার তা ঋণ হিসেবে দেবে। ভারত স্বাধীন হলে ঐ ঋণ শোধ করা হবে।

সুভাষচন্দ্র যখন এই পারকল্পনা জমা দেন তখন জার্মানর বলকান বিজয় চলছে। স্বভাবতই সুভাষচন্দ্র খুব খুশী ছিলেন কারণ বলকানের পথ ধরেই তো ভারত-সীমান্তে পৌঁছবার রাস্তা। তার নিশ্চিত ধারণা ছিল এভাবেই অক্ষশক্তি দ্রুত ভারত সীমান্তে পৌঁছবে। এই ধারণা নিয়েই তিনি মুসোলিনির আমন্ত্রণে রোমে গেলেন ২৯ মে ১৯৪১। সেই রোমে বসেই খবর পেলেন হিটলার সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করেছে। এই সংবাদ সুভাষের কাছে চরমতম আঘাতের সমান। এর মানে অক্ষশক্তি এখন দীর্ঘদিন ধরে রাশিয়া-যুদ্ধে ব্যস্ত থাকবে। ভারত-সীমান্তে সেনা সমাবেশ এখন সুদূর ভবিষ্যতের ব্যাপার। এর উপর হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করাতে ভারতবাসীর মনে জার্মান-বিদ্বেষ আরও তীব্র হবে। হতাশ সুভাষ ভাবলেন এর পর আর জার্মানিতে গিয়ে কি করব ? কিন্তু জার্মানির তখন সুভাষকে বিশেষ প্রয়োজন। ওয়ারম্যান তাকে খবর পাঠালেন ফিরে আসার জন্যে। সুভাষের তখন দ্বিতীয় রাস্তা খোলা নেই। তিনি ভাবলেন শেষ চেষ্টা একবার করাই যাক। ওয়ারম্যানের চিঠির উত্তরে লিখলেন——

আপনার পরামর্শমত কাউণ্ট সিয়ানো ভিয়েনা হইতে ফিরবার পর তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি। এই সাক্ষাৎকার আমার মনে কোনরূপ সাড়া জাগাইতে পারে নাই। ইহার পরই সোভিয়েত রাশিয়ায় যুদ্ধ শুরু হইল। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমার পরিকল্পনা ব্যর্থ আশায় পর্যবসিত হয়। সেইজন্য আমি ভাবিতেছিলাম যে পূর্ব রণাঙ্গণের পরিস্থিতির একটি পরিস্কার চিত্র না পাইলে বার্লিনে ফিরিয়া লাভ নাই। কিন্তু আপনার পত্রটি পাইয়া খুবই আনন্দিত হইয়াছি। *(৫জুলাই ১৯৪১ ড: ওয়ারম্যানকে লেখা ও. ম্যাজোট্টার চিঠি)*

জার্মান সরকারকে দেওয়া স্মারকলিপিতে 'বার্লিনে স্বাধীন ভারত সরকার গঠন' এবং 'ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে ঘোষণা' প্রস্তাবদুটি বাদ দিলে, এমন কতগুলো প্রস্তাব ছিল যা নাৎসী জার্মানির পক্ষে লোভনীয়। মনে রাখতে হবে সুভাষ যেদিন বার্লিন পৌঁছেছিলেন তার চারদিন আগে উত্তর আফ্রিকায় জার্মান সেনানায়ক রোমেল তার অভিযান শুরু করেছেন। রোমেলের বিরুদ্ধে যে বৃটিশ বাহিনী যুদ্ধ করছিল তার মধ্যে একটা বড় অংশ ছিল ভারতীয় সৈন্য। সুভাষচন্দ্র যদি তার বেতার প্রচারের মধ্যে দিয়ে এইসব ভারতীয় সৈন্যদের উপরে প্রভাব ফেলতে পারেন, সেটাই জার্মানির মস্তবড় লাভ। প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এই সময়টাতে হিটলারের ছকই ছিল যে এশিয়া এবং উত্তর আফ্রিকায় বৃটিশ বাহিনীকে এমনভাবে ব্যস্ত রাখতে হবে যে বৃটিশ সরকারের ইচ্ছে থাকলেও যেন কোনোভাবে সোভিয়েত রাশিয়াকে সাহায্য করতে না পারে। এখন যদি সুভাষচন্দ্রের মাধ্যমে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা তৈরী করা যায় তাহলে জার্মানি নিশ্চিন্তে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে। সুতরাং হিটলারের লোকজনেরা সুভাষচন্দ্রকে তোয়াজ করতে লাগল।

এরই সঙ্গে শুরু হল সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে নাৎসী জার্মানির অভিনব প্রতারণা। সুভাষ প্রস্তাব করেছিলেন যে কাবুল থেকে ভারত এবং জার্মানির মধ্যে সংযোগরক্ষাকারী দল তৈরী করতে হবে। সেইমত দু'জন নাৎসী দলের সদস্য রাসমুস এবং ওয়েঙ্গারকে টাকা দিয়ে কাবুলে পাঠানো হ'ল। আসলে কিন্তু এরা ছিল জার্মান গুপ্তচর। এদের কাবুলে পাঠানো হয়েছিল রাশিয়ায় যুদ্ধ সম্পর্কে চরবৃত্তি করার জন্যে, ভারত নিয়ে এরা কোনও আগ্রহই দেখায় নি। জার্মান বিদেশমন্ত্রী রিবেনট্রপ সুভাষচন্দ্রকে পাঠিয়েছিলেন রোমে গিয়ে ইতালির পররাষ্ট্রমন্ত্রী কাউণ্ট সিয়ানোর সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু পরে সিয়ানোকে জানিয়েছিলেন তিনি যেন ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারে সুভাষকে কোন প্রতিশ্রুতি না

দেন। রিবেনট্রপ সিয়ানোকে পরিষ্কার বলেন যে সুভাষচন্দ্রকে দিয়ে তারা কেবলমাত্র ব্রিটিশ বিরোধী প্রচারের কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। *(সিয়ানোর ডায়েরী)*। ডঃ ওয়ারম্যান আগেই সুভাষকে জানিয়েছিলেন যে ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে ঘোষণা করতে জার্মান সরকার রাজী হয়েছে। আট-দশদিনের মধ্যেই তা ঘোষণা করা হবে। কিন্তু সেই আট-দশদিন আর কোনদিনই আসে নি। সাথে সাথে সুভাষচন্দ্রকে তোয়াজ করবারও ব্যাপক ব্যবস্থা করা হল।

এবার বার্লিনে ফেরার পর সুভাষচন্দ্রকে শান্ত রাখতে তাঁকে একটা বেশ বড় বাড়ি সুসজ্জিত করে দেওয়া হল, বিশেষ খাদ্য ও পানীয়ের বন্দোবস্ত করা হল। বাড়ির কাজের জন্য পাচক, চাকর, গাড়ির ড্রাইভার, আংশিক সময়ের জন্য ঝি ও মালী দেওয়া হল। ইউরোপের সবরকম খাদ্য-পানীয়তে অভ্যস্ত হওয়া ছাড়াও ইতিমধ্যে সুভাষচন্দ্র ধূমপানেও অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। সারারাত্রি পড়াশুনো করতেন। সকাল ১১টা পর্যন্ত ঘুমোতেন। তারপরে কিছু খেয়ে স্বাধীন ভারত কেন্দ্রে কাজ দেখতে চলে যেতেন। এই সময় ডাঃ এ. কিউ. ফারাক্কী সুভাষচন্দ্রের শক্তি বৃদ্ধির জন্য মাঝে মাঝে গ্লুকোজ ইঞ্জেকশন দিতেন। একবার এই ইঞ্জেকশনের প্রতিক্রিয়ায় সুভাষচন্দ্র মরণাপন্ন হয়েছিলেন। *(সুধী প্রধান—সুভাষচন্দ্র, ভারত ও অক্ষশক্তি)*

এছাড়াও মিলল 'নাকের বদলে নরুন'। সুভাষ দাবী করেছিলেন বার্লিনে অবস্থিত একটি স্বাধীন ভারত সরকার গঠন, কিন্তু জার্মান সরকার তাতে রাজী হল না। বাধ্য হয়ে খোলা হল 'ফ্রি ইন্ডিয়া সেন্টার'। এর জাঁকজমক অবশ্য কম হল না। জার্মান সরকারের অর্থানুকূল্যে ফ্রি ইন্ডিয়া সেন্টারের অফিস খোলা হল। জার্মানীতে সুভাষচন্দ্রের অন্যতম সহচর এন জি গণপুলের ভাষায়—

বোসের অফিস খুলবার জন্য অভিজাত টাইগারটেন এলাকায় যেখানে সমস্ত বিদেশী দূতাবাসগুলি অবস্থিত ছিল, একটা বাড়ী রাখা ছিল। বাড়ীটি ছিল অপূর্ব সুন্দর এবং ভালোরকম আসবাবপত্রে সুসজ্জিত। *(নেতাজী ইন জার্মানি)*

শুধু তাই নয় সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যে প্রতি মাসে আট শো পাউন্ড মাসোহারা বরাদ্দ হল। *(এন জি গণপুলে—নেতাজী ইন জার্মানি)*। এই ফ্রি ইন্ডিয়া সেন্টারের অধীনে প্রচার করা হয়েছিল 'আজাদ হিন্দ রেডিও'। পরবর্তীকালে 'আজাদ মুসলিম রেডিও' এবং 'কংগ্রেস রেডিও' নামে দুটো আলাদা বেতার-প্রচার চালু করা হয়েছিল। কিছু প্রবাসী ভারতীয় যারা মনেপ্রাণে ভারত থেকে ইংরেজ হটানোর লড়াইতে বিশ্বাসী ছিলেন, তারা ফ্রি ইন্ডিয়া সেন্টারে যোগ দিলেন। এছাড়া ছিলেন কিছু বেতনভোগী ভারতীয় কর্মচারী। সর্বোপরি ছিলেন এমেলি শেঙ্কেল যাকে সুভাষচন্দ্র ভিয়েনা থেকে নিয়ে এসেছিলেন। এখানেই সুভাষচন্দ্র প্রথম 'নেতাজী' আখ্যা পেলেন।

এরই সাথে চেষ্টা করা হল একটা সেনাবাহিনী তৈরী করার। বৃটিশ বাহিনীর সাথে যুদ্ধে যেসব ভারতীয় সৈন্যদের যুদ্ধবন্দী হিসাবে ধরে আনত, জার্মান সরকার তাদের মধ্যে থেকে এই বাহিনী গড়ে তুলতে বলল। সুভাষচন্দ্র বন্দীশিবিরগুলোতে যেতেন। সেখানে ভারতীয় সৈন্যদের এক জায়গায় বসিয়ে সুভাষচন্দ্র বলতেন দেশের পরাধীনতার কথা, ইংরেজদের অত্যাচারের কথা, দেশপ্রেমের কথা। কিন্তু আমরা আগেই উল্লেখ করেছি ভারতীয় সেনাদের মধ্যে জাতীয়বাদী নেতাদের এইসব কথার বিশেষ দাম ছিল না। এইসব সেনারা ভারতের এমন সব দূর গন্ডগ্রামের মানুষ, যেখানে কংগ্রেসের রাজনীতির তাপ উত্তাপ পৌঁছাত না। সুভাষচন্দ্র যে ভারতে একজন 'বড় বিপ্লবী চরিত্র', এ বিষয়ে তাদের

কোন ধারণাই ছিল না। এক জার্মান সমীক্ষায় প্রকাশ, বেশির ভাগ সৈন্য এর আগে সুভাষচন্দ্রের কাজকর্মের সাথে বিশেষ পরিচিত ছিল না। বেশিরভাগ উপজাতি, দলিত জনগোষ্ঠী ইংরেজদের শোষণ অত্যাচার দেখে নি। তারা অত্যাচার দেখেছে জমিদার, জোতদার, মহাজনদের। আবার এই জমিদার-জোতদারদের অধিকাংশই আবার কংগ্রেসের সভ্য কিংবা পৃষ্ঠপোষক। সুতরাং দেশপ্রেমের আবেগভরা কথায় এদের কাছে কোনও ফল মিলল না। সুভাষচন্দ্রের অন্যতম সহকারী আবিদ হাসান দুঃখ করে লিখেছেন যে—— এইসব সৈন্যরা তাদের নাৎসীদের দালাল বলে গালাগালি দিত এবং তাদের কথা শুনতে চাইত না। *(এ সোলজা'র রিমেমবারস্)*। প্রথম অবস্থায় মাত্র পনেরো জন সৈন্য জুটল। বাধ্য হয়ে জার্মান কর্তৃপক্ষ অন্য রাস্তা ধরল। সুভাষচন্দ্রের সেনাবাহিনীর জন্য ভালো পোষাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য ইত্যাদির ব্যবস্থা করল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জার্মানির সবচেয়ে বেশি রসদ মজুদ ছিল। অন্য যে কোন দেশের তুলনায় জার্মানির সৈন্যরা খাদ্য, পোষাক অস্ত্র ইত্যাদি পেত অনেক উঁচুমানের। সেই জার্মান বাহিনীর সৈন্যেরাও ইন্ডিয়ান লিজিয়নের সেনাদের খাবার দেখে ঈর্ষায় জ্বলে যেত। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই বাহিনীর সেনা সংখ্যা বিশেষ বাড়তে পারে নি। সুভাষচন্দ্র যখন জাপানের উদ্দেশ্যে জার্মানি ত্যাগ করে চলে যান সে সময় ইন্ডিয়ান লিজিয়নের সৈন্য সংখ্যা ছিল সাকুল্যে সাড়ে তিন হাজার *(গণপুলে——নেতাজী ইন জার্মানি)*। সেনা সংখ্যা আরও কিছু হয়তো বাড়ত যদি বেছে বেছে মুসলমান সৈন্যদের একবাল সেদাই-এর কাছে না পাঠানো হত।

সুভাষচন্দ্র আপ্রাণ চেষ্টা করতেন তার ফ্রি ইন্ডিয়া সেন্টার বা ইন্ডিয়ান লিজিয়নকে নাৎসী জার্মানির হস্তক্ষেপমুক্ত রাখতে। তিনি জার্মান সরকারের সাথে একটা চুক্তি করতেও সমর্থ হয়েছিলেন যে ইন্ডিয়ান লিজিয়নের সৈন্যদের ইংরেজ ছাড়া অন্যদের বিরুদ্ধে কিংবা যেখানে ভারতের স্বার্থ নেই সেখানে ব্যবহার করা যাবে না। কিন্তু সময়টা ছিল আগ্রাসী নাৎসীদের এবং স্থানটা ছিল জার্মানি। নিরুপায় সুভাষের কোন বিকল্প পথ ছিল না। ইন্ডিয়ান লিজিয়নের সেনাদের শপথ নিতে হত হিটলারের নামে। শপথ গ্রহণের কথা কয়টি ছিল——

ঈশ্বরের নামে আমি শপথ গ্রহণ করছি সুভাষচন্দ্র বসু ভারতের যে স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা, সেই সংগ্রামে জার্মান সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং জার্মান রাষ্ট্র ও জনগণের নেতা অ্যাডলফ হিটলারকে মান্য করে চলব এবং এই শপথ পালনে আমার প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকলাম।

ভারতের স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করতে চলেছে যে বাহিনী, সে শপথ গ্রহণ করছে দেশের নামে নয়, দেশের জনগণের নামে নয়, এমনকি দেশের কোন নেতার নামে নয়—— সে শপথ নিচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে আগ্রাসী, সবচেয়ে নৃশংস, ইতিহাসের এক ঘৃণিত চরিত্রের নামে। ভারতের সশস্ত্র সংগ্রামের পক্ষে, সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের পক্ষে, এরচেয়ে ট্রাজেডি আর কী-ই বা হতে পারে। এর পরেও আমরা দেখব সুভাষ জার্মানি ছেড়ে চলে যাবার পর ঐ বাহিনীকে দিয়ে নাৎসীরা তাদের মনোমত কাজ করাচ্ছে। যারা তাতে রাজী হয় নি তাদেরকে নাৎসীরা সাথে সাথে বন্দী করেছিল।।

আজাদ হিন্দ রেডিও

ফ্রি ইন্ডিয়া সেন্টার কিংবা ইন্ডিয়ান লিজিয়নের মাধ্যমে সুভাষচন্দ্র যে সব কাজকর্মগুলো করেছিলেন ভারতবাসী তা সরাসরি দেখতে পায় নি। পরবর্তীকালে ইতিহাস বইতে বা

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে তারা এ সম্বন্ধে জেনেছে। কিন্তু আজাদ হিন্দ রেডিও-র প্রচার ভারতবাসী নিজের কানে শুনেছে। প্রকৃতপক্ষে সে সময় শিক্ষিত ভারতবাসীর একটা অংশ উদগ্রীব হয়ে থাকত এই রেডিও প্রচারের জন্যে। জার্মান সরকারও এই প্রচারের উপর সমধিক গুরুত্ব দিয়েছিল কারণ এটাই তাদের কাছে সবচেয়ে কার্যকরী বলে মনে হয়েছিল।

আজাদ হিন্দ রেডিও থেকে প্রচার শুরু হল ১৯৪১ সালের নভেম্বর মাস থেকে। এর মধ্যে অবশ্য বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গিয়েছে। তার মধ্যে একটা হল ১২ জুলাই ১৯৪১ বৃটেন-রুশ মৈত্রীচুক্তি। এই চুক্তির ফলে ফ্যাসিবাদ বিরোধী জোটের সূচনা হল। আর একটা ঘটনা ঘটেছিল যার ফলাফল পৃথিবীর পরবর্তী ইতিহাসে অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। বৃটিশ-রুশ মৈত্রীচুক্তির একমাস পর প্রকাশিত হল আটলান্টিক সনদ। মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এবং বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল যুদ্ধে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্য-স্বরূপ এটি তৈরী করেছিলেন। যদিও এটি রচনার ক্ষেত্রে রুজভেল্টের অবদানই সমধিক। মনে রাখতে হবে এই সনদ রচনার সময় বৃটেন ছিল যুদ্ধরত কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তখনও যুদ্ধে যোগ দেয় নি। এই সনদ অনুযায়ী কোন দেশের নাগরিকদের তার মনোমত সরকার গঠনের অধিকার ঘোষণা করা হল। যে কোন দেশ ছোটই হোক বা বড়, একই শর্তে ব্যবসা-বাণিজ্য করার অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হল। এছাড়াও নাৎসী আগ্রাসনের সমাপ্তি হবার পরে সকল দেশের স্বাধীনতার অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হল। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও চার্চিলকে এই সনদের অংশীদার হতে হল কারণ মার্কিন সাহায্য ছাড়া তখন আর তার গতি নেই। যদিও পরে চার্চিল বৃটেনের কমন্স সভায় ৯সেপ্টেম্বর ১৯৪১-এ বললেন —— "আটলান্টিক সনদে আমরা প্রধানতঃ ইউরোপে নাৎসী অধিকৃত দেশগুলির সার্বভৌমত্ব এবং জাতীয় সত্তা পুনরুজ্জীবনের কথা চিন্তা করেছিলাম।" অর্থাৎ তিনি বলতে চাইলেন যে আটলান্টিক সনদ বৃটিশ উপনিবেশগুলোর উপর প্রযোজ্য নয়। বস্তুতপক্ষে চার্চিল গোটা যুদ্ধ এবং পরবর্তী শান্তিচুক্তি পর্ব জুড়ে চেষ্টা করে গেছেন যাতে বৃটেনের উপনিবেশগুলো তাদের হাতছাড়া না হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন তার সেই স্পর্ধিত উক্তি——"বৃটিশ সাম্রাজ্য লাটে তুলবার জন্যে আমি বৃটিশ-রাজের প্রধানমন্ত্রী হই নি" তো আজ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। আটলান্টিক সনদ সম্পর্কে চার্চিলের এই অপব্যাখ্যা অবশ্য রুজভেল্ট মেনে নেন নি। ১৯৪২ এর ২২ ফেব্রুয়ারী রুজভেল্ট ঘোষণা করলেন——"আটলান্টিক সনদ গোটা পৃথিবীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য"। *(রবার্ট ই শেরউড——রুজভেল্ট এ্যান্ড হপকিন্স)*। যদিও আটলান্টিক সনদের ফলে পরবর্তীকালে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কোন অসুবিধাই হয় নি, তবুও তৎকালীন ঔপনিবেশিক শাসনের সময়ে এর একটা ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিল। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের কাছে এটা ছিল নেহাতই একটা 'বাজে কাগজমাত্র'।

আজাদ হিন্দ রেডিও চালু হওয়ার অব্যবহিত পরেই এমন একটা ঘটনা ঘটে গেল যার ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস নতুনভাবে লিখিত হল এবং সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনেও যার ফল হয়েছিল তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৪১ এর ৭ ডিসেম্বর জাপান পার্ল হারবার বন্দর আক্রমণ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি নৌবহর ধ্বংস করে ফেলল। এরই সাথে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামল দুই শক্তিধর জাপান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বৃটেনও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সর্বাত্মক রূপ নিল।

এই সময় রুশ রণাঙ্গনে অবশ্য জার্মানি প্রথম ধাক্কা খেতে শুরু করল। দুর্জয় জার্মানি সোভিয়েত রাশিয়ার সামরিক শক্তিকে চূর্ণ করে বিশাল অঞ্চল দখল করে নিয়েছিল। তাদের সেই বিজয়-রথ,প্রথম ধাক্কা খেল খোদ রাজধানী মস্কো এবং সোভিয়েত রাশিয়ার দ্বিতীয়

বৃহত্তম শহর লেনিনগ্রাদে। মস্কো থেকে মাত্র চল্লিশ কিলোমিটার দূর থেকে জার্মান বাহিনীকে ফিরতে হল। মস্কো বিজয় আর হল না। ৭ ডিসেম্বর যেদিন পার্ল-হারবারে জাপান বিমানবাহিনী বোমাবর্ষণ শুরু করল, সেই দিন থেকেই জার্মান বাহিনী রাশিয়া থেকে পিছু হটতে লাগল। এরপর জার্মানির শুধুই পরাজয়ের পালা। ক্ষুব্ধ হিটলার তার সামরিক জেনারেলদের পাইকারি হারে পদচ্যুত করলেন। কাউকে জেলে পাঠালেন, কারও কারও মুণ্ড গেল। এমনকি প্রধান সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল ব্রাউসিৎসকে পর্যন্ত পদচ্যুত করলেন। কিন্তু ঐ পদে আর বিশ্বাস করে কাউকে বসালেন না। তিনিই হলেন একাধারে স্থল-বাহিনীর প্রধান সেনাপতি, পুরো সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক, সমর বিষয়ক মন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, সর্বোপরি জার্মান জাতির নেতা 'ফুয়েরার'। একাই জার্মানির সর্বেসর্বা হয়েও তিনি নিজ দেশের পতন ঠেকাতে পারলেন না। এরপর থেকে পরাজয়ের পর পরাজয়।

পূর্বে জাপানের অবস্থা কিন্তু সম্পূর্ণ উল্টোটি। হিটলার যেমন যুদ্ধের শুরুতে বিদ্যুৎ-গতিতে একের পর এক দেশ দখল করেছিলেন, তোজোর জাপানও তার চেয়ে কম কিছু দেখাল না। একের পর এক তারা প্রশান্ত মহাসাগরের ছোট ছোট দ্বীপগুলো দখল করে নিল। তার সেনাবাহিনী প্রথমে দখল করল হংকং আর মালয়। শুধু তাই নয়, ইংরেজদের দুই বিখ্যাত যুদ্ধজাহাজ 'প্রিন্স অব ওয়েলস' এবং 'রিপালস'কে ১০ডিসেম্বর ১৯৪১ মাত্র দু'ঘণ্টার মধ্যে জলে ডুবিয়ে দিল। এর পর জাপান দখল করল ইংরেজদের বহু প্রচারিত দুর্ভেদ্য দুর্গ সিঙ্গাপুর। ইংরেজরা প্রচার করত এবং নিজেরাও বিশ্বাস করত যে কোন শক্তিই সিঙ্গাপুর দখল করতে পারবে না। তাদের গর্বের ফানুসটা ফেটে গেল ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৪২। সাথে সাথে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধও ভারতের দরজায় পৌঁছে গেল।

জার্মানির এই দুঃসময়ে আর জাপানের এই চমকপ্রদ বিজয়ের দিনগুলোতে সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ রেডিওর প্রচার স্বাভাবিকভাবেই জাপানকে ঘিরে চলল। এ সময়কার সুভাষের বক্তৃতাগুলো লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে তিনি সেখানে জার্মানির নাম করছেন না। হয় করছেন জাপানের নাম নতুবা অক্ষশক্তির। চিন-জাপান যুদ্ধে তার নিজের পূর্ব অবস্থান ভুলে তিনি জাপানকে সমর্থন করলেন। ১ মে ১৯৪২ এর বেতার বক্তৃতায় তিনি বললেন——

আমি এক বৎসরেরও বেশি পূর্বে আমার গৃহত্যাগ করার পর ইহাদের সহিত ঘনিষ্ঠ ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছি এবং আমি সর্বপ্রকার গুরুত্ব ও আন্তরিকতাসহ আপনাদের এই আশ্বাস দিতে পারি যে এই তিনটি শক্তিই ভারতকে পূর্ণ স্বাধীন ও নিজের ভাগ্য নিয়ন্তারূপে দেখিতে চায়।

তিনি তখন জানতেন যে জার্মান সরকার কিভাবে তার সাথে অসহযোগিতা করে 'ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে ঘোষণা' ঝুলিয়ে রেখেছে। তবু তিনি বারবার বলেছেন——

অক্ষ শক্তিগুলির সমন্বয় ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে বিপজ্জনক ইহা বলা সম্পূর্ণরূপে হাস্যকর। তথ্যগুলি সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমি এই-সব জাতিবৃন্দকে সম্পূর্ণরূপে জানি এবং তাহাদের যে ভারতের স্বাধীনতার আদর্শের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি আছে এ-বিষয়ে আমি আপনাদের আশ্বস্ত করিতে পারি। *(১৩ মার্চ ১৯৪২-এর বেতার ভাষণ)*

জার্মানি থেকে বেতারে সুভাষচন্দ্র এক আজব তথ্য জানালেন দেশবাসীর উদ্দেশ্যে। এই বেতার ভাষণটি ২৫এপ্রিল ১৯৪২ কুয়ালালামপুরের 'তামিল নেশন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই ভাষণটিতে সুভাষ বললেন——

সারা ভারতে আমার যে-সব গুপ্তচর কর্মরত আছেন তাঁহারা বেতারে সাংকেতিক ভাষায় নিয়মিত নির্দেশ পাইতেছেন। একমাত্র সরকারী কর্মচারীদের মধ্যেই আমাদের ৫০

হাজারের বেশি চর আছেন। ইহা ছাড়াও আছেন অসংখ্য গুপ্ত বাহিনীর সদস্য। উপযুক্ত সময়ে তাঁহারা আঘাত হানিবেন। যখন বিদেশস্থ ভারতীয়দের অগ্রগতি হইবে তখন শত্রুসেনার পশ্চাতে কর্মরত ঐ-সব লক্ষ লক্ষ ভারতীয় তাহাদের সহিত যোগ দেবেন।

এই সময়ে সুভাষের বাহিনী সাকুল্যে হাজার তিনেকও হবে না। তার ৫০ হাজার গুপ্তচর! সুভাষচন্দ্র জেনেশুনেই মিথ্যে বলছেন। আসলে তিনি জানতেন ভারতবাসী শুনুক বা না শুনুক, বৃটিশ গোয়েন্দারা তার প্রচার নিশ্চয়ই শুনছে। আমরা আগেই বলেছি যে হিটলারের মতলব ছিল যত বেশি বৃটিশ সৈন্য ভারতের মাটিতে আটকে রাখা যায়। আর সেই জন্যেই সুভাষকে দিয়ে ঐরকমের প্রচার। সেদিন কিন্তু হাজার হাজার ভারতবাসী সুভাষের ঐ প্রচার শুনে তা বিশ্বাস করে আশায় বুক বেঁধেছিল।

জাপান যখন রেঙ্গুন দখল করে একেবারে ভারতের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছিল তখন সুভাষ ভেবেছিলেন যে এবার বুঝি জাপান ভারত আক্রমণ করবে। তিনি ভারতবাসীর কাছে বার্লিন বেতার থেকে আবেদন করলেন——

জাপানের উপর আমাদের পরিপূর্ণ আস্থা রাখিতে হইবে। জাপানীরা ভারতে ব্রিটিশদের সকল সামরিক ও নৌ-ঘাঁটির উপর বোমা নিক্ষেপ করিবে। আমার ভারতীয় ভ্রাতৃবৃন্দ, আপনারা এই বিমান আক্রমণকে ভুল বুঝিবেন না। ব্রিটিশ ঘাঁটিগুলি ধ্বংস করিয়া জাপানীরা শুধু বিদেশস্থিত ভারতীয় বাহিনীর অগ্রগতির পথে বাধাগুলি অপসারিত করিতেছে। জাপান আমাদের মিত্র, আমাদের সাহায্যকারী। ব্রিটিশ প্রভুত্বের অবসান ঘটানোর ও একটি নববিধান গঠনের জন্য জাপানীদের সহিত সহযোগিতা করুন। *(২৩ এপ্রিল ১৯৪২ কুয়ালালামপুরের 'তামিল নেশন' পত্রিকায় প্রকাশিত)* কেন এই প্রচার? কি সেই 'বিদেশস্থিত ভারতীয় বাহিনী'? সুভাষের সম্বল তো ইন্ডিয়ান লিজিয়নের হাজার তিনেক সৈন্য। আর কি তার অগ্রগতি? জার্মানে অবস্থিত ঐ সেনা তো দূরস্থান তাদের প্রভু হিটলারের কোন বাহিনীরও তখন ভারত সীমান্তে আসার ক্ষমতা ছিল না। তবে কেন সুভাষ তার দেশবাসীকে বিদেশী শক্তির বর্ষিত বোমাকে সাদরে বরণ করতে বলছেন? তা কি স্বাধীন ভারতের স্বার্থে? পরবর্তীকালে যখন জাপানে তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজ করেছিলেন, কোন কোন তার সহকর্মী লিখেছেন, তখন নাকি তিনি জাপানীদের কলকাতায় বোমা ফেলতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু ১৯৪২ সালের মার্চে সুভাষচন্দ্রের এই বেতার ভাষণের ব্যাখ্যা আজ পর্যন্ত কোনও জীবনীকারই দেন নি। এ প্রসঙ্গে একটা তথ্য জানিয়ে রাখা জরুরী, বার্লিনে ১৯৪২ এর ২৭ জানুয়ারী জার্মান-অফিসারদের এক সভায় সুভাষচন্দ্র এবং জার্মানিতে জাপানী রাষ্ট্রদূত ইয়ামামোতো মিলিত হয়েছিলেন। সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে ভারতে জাপানী আক্রমণের সম্ভাবনার স্বার্থে সুভাষচন্দ্র ভারতে ধ্বংসাত্মক কাজের পরিকল্পনা চালিয়ে যাবেন। *(আর স্যাবেল সম্পা ঃ—— টাইগার এ্যান্ড স্ক্যাকাল)*

অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে যে সোভিয়েত রাশিয়া, বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহাজোট ধীরে ধীরে গঠিত হতে চলেছে তার গুরুত্বও সম্ভবত সুভাষ বুঝতে পারেন নি। ১৯৪২ এর ৭ ডিসেম্বর তিনি নিতান্ত অবজ্ঞাভরে বললেন——

এতদিনে আমার স্বদেশবাসীর নিকট ইহা পরিষ্কার হইয়া থাকিবে যে তথাকথিত সম্মিলিত জাতিগুলি সাধারণ বিশ্ব-রণকৌশলের মতো একটা-কিছু গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু ইহা বার্লিন, রোম, টোকিও অক্ষের ত্রিপাক্ষিক শক্তিগুলির সাধারণ বিশ্ব-রণকৌশলের দুর্বল অনুকরণ।

তবে সুভাষচন্দ্র ভারতে যতই বেতার প্রচার করুন না কেন, তার কতটা প্রভাব ভারতে পড়েছিল সে বিষয়ে বেশ সন্দেহ আছে। জার্মান এক সমীক্ষায় প্রকাশ যে গোটা

ভারতবর্ষে তখন মোট এক লক্ষ দশ হাজারের মত রেডিও সেট ছিল। তার মধ্যে সট ওয়েভ অনুষ্ঠান শোনা যেত তিরিশ হাজারের মত রেডিওতে। সুতরাং যদি ধরে নেওয়াও হয় ভারতের গ্রহণক্ষম সব রেডিও থেকেই সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতা শোনা হচ্ছে, তাহলেও সেই সংখ্যাটা তিরিশ হাজারের বেশি হত না। তবু নানা ঐতিহাসিকেরা এবং রাজনৈতিক নেতারা এই বেতার প্রচারের উপর অস্বাভাবিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তখনকার কংগ্রেস সভাপতি স্বয়ং আবুল কালাম আজাদ লিখেছেন—"ইতিমধ্যে ভারতে ব্রিটিশ অধিকারের বিরুদ্ধে জাপানী প্রচার অভিযানও ক্রমে তীব্র হয়ে উঠল। জার্মানি ও জাপানের এই প্রচার ভারতের বহু সংখ্যক লোকের মনে ছাপ ফেলেছিল"। শুধু তাই নয় আজাদের মতে সুভাষচন্দ্রের কার্যাবলী স্বয়ং গান্ধীর উপরও ছাপ ফেলেছিল। তার ভাষায়—

আমি এও দেখেছিলাম যে, সুভাষ বসুর জার্মানিতে পালানোর ব্যাপারটা গান্ধীজীর মনকে বেশ ভালভাবে নাড়া দিয়েছিল। তাঁর অনেক কাজ ইতিপূর্বে গান্ধীজীর অপছন্দ হলেও দেখলাম এই সময় তাঁর মনোভাবে বেশ একটা পরিবর্তন এসেছে। তাঁর নানা মন্তব্য শুনে এ বিষয়ে আমি নিঃসংশয় হয়েছিলাম যে, ভারত থেকে পালানোর ব্যাপারে সুভাষ বসু যে সাহস আর বলবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন তা গান্ধীজীর মন কেড়েছিল। সুভাষ বসু সম্পর্কে তাঁর এই গুণগ্রাহিতা তাঁর অজান্তে সমগ্র যুদ্ধপরিস্থিতি সম্পর্কে গান্ধীজীর মতামতকে কিছুটা প্রভাবিত করেছিল। *(ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম)*

আজাদ দীর্ঘদিন গান্ধীর সহযোগী থাকতে পারেন, তিনি গান্ধীকে চেনেন নি। সুভাষের কার্যাবলীতে গান্ধী মোটেই প্রভাবিত হন নি। তাহলে গান্ধী অনেক আগেই তাকে বুকে টেনে নিতেন। গান্ধীর কাছে পরিস্থিতির মূল্যায়ন তখন অন্য। সেই মূল্যায়নের ভিত্তিতে তিনি তখন এসে পড়েছেন সুভাষের কাছাকাছি। এই মূল্যায়নের সঠিক রূপটা চিনতে পারলেই ধরা যাবে গান্ধীর এই আচমকা সুভাষ প্রীতির কারণ। ধরা যাবে জওহরলালসহ কংগ্রেসের একটা বড় অংশের সাথে গান্ধীর কেন হঠাৎ বিরোধ দেখা দিয়েছিল।

যুদ্ধের দিনগুলি ও ভারতের জাতীয় কংগ্রেস

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলেও যুদ্ধ যে হচ্ছেই বিশ্বের প্রথম সারির নেতারা সে বিষয়ে অনেক আগে থেকেই ওয়াকিবহাল ছিলেন। কিন্তু ভারতের কংগ্রেস চলছিল তার নিজের ছক-বাঁধা পথে। সুভাষচন্দ্র যে দেশে থাকতে এ বিষয়ে বার বার অনুযোগ করেছিলেন তা অমূলক ছিল না। বস্তুতপক্ষে সুভাষচন্দ্র আর জওহরলাল ছাড়া কংগ্রেসের অন্য নেতারা আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে বিশেষ একটা গুরুত্ব দিতেন না। ভারতীয় শিল্পপতিরা কিন্তু পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক খোঁজ-খবর রাখত। তাই যুদ্ধ যখন শুরু হল তখন তারা ছিল প্রস্তুত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ভারতের শিল্পপতি, ব্যবসাদার, ফাটকাবাজ, মজুতদারদের সামনে মুনাফা বানাবার এক অবাধ রাজ্য খুলে দিল। ভারতে উৎপাদিত পণ্য যুদ্ধে ব্যবহার হওয়াতে তার দাম এবং চাহিদা দুই-ই বেড়ে গেল। যুদ্ধ শুরু হয়েছিল দূর ইউরোপে। ভারতে সামরিক ক্ষয়ক্ষতির ভয় ছিল না, কিন্তু বাণিজ্যের সম্ভাবনা ছিল সমধিক। সুতরাং যুদ্ধ ছিল ভারতীয় পুঁজির কাছে 'আশীর্বাদ'। ভারতীয় শিল্পপতিরা চাইল না এ সময়ে কংগ্রেস কোনওভাবে বৃটিশ শাসনকে উত্ত্যক্ত করুক। এবং তারা নিজেরাও সরকারের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতে থাকল। মুসলিম লীগের খালেকুজ্জামান সেসময় ছিলেন যুক্তপ্রদেশের প্রধানমন্ত্রী। তিনি লিখেছেন যে মুসলিম লীগকে আরও বেশি ইংরেজদের সাথে সহযোগিতার পথে ঠেলে দিয়েছিল ধনী ব্যবসায়ীরা। *(সি খালেকুজ্জামান—পাথওয়ে টু পাকিস্থান)*। কংগ্রেসের ক্ষেত্রেও এই একই কথা বলা যায়।

এই সময় কংগ্রেসের মধ্যে একটা বিতর্ক দেখা দিল। জওহরলাল, আবুল কালাম আজাদ ফ্যাসিবাদবিরোধী যুদ্ধে মিত্রশক্তির পক্ষে থাকার অনুকূলে ছিলেন। কিন্তু গান্ধী বললেন কংগ্রেস যেহেতু অহিংসবাদী সংগঠন, সুতরাং যুদ্ধের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। শুধু তাই নয়, বৃটেন যখন জার্মানির সাথে মরণপণ যুদ্ধ করছে, জার্মান বোমারু বিমানের আক্রমণে লন্ডনের রাস্তায় রাস্তায় মৃতদেহের স্তূপ——গান্ধী তখন বড়লাট লিনলিথগোর অফিসে গিয়ে তাকে পরামর্শ দিলেন যে ইংল্যান্ডের উচিত অস্ত্র ত্যাগ করে আত্মিক শক্তিতে হিটলারকে বাধা দেওয়া। লিনলিথগো নাকি গান্ধীর পরামর্শ শুনে এমন হাঁ হয়ে গিয়েছিলেন যে বেল বাজিয়ে বেয়ারাকে ডাকতে পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিলেন *(ইন্ডিয়া উইন্‌স ফ্রিডম)*। আসলে গান্ধী এত সরল লোক ছিলেন না। এটা ছিল তার কৌশল। এই অবস্থান নিয়ে তিনি যুদ্ধ থেকে হাত ধুয়ে বসে থাকলেন। শিল্পমালিকদের মুনাফায়ও কোন বাধা থাকল না। ১৯৪০ এর জুলাইয়ে পুণায় এ আই সি সি-র সভায় প্রস্তাব নেওয়া হল যে কংগ্রেস ফ্যাসিবাদ বিরোধী শিবিরেই নিজেকে মনে করে। কিন্তু স্বাধীনতা না মেলায় সে গণতান্ত্রিক শক্তির যুদ্ধ প্রচেষ্টায় যোগ দিতে পারছে না। এ প্রস্তাব কিন্তু গান্ধীর পছন্দ হল না। তিনি যুদ্ধের নাম-গন্ধের মধ্যে যাবেন না। গান্ধীর যখন চিন্তা এই-——কিছুদিনের মধ্যেই প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, বাদশা খান, এরা সব বদলে ফেললেন মতটা। তখন কংগ্রেস সভাপতি আজাদ লিখে জানালেন——চাইলেই তো আর বৃটিশ স্বাধীনতা দিচ্ছে না। ওটা লিখতে হয়, তাই লেখা হয়েছে। সুতরাং যথারীতি গান্ধীর প্রস্তাবই বহাল থাকল।

কিন্তু কংগ্রেসের উপর ছাত্র-যুবক, সোসালিস্ট, কমিউনিস্টদের চাপ বাড়তেই থাকল। বাধ্য হয়ে গান্ধী এক আজব আন্দোলনের ডাক দিলেন। ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ। আন্দোলনের সখও মিটবে, আবার শিল্পপতি বা বৃটিশ ক্ষেপবে না। কংগ্রেসের বহু নেতা পর্যন্ত এই আন্দোলনকে 'হাস্যকর' বলে মনে করতেন।

বৃটিশ সরকার কিন্তু এক ইঞ্চিও জমি ছাড়তে রাজী ছিল না। যুদ্ধের সুযোগে নানা দমনমূলক আইন তারা জারী করল। বড়লাট লিনলিথগো বৃটেনের ভারত সচিব জেটল্যান্ডকে লিখলেন যে কংগ্রেসের সহযোগিতার পিছনে না ছুটে গা ছাড়া দেওয়াই ভাল। *(৩ এবং ১৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৪০ লেখা চিঠি)*। তার উপর ১৯৪০ এর মে মাসে বৃটেনে এক বহুদলীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী হলেন চার্চিল। চার্চিলের একেবারে প্রথম থেকে লক্ষ্য ছিল বৃটেনের কোন উপনিবেশ যেন হাতছাড়া না হয়। সুতরাং দিল্লীতে এবং লন্ডনে ভারতবিরোধী যে লবি ছিল তারা অত্যন্ত সক্রিয় হল। সুতরাং ১৯৪০ এর ৮ আগস্ট বড়লাট লিনলিথগো যে 'আগস্ট প্রস্তাব' দিলেন তাতে দূর ভবিষ্যতে ডোমিনিয়ান স্টাটাসের বেশি কিছু ছিল না। হিটলার সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করবার পর বৃটিশ আরও বেশি দম নেবার সুযোগ পেল, তারা ভারতের উপর জাঁকিয়ে বসল। এমনকি সেই ১৯৩৫ সালে 'ভারত-শাসন আইন' যেটুকু ছাড় দিয়েছিল তাও কেড়ে নিল।

কিন্তু ভারতের প্রতি এই কঠোর মনোভাব বৃটিশ সরকার ধরে রাখতে পারল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, অস্ট্রেলিয়া বারবার বৃটেনকে চাপ দিতে লাগল ভারত সম্পর্কে অনুকূল ব্যবস্থা নিতে। ১২ আগস্ট ১৯৪১এর আটলান্টিক সনদের ফলে ভারতের প্রতি একটা ব্যবস্থা না নিয়ে বৃটেনের উপায় ছিল না। সুতরাং চার্চিল ভারতে পাঠালেন লেবার দলের মন্ত্রী স্টাফোর্ড ক্রিপস্‌কে। কিন্তু তার হাত-পা এমনভাবে বেঁধে দিলেন যাতে ক্রিপস কোন সমাধানে না আসতে পারেন। কারণ ভারতকে কোন ছাড় দেওয়া তার উদ্দেশ্য নয়। তিনি চান তার মিত্রদের দেখাতে যে তিনি ভারতীয়দের স্বাধিকার নিয়ে কত

আগ্রহী। ১৯৪২ এর ১০ মার্চ ভারতের বড়লাট লিনলিথগোকে চার্চিল লেখেন——"আমাদের উদ্দেশ্যের সততা প্রমাণ করার জন্যেই ক্রিপস্ মিশন অপরিহার্য..........ভারতের রাজনৈতিক দলগুলি যদি একে প্রত্যাখ্যান করে..............তাহলে বিশ্বের কাছে আমাদের ঐকান্তিকতা প্রমাণ হবে। *(এন ম্যানসার সম্পা——-ট্রানস্ফার অব পাওয়ার)*। চার্চিল তার লক্ষ্যে সফল হলেন। জাতীয় কংগ্রেস ক্রীপসের প্রস্তাব গ্রহণ করল না। তা গ্রহণযোগ্যও ছিল না। বৃটিশ প্রচার মাধ্যম ভারতীয় নেতাদের নিন্দায় দুনিয়া ভাসাতে লাগল।

গান্ধীর চমকপ্রদ শিবির-বদল

কংগ্রেসের একান্ত ইচ্ছা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির পক্ষে দাঁড়ায়। যুদ্ধ শুরুর আগে খোদ বৃটিশ-রাজ ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তাদের মত খোলসা করে বলে নি। কিন্তু কংগ্রেস মোটামুটিভাবে ফ্যাসিবাদের বিরোধিতা করেছিল। যুদ্ধ বাধার পর কংগ্রেস বৃটিশকে দুটো প্রস্তাব দেয়। তারা জানায় এর মধ্যে সরকার যে কোন একটা গ্রহণ করলেই কংগ্রেস বৃটেনের পক্ষে যুদ্ধে যোগ দেবে। হয়, যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পর ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে বৃটিশ এই ঘোষণা করুক। অথবা, যুদ্ধরত ভারতবর্ষে একটা জাতীয় সরকার গঠন করা হোক। (পাঠক লক্ষ্য করুন, অনুরূপ দুটি প্রস্তাব সুভাষও নাৎসী জার্মানির কাছে রেখেছিল)। কিন্তু ইংরেজ কংগ্রেসের দেওয়া এই দুটো প্রস্তাব কোনটাই মানতে রাজী ছিল না। (জার্মানিও সুভাষের প্রস্তাব মানে নি)। কিন্তু তা সত্ত্বেও কংগ্রেস কার্যত কোন বৃটিশ বিরোধিতা করে নি। (সুভাষও জার্মান বিরোধিতা করে নি। কি ভীষণ মিল!)। কারণ কংগ্রেস চায়নি ইংরেজ-বিরোধী আন্দোলন করে ভারতীয় পুঁজিপতিদের অসুবিধা ঘটাতে।

কিন্তু ১৯৪১ এর ডিসেম্বরে এমন একটা ঘটনা ঘটল যাতে কংগ্রেস তার শীতঘুম ভাঙ্গাতে বাধ্য হল। ৭ ডিসেম্বর জাপান যুদ্ধে যোগ দিল। শুধু যোগ দেওয়া নয়, ১৫ ফেব্রুয়ারী বৃটিশের গর্ব, 'দুর্ভেদ্য' সিঙ্গাপুর দখল করে নিল। ইংরেজ প্রতিরক্ষা জাপানের আক্রমণের সামনে কাগজের মত ভেসে গেল। ৮ মার্চ রেঙ্গুনের পতন ঘটল। ২৫ মার্চ জাপানী সেনা আন্দামান আর নিকোবর দ্বীপপুঞ্জও দখল করে নিল। যে যুদ্ধ ছিল ভারতবাসীর কাছে সকালের চায়ের সাথে খবরের কাগজের বস্তু, তা তাদের দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল। বৃটিশ প্রচারের কল্যাণে সাধারণ মানুষের মায় জাতীয় কংগ্রেসের নেতাদের পর্যন্ত ধারণা ছিল যে দুর্ভেদ্য সিঙ্গাপুর পেরিয়ে পূর্বদিক থেকে কোন শক্তি ভারত সীমান্তে আসতে পারবে না। কিন্তু সেই সিঙ্গাপুর দখল করে জাপান ভারত সীমান্তে এসে পড়ল, খবরগুলো ভারতবাসী ভালো করে হজম করতে না করতে। জাপানের দুরন্ত আক্রমণে মিত্রবাহিনী পালিয়ে পথ পেল না। এই যে 'পালিয়ে পথ পেল না'——এটা শুধু কথার কথা নয়। সত্যিই তখন মিত্রবাহিনীর লড়াই বলতে পালাবার লড়াই। এবং কার্যত পালাতে গিয়েও পথের বিপত্তিতে বহু সৈন্য মারা পড়েছিল। অবস্থা খানিকটা বোঝা যায় বর্মার 'জঙ্গল দিয়ে পালিয়ে বাঁচা' মার্কিন সেনাপতি স্টিলওয়েলের কথা থেকে, "জাপানীরা আমাদের খেদিয়ে বিদায় করেছে। কী প্রচন্ড মারটাই আমাদের দিয়েছে!" *(এল স্নাইডার——দ্য ওয়ার, ১৯৩৯-১৯৪৫)*। যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে আসা এবং আহত সৈন্যদের যখন ভারতে আনা হতে লাগল, প্রবল উত্তেজনা দেখা দিল। বর্মা, শ্যাম, সিঙ্গাপুরে বসবাসকারী হাজার হাজার ভারতীয় শরণার্থী হয়ে ভারতে প্রবেশ করল। ভারতে, বিশেষতঃ পূর্বভারতে এবং দক্ষিণভারতের পূর্ব উপকূলে জাপানী আক্রমণের আতঙ্কসৃষ্টি হল। চট্টগ্রামে পর পর দু'দিন জাপানী বিমান বোমা ফেলল। আতঙ্ক এতদূর প্রসারিত হয়েছিল যে আন্দামান থেকে জাপানীরা আক্রমণ করছে এই গুজবে মাদ্রাজের অফিস-কাছারি ছেড়ে লোকজন পালিয়ে গিয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সেই ছিল চরমতম মুহূর্ত। একদিকে এশিয়ার রণাঙ্গনে জাপান মিত্রশক্তির তিন স্তম্ভ মার্কিন, বৃটিশ আর অস্ট্রেলিয়ার মিলিত প্রতিরক্ষাকে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে——অন্যদিকে সোভিয়েত রাশিয়ার ভিতরে ঢুকে জার্মানি পৃথিবীর ইতিহাসে বৃহত্তম রণসজ্জা নিয়ে আক্রমণ চালাচ্ছে। যে কোন সময়ে অক্ষশক্তির বিজয় সংবাদ আসতে পারে। গান্ধী বিচলিত হর্ন। তবে কি যুদ্ধে অক্ষশক্তি জিতে যাবে? ফরোয়ার্ড ব্লকে থাকাকালীন এবং পরে জার্মানির রেডিও থেকে যে কথা সুভাষ বারবার বলেছে, তাই সত্যি হবে? আর বিজয়ী জাপান যখন ভারতের মাটিতে প্রবেশ করবে তার নিজের অবস্থানটা হবে কোথায়? গান্ধীর ইংরেজ-প্রীতি ফিকে হয়ে গেল, কারণ তিনি এখন নিশ্চিত যুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন-রুশ জোট হারছে। আবুল কালাম আজাদ তার 'ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম' বইতে লিখেছেন——"আরেকটি বিষয়েও পরিস্থিতি বিচারের দিক থেকে গান্ধীজী ও আমার মধ্যে পার্থক্য ছিল। এই সময় ক্রমেই গান্ধীজীর কেমন যেন মনে হতে থাকে যে মিত্রপক্ষ যুদ্ধে জিততে পারবে না।" সুতরাং গান্ধী সময় বুঝে ঘোর ইংরেজ-বিরোধী হয়ে গেলেন। অন্যদিকে আজাদ, জওহরলাল, রাজাগোপালাচারীর ধারণা যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত মিত্রশক্তিই বিজয়ী হবে। সুতরাং তারা ঘোর ফ্যাসিবাদ-বিরোধী থেকে গেলেন। যুদ্ধে জাতীয় কংগ্রেসের ভূমিকা নিয়ে যে মতদ্বন্দ্ব দেখা দিল তা কোন আদর্শগত কারণে নয়। দু'পক্ষেরই ইচ্ছা যে শক্তি বিজয়ী হবে তার শিবিরে গিয়ে যোগ দেবেন। সেক্ষেত্রে গান্ধীদলের পছন্দ অক্ষশক্তি আর জওহরদলের পছন্দ মিত্রশক্তি। মহাযুদ্ধ সুবিধাবাদের মুখোশ খুলে দিল। কিন্তু গান্ধীর বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করলেও তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর মত বুকের পাটা জওহরলালের তো ছিলই না, অন্যদেরও ছিল না। তারা শেষকালে গান্ধীর পদাঙ্কই অনুসরণ করলেন।

এই সময় গান্ধীর সুভাষ-প্রীতির আর পরিসীমা রইল না। সর্বত্রই তিনি সুভাষের কথা বলে বেড়াতে লাগলেন। সেসময় তাকে যারা দেখেছেন, দেখেছেন সুভাষের জন্যে তিনি কান্নাকাটি পর্যন্ত করছেন। গান্ধী যখন ক্রিপ্সের সাথে দেখা করতে গেলেন, সেখানেও সুভাষের কথা। আবুল কালাম আজাদ লিখেছেন——"যাইহোক ক্রিপস আমার কাছে এই বলে অনুযোগ করেছিলেন যে গান্ধীজীর মত মানুষ অমন গদগদ হয়ে সুভাষ বসুর প্রশংসা করবেন এটা তাঁর কাছে ছিল অপ্রত্যাশিত" *(ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম)*।

গান্ধী প্রাণপণে ইংরেজ বিরোধিতা শুরু করলেন। এই বিরোধিতা যতটা না বৃটিশের বিরুদ্ধে, তারচেয়ে বেশি জাপানের অধীন ভারতবর্ষে নিজের অবস্থানকে সুনিশ্চিত করতে। তিনি পরিষ্কার বললেন ইংরেজরা আছে বলেই জাপান ভারত আক্রমণ করতে চলেছে। বৃটিশরা চলে গেলেই জাপান তার পরিকল্পনা পাল্টাবে। (*৩ মে ১৯৪২, হরিজন*)। কংগ্রেসেও গান্ধী তার মত খোলাখুলি বলতে থাকলেন। ১৯৪২ এর এপ্রিলে এলাহাবাদে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে গান্ধী যে প্রস্তাবের মূল খসড়াটা করেছিলেন, তাতে তিনি লিখেছিলেন——"ভারত যদি স্বাধীন হয়, তাহলে তার প্রথম কাজই হবে জাপানের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করা............জাপানের সঙ্গে ভারতের কোন শত্রুতাই নেই"। জওহরলাল এই অংশে আপত্তি তুললেন। তিনি বললেন——"গান্ধীজী মনে করেছেন জাপান আর জার্মানি জিতবে। তাঁর এই মনে হওয়াটাই অবচেতনভাবে তাঁর সিদ্ধান্তকে চালিত করেছে"। বৈঠকে গান্ধীর প্রস্তাবের ঐ অংশটুকু কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু মজার কথা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মধ্যে থাকা তাদের এজেন্ট দিয়ে ব্রিটিশ সরকার পুরো আলোচনাটাই জানতে পারে এবং তা প্রকাশ করে দেয়।

গান্ধী তখন প্রাণপণে হবু বিজয়ী জাপানের মন যোগাতে ব্যস্ত। তিনি 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের ডাক দিলেন। ৮ আগস্ট ১৯৪২ বোম্বের এ আই সি সি-র সভায় প্রস্তাব

গৃহীত হল। প্রস্তাবে একটা মজার কথা বলা হয়েছিল—"প্রত্যেক স্বাধীনতাকামী এবং স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামরত ভারতবাসীর অবশ্যই নিজেকে নিজের দিশারী হতে হবে"। অর্থাৎ নিজের বিবেচনামত আন্দোলনের ধরন নির্ধারণ করতে পারবে। শুধু তাই নয়, যে গান্ধী ছিলেন এতদিন ধর্মঘটের ঘোর বিরোধী তিনি ৬ আগস্ট এক সাক্ষাৎকারে বললেন—"যদি একটা সাধারণ ধর্মঘটের ঘোর প্রয়োজন হয়ে ওঠে, তাহলেও আমি পিছিয়ে যাব না।" *(সুমিত সরকার—মডার্ণ ইন্ডিয়া)*। একই সময়ে সুভাষচন্দ্র তার আজাদ হিন্দ রেডিও থেকে ভারতবাসীকে নির্দেশ দিচ্ছেন—

জনসাধারণের জন্য আমি নিম্নোক্ত কাজগুলিও সুপারিশ করি ঃ—

যুদ্ধের উদ্দেশ্যে কাজ করিতেছে এরূপ সরকারী অফিস ও কারখানাগুলিতে অগ্নিসংযোগ করা।

বারবার যতটা সম্ভব এবং বিভিন্ন স্থানে ডাক, তার ও টেলিফোনের যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত করা।

যখনই সৈনিক কিংবা যুদ্ধ-পণ্য পরিবহণে বাধা সৃষ্টি করার সম্ভাবনা থাকবে তখনই রেল, বাস ও ট্রাম চলাচল ব্যাহত করা।

বিচ্ছিন্ন এলাকায় থানা, রেলস্টেশন ও কারাগার ধ্বংস করা।

মনে রাখতে হবে যে সুভাষচন্দ্র যখন এ নির্দেশ দিচ্ছেন তখন কোনও ভারতীয় বাহিনী ভারত-সীমান্তে আসে নি। তিনি নিজে তখন বার্লিনে। তার এই নির্দেশ ছিল প্রকৃতপক্ষে জাপান সেনার অনুকূলে কাজ করা। তবুও সুভাষ এই নির্দেশ দিচ্ছেন, কারণ তার স্থির বিশ্বাস যে যুদ্ধে অক্ষশক্তি জিতলেই ভারত স্বাধীন হবে।

ইতিহাসের যে সন্ধিক্ষণে সমস্ত পৃথিবীর মানুষ যখন যুদ্ধাঙ্গনের দিকে তাকিয়ে আছেন, কায়মনে চাইছেন ফ্যাসিবাদী শক্তির পরাজয়, গোটা দুনিয়া নাৎসীদের ভয়ঙ্কর মুঠোয় যাবে কিনা তারই অগ্নিপরীক্ষা যে মুহূর্তে—ভারতের দুই জনপ্রিয়তম নেতা, যারা ঐ যুদ্ধে একটি বুলেটও ছুঁড়ছেন না, তারা অক্ষশক্তির হয়ে দেশবাসীকে স্যাবোতেজ করতে বলছেন। সুভাষচন্দ্রের অবস্থান তো তবু পরিষ্কার। তার চিন্তা তিনি বারবার প্রচার করেছেন। কিন্তু গান্ধী, সত্যের পূজারী গান্ধী! যিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজদের হয়ে সৈন্য যোগাড় করেছেন, বারবার বৃটিশের শুভবুদ্ধির উপর নির্ভর করে এসেছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান বিমান বার্মিংহাম প্যালেসে বোমা ফেলবে সেই চিন্তায় আকুল হয়েছেন—আজ কেন তার এই আনুগত্য পরিবর্তন। অক্ষশক্তি জিতবে এই ধারণায় তিনি রাতারাতি ইংরেজদের ছেড়ে জাপান-জার্মানির নৌকায় উঠলেন! একটা বিরাট আক্রমণের মুখে কোন দেশে তার জাতীয় নেতার পরীক্ষা হয়। ভারতে জাপানী আক্রমণের হুমকির সামনে গান্ধীর আদর্শের খোলস ভেঙে পড়ল।

কিন্তু একটা প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে গান্ধী কি ভারতীয় শিল্পপতিদের স্বার্থের বাইরে গিয়ে ইংরেজদের প্রতি তার সমর্থন তুলে নিলেন। মোটেই তা নয়। আমরা আগেই দেখেছি ভারতীয় পুঁজি ইংরেজ শাসন থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছে তিরিশের দশক থেকেই, কিন্তু তাদের তাড়াহুড়োর কিছু ছিল না। প্রথমতঃ তাদের উপর বৃটিশ-নিয়ন্ত্রণ অনেক শিথিল হয়ে গিয়েছিল। তার উপর তারা সবসময়েই সতর্ক ছিল যাতে আন্দোলন শ্রমিক-কৃষকের আয়ত্তে চলে না যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মুনাফার দিনগুলোতে তারা কংগ্রেসকে একেবারে চুপ করিয়ে রেখেছিল। কিন্তু ১৯৪২ এর প্রথম মাসগুলিতে কংগ্রেস

নেতৃত্বের মতো ভারতীয় শিল্পপাতরাও ভাবতে শুরু করল যে অক্ষশক্তি জিতবে। ১৯৪২ এর ২৫ মে মধ্যপ্রদেশের লাটসাহেব বড়লাট লিনলিথগোকে এক চিঠিতে লিখলেন যে ভারতীয় ব্যবসাদারেরা দুবছর আগেও যুদ্ধে তাদের পক্ষে ছিল। কিন্তু বর্তমানে অবস্থাটা পাল্টে গিয়েছে। "মালয় এবং বর্মায় যে ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তাতে বেনিয়া আর মাড়োয়াড়িদের হৃদপিন্ড কেঁপে উঠেছে..........একটা ব্যাপার যথেষ্ট পরিষ্কার যে কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক কমিটিতে যেসব পুঁজিপতি আছেন, সম্ভাব্য জাপানি আক্রমণের ক্ষতি থেকে নিজেদের সম্পত্তি বাঁচানোর জন্যে যতদূর যাওয়া যায় তাঁরা প্রায় ততদূরই যাবেন।" *(এন ম্যানসার সম্পাঃ—— ট্রানস্ফার অব পাওয়ার)*। গান্ধীর মতই ভারতীয় শিল্পপতিদের মনে হয়েছিল ইংরেজদের তাড়াতে পারলে জাপান আর ভারত আক্রমণ করবে না। কিন্তু পরে যখন বৃটিশ শক্তি প্রাথমিক বিহ্বলতা কাটিয়ে আসামে বড় একটা সৈন্য সমাবেশ করতে পারল, জাপানের অগ্রগতি স্তব্ধ হয়ে গেল——অন্যদিকে সোভিয়েত রাশিয়ার রণাঙ্গনে জার্মানি বড় রকমের ধাক্কা খেল——ভারতীয় পুঁজিপতিরা আবার তাদের পুরনো খোলসে ফিরে গেল। ১৯৪২ এর মে মাসে ভারতে জাপান আক্রমণের আতঙ্ক যে ইতিহাসের অনেকগুলো সত্যকে ভারতবাসীর সামনে নগ্ন করে দিয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

হিটলার —— সুভাষচন্দ্র সাক্ষাৎকার

আমরা আগেই দেখেছি, সুভাষচন্দ্র বারবার আবেদন করেও জার্মানির কাছ থেকে 'ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে ঘোষণা' আদায় করতে ব্যর্থ হলেন। অথচ তিনি বার্লিন পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে তাকে বলা হয়েছিল যে দশদিনের মধ্যে ঘোষণাটি করা হবে। তিনি সেই প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করে ১৯৪১ এর ২০ মে "ভারতের কমরেডদের প্রতি" শীর্ষক এক আবেদন ভারতে পাঠালেন। তাতে তিনি লিখলেন——"আমি অক্ষশক্তির নিকট হইতে ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে একটি ঘোষণা দুই সপ্তাহের মধ্যে আশা করিতেছি। এই ঘোষণা প্রচারিত হইলেই আমি স্বাধীন ভারতের নামে বেতার প্রচার এবং অন্যান্য কার্যাদি শুরু করিয়া দিব।" কিন্তু এর চারদিন পরই জার্মান বিদেশ মন্ত্রী রিবেনট্রপ তাকে জানালেন যে ঘোষণাটি অল্প কয়েকদিনের জন্যে স্থগিত রাখা হয়েছে। রিবেনট্রপ ইচ্ছাকৃতভাবে সুভাষকে প্রতারিত করেছিলেন। ৬ জুলাই ইতালির বিদেশমন্ত্রী কাউন্ট সিয়ানোর সাথে কথা বলার সময় রিবেনট্রপ তাকে বলেন যে জার্মানির উদ্দেশ্যই হচ্ছে সুভাষচন্দ্রকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া। ভারত সম্বন্ধে অক্ষশক্তির উদ্দেশ্যটা কি তা যেন সিয়ানো প্রকাশ না করেন। আর সুভাষ যা চাইছেন তা জেনেই হিটলার তার সাথে দেখা করতে চাইছেন না। *(সিয়ানোর ডায়েরী)*। জার্মান পররাষ্ট্র দপ্তরের দুই অফিসার কেপলার এবং ওয়ারম্যানের সাথে সুভাষচন্দ্র দেখা করলেন ১৭ জুলাই ১৯৪১। ওয়ারম্যান সেই সাক্ষাৎকার সম্পর্কে লিখেছেন——"আমি বোসকে বললাম যে ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে ঘোষণার ক্ষেত্রে আমাদের সম্মতির কোন পরিবর্তন হয় নি। তবে তার জন্য উপযুক্ত সময় লাগাই স্বাভাবিক। এ কথায় বোস খুব উত্তেজিত হয়ে উঠলেন এবং বললেন পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে দ্রুত সেই ঘোষণা করতে বলা হোক।" *(জার্মান বিদেশনীতি সম্পর্কিত দলিল——Series D, Vol XIII)*

সুভাষচন্দ্র তার দাবী আদায় না করতে পারলেও তাকে দিয়ে জার্মান সরকার তাদের কাজটুকু আদায় করে নিয়েছিল। আজাদ হিন্দ রেডিও-র মধ্যে দিয়ে তীব্র বৃটিশ বিরোধী প্রচারের সুযোগ তারা নিল। এর পর থেকে হিটলার তো দূরের কথা রিবেনট্রপের নাগাল পাওয়াও ভার হয়ে উঠল। সেই সব অফিসারই সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করল, যারা

কেবল রোডিও প্রচার এবং ফ্রী ইণ্ডিয়া সেণ্টারের কাজকর্ম সম্পর্কেই কথা বলতে পারত। কোন নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা তাদের ছিল না। সুভাষ ফাঁদে পড়ে গেলেন। তিনি জানতেন জার্মানির সম্মতি ছাড়া অক্ষশক্তির কাছ থেকে কোনকিছুই আদায় করা যাবে না। জার্মানির হয়ে প্রচার করা ছাড়া তার আর কোন উপায়ই রইল না। তিনি ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করতে থাকলেন কবে নাৎসীদের মন গলে।

বার্লিনে তাঁর গতিবিধির উপর কড়া নজরদারি করা হয়। স্পেল্‌ন্‌ডিড হোটেলে যে ঘরে তিনি থাকতেন সেখানে একজন গেস্টাপো পাহারা দিত। পরে সোফিয়েনস্ট্রাসিতে একটা বাড়িতে তিনি থাকার সময় তাঁর যে চাকর নিযুক্ত করা হয়, জানা যায় সে-ও ছিল গেস্টাপোর লোক। তাঁর উপর নজরদারি এতটা ছিল যে তিনি তাঁর ডায়েরী বাংলাতে লেখা শুরু করেন। তিনি বলেছিলেন যে তাঁর ডায়েরি এবং সুটকেশ মাঝে মাঝেই কেউ ঘাঁটাঘাঁটি করত।

পরবর্তীকালে এক সাক্ষাৎকারে এমেলি শেঙ্কেল বলেছিলেন যে তাদের গোপনীয়তা এতদূর বিঘ্নিত ছিল যে দরকারী কথাগুলো তাদের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে বলতে হত। জার্মানির প্রচারমন্ত্রী গোয়েবলস্ তার ডায়েরীতে লিখেছেন যে তিনি গোপনে সুভাষের রেডিও প্রচারের উপর কড়া নজর রাখতেন। এই যখন অবস্থা, তখনও নিরুপায় সুভাষ আজাদ হিন্দ রেডিও থেকে ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে বলে চলেছেন——"আমি যখন বলি যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শত্রুরা আমাদের বন্ধু ও মিত্র, সে কথা বিশ্বাস করুন।"

সুভাষচন্দ্রের একান্ত বিশ্বাস ছিল যে তিনি যদি একবার স্বয়ং হিটলারের সাথে দেখা করার সুযোগ পান, তাহলে তিনি হিটলারকে বুঝিয়ে সুজিয়ে স্বাধীনতার ঘোষণা আদায় করতে পারবেন। কিন্তু হিটলার সুভাষের সঙ্গে দেখা করতে রাজী নন। এর মধ্যে ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে জাপান যুদ্ধে যোগ দেওয়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতি পাল্টে গেল। জাপান প্রচণ্ডগতিতে সিঙ্গাপুরসহ ইংরেজদের ঘাঁটিগুলো দখল করে নিতে থাকল। সাথে সাথে হিটলারের কাছে সুভাষের প্রয়োজনীয়তাও ফুরলো। হিটলার চেয়েছিলেন সুভাষের প্রচারের মাধ্যমে ভারতে এমন একটা অস্থিরতা হোক যে বৃটিশ সরকার ভারতীয় বাহিনীকে আফ্রিকায় কিংবা রুশ রণাঙ্গনে না পাঠাতে পারে। জাপান বৃটেনের উপনিবেশগুলো আক্রমণ করায় সে সম্ভাবনা একেবারে দূর হয়ে গেল। হিটলার সুভাষকে জার্মানি থেকে সরাবার মনস্থ করলেন। বস্তুতপক্ষে হিটলারের সাথে সুভাষের দেখা হওয়ার অনেক আগেই ১৯৪২ এর ২ জানুয়ারী রিবেনট্রপ জাপানী রাষ্ট্রদূত ওশিমাকে ডেকে সুভাষচন্দ্রকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পাঠানোর প্রস্তাব করেন। ওশিমা রাজী হন। এরপর ১৭ এপ্রিল অক্ষশক্তির মধ্যেকার পারস্পরিক সংযোগ রক্ষাকারী কমিটি সিদ্ধান্ত নেয় যে সুভাষচন্দ্রকে জার্মানি থেকে জাপানে পাঠানো হবে। তাকে নিয়ে যে এইসব আলোচনা হচ্ছে সুভাষ তা জানতেই পারেন নি। সুতরাং ১৯৪২ এর মে মাসে হিটলার যখন সুভাষকে দেখা করার সময় দিলেন তখন সুভাষকে যা করতে হবে তা স্থির হয়েই গিয়েছে। সুভাষচন্দ্রের বেশির ভাগ জীবনীকারই এমন লিখেছেন যেন তিনিই ইচ্ছা করে জার্মানি ছেড়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় গিয়েছিলেন। ব্যাপারটা মোটেই তা নয়।

অবশেষে জার্মানিতে পৌঁছানোর দীর্ঘ একবছরেরও বেশি পরে সুভাষচন্দ্র হিটলারের

সাথে তার প্রার্থিত সাক্ষাৎকারের সুযোগ পেলেন। বার্লিন থেকে বিমানে তাকে পূর্ব প্রাশিয়ায় হিটলারের সদর দপ্তরে নিয়ে যাওয়া হল ১৯৪২ এর ২৭ মে। সেখানে রিবেনট্রপের সাথে প্রথমে তার কথা হল। এর আগে সুভাষচন্দ্র তাকে কয়েকটি চিঠি দিয়েছিলেন। রিবেনট্রপ জানালেন তিনি ইচ্ছে করেই উত্তর দেন নি কারণ ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা নিয়ে তারা কোন মনস্থির করতে পারেন নি। তিনি সুভাষকে জাপানে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। শুধু তাই নয়, গায়ে পড়ে জানালেন যে ডুবোজাহাজে যাওয়াই ভালো কারণ বিমানে যাওয়াটা নিরাপদ নয়।

১৯৪২ এর ২৯ মে হিটলারের সাথে সুভাষচন্দ্রের সাক্ষাৎ হল। কি হল সেদিনের আলোচনা? জার্মান পররাষ্ট্র দপ্তরের এক অফিসার ফুর্টভ্যাংলারের বর্ণনা অনুযায়ী সুভাষচন্দ্র প্রথমে হিটলারকে একজন প্রবীন বিপ্লবী বলে সম্বোধন করে জানান যে তিনি নিজে একজন বিপ্লবী বলে হিটলারের কাছ থেকে পরামর্শ আশা করেন। এরপরই শুরু হয়ে যায় যথারীতি হিটলারের বাক্যস্রোত। তিনি ইংরেজ জাতির প্রশংসা করলেন। ভারতের স্বাধীনতা আগামী ১৫০ বছরের মধ্যে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই বলে মত প্রকাশ করলেন। সুভাষকে বললেন ভারতের সীমান্তে জার্মান বাহিনীর পৌঁছতে আরও দু'তিন বছর সময় লেগে যাবে। হিটলার নিজে একজন সৈনিক, রাজনৈতিক প্রচারক নন। তাই তিনি মিথ্যে আশ্বাস দেওয়া পছন্দ করেন না। হিটলার সুভাষকে জাপান যেতে বললেন। তবে জাপান যদি যাওয়ার ব্যবস্থা না করে তাহলে তিনি ডুবোজাহাজ দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিলেন। *(ক্রিস্টোফার জাইকস্—ট্রাবল্ড লয়ালিটি)*। আলেকজান্ডার ভার্থ ছিলেন আর একজন জার্মান বিদেশ দপ্তরের অফিসার। (ইনি রুশ-জার্মান যুদ্ধের সেই বিখ্যাত ইতিহাস লেখক নন)। তিনি 'এ বেকন এক্রস এশিয়া' নামের স্মারক পুস্তিকায় লিখেছেন যে সুভাষচন্দ্র ফ্রি ইন্ডিয়া সেন্টারের সহকর্মীদের কাছে বলেছিলেন যে ঐ আলোচনায় তিনি হিটলারের 'মাইন ক্যাম্ফ' বইতে লেখা ভারত সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্যের কথা তুলেছিলেন। কিন্তু হিটলার সে নিয়ে আলোচনা করতেই রাজী হন নি। সুভাষচন্দ্র তার সেই বহু প্রার্থিত 'স্বাধীনতা ঘোষণার' কথা জিজ্ঞেস করলে হিটলার উত্তর দিয়েছিলেন যে আরও দেড়শো বছরের মধ্যে ভারত নিজের দেশ শাসন করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে না। আলোচনার শেষে হিটলার সুভাষকে জিজ্ঞাসা করেন যে ভারতের পক্ষে এরকম প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তিনি কি ভূমিকা পালন করতে চান? আলোচনার ব্যর্থতায় সুভাষচন্দ্র এত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে তিনি নাকি তার দোভাষী অ্যাডাম টটকে ইংরাজীতে বলেন—"মাননীয় ফুয়েরারকে বলুন যে আমি সারা জীবন ধরে রাজনীতি করছি, আমার কারও উপদেশের প্রয়োজন নেই।" (বাঁচোয়া, হিটলার ইংরেজী জানতেন না)। *(আলেকজান্ডার ভার্থ—প্ল্যানিং ফর রেভ্যুলুশন)*।

সুভাষচন্দ্রের বেশিরভাগ বাংলা জীবনীগুলো পড়লে মনে হয় যে হিটলারের সাথে আলোচনার ব্যর্থতার পরই সুভাষ জাপানে চলে গিয়েছিলেন। তা কিন্তু নয়। হিটলারের সাথে দেখা হয় ১৯৪২ এর ২৯ মে, আর সুভাষ জাপানের উদ্দেশ্যে ডুবোজাহাজে ওঠেন ১৯৪৩ এর ৮ ফেব্রুয়ারী। যুদ্ধের ঘটনাবহুল দিনগুলোতে আট মাস কম সময় নয়। কিন্তু উপায় নেই, কোন কিছুই তখন সুভাষের ইচ্ছা অনুযায়ী ছিল না। এই ব্যর্থ আলোচনার পর জার্মান সরকার সুভাষচন্দ্রকে দিয়ে অনেকগুলো বেতার বক্তৃতা রেকর্ড করিয়ে নিল। যেগুলো সুভাষ জার্মানি ছাড়ার পর আজাদ হিন্দ রেডিও থেকে প্রচার করা হয়েছিল। কি ছিল সেই বক্তৃতাগুলোয়। তিনি বার্লিন ছাড়ার পর ১ মার্চ ১৯৪৩ আজাদ হিন্দ রেডিও থেকে সুভাষের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—

কিন্তু এই তাত্ত্বিক আলোচনা ছাড়াও আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং হের হিটলার ও সিনর মুসোলিনির সহিত আমার সাক্ষাৎকার আমার মনে এই প্রত্যয় সৃষ্টি করিয়াছে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামে ভারতের বাহিরে ত্রিপাক্ষিক শক্তিগুলিই আমাদের সর্বোত্তম বন্ধু ও মিত্র।

সাক্ষাৎকারটি 'প্রত্যয় সৃষ্টি' করবার মতই হয়েছিল বটে! শুধু তাই নয়, জাপানে পৌঁছবার পর ২২ জুন ১৯৪৩ জার্মান দেশবাসীর উদ্দেশ্যে টোকিও বেতার থেকে দেওয়া এক ভাষণে সুভাষচন্দ্র বললেন——

ফুয়েরার ও পররাস্ট্র মন্ত্রী ভন রিবেনট্রপ, রাইখ মন্ত্রী ডঃ গোয়েবলস, রাইখলিটার এস. এস. হিমলার, রাইখলিটার বালডুর ভন স্কাইরাখ প্রমুখ নূতন জার্মানির বিশিষ্ট নেতাদের সহিত আমার আলোচনা প্রসঙ্গে আমি গভীর সন্তোষের সহিত লক্ষ্য করি ভারতের বিষয়ে তাঁহাদের আগ্রহ কত খাঁটি এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি তাঁহাদের সহানুভূতি কত গভীর।

আসলে নাৎসীদের প্রশংসা না করে সুভাষের উপায় নেই। নাৎসীরা হচ্ছে অক্ষশক্তির বড় শরিক। তাদের চটালে জাপানের কাছ থেকেও কোন সাহায্য মিলবে না। কাজেই নিজে হাড়ে হাড়ে বুঝলেও সুভাষ এরকম প্রচার করেই গেছেন। আর ভারতবাসী তা শুনে উৎফুল্ল হয়ে ভেবেছে হিটলার বুঝি মস্তবড় এক ভারতবন্ধু।

অবশেষে ১৯৪৩ এর ৮ ফেব্রুয়ারী একমাত্র সাথী আবিদ হাসানকে নিয়ে সুভাষচন্দ্র U180 নম্বর জার্মান ডুবোজাহাজে চাপলেন। তার অন্য কোন সহযোগীর স্থান হয়নি—— ডুবোজাহাজে জায়গা নেই। সুভাষচন্দ্র চললেন এক নতুন পথের সন্ধানে, নতুন লড়াইয়ের আশা বুকে নিয়ে——নতুন উদ্যমে, নতুন প্রত্যয়ে। সঙ্গে থাকল তার অদম্য সাহস, অফুরন্ত প্রাণশক্তি আর দেশ থেকে ইংরেজ হটানোর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। দূর জার্মানিতে পড়ে রইল তার ফ্রি ইন্ডিয়া সেন্টার, ইন্ডিয়ান লিজিয়ন, সহকর্মীরা আর স্ত্রী এমেলি। এবং সদ্যোজাত শিশুকন্যা, যার মুখ সুভাষ আর কোনদিন দেখতে পাননি।

সপ্তম পর্ব

সুভাষচন্দ্র ও আজাদ হিন্দের স্বপ্ন

সুভাষচন্দ্র জার্মানি ছাড়লেন কেন

দীর্ঘ দুবছর জার্মানিতে থাকা সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র নাৎসী সরকারের কাছ থেকে তার ন্যূনতম চাহিদা ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে ঘোষণা আদায় করতে পারলেন না। এরপর হিটলার সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করার পর তিনি বেশ বুঝতে পারলেন জার্মানি এমনভাবে ফেঁসে গেল যে ভারত সম্পর্কে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা তার নেই। তবুও সুভাষ জার্মানিতে রয়ে গেলেন ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীন রাজনীতির কথা ভেবে। অক্ষশক্তির কাছ থেকে যদি কিছুই না পাওয়া যায় তাহলে দেশের মানুষকে তার নাৎসীদের সাথে যোগ দেবার যৌক্তিকতা বোঝাবেন কি করে? কিন্তু নাৎসীদের কাছ থেকে কেবল আশ্বাসই পেয়ে গেলেন, কাজের কাজ কিছু হল না। সোজা কথায় নাৎসী জার্মানি তাকে প্রতারণা করল।

সুভাষচন্দ্র ইন্ডিয়ান লিজিয়ন স্থাপন করেছিলেন. যুদ্ধবন্দী ভারতীয় সেনাদের নিয়ে এক নিজস্ব সেনাবাহিনী গড়বার জন্যে। কিন্তু অনেক সুযোগ সুবিধা দিয়েও কখনই হাজার তিনেকের বেশি সৈন্য সংগ্রহ করা গেল না। ইন্ডিয়ান লিজিয়ন একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেল। সুভাষচন্দ্রের গোটা রাজনৈতিক জীবন পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাব যে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পেরেছিলেন ভারতীয় কংগ্রেসের একজন নেতা হিসাবে এবং জাপানে আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক হিসাবে। মনে রাখতে হবে যে এ দুটোর কোনটাই সুভাষ নিজে গড়ে তোলেন নি। কংগ্রেস অনেক আগে থেকেই ছিল এবং গান্ধীর নেতৃত্বে সারা ভারতে একটা প্রভাবশালী সংগঠন গড়ে উঠবার পর সুভাষ তাতে যোগ দিয়েছিলেন। আবার মোহন সিং, রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা একটা সংগঠন হিসাবে আজাদ হিন্দ ফৌজকে তিনি পেয়েছিলেন। একেবারে গোড়া থেকে সুভাষকে গড়ে তুলতে হয়েছিল দুটো সংগঠনকে। ভারতে ফরোয়ার্ড ব্লক এবং জার্মানিতে ইন্ডিয়ান লিজিয়ন। দুটো ক্ষেত্রেই সুভাষচন্দ্র ব্যর্থ হয়েছিলেন।

পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেল ১৯৪১ এর ডিসেম্বর থেকে। জাপান শুধু যুদ্ধেই যোগ দিল না একে একে হংকং, সিঙ্গাপুর, বর্মা, আন্দামান-নিকোবর দখল করে নিল। জাপানের বোমারু বিমান চট্টগ্রাম, মাদ্রাজ এবং সিংহলে বোমা ফেলতে শুরু করল। যুদ্ধকে জাপান ভারতের সীমান্তে এনে দিল যা আগে থেকে সুভাষ ধারণাই করতে পারেন নি। শুধু যুদ্ধকে ভারত সীমান্তে নিয়ে আসা নয়, জাপানে বা জাপ-দখলীকৃত

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এমন কতগুলো ব্যাপার ঘটল যাতে তিনি উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী ভারতীয় যারা বৃটিশ শাসন অবসানের লড়াই করতে আগ্রহী ছিলেন ১৯৪২ এর ১৫ জুন ব্যাঙ্ককে এক সম্মেলন করলেন। জার্মানি থেকে সুভাষচন্দ্র সেখানে একটা ভাষণ পাঠালেন। সম্মেলনে সুভাষচন্দ্রকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এসে নেতৃত্ব নেওয়ার আমন্ত্রণ জানান হল। তাকে নেতৃত্ব নিতে আমন্ত্রণ জানানোর সুনির্দিষ্ট কারণ ছিল যা আমরা পরের অধ্যায়ে আলোচনা করব। ব্যাঙ্কক সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল ভারতীয়দের একটা সেনাবাহিনী তৈরী করা হবে। সেইমত ১৯৪২ এর ১০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে মোহন সিং-এর নেতৃত্বে ১৬ হাজার ৩০০ জন সেনা নিয়ে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির প্রথম ডিভিশন তৈরী করা হল। সেই সেনারা সকলেই জাপ-বাহিনীর হাতে বন্দী ভারতীয় সৈন্য। ইতিমধ্যে মে মাসের সাক্ষাৎকারে হিটলার সুভাষকে জাপানে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। সুভাষচন্দ্র অবশ্যই রাজী। সেই জাপান, যার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সুভাষ চীনে মেডিকেল মিশন পাঠিয়েছিলেন। সেই জাপান যাকে সুভাষ বলেছিলেন——"প্রাচ্যের সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ" *(কিটি কুর্টিকে লেখা চিঠি)*।

অবশ্য জাপান সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে রাজী হল অনেক পরে। অক্ষশক্তির মধ্যেকার পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষাকারী কমিটি সুভাষকে জাপানে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয় ১৯৪২ এর ১৭ এপ্রিল, আর তিনি জাপান অভিমুখে ডুবোজাহাজে উঠলেন ১৯৪৩ এর ৮ ফেব্রুয়ারী। এর কারণ, জাপান ভারত আক্রমণ করতে বিশেষ আগ্রহী ছিল না। (বিস্তৃত আলোচনা পরে করা হবে)। যাইহোক, প্রথম সুযোগেই সুভাষচন্দ্র জাপানের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। তার স্ত্রী এবং কন্যা ভিয়েনাতে ফিরে গেল।

সুভাষচন্দ্র যে বিয়ে করেছিলেন তা তিনি ভারতবাসীকে একেবারেই জানান নি। তার আশঙ্কা ছিল, তিনি বিয়ে করেছেন জানলে দেশবাসী তাকে ভুল বুঝবে। এর আগে তিনি বারবার তার দাদাকে লিখেছেন যে জীবনে বিয়ে করবেন না। শরৎ বসু সেই সব চিঠির কথা সর্বসমক্ষে আলোচনা করেছেন। কলকাতায় এমন কথাও প্রচারিত ছিল যতদিন দেশ পরাধীন থাকবে, সুভাষের প্রতিজ্ঞা তিনি ততদিন বিয়ে করবেন না। জনসাধারণের এই ধারণা কোন তরফ থেকেই ভাঙ্গার চেষ্টা হয় নি। সেই সুভাষ বিয়ে করেছেন, তাও আবার বিদেশিনী খ্রীস্টান——ভাবমূর্তিতে টোল খাবার বিরাট সম্ভাবনা। যে ধরনের রাজনীতির যে পরিণতি আর কি। সুভাষচন্দ্র স্ত্রী-কন্যাকে জাপানে নিয়েই গেলেন না——বরং জাপানে পৌঁছে বিষয়টা বেমালুম চেপে গেলেন। জাপানে যারা ভাবতেন যে তারা সুভাষের অত্যন্ত কাছের লোক, তারাও কিছু জানতে পারেন নি। এমেলি রয়ে গেলেন উপেক্ষিতা। এই বিয়ের খবর পরে যখন ভারতে প্রকাশিত হয়েছিল, বেশিরভাগ ভারতবাসীই বিশ্বাস করেনি। বরং সুভাষচন্দ্রের ভক্তরা 'মিথ্যে খবর' দেবার অভিযোগে প্রেসের উপর খড়্গহস্ত হয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের স্বার্থ

বিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়া থেকেই জাপান এশিয়ার মধ্যে সামরিক শক্তিতে নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে প্রতিপন্ন করতে পেরেছিল। জার-শাসিত রাশিয়া এবং কোরিয়ার উপর বিজয়ের ফলে জাপান এশিয়াবাসীর কাছে বিশেষ সমীহ আদায় করেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী মিত্রপক্ষে থাকার সুবাদে ভার্সাই চুক্তির মধ্যে দিয়ে মাঞ্চুরিয়ার উপর দখলও সে কায়েম করতে পেরেছিল। কিন্তু তাতেও জাপনের সংকট মিটল না। বিপুল জনস্ফীতি জাপানকে বিপদে ফেলল। ১৮৪৬ সালে জাপানের জনসংখ্যা ছিল ২ কোটি ৬০

লক্ষ, সেখানে ১৯২০ সালে তা দাড়াল সাড়ে ৫ কোটিতে। এই বিপুল জনস্ফীতিকে প্রয়োজনীয় কাজ দেবার মত কৃষিজমি জাপানের ছিল না। ফলে জাপানের শাসকেরা জোর দিল দেশজুড়ে শিল্প-স্থাপনে। কিন্তু শিল্পগুলোর জন্যে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল জাপানকে সংগ্রহ করতে হত মার্কিন যুক্তরাস্ট্র, বৃটেন ও বৃটেনের উপনিবেশগুলো থেকে। সুতরাং জাপানের বরাবরের একটা প্রচেষ্টা ছিল পূর্ব এশিয়ার কিছু দেশ দখল করে সেখান থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করবার।

জাপানে সরকার চলত একজন নিয়মতান্ত্রিক সম্রাটের অধীনে। কিন্তু সম্রাটকে সামনে রেখে বড় বড় কিছু ব্যবসায়ী গোষ্ঠী তাদের পছন্দমত সরকার গঠন করে দেশের নীতি নির্ধারিত করে দিত। এরকম দুই পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ছিল মিৎসুই এবং মিৎসুবিসি। আবার দুই বিবাদমান রাজনৈতিক দল সিজুকাই এবং মিনসিটো ছিল যথাক্রমে মিৎসুই আর মিৎসুবিসির প্রতিনিধি। এই দুটো দলকে সরকারে বসিয়ে ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলো নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে কাজ করিয়ে নিত। এভাবেই জাপানে 'গণতন্ত্র' রক্ষিত হত। কিন্তু এতে সংকটের নিরসন হল না। বিশেষতঃ বিশ্বব্যাপী মন্দার বাজারে জাপানের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠল। জনসাধারণ এই তথাকথিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ল। এর প্রভাব পড়ল দুভাবে। একদিকে যেমন দেশে কমিউনিস্ট ভাবধারা প্রাধান্য পেতে লাগল, অন্যদিকে একটা সামরিক গোষ্ঠী অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে উঠল। এই সামরিক গোষ্ঠীর লক্ষ্য হল জাপানের পাশ্ববর্তী দেশগুলোর জমি দখল করে সাম্রাজ্য বাড়িয়ে সংকট থেকে পরিত্রাণ পাওয়া। কমিউনিজমের 'বিপজ্জনক চিন্তাধারা' থেকে রক্ষা পেতে সিজুকাই এবং মিনসিটো দুটো দলই আর্মিকে সমর্থন করল। ১৯২৮ সালে 'ব্যক্তিগত সম্পত্তির' বিরুদ্ধে কোনরকম আঘাতকে মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য অপরাধ বলে আইন পাশ করা হল। এরপর বহু বামপন্থী অধ্যাপক, সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীকে গ্রেপ্তার কিংবা হত্যা করা হল। প্রকৃতপক্ষে সেখানে কমিউনিস্ট আন্দোলনকে গোড়াতেই নির্মূল করা হয়েছিল।

এতেও শিল্পগোষ্ঠীদের এজেন্ট রাজনৈতিক দলগুলো এবং আর্মির মধ্যেকার দ্বন্দ্ব থেমে থাকল না। এরই ফলশ্রুতিতে জাপানী রাজনীতিতে ডামাডোল লেগেই চলল। রাজনৈতিক গুপ্তহত্যা চলতে থাকে অবাধে। অন্যান্য মন্ত্রীদের তো কথাই নেই, ১৯১৮ থেকে ১৯৩৬——এই আঠারো বছরে নয় নয় করে ছয়জন জাপানী প্রধানমন্ত্রীকে খুন হতে হল। শেষ পর্যন্ত এ লড়াইয়ে সামরিক গোষ্ঠী জয়লাভ করল। মনে রাখতে হবে যে সেদিনকার সেই ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের যুগে ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এবং সামরিক বাহিনীর সাথে দ্বন্দ্ব কোন স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না। আজকের এই অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের যুগে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর অভ্যন্তরে এ লড়াই সীমিত হয়ে গিয়েছে।

সামরিক গোষ্ঠীর শাসনাধীন জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেই চীনের একটা বিশাল অংশ দখল করে নেয়। শুধু দখল নয়, সেখানে জাপ-বাহিনী নামিয়ে আনল বীভৎস গণহত্যা, বলাৎকার, উৎপীড়ন। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এই জাপানী আগ্রাসন ও অত্যাচারের বিরোধিতা করেছিল। বিশ্বের জনমত ছিল জাপানের বিরুদ্ধে। চীনের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ থাকার দরুন সেও জাপানের প্রতি চাপ সৃষ্টি করতে থাকল। কিন্তু জাপানের উদ্দেশ্য ছিল আমেরিকাকে না চটিয়ে যতটা সম্ভব নিজের এলাকা বাড়িয়ে নেওয়া।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান অক্ষশক্তির একটা শরিক হলেও হিটলারের উদ্দেশ্যের

সাথে তাদের উদ্দেশ্যের মিল ছিল না। হিটলার চেয়েছিলেন এক 'নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থা'র অধীনে গোটা দুনিয়ার উপর 'শ্রেষ্ঠ জাতি' জার্মানির প্রভুত্ব। সেখানে জাপানের উদ্দেশ্য ছিল তার নিজস্ব অঞ্চল সম্প্রসারণের জন্যে 'সম উন্নতি অঞ্চল পরিকল্পনা'। ১৯৪০ এর জুলাই মাসে জাপান সরকার এক সিদ্ধান্ত নেয় যে ইউরোপে জার্মানি যেসব দেশ দখল করেছে অর্থাৎ ফ্রান্স, হল্যান্ড প্রমুখ দেশের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যে উপনিবেশগুলো আছে তা সে নিয়ে নেবে। চীন, মালয়, হংকং, শ্যাম, সিঙ্গাপুর থেকে বৃটিশকে হটিয়ে দখল করে নেবে। অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ফিজি, এগুলোও জাপান দখল করে নেবে। মোদ্দা কথা, পূর্ব এশিয়া এবং ওশেনিয়ার এক মস্ত ভূভাগ জাপানের দখলে থাকবে। মজার ব্যাপার হল, সুভাষচন্দ্র যখন জার্মানিতে ছিলেন তখন তিনি হিটলারের 'নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থা'কে সমর্থন করেছিলেন। আবার যখন জাপানে এলেন তখন তিনি 'সম উন্নতি অঞ্চল'কে পূর্ণ সমর্থন জানালেন। যাইহোক জাপান তার এই সাম্রাজ্যবাদী কর্মসূচী রূপায়ণ করতে চাইল যতটা সম্ভব আমেরিকার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে না গিয়ে।

কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ জড়িত ছিল। তাই জাপান যখন পরিকল্পনামত ইন্দোচীনের দক্ষিণভাগ দখল করে নিল তখন সে চুপ করে থাকতে পারল না। আমেরিকা, বৃটেন একযোগে জাপানের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ জারি করল। শুধু তাই নয় অমেরিকার ব্যাঙ্কে জাপানের গচ্ছিত টাকা আর সম্পদ আটকে দেওয়া হল। তার উপর জাপানের শিল্প ছিল মূলত বৃটিশ ও আমেরিকার কাঁচামালের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং জাপানের সঙ্কট ঘনিয়ে এল। এই সঙ্কট থেকে মুক্ত হতে জাপান দুটো ব্যবস্থা নিল। একদিকে আমেরিকার সাথে একটা সমঝোতায় আসতে আলোচনা চালাতে লাগল, অন্যদিকে জোর যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করে দিল। এক্ষেত্রে জাপানের লক্ষ্য ছিল খনিজ এবং পেট্রোলিয়াম সমৃদ্ধ ইন্দোনেশিয়ার দিকে। দীর্ঘ নয় মাস ধরে আলোচনা চলেও কোন সুরাহা হল না। জাপান আর আমেরিকার মধ্যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল। আর আমেরিকার সাথে যুদ্ধ করতে যাবার আগে জাপান এমন একটা কাজ করল যাতে আন্তর্জাতিক মহল বিস্মিত হয়ে গেল।

জাপান একেবারে গোড়া থেকেই সোভিয়েত রাশিয়া বিরোধী। লেনিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত রাশিয়া প্রতিষ্ঠার শুরুতেই সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো তাকে ধ্বংস করতে সেনাবাহিনী পাঠিয়েছিল। সেই সদ্য প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স প্রত্যেকেই সাত হাজার করে সৈন্য পাঠায়। আর জাপান একাই পাঠায় সত্তর হাজার সেনা। এর পর থেকে সোভিয়েত সরকারকে উৎখাত করার এবং তার জমি দখল করার চেষ্টায় জাপান কখনও থামতি দেয় নি। ১৯৩৬ এর ডিসেম্বরে জার্মান, ইতালি, জাপান মিলে কমিউনটার্ন বিরোধী চুক্তি করে। সোভিয়েত সীমান্তে অস্থিরতা সৃষ্টি করার জন্যে সব সময়েই উপস্থিত থাকত কয়েক ডিভিসন জাপানী সৈন্য। কিন্তু আমেরিকা, বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করতে গিয়ে জাপান দুটো ফ্রন্টে যুদ্ধ করা বুদ্ধিমানের কাজ মনে করল না। সে চাইল সোভিয়েত রাশিয়ার সাথে অনাক্রমণ চুক্তি করতে। অন্যদিকে সোভিয়েত রাশিয়া তখন জার্মানির দ্বারা আক্রান্ত। তাদের কছে সুনির্দিষ্ট খবর ছিল যে পূর্ব সীমান্তে রাশিয়াকে আক্রমণ করার জন্যে জাপানকে জার্মানি চাপ দিয়ে চলেছে। পূর্বে ও পশ্চিমে দুই ফ্রন্টে লড়াই করতে সোভিয়েত রাশিয়াও রাজী ছিল না। সুতরাং রুশ-জাপান অনাক্রমণ চুক্তি হল। কিন্তু জাপানের পরিকল্পনা ছিল আরও সুদূর-প্রসারী। আর সেই পরিকল্পনার হদিস পেলেই পাওয়া যাবে ভারত সম্পর্কে জাপানের প্রকৃত মনোভাব।

ভারত সম্পর্কে জাপানের অনাগ্রহ

আগ্রাসী জাপানের 'সম উন্নতি অঞ্চল' পরিকল্পনায় তারা অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং এশিয়ার একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চল দখলের সিদ্ধান্ত নিলেও ভারত সম্পর্কে নিস্পৃহতা আশ্চর্যজনক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানী পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কখনই তারা ভারত আক্রমণ করার কথা ভাবে নি। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে বিশ্বজয় সম্পর্কে হিটলারের চিন্তার সাথে জাপানের চিন্তার বিস্তর অমিল ছিল। হিটলারের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল 'বর্বর' বলশেভিকদের ধ্বংস করা। আর জাপান ঘোর বলশেভিক বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও বৃটেন আর আমেরিকার কাছ থেকে সাম্রাজ্য কেড়ে নেওয়ার যুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়াকে পাশে পেতে চেয়েছিল। ১৯৪০ এর পয়লা আগস্ট জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়াসুকুমাৎসুকু জার্মান, ইতালি, রাশিয়া এবং জাপান এই চার দেশ নিয়ে অক্ষশক্তি তৈরীর প্রস্তাব জার্মানি এবং রাশিয়াকে দেন। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়া রাজী হয় নি। সোভিয়েত রাশিয়াকে রাজী করানো জাপানের খুব দরকার ছিল। কারণ. এশিয়ার যে বিরাট অঞ্চল নিয়ে জাপান তার সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখত সোভিয়েত রাশিয়ার অমতে তা তার পক্ষে হাসিল করা সম্ভব ছিল না। তাই জাপান সোভিয়েত রাশিয়াকে দিয়েছিল একটা বড় টোপ——ভারত এবং ইরান, আফগানিস্হান দখলে নেবার টোপ। জাপানের আশা ছিল রাশিয়া তার এই প্রস্তাব মেনে নেবে এবং জাপানও মনের সুখে তার সাম্রাজ্য ভোগদখল করতে পারবে। এমন কি জার্মানি রাশিয়াকে আক্রমণ করবার চারমাস পরও জাপান হিটলারকে রাশিয়ার সাথে একটা মিটমাট করে নিতে অনুরোধ করেছিল। ১৯৪০ সালের ১৩ নভেম্বর সোভিয়েত রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী মলোটভ যখন জার্মান বিদেশমন্ত্রী রিবেনট্রপের দেওয়া নৈশভোজে মিলিত হয়েছিলেন তখন রিবেনট্রপ ২৭ সেপ্টেম্বর সই করা জার্মান, ইতালি, জাপানের ত্রিপক্ষীয় চুক্তিটি পড়ে শুনিয়েছিলেন। তাতে ছিল ঐ ত্রিশক্তিতে সোভিয়েত রাশিয়াকে অন্তর্ভূক্ত করে চতুঃশক্তি বানাবার খসড়া প্রস্তাব। সেই প্রস্তাবের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে ছিল সারা বিশ্বজয়ের পর পৃথিবীটাকে কিভাবে ভাগ বাঁটোয়ারা করা হবে তার পরিকল্পনা। পরিকল্পনাটা এরকম——

জার্মানি ঘোষণা করছে——যুদ্ধের পর শান্তির প্রয়োজনে ইউরোপীয় রাষ্ট্র গুলি ভেঙ্গে পুনর্বন্টন করা হবে এবং জার্মানির ভূমি আকাঙ্খা মেটাবে মধ্য আফ্রিকার রাষ্ট্র গুলি।

ইতালি ঘোষণা করছে——ইউরোপীয় রাজ্যগুলির পুনর্বন্টন এবং তার ভূমিতৃষ্ণা মেটাবে উত্তর এবং উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলি।

জাপান ঘোষণা করছে——তার ভূমিগত আকাঙ্খা পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি এবং জাপানের দক্ষিণ দিকের অঞ্চল।

সোভিয়েত রাশিয়া ঘোষণা করছে——তার ভূমিগত আকাঙ্খা তার দক্ষিণ দিকের অঞ্চলে ভারত মহাসাগর অভিমুখে (অর্থাৎ ভারতীয় উপমহাদেশ)।

এইসব দলিলাদি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় জাপান কেন ভারত আক্রমণে রাজী ছিল না। সোভিয়েত.রাশিয়া উপরোক্ত প্রস্তাবে রাজী না হলেও জাপান ভারত দখল করতে উৎসাহী ছিল না। তার প্রধান কারণ প্রায় ৪০ কোটি জনসংখ্যার সুবিশাল দেশকে দখলে রাখার ক্ষমতা তার ছিল না। চীন আক্রমণ করে সে বুঝতে পেরেছিল এরকম কাজটা কত কঠিন। তার উপর ভারতবর্ষের সবকটা রাজনৈতিক দল ছিল জাপানের প্রতি বিরূপ। ১৯৪২ এর ২৯ জানুয়ারী জার্মান রাষ্ট্রদূত ইউজিন ওট্রো তার সরকারকে জানিয়েছিলেন যে জাপান মনে করছে যে ভারত শাসন করা তাদের পক্ষে অসম্ভব। (*জার্মান পররাষ্ট্র*

দপ্তরের ফাইল, 4758 HE / 234099-103, OTT No. 245)। সেইজন্য জাপান ঘোষণা করল যে ভারতের উপর তার কোন ভূমিগত আকাঙ্খা নেই। কিন্তু জাপান যে কোনদিন ভারত আক্রমণ করবে না তা তারা সুভাষকে কখনও বুঝতে দেয় নি। আর সুভাষচন্দ্র ভেবেছেন জাপানের সহযোগিতা নিয়ে একদিন তার সেনাবাহিনী দিল্লী পৌঁছে যাবে। সুভাষের সাথে এই জাপানী প্রতারণার স্বরূপ আমরা ধীরে ধীরে উন্মোচিত করব।

সকল যুদ্ধ-বিশারদ এমনকি আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাপতিরা পর্যন্ত স্বীকার করেছেন যে জাপানের যদি ইচ্ছা থাকত তাহলে ১৯৪২ এর এপ্রিল-মে মাস নাগাদই আসাম-বাংলা সহ পুরো পূর্বভারতই দখল করে নিতে পারত। লে. কর্ণেল এ সি চ্যাটার্জ্জী ছিলেন সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ সরকারের অর্থমন্ত্রী। তিনি লিখেছেন——"১৯৪২ এর মাঝামাঝি নাগাদ পূর্বভারতে প্রতিরক্ষা অত্যন্ত দুর্বল ছিল। ভারতীয় বাহিনী আসামে ছিল এক ডিভিশন, চট্টগ্রামে ছিল একটা দুর্বল ব্রিগেড, বাংলায় দুই ডিভিশন সৈন্যও পুরো ছিল না। ....জাপানীরা ভারত অভিযানে আদৌ উৎসাহী ছিল না। তা যদি থাকত তাহলে INA গঠন হওয়ার আগেই তারা ভারতে দখল নিতে পারত।" *(ইন্ডিয়াস্ স্ট্রাগল ফর ফ্রীডম)*

সহজেই প্রশ্ন করা যায়, কিন্তু তবু তো জাপানী বাহিনী ইম্ফল হয়ে কোহিমা পর্যন্ত অভিযান চালিয়েছিল। কিন্তু কেন ছিল সেই অভিযান, তার মূল উদ্দেশ্যটা কি, সেই প্রসঙ্গে পরে যাচ্ছি।

আজাদ হিন্দের গড়ে উঠবার কাহিনী

মালয়, শ্যাম, সিঙ্গাপুর, বর্মা, প্রমুখ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো জাপানী আক্রমণের আগে ছিল বৃটিশ দখলে। ঐ সব দেশগুলোতে একটা বড় সংখ্যায় ভারতীয়রা বসবাস করত। এইসব ভারতীয়রা ভারতের স্বাধীনতা চাইলেও তার জন্যে বড় রকমের কোন পদক্ষেপ নিয়ে উঠতে পারে নি। মালয়ে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ভারতীয় থাকায় সেখানে গড়ে উঠেছিল 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ'। এই লীগের শাখা ধীরে ধীরে ঐ অঞ্চলের নানা দেশে সম্প্রসারিত করা হয়। সাধারণভাবে ভারতীয়দের সুযোগ-সুবিধা দেখাই ছিল লীগের প্রধানতম কাজ। কিন্তু জাপান একে একে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো দখল করবার পর লীগের কাজে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা দিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন গতিশীল হয়ে উঠল। এই লীগের নীতি ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুক্তি আন্দোলনকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের পরিপূরক হিসাবে প্রতিস্থাপিত করা। ভারতীয় কংগ্রেসের নেতাদেরই তারা নিজেদের নেতা বলে মনে করত।

এই 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ'- এর জাপান শাখার সভাপতি ছিলেন রাসবিহারী বসু। তিনি ভারতে থাকাকালীন সন্ত্রাসবাদী দলে যুক্ত ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে তিনি বিদ্রোহ সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেন এবং ব্যর্থ হন। গ্রেপ্তার এড়াতে জাপানে পালিয়ে আসেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জাপান মিত্রবাহিনীর অন্যতম শক্তি ছিল। সুতরাং বৃটিশ শাসকেরা রাসবিহারীকে তাদের হাতে তুলে দেবার জন্যে চাপ দিতে থাকল। কিন্তু রাসবিহারী আশ্রয় নিয়েছিলেন জাপানের চরম দক্ষিণপন্থী দল ব্ল্যাক ড্রাগনের প্রভাবশালী নেতা তোয়ামার কাছে। সেইজন্যে জাপান সরকার তাকে ছুঁতে পারল না। এরপর রাসবিহারী বিয়ে করলেন ঐ ব্ল্যাক ড্রাগন দলেরই এক কর্মকর্তার মেয়েকে এবং জাপানী নাগরিকত্ব নিলেন। সে সময়ে জাপানে ভারতীয়ের সংখ্যা সাকুল্যে এক হাজারও ছিল না। তবুও জাপান সরকার লীগের নেতাদের মধ্যে রা
সবচেয়ে বেশি পছন্দ করত।

জাপান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া দখল করে দেখল সেখানে বিপুল সংখ্যক ভারতীয় বাস করে। ১৯৪১ সাল নাগাদ ঐ অঞ্চলে প্রায় ২০ লক্ষের মত ভারতীয় বসবাস করত। (সুভাষচন্দ্র তার বক্তৃতায় বারবার বলেছেন যে এই অঞ্চলে ৩০ লক্ষ ভারতীয় বাস করে। এ হিসাব অতিরঞ্জিত ছিল)। ভারতীয়দের মধ্যে মালয়ে ছিল প্রায় আট লক্ষ, বার্মায় আট লক্ষ, শ্যামে এক লক্ষের কিছু কম। এই ভারতীয়দের বেশিরভাগের মনোভাবই বৃটিশ-বিরোধী। সুতরাং এইসব ভারতীয়দের কাজে লাগানোর কথা জাপ-কর্তৃপক্ষ চিন্তা করল। আবার এই অঞ্চলে বৃটেনের যে সৈন্যবাহিনী যুদ্ধ করত তার বেশিরভাগই ছিল ভারতীয় সেনা। এই সেনাবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ এবং অসন্তোষ ছড়ানোর জন্যে জাপান একটা দপ্তর খুলল। এই দপ্তরের প্রধান করা হল সামরিক গুপ্তচরবৃত্তিতে দক্ষ এক অফিসার ইওচি ফুজিয়ারাকে। তারই নাম অনুসারে দপ্তরের নাম রাখা হল ফুজিয়ারা কিকান। এই দপ্তরের কাজ হল ভারতীয় বাহিনীর মধ্যে গুপ্তচরবৃত্তি করা এবং অসামরিক ভারতীয়দের সাথে যোগাযোগ রাখা। জনা কুড়ি গুপ্তচর নিয়ে দপ্তরটা কাজ শুরু করে দিল।

মালয়ে 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ' -এর নেতা ছিলেন জ্ঞানী প্রীতম সিং। তিনি ফুজিয়ারার সাথে যুদ্ধ শুরুর আগেই দেখা করে একটা আলোচনা করলেন। সেই আলোচনা অনুযায়ী ১৯৪১ এর ৪ ডিসেম্বর তাঁরা একটা সিদ্ধান্তে এলেন। ঠিক হল, ভারতের স্বাধীনতার জন্যে লীগের লড়াইতে জাপান সাহায্য করবে। এর জন্যে জাপান ভারতের কাছে কোন অর্থ, অঞ্চল, সামরিক সাহায্য ইত্যাদি দাবী করবে না। জরুরী অবস্থা ছাড়া লীগ স্বাধীনভাবে কাজ করবে। এই আলোচনাতেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে যুদ্ধবন্দী ভারতীয় সেনা এবং মালয়ের যুবকদের নিয়ে একটা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলা হবে। *(ই ফুজিয়ারা—ফুজিয়ারা কিকান)*। এই বৈঠকটিই ছিল 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' গঠনের সূচনা। (এই সময় বাহিনীর নাম ছিল ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি বা আই এন এ। সুভাষচন্দ্র পরে এর নাম পাল্টে রাখেন 'আজাদ হিন্দ ফৌজ'। আমরা বুঝবার সুবিধার্থে একে 'আজাদ হিন্দ ফৌজ'ই বলব)।

এরপর প্রীতম সিং লেগে গেলেন সৈন্য সংগ্রহের কাজে। জাপানের হাতে যুদ্ধবন্দী ভারতীয় সৈন্যদের বোঝাতে লাগলেন স্বদেশকে মুক্ত করবার কথা, বৃটিশের অত্যাচারের কথা। এরকমই একটা সভায় ১৯৪২ এর পয়লা জানুয়ারী প্রীতম সিং মিলিত হলেন ভারতীয় বাহিনীর ১৪ নম্বর পাঞ্জাব রেজিমেন্টের প্রথম ব্যাটেলিয়ানের ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর সাথে। দীর্ঘ আলোচনার পর মোহন সিং রাজী হলেন আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিতে। এরপর মোহন সিং এবং প্রীতম সিং একত্রে প্রচেষ্টা চালালেন তাদের নতুন বাহিনী গড়ে তুলতে।

প্রীতম সিং ছিলেন একজন অসামরিক ব্যক্তি। বস্তুতপক্ষে তিনি রাজনীতির লোকও নন। অন্যদিকে মোহন সিং ছিলেন একজন সামরিক অফিসার। একেবারে সাধারণ জওয়ান থেকে পদোন্নতির ফলে উঠে আসার দরুন সাধারণ সেনাদের মনোভাবও ছিল তার জানা। ফলে যুদ্ধবন্দী ভারতীয় সৈন্যদের কাছে মোহন সিং-এর আবেদন খুব কার্যকরী হতে থাকল। আজাদ হিন্দে সৈন্য সংখ্যা বেড়ে প্রায় সতেরো হাজারের মত দাঁড়াল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে তোলার পিছনে সবচেয়ে বেশি অবদান প্রীতম সিং এবং মোহন সিং-এর। অথচ প্রতিদানে প্রীতম সিং-এর জুটেছিল মৃত্যু আর মোহন সিং-এর কারাবাস। স্বাধীন ভারতের মানুষকে জানানো হয় যে আজাদ হিন্দ ফৌজ তৈরী করেছিলেন রাসবিহারী বসু এবং পরে সংগঠিত করেছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। ভারতে ইতিহাস বিকৃতির এ এক জ্বলন্ত নিদর্শন।

এদিকে যেমন লীগের কাজ চলছে এবং সেনাবাহিনী তৈরী হচ্ছে, কিন্তু এসবের নেতা হবে কে? জাপ-কর্তৃপক্ষ অন্য কাউকে বিশ্বাস করতে পারল না। ১৯৪২ এর ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে টোকিও রেডিও এবং খবরের কাগজ মারফৎ প্রচার করা হল যে রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ স্থাপন করা হয়েছে। এর সদর দপ্তর স্থাপন করা হয়েছে টোকিওর সান্নো হোটেলের ৩০২ নম্বর ঘরে। পুরো ব্যাপারটার জন্য কোন গণতান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় নি। জাপানি জেনারেল সুগিয়ামো এবং রাসবিহারীর মধ্যেকার আলোচনার ফলশ্রুতি এই ঘোষণা।

১৯৪২ এর ২৮ মার্চ লীগের কনফারেন্সের দিন ধার্য হল টোকিও-র সান্নো হোটেলে। এখানেই লীগের সভাপতি ও কর্মকর্তা নির্বাচিত হবে। কিন্তু জাপান তাদের বিশ্বস্ত রাসবিহারীকেই নেতা হিসাবে চায়। সে সময়ে রাসবিহারী বসুর সহকারী এ এম নায়ার তার স্মৃতিকথায় লিখেছেন——

রাসবিহারী এবং আমার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দেখাসাক্ষাৎ ও আলোচনাগুলির মধ্যে একবার তিনি স্থির করলেন যে, তিনিই লিগের ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট হবেন এবং প্রস্তাবিত টোকিও সম্মেলনের চেয়ারম্যান হবেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে একজন কো-ফাউন্ডার বা সহযোগী প্রেসিডেন্ট এবং তাঁর একজন বিকল্প থাকা দরকার, যিনি তাঁর দায়িত্ব নেবেন জরুরী কোন প্রয়োজনে। তিনি স্থির করলেন যে, আমিই এই দুই পদের বিকল্প দায়িত্ব নেবো যখনই এরকম কোনো প্রয়োজন দেখা দেবে। *(এ এম নায়ার——এ্যান ইন্ডিয়ান ফ্রিডম ফাইটার ইন জাপান)*

কি সুন্দর নেতা উপ-নেতার পদ ভাগাভাগি হয়ে গেল! কিন্তু কনফারেন্সে যদি রাসবিহারী বসুকে সভাপতি বলে না মেনে নেওয়া হয়? তার ব্যবস্থাও হয়ে গেল। টোকিও সম্মেলনে উপস্থিত ১৮ জন প্রতিনিধির মধ্যে ৯ জনই ছিল জাপানের। বুঝে দেখুন, এক হাজার ভারতীয় বসবাস করে যে জাপানে তার প্রতিনিধি ৯ জন, আবার অবশিষ্ট দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ২০ লক্ষ ভারতীয়দের প্রতিনিধিও ৯ জন। আবার এই প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হয়েছে কিভাবে! নায়ারের কথায়——"প্রস্তাবিত টোকিও কনফারেন্সের জন্যে, টোকিওবাসী ভারতীয়রা স্থির করলেন যে, মালয়বাসী ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করবেন——-"*(এ্যান ইন্ডিয়ান ফ্রিডম ফাইটার ইন জাপান)*। অর্থাৎ মালয় থেকে কে কে লীগের প্রতিনিধিত্ব করবেন তা ঠিক করে দিল টোকিওবাসী ভারতীয়রা (ব-কলমে রাসবিহারী)। এতই যেখানে আঁটঘাট বেঁধে নামা সেখানে ফল যা হবার তাই হল। রাসবিহারী বসুই লীগের প্রেসিডেন্ট হলেন।

এই টোকিও সম্মেলনের প্রাক্কালে এক ভয়াবহ ঘটনা ঘটল। সম্মেলনে যোগ দেবার জন্যে বিমানে টোকিও আসছিলেন প্রীতম সিং, সত্যানন্দ পুরী এবং আরও দুজন। পথে বিমানটি দুর্ঘটনায় পড়ে এবং সকলেই প্রাণ হারান। বিস্ময়ের কথা এই যে তাদের মৃতদেহ তো পাওয়া গেলই না, উপরন্ত বিমানের ধ্বংসাবশেষও খুঁজে পাওয়া গেল না। এই সত্যানন্দ পুরী ছিলেন ভারতে বৃটিশ শাসন অবসানের সংগ্রামী, কিন্তু জাপানের 'সম উন্নতি অঞ্চল' পরিকল্পনার বিরোধী। তিনি রাসবিহারী বসুকে মনে করতেন সাম্রাজ্যবাদী জাপানের বশংবদ এবং তার নেতৃত্ব মানতে রাজী ছিলেন না। অন্যদিকে প্রীতম সিং ছিলেন আজাদ হিন্দ ফৌজ-এ কোনরকম জাপানী হস্তক্ষেপের বিরোধী এবং তিনি জাপানের কাছ থেকে নিঃশর্ত সাহায্যের চুক্তি আদায় করতে সফল হয়েছিলেন। এদের দুজনের মৃত্যুতে রাসবিহারী নিষ্কণ্টক হলেন এবং সবকিছুই জাপান সরকারের ইচ্ছাধীন চলতে লাগল। এইভাবেই আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিষ্ঠাতা প্রীতম সিং-কে ইতিহাসের পাতা থেকে ছেঁটে

ফেলা হল। মজার কথা, স্বাধীন ভারতেও এই বিমান দুর্ঘটনা নিয়ে কোন উচ্চবাচ্য করা হয় না।

কিন্তু এত করেও প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরগুলোকে থামানো গেল না। রাসবিহারীর উপর ক্ষুব্ধ তিন মালয়ী প্রতিনিধি কে পি কে মেনন, এস সি গুহ এবং এন রাঘবন ২৫ এপ্রিল ১৯৪২ 'নিখিল মালয় স্বাধীনতা লীগ' স্থাপন করলেন। মূলত তাদেরই চেষ্টায় ১৫ জুন ব্যাঙ্ককে এক সম্মেলন হল। সুভাষচন্দ্র জার্মানি থেকে এই সম্মেলনে তার বক্তব্য পাঠালেন। এখানে রাসবিহারীর উপর আস্থাহীন প্রতিনিধিরা সুভাষচন্দ্রকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এসে লীগের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে আহ্বান জানালেন। ব্যাঙ্কক কনফারেন্সে যে ৩৫ টি প্রস্তাব পাশ হল, সেগুলিও ছিল বেশ স্বাধীনচেতা। রাসবিহারী বসুর উপর ভার দেওয়া হল সেই প্রস্তাবগুলিতে জাপান সরকারের অনুমোদন আদায় করার জন্যে। কিন্তু তিনি তা আদায় করতে পারলেন না অথবা জাপানীদের সাথে যোগসাজশে প্রস্তাবগুলিকে ঝুলিয়ে রাখলেন।

ইতিমধ্যে জাপান তার ফুজিয়ারা কিকান গুটিয়ে ফেলে নতুন দপ্তর করেছে ইয়াকুরো কিকান। অফিসারের নামে অফিস চালালে তার সুবিধা, অফিসার পাল্টালেই আগের চুক্তিগুলো বাতিল করা যায়। জাপান ভারতীয়দের সাথে এই প্রতারণাই করছিল। আগেই প্রীতম সিং-এর মৃত্যু হয়েছে, এখন ফুজিয়ারা না থাকাতে প্রীতম সিং-ফুজিয়ারা চুক্তিকেও তামাদি করে দেওয়া হল। আজাদ হিন্দ ফৌজকে জাপানী সামরিক কাছে ইচ্ছেমত লাগানো হতে থাকল। মোহন সিং চুপ করে থাকতে পারলেন না। তিনি সাধ্যমত বাধা দিতে থাকলেন। কিন্তু তার সাথে জাপান সরকার এবং রাসবিহারী বসুর দূরত্ব ক্রমশই বাড়ছিল। ১৬ হাজার ৩০০ সৈন্যের প্রথম ডিভিশন তৈরী হওয়ার পর মোহন সিং-এর ইচ্ছা ছিল দ্বিতীয় ডিভিশনটি তৈরী করার। তিনি জাপানী কর্তৃপক্ষকে বলেছিলেন যে তার লক্ষ্য আড়াই থেকে পাঁচ লক্ষের এক সেনাবাহিনী তৈরী করা। কিন্তু জাপানী কর্তৃপক্ষ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তাদের নিজেদের বাহিনীর চেয়ে INA কে বড় করতে দিতে কখনই রাজী ছিল না। এটা তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকরও বটে।

১৯৪২ এর পয়লা ডিসেম্বর লীগের কর্মপরিষদ এবং ইয়াকুরো কিকানের মধ্যে এক বৈঠক হল। বৈঠকে ইয়াকুরো পরিষ্কার জানালেন যে ব্যাঙ্কক সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলি মেনে নেবার কোনও রকম বাধ্যবাধকতা জাপানের নেই। এমন কি এক জাপানি অফিসার গলা চড়িয়ে বলল——"তোমরা আমাদের হাতের পুতুল হবে, এটা আমরা চাই না। কিন্তু আমরা যদি সেটা চাই তবে ক্ষতিটা কোথায়? কারো হাতের পুতুল হওয়াটা কি খারাপ?" মোহন সিং নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না। তিনি ইয়াকুরোকে বললেন——"আমাদের আশঙ্কা যে তোমরা মালয়, চীন, মাঞ্চুরিয়া দখল করে যা করছ, ভারতের বেলাতেও সেই একই কাজ করবে। তোমরা ভারতে ঐ রকম কাজ করবে না——এই প্রতিশ্রুতি না দিলে আমরা তোমাদের সাথে কোন কাজ করব না।"

১ এবং ২ ডিসেম্বর ইয়াকুরোর সাথে বৈঠকের ব্যর্থতার পর লীগের কর্ম পরিষদ ৫ ডিসেম্বর বৈঠকে বসল। সেখানে রাসবিহারী বসুর আপত্তি সত্ত্বেও কর্মপরিষদ সিদ্ধান্ত নিল যে যতদিন পর্যন্ত জাপান সরকার ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে প্রকাশ্যে ঘোষণা না করছে, আজাদ হিন্দ ফৌজ যুদ্ধ করতে বর্মায় যাবে না। কিন্তু জাপানীরা সে ঘোষণা তো করলই না উল্টে আজাদ হিন্দ ফৌজে মোহন সিং-এর সহকারী লে. কর্ণেল এন এস গিলকে গ্রেপ্তার করল। ক্ষুব্ধ মোহন সিং, কে পি কে মেনন, এন রাঘবন জানালেন যে জাপান যদি ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে ঘোষণা ১৯৪৩ এর পয়লা জানুয়ারীর মধ্যে না করে তবে তারা পদত্যাগ করবেন। পরে অবশ্য জাপানী চাপে রাঘবন এ ঘোষণা থেকে

নিজের নাম প্রত্যাহার করে নেন। কিন্তু নির্ধারিত দিনের আগেই ২৯ ডিসেম্বর ১৯৪২ একটা মিটিং-এর কথা বলে মোহন সিং-কে ইয়াকুরোর বাসায় ডাকানো হল। সেখানে রাসবিহারী বসু তাকে জেলে পাঠানোর হুকুম শোনালেন। মোহন সিং-কে জাপানী জেলে পাঠানো হল।

মোহন সিং বিপ্লবী ছিলেন না। তিনি কোন বিপ্লবী বাহিনীও গড়ে তোলেন নি। তার বাহিনীতে ঢোকানোর জন্যে অনেক সময় তিনি বন্দীদের প্রতি অবিচারও করেছেন। কিন্তু একথা মানতেই হবে যে আজাদ হিন্দ বাহিনী গড়ে উঠেছিল তারই অক্লান্ত প্রচেষ্টায়। কিন্তু না রাসবিহারী, না সুভাষচন্দ্র——কেউ-ই তাকে তার যোগ্য মর্যাদা দেন নি। আজাদ হিন্দের প্রতি মোহন সিং তার শেষ কর্তব্য করেছিলেন অনেক পরে, দিল্লীর লালকেল্লায়। সে কথা পরে হবে।

মোহন সিং-এর গ্রেপ্তারের পর আজাদ হিন্দ ফৌজ ছন্নছাড়া হয়ে গেল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়রা একান্তভাবে সুভাষচন্দ্রকে নেতৃত্বে চাইতে লাগল। তারই মধ্যে রাসবিহারী বসু ফৌজকে খানিকটা সংহত করলেন। এ কাজে তাকে পূর্ণ সহযোগিতা করল জাপানীরা। খানিকটা গুছিয়ে ওঠার পর ১৯৪৩-এর এপ্রিল মাসে সিঙ্গাপুরে লীগের এক প্রতিনিধি সম্মেলন ডাকা হল সিঙ্গাপুরে। সেখানে ব্যাঙ্কক সম্মেলনের গৃহীত প্রস্তাবগুলো বাতিল করা হল। জাপানীরা যাতে সম্মত হবে এমন সব প্রস্তাব গ্রহণ করা হল। রাসবিহারী বসুর হাতে লীগের সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করা হল। সমস্ত বিরোধী কন্ঠকে চুপ করিয়ে দেওয়া হল এই বলে যে, শীঘ্রই সুভাষ বসু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আসছেন। তিনি এসে যা ভালো মনে হয় তা করবেন। ভারতীয়রা সুভাষচন্দ্রের আসার আকাঙ্খায় গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকলেন।

আজাদ হিন্দের নেতৃত্ব গ্রহণ

সুভাষচন্দ্রকে জাপানে পাঠানোর পরিকল্পনা হিটলার অনেকটা আগেই নিয়েছিলেন। ১৯৪২ এর ২ জানুয়ারী জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেনট্রপ জাপানী রাষ্ট্রদূত ওশিমাকে এই প্রস্তাব দিয়েছিলেন। অক্ষশক্তির মধ্যেকার সংযোগ রক্ষাকারী কমিটি ১৭ এপ্রিল সুভাষকে জাপানে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু জাপান গড়িমসি করে কালহরণ করছিল। কারণ, তাদের মনোমত লোক রাসবিহারী বসুকে তারা পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অন্যান্য ভারতীয়দের কাছে রাসবিহারী গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় জাপান সুভাষচন্দ্রের কথা ভাবতে বাধ্য হল। বিশেষতঃ মোহন সিং-এর গ্রেপ্তারের পর আজাদ হিন্দ বাহিনীকে জোড়া লাগাতে সুভাষচন্দ্র ছাড়া কোন পথ ছিল না। বস্তুতপক্ষে রাসবিহারী যে বাহিনীকে এক রাখতে পারছিলেন তা ঐ সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বের আশ্বাস দিয়েই।

১৯৪৩ এর ৮ ফেব্রুয়ারী সুভাষচন্দ্র জার্মানির কিউল থেকে U 180 ডুবোজাহাজে চাপলেন। জাপান অধিকৃত সুমাত্রার সবং দ্বীপে নামলেন ৬ মে। দীর্ঘ তিন মাসের এই ডুবোজাহাজ যাত্রা ছিল যথেষ্ট বিপদ সংকুল। এর মধ্যে আবার ভারত মহাসাগরে মাদাগাস্কারের কাছে জার্মান ডুবোজাহাজ ছেড়ে জাপানী 1-29 ডুবোজাহাজে তাকে উঠতে হয়েছে। সুভাষচন্দ্রের এই ডুবোজাহাজ যাত্রা কিন্তু মিত্রশক্তির কাছে আজানা ছিল না। ডুবোজাহাজ থেকে জার্মান বা জাপানী যে সব সাংকেতিক বার্তা পাঠানো হত সেগুলি মিত্রশক্তি উদ্ধার করে নিত। *(রোল্যান্ড লেউইন——আমেরিকান ম্যাজিক)*। কিন্তু জার্মানিতে গিয়ে সুভাষচন্দ্রের হাল মিত্রশক্তি দেখেছিল। তার জাপানযাত্রা নিয়েও তাদের কোন মাথাব্যথা ছিল না। বরং তারা মনে করেছিল যে সুভাষচন্দ্র অক্ষশক্তির বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জাপানী অধিকৃত অঞ্চলে পৌঁছলেও প্রধানমন্ত্রী তোজোর সাথে দেখা করতে আরও একমাস সময় লেগে গেল। আমরা আগেই উল্লেখ করছি যে জাপানের ভারত আক্রমণের কোন উদ্দেশ্য ছিল না। সুতরাং তোজোর তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই। এমন কি ১০ জুন সাক্ষাৎকারে সুভাষচন্দ্র যখন বললেন যে বর্মার মধ্যে দিয়ে দ্রুত ভারতবর্ষে অভিযান করা দরকার তখন তোজো আমতা আমতা করে বললেন যে বিষয়টা তো সামরিক, সুতরাং অভিযানের আগে অনেক কিছু চিন্তাভাবনা করতে হবে *(লেব্রা ——জাঙ্গল এলায়েন্স)*। তবুও তোজো ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ব্যাপারে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন। সুভাষচন্দ্র একটা অস্থায়ী সরকার গড়তে চান শুনে তাতেও সম্মতি দিলেন। দীর্ঘদিন ধরে হিটলারের কাছে প্রতারিত সুভাষের এটা একটা কম পাওনা নয়।

টোকিওতেই একটা সাংবাদিক সম্মেলন ডাকলেন ১৯ জুন। এরপর টোকিও রেডিও থেকে কয়েকটা বক্তৃতাও দিলেন। এইসব বক্তৃতায় তিনি জানালেন——জাপান যে চীন, মাঞ্চুরিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো দখল করেছে, তা এইসব দেশের ভালোর জন্যেই করেছে। একথা বলবার সময় ভুলে গেলেন যে তিনিই কংগ্রেস সভাপতি থাকাকালীন জাপানী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে চীনে মেডিক্যাল মিশন পাঠিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সহ গোটা বিশ্বের মনীষীরা জাপানী অত্যাচারের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানিয়েছেন। এমন কি সুভাষ, টোকিও বেতার থেকে 'জার্মানির জনসাধারণের উদ্দেশ্যে' এক ভাষণ দিলেন। তাতে বললেন——"ন্যায়নীতি ও সমান অধিকারের ভিত্তিতে এক নববিধান গড়িয়া তোলার জন্য আপনারা যে অনন্য সাফল্য অর্জন করিয়া চলিয়াছেন সেজন্য আমি আপনাদিগকে অভিনন্দন জানাই" *(২২জুন ১৯৪৩ টোকিও রেডিও থেকে ভাষণ)*। নাৎসীদের এরকম সার্টিফিকেট তাদের আর কোন অতি বড় বন্ধুও দেয় নি। তখনকার যুদ্ধ পরিস্থিতি ছিল অক্ষশক্তির প্রতিকূলে। রুশ-রণাঙ্গনে স্তালিনগ্রাদে জার্মানির শোচনীয় পরাজয় ঘটেছে। আফ্রিকায় ইঙ্গ মার্কিন বাহিনীর কাছে অক্ষশক্তি তাদের অধিকৃত অঞ্চলগুলো ক্রমেই হারাচ্ছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এবং প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকা ক্রমাগত আক্রমণ হেনে জাপানের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করছে। কিন্তু সুভাষের গলায় অন্যসুর। ২১ জুন বেতার বক্তৃতায় বললেন মিত্রশক্তির বিজয় সংবাদ সবই ইংরেজদের দেওয়া মিথ্যে খবর। তার ভাষায়——"যাঁহারা এখনো ইঙ্গ-মার্কিন বিজয়ের অলৌকিক স্বপ্ন দেখিতেছেন তাঁহাদের ভাগ্যে বেদনাদায়ক হতাশা সঞ্চিত রহিয়াছে। এই আশাবাদীগণ শীঘ্রই বুঝিবেন যে ইউরোপীয় মহাদেশ দখল চন্দ্রলোক দখলের মতো এখনো সুদূর পরাহত।" কিন্তু এই 'চন্দ্রলোক দখল'-এর সংবাদ পেতে সুভাষকে বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয় নি।

টোকিও-র কাজ মিটে যাবার পর সুভাষচন্দ্র রাসবিহারী বসুর সঙ্গে সিঙ্গাপুর এলেন। এই সিঙ্গাপুরেই রয়েছে আজাদ হিন্দ ফৌজ। ফৌজের সৈন্য আর অফিসারেরা এবং অসামরিক ভারতীয়রা সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বের জন্যে উদগ্রীব হয়ে ছিলেন। জাপানী সরকার আর ইন্ডিপেনডেন্স লীগের প্রবল প্রচারের দরুন মানুষের প্রত্যাশার বাঁধ আর মানছিল না। ভারতীয় রাজনীতিতে তার গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা, দেশ ছেড়ে 'অলৌকিক' পলায়ন, খোদ জার্মানিতে বসে সফল রাজনীতি (সেরকমই প্রচার হয়েছিল)——সব মিলিয়ে ভারতীয়রা এক অবতার পেয়ে গেল। ফৌজের মধ্যে তার আসার কিরকম প্রভাব পড়েছিল তার উদাহরণ মেলে শাহ্‌নওয়াজের কথায়——

বিমান থেকে নেমে নেতাজী সোজা আমাদের কাছে এগিয়ে এলেন এবং আমাদের প্রত্যেকের সাথে করমর্দন করে দু'একটি করে কথা বলে যেতে লাগলেন। আমার শরীরের মধ্যে শিহরণ জেগে উঠল——জীবনে তাঁকে এই প্রথম দেখলাম। কত কিছুইনা তাঁর কাছে প্রত্যাশা করে আছি। তাঁকে আমি সতৃষ্ণ নয়নে দেখতে থাকলাম।......... ....

গৌরবোজ্জ্বল মূর্তিতে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছেন নেতাজী। মুখে স্মিত হাসি। যে দেখছে সেই মুগ্ধ হচ্ছে। আমরা তার দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছিলাম——হ্যাঁ, এইবার আমরা ঠিক নেতা পেয়েছি। ইনিই পারবেন আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে। *(শাহনওয়াজ খান——মাই মেমোরিজ অব আই এন এ অ্যান্ড ইট্‌স্ নেতাজী)* কর্ণেল প্রেম সায়গল, যিনি পরে সুভাষের সামরিক সচিব হয়েছিলেন তিনি এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন যে সে সময় তাদের মনে হয়েছিল যেন স্বয়ং ঈশ্বর এসে গিয়েছেন এবং স্বাধীনতার লড়াই এবার জয়যুক্ত হবে *(নেহরু মেমোরিয়াল লাইব্রেরিতে দেওয়া সায়গলের সাক্ষাৎকার)*। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এসে সুভাষচন্দ্রকে আপনার গুণ প্রকাশ করে নেতা হতে হয় নি। এখানকার ভারতীয়রা তাকে আগে থেকেই 'ঈশ্বর-সদৃশ' নেতা বানিয়ে রেখেছিলেন। এখন তারা সুভাষের নেতৃত্বে সর্বস্ব দিতেও প্রস্তুত।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতবাসীর এই মনোভাব সুভাষচন্দ্র পুরোপুরি কাজে লাগালেন। ৪ জুলাই ১৯৪৩ সিঙ্গাপুরের ক্যাথে সিনেমা হলের সভায় তিনি বললেন——

বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে স্বদেশে ও বিদেশে আমার অভিজ্ঞতার কথা যদি আপনারা শোনেন তবে আপনারা আমার মতই অনুভব করিবেন যে বিধাতার হস্ত আমাদিগকে অনিষ্টের কবল হইতে রক্ষা করিয়া বিজয় ও স্বাধীনতার পক্ষে আমাদের উদ্যোগকে পরিচালিত করিয়া চলিয়াছে।

গান্ধীর মত সুভাষও নেতৃত্ব প্রতিস্থাপিত করতে নিজেকে বিধাতার প্রেরিত পুরুষ হিসেবেই দেখালেন। বক্তৃতায় সুভাষচন্দ্র এক আজব তথ্য জানালেন। তিনি বললেন যে তার প্রেরিত বহু গুপ্তচর ভারতে নাকি কাজ করছে। তিনি রাসবিহারীর প্রতি মানুষের অবিশ্বাসের কথা জানতেন। তাই তিনি আশ্বাস দিয়ে ঘোষণা করলেন যে শত প্রলোভনেও বৃটিশরা তাকে যখন কব্জা করতে পারে নি, আর কেউই তা পারবে না। এই সভাতেই রাসবিহারী বসু ঘোষণা করে সুভাষচন্দ্রকে নেতৃত্বের আসন ছেড়ে দিলেন।

পরদিন থেকে সুভাষ তার বেসামরিক পোষাক ছেড়ে সামরিক পোষাক পরলেন, যদিও তিনি তখনও তার বাহিনীর কোন পদ আনুষ্ঠানিকভাবে নেননি। ৫ জুলাই তিনি ঘোষণা করলেন যে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করা হল। এই ঘোষণায় এমন মনে হয় যে সেদিন থেকে আজাদ হিন্দ বাহিনীর জন্ম হল। প্রকৃতপক্ষে সুভাষচন্দ্র 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি'র নাম পাল্টে 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' রাখলেন। এরপর তিনি ফৌজের সংখ্যা বাড়ানোর দিকে মন দিলেন। তার ইচ্ছা ছিল পঞ্চাশ হাজারের মত একটা বাহিনী তৈরী করার (যদিও তিনি ভাষণগুলোতে বলতেন যে তার লক্ষ্য তিন লক্ষ সেনার বাহিনী) কিন্তু আমরা আগেই বলেছি যে জাপান ভারতীয় বাহিনীকে বেশি বড় হতে দিতে রাজী ছিল না। সব মিলিয়ে পঁচিশ-তিরিশ হাজারের একটা বাহিনী তৈরী করা হল। তবে তারা সকলেই যে সৈনিক ছিল তা নয়। এ এম নায়ার তার স্মৃতিকথায় লিখেছেন——ভারতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে হাজার হাজার যুবক ও মাঝ বয়সী অসামরিক লোক ছিলেন, যাঁরা যুদ্ধ ইত্যাদি বিষয়ে কিছু না জেনেই INA বাহিনীর ইউনিফর্ম পরেছিলেন, তারা শিখেছিলেন কেবলমাত্র স্যালুট করতে ও তদনুযায়ী চলাফেরা করতে, এবং তাঁরা এমনভাবে আচরণ করতেন যেন তারা ঐ নতুন সম্প্রসারিত INA বাহিনীর সদস্য। তাঁরা তা করত কেবলমাত্র জাপানিদের কাছ থেকে বিশেষ সুবিধা আদায়ের জন্যে।

যে বাহিনী তৈরী হল তাদের উপযুক্ত পোষাক, বস্ত্র, খাদ্য ইত্যাদি পাওয়া সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। জাপান নিজেই তখন সমস্যায়। আজাদ হিন্দ ফৌজকে তারা যে রসদ দিতে থাকল তা প্রয়োজনের তুলনায় কম এবং অনুন্নত। সুভাষচন্দ্র নিজেই টাকার সংস্থান

করতে থাকলেন। দাক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যে কুঁড়ি লক্ষ ভারতীয় থাকতেন তাদের কাছ থেকে সুভাষ অর্থ দাবী করলেন। তার আহ্বানে বহু গরীব মানুষ তাদের সর্বস্ব পর্যন্ত 'সুভাষ-তহবিল'-এ দান করলেন। গরীব নারী মজুরেরা তাদের মঙ্গলসূত্র পর্যন্ত দিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ধনী ভারতীয়দের তরফ থেকে তেমন সাড়া মিলল না। সুভাষচন্দ্র তাদের সম্পত্তির একটা বড় অংশ দাবী করে বসলেন। ধনীরা তখন তাদের সম্পত্তির পরিমাণ কম করে বলতে লাগল। ব্যতিক্রম একমাত্র হাবিব নামের একজন ব্যবসায়ী। তিনি তার সমস্ত সম্পত্তি দান করলেন। সুভাষচন্দ্র তাকে 'সেবক-ই-হিন্দ' উপাধি দিলেন। অন্যান্য ভারতীয় ধনীদের উপর সুভাষ শক্তি প্রয়োগের ব্যবস্থা নিলেন। অবস্থা এতদূর পর্যন্ত গিয়েছিল সুভাষচন্দ্রের একান্ত অনুরক্ত সহচর এস এ আয়ার পর্যন্ত লিখেছেন——"মেজাজ গরম না করে তিনি ধৈর্যের সঙ্গে তাদের বক্তব্য শুনতেন। কিন্তু ভারতের মুক্তিযুদ্ধের জন্যে দরকার হলে এইসব ধনীদের একেবারে গরীব বানিয়ে দিতে তিনি দ্বিধা করতেন না।" *(এস এ আয়ার——আনটু হিম এ উইটনেস)*। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তিন কোটি টাকা তোলার যে ঘোষিত লক্ষ্য সুভাষ রেখেছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশি অর্থ ও সম্পদ তিনি আদায় করেছিলেন।

১৯৪৩এর ২৫ আগস্ট সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ ফৌজের পুরোপুরি কর্তৃত্ব নিজের হাতে তুলে নিলেন। এর মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল। জাপ-অধিকৃত বার্মায় জাপান পয়লা অক্টোবর ব ম-র নেতৃত্বে তাদের পছন্দমত একটা 'স্বাধীন সরকার' বানিয়ে দিল। সুভাষচন্দ্র অস্থায়ী ভারত সরকার করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। ২১ অক্টোবর ১৯৪৩ স্বাধীন সরকারের ঘোষণা করা হল। এস এ আয়ার তার 'আনটু হিম এ উইটনেস' বইতে লিখেছেন কিভাবে সুভাষচন্দ্র রাত জেগে একা পাতার পর পাতা অস্থায়ী সরকারের ঘোষণা লিখেছেন। সাথে সাথে সেই লেখা টাইপ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ঘোষণাপত্রের যে জায়গায় সরকারের পদাধিকারীদের নাম থাকার কথা সেখানটা ছিল ফাঁকা। পরে সুভাষচন্দ্র সেখানে মনোমত নামগুলো বসিয়ে দেন। এতসব কান্ড দেখে আয়ার অত্যন্ত পুলকিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি জানতেও পারেন নি কারা ঐ সরকারে আছে। অথচ সরকারে সুভাষচন্দ্রের পরে দ্বিতীয় স্থানটি জুটেছিল আয়ারেরই। এরকম কাজের পদ্ধতি ছিল গোটা আজাদ হিন্দ পর্ব জুড়েই। ২১ অক্টোবর ১৯৪৩ সিঙ্গাপুরের ক্যাথে সিনেমা হলে সুভাষচন্দ্র স্বাধীন আজাদ হিন্দ সরকারের ঘোষণা করলেন। সুভাষ একাধারে তার রাষ্ট্রপ্রধান, প্রধান মন্ত্রী, সমরমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক।

একদিন পরে আজাদ হিন্দ সরকারের মন্ত্রীসভার বৈঠক বসল। 'স্বাধীন আজাদ হিন্দ সরকার' বৃটেন এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে। লে. কর্ণেল লোগনাথন আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায় আপত্তি তুললেন। তিনি বললেন ভারতবর্ষের শত্রু একমাত্র বৃটিশ, সুতরাং কেবল বৃটিশের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করা হোক। কিন্তু জাপান তখন আমেরিকার সাথে যুদ্ধ করছে। সুতরাং জাপানকে না চটাতে তার আপত্তি গ্রাহ্য করা হল না। (এমনও হতে পারে যে তোজোর সাথে সুভাষের এই মর্মে কথা হয়ে গিয়েছিল)। আজাদ হিন্দ সরকার একযোগে বৃটেন এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। অনেকে বলেন যে সুভাষচন্দ্র সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার প্রতি এত আস্থাশীল ছিলেন যে রাশিয়ার বিরুদ্ধে কখনও যুদ্ধ ঘোষণা করেন নি। আসলে জাপান তখন সোভিয়েত রাশিয়ার সাথে যুদ্ধরত দেশ ছিল না। তাদের মধ্যে ছিল অনাক্রমণ চুক্তি। রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে অনেক পরে ১৯৪৫ এর ১১ আগষ্ট——সুভাষের আজাদ হিন্দ ফৌজ তখন বৃটিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

ইতিমধ্যে অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে ফ্যাসিবিরোধী মহাজোটের সৃষ্টি হয়েছে। মস্কোতে হয়ে গেছে মিত্রশক্তির পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন। ১৯৪৩ এর নভেম্বরে মিশর সম্মেলনে চীনকেও ডাকা হল। বস্তুতপক্ষে কায়রো সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুক্ত হওয়ার ঘোষণার ফলাফল পরবর্তি কালে সুদূর প্রসারী হয়েছিল। এই কায়রো সম্মেলনের পাল্টা হিসাবে জাপানী রাষ্ট্রনায়ক তোজো টোকিও সম্মেলন ডাকলেন। জাপানের দখলীকৃত দেশগুলো ও তোজোর বানিয়ে দেওয়া সরকারের প্রধানেরা এই সম্মেলনে যোগ দিলেন। সুভাষচন্দ্র ইচ্ছাকৃতভাবে অস্থায়ী ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে সেখানে গেলেন না। তিনি গেলেন একজন দর্শক প্রতিনিধি হিসাবে। তার চিন্তা ছিল, দেশের হয়ে তার এই প্রতিনিধিত্ব গান্ধী বা জওহরলালেরা ভালো চোখে দেখবেন না। শুধু তাই নয়, সম্মেলনে তোজো যখন বললেন সুভাষ স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রনায়ক হবেন, তখন সুভাষচন্দ্র দাঁড়িয়ে বিনীতভাবে জানালেন যে ভারতে গান্ধী, জওহরলাল, আজাদের মত যোগ্য নেতৃত্ব রয়েছে। এই সম্মেলনে তিনি জাপানকে 'নূতন এশিয়ার রচয়িতা' বলে যে ভাষণ দিলেন, তোজো তাতে অত্যন্ত খুশী হলেন। সম্মেলনের পরেও আলাপ আলোচনা চালানোর জন্যে সুভাষ কয়েকদিন টোকিও থেকে গেলেন। এসময়ে জাপানী সমর নায়কদের সাথে আলোচনায় আসন্ন অভিযানে তার আজাদ হিন্দ ফৌজের কি ভূমিকা হবে তা ঠিক করে নিতে চাইলেন। তোজো 'শুভেচ্ছার নিদর্শন স্বরূপ' আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ আজাদ হিন্দ সরকারের হাতে তুলে দিলেন। আনন্দিত সুভাষ দ্বীপ দুটির নাম পাল্টে রাখলেন 'শহীদ ও স্বরাজ' দ্বীপ। টোকিও থেকে তিনি জাপান অধিকৃত চীন, ফিলিপাইনস্ সফর করে সিঙ্গাপুর ফিরে এলেন। এ সমস্ত দেশে যথেষ্ট রাজকীয় সমাদরও পেয়েছিলেন।

সিঙ্গাপুরে ফিরেই সুভাষচন্দ্র গেলেন আন্দামান ও নিকোবর সফরে। এখানেও জাপ-সামরিক লোকেরা তাকে দারুণ অভ্যর্থনা জানাল। পরে সুভাষচন্দ্র লে কর্নেল লোগনাথনকে এখানে পাঠিয়েছিলেন চিফ্ কমিশনার করে। কিন্তু লোগনাথন নামে মাত্র প্রশাসক ছিলেন। পুরো দ্বীপপুঞ্জটা নিয়ন্ত্রণ করত জাপ-সামরিক বাহিনী। লোগনাথনের হাতে জাপান দিয়েছিল ছ'টি দপ্তর। হাস্যকর ছ'টি দপ্তর—(১) শিক্ষা (২) খাদ্য উৎপাদন (৩) হস্তশিল্প (৪) প্রচার (৫) বেসামরিক প্রশাসন (৬) নারী উন্নয়ণ বিষয়ক। গোটা দ্বীপপুঞ্জে জাপানীরা চালিয়েছিল তাণ্ডব। বৃটিশ-গুপ্তচর সন্দেহে বহু ভারতীয়কে তারা হত্যা করে। লোগনাথনকে অসহায় দর্শকমাত্র হয়ে থাকতে হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র এসব খবর একেবারেই জানতেন না তা নয়। কিন্তু তিনি সেগুলিকে উপেক্ষা করেছিলেন। *(এন ইকবাল সিং— দ্য আন্দামান স্টোরি)*। আসলে খাতায় কলমে হলেও যেটুকু ভূখণ্ডের কর্তৃত্ব পেয়েছিলেন, তা হাতছাড়া করতে তিনি রাজী ছিলেন না। ক্ষুব্ধ লোগনাথন পোর্টব্লেয়ার ছেড়ে রেঙ্গুন চলে এসেছিলেন। পরে বৃটিশ বাহিনী যখন আন্দামান নিকোবরকে জাপানের দখল থেকে মুক্ত করল, সেখানকার অধিবাসীরা হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল। প্রসঙ্গত জানাই, সম্প্রতি (১৯৯৫) 'নেতাজী জন্মশতবর্ষ কমিটি'র বৈঠক দিল্লীতে হয়ে গেল প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে। সেখানে একটা প্রস্তাব উঠেছিল যে আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের নাম পাল্টে সুভাষচন্দ্রের দেওয়া 'শহীদ ও স্বরাজ' দ্বীপ রাখা হোক। কিন্তু আন্দামান ও নিকোবরের সাংসদ মনোরঞ্জন ভক্ত তাতে আপত্তি জানান। তিনি বলেন যে এই নাম পাল্টালে সেখানকার অধিবাসীদের ভাবাবেগে আঘাত লাগবে। মনোরঞ্জন ভক্তের আশংকা অমূলক নয়।

আন্দামান থেকে সুভাষচন্দ্র গেলেন রেঙ্গুন। সেখানে ব্রহ্মদেশের প্রধানমন্ত্রী ব ম-এর মেয়ের বিয়েতে উপস্থিত থাকলেন। পরে ব্রহ্ম সরকারকে শুভেচ্ছাস্বরূপ আড়াই লক্ষ টাকা দান করলেন। এই দান করার পেছনে অন্যতম আরেকটা কারণ ছিল। তিনি সিঙ্গাপুর

ফিরে এসেই তার সদর দপ্তর রেঙ্গুনে স্থানান্তরিত করার আদেশ দিলেন। কারণ ভারত অভিযান যে আসন্ন। জাপান রাজী হয়েছে বর্মাসীমান্ত দিয়ে ভারত আক্রমণ করতে।

ভারত অভিযানে জাপানের আসল উদ্দেশ্য

আমরা আগেই দেখেছি যে ভারত অভিযানে জাপান কোন সময়েই আগ্রহী নয়। ১৯৪২ এর আক্রমণ প্রচেষ্টা তারা বর্মা-সীমান্তেই থামিয়ে দেয়। ভারতের দু'একটা জায়গায় তারা বোমা ফেলেছে বটে তবে তা স্রেফ বৃটিশের উপর চাপ দেওয়ার জন্যে। টোকিওস্থ জার্মান রাষ্ট্রদূত ওট্টোকে জাপানী পররাষ্ট্রমন্ত্রী তোগো জানিয়েছিলেন যে ক্রিপস্ মিশনকে বানচাল করার জন্যেই তারা ভারতে কয়েকবার বিমান হামলা চালিয়েছেন (*জার্মান পররাস্ট্র দপ্তরের দলিল, ওট্টো নং ১১৩৫, তাং ১৪-৪-১৯৪২*)। ভারতকে রাশিয়ার তাঁবেতে দিয়ে রাশিয়াকে অক্ষশক্তির মধ্যে নিয়ে নেওয়ার আকাঙ্খাগত পরিকল্পনার কথা আমরা আগেই দেখেছি।

সুভাষচন্দ্র জাপানী মতলবের বিন্দুবিসর্গ জানতেন না। জাপানীরা তাকে কখনও জানতেও দেয় নি। তিনি স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বাস করেছেন যে জাপান ভারতে অভিযান চালিয়ে বৃটিশ শাসনমুক্ত করবে। কিন্তু জার্মানির মত জাপানও সুভাষচন্দ্রকে দিয়ে কেবল ইংরেজ বিরোধী প্রচারের কাজই করিয়ে নিতে থাকল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিপুল সংখ্যক ভারতীয়কে জাপানের পক্ষে রাখাও সম্ভব হল। সেই জন্যেই জাপান আজাদ হিন্দ ফৌজকে কখনও বেশি বড় হতে দিতে আগ্রহী ছিল না। তাদের যে অস্ত্রশস্ত্র যোগান দিত, তাও ছিল বেশ নিম্নমানের। সুভাষচন্দ্র মালয়ের পেনাং-এ একটা গুপ্তচর বাহিনী তৈরী করবার জন্যে প্রতিষ্ঠান করেছিলেন। তার নাম ছিল স্বরাজ ইনস্টিটিউট। এখান থেকে গুপ্তচর দল ভারতে পাঠানো হয়। কিন্তু গুপ্তচরবৃত্তি তাদের ঠিকমতো শেখানো হয়নি। সবচেয়ে যা প্রয়োজনীয় উপযুক্ত রেডিও খবর পাঠানোর যন্ত্রাদিও দেওয়া হয় নি। আসলে জাপান ভারতের অভ্যন্তরের কোন ব্যাপার নিয়ে উৎসাহই দেখায় নি। কিন্তু ক্রমেই যুদ্ধ পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছল যে জাপান বর্মাসীমান্তে যুদ্ধ পরিকল্পনা করতে বাধ্য হল।

প্রচন্ড গতিতে আক্রমণ চালিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া দখল করে ১৯৪২ এর মাঝামাঝি নাগাদ জাপান তাদের অভিযান থামিয়ে দেয়। তারা ঐ অঞ্চলে নিজেদের দখল সংহত করার দিকে জোর দিল। কিন্তু আমেরিকা চুপ করে বসে থাকল না। ১৯৪৩ সালের গোড়া থেকেই প্রশান্ত মহাসাগর এলাকা জুড়ে একের পর এক মার্কিন আক্রমণ চলতে থাকল। পয়লা মার্চ বিসমার্ক সাগরে মার্কিন বোমারু বিমান জাপানী নৌবহরের একটা বড় রকমের ক্ষতি করল। জাপানী সামরিক বাহিনীর সংকেতগুলি মার্কিনীরা ধরে ফেলত। এরকমই এক সংকেতবার্তার সূত্র ধরে বিমানে সফররত জাপানী নৌবাহিনীর প্রধান সেনাপতি ইসোরকু ইয়ামামোতোকে মার্কিন বিমানবাহিনী বিমানসহ ধ্বংস করে দিল। মার্কিন বিমান খোদ জাপানী দ্বীপপুঞ্জে হানা দিতে থাকল। এই সময় জাপানী সামরিক কর্তারা মনে করেছিল যে বর্মার মধ্যে দিয়ে যদি ভারতসীমান্তে কিছু আক্রমণ ঘটানো যায় তাহলে মিত্রবাহিনী এই অঞ্চলে সেনা নিবেশ করতে বাধ্য হবে। আর তাহলেই জাপানের পূর্বদিকে আক্রমণের তীব্রতা কমে যাবে। এছাড়া উত্তর দিকে চীনের যুদ্ধেও জাপানের বেশ ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছিল। চীনে যুদ্ধের রসদ যাচ্ছিল ভারত থেকে উত্তর বর্মার মধ্যে দিয়ে। জাপানী বাহিনীর লক্ষ্য ছিল ইম্ফল দখল করে সেই পথটা বন্ধ করার। আর এই পথ বন্ধ করলেই ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী ওখানে বিরাট আকারে সেনা আনতে বাধ্য হবে। উত্তর দিক থেকেও জাপানের উপর চাপ কমবে। সুতরাং জাপানের ইম্ফল অভিযান কোন আক্রমণাত্মক

লড়াই ছিল না। প্রকৃতপক্ষে তা ছিল আত্মরক্ষামূলক কৌশল। ইম্ফল থেকে ভারতের অভ্যন্তরে আরও ঢুকে পড়বার পরিকল্পনাও তাদের ছিল না। এটা বোঝা যায় গুপ্তচর সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে। সব সামরিক বাহিনীই কোন অঞ্চল দখল করতে যাবার আগে সে সব অঞ্চলে নিজস্ব গুপ্তচর নিয়োগ করে। কিন্তু জাপানীরা ভারতের অভ্যন্তরে কোন গুপ্তচর নিয়োগ করে নি। যেটুকু করেছিল তা সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজ। বারবার অনুরোধ করা সত্তেও ভারতে বিমান থেকে কোন প্রচার পত্র ফেলে নি। আজাদ হিন্দ ফৌজ অনেক প্রচার পত্র ছাপিয়েছিল, কিন্তু তা অবহেলায় পড়ে রইল। লে. কর্ণেল এ সি চ্যাটার্জ্জী লিখেছেন——"এরোপ্লেন থেকে ছড়াবার জন্যে লিফ্লেট তৈরী করা হলেও জাপানীরা তা ছড়ায় নি। তারা কলকাতার উপর বোমা ফেলতে আগ্রহী ছিল কিন্তু লিফ্লেট ফেলার জন্য বিমান ব্যবহার করতে রাজী হয় নি।" *(ইন্ডিয়াস স্ট্রাগল ফর ফ্রীডম)*। সুভাষচন্দ্র বা তার অফিসাররা——কেউই বুঝতে পারেন নি জাপানীদের আসল মতলবটা কি।

দিল্লী চলো

১৯৪৩ এর শেষদিকে সুভাষচন্দ্র যখন টোকিওতে গিয়েছিলেন তিনি জাপানী সামরিক বাহিনীর কর্তাদের সাথে আসন্ন যুদ্ধে আজাদ হিন্দ ফৌজের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করে এসেছিলেন। ফিল্ড মার্শাল তেরাউচি ছিলেন দক্ষিণ বাহিনীর অধিনায়ক। বর্মা ফ্রন্টে যুদ্ধের অধিনায়ক ছিলেন লে. জেনারেল কাওয়াবে। আর জাপানের সমগ্র স্থলবাহিনীর প্রধান ছিলেন জেনারেল সুগিয়ামা। তেরাউচি আজাদ হিন্দ ফৌজকে সরাসরি ফ্রন্টে লড়াই করতে দিতে রাজী নন। তার মতে এতে জাপানী ফৌজের অসুবিধাই ঘটবে। ফৌজ তার চেয়ে সিঙ্গাপুরেই থাকুক, বরং ভারতীয়দের সমর্থন সহানুভূতি জোগাড় করুক——তাতেই কাজ হবে। বড়জোর তাদেরকে চরবৃত্তিতে লাগানো যেতে পারে। সুভাষচন্দ্র তাতে রাজী নন। তিনি বারবার অনুরোধ করলেন যাতে তার বাহিনীকে যুদ্ধে লড়বার সুযোগ দেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত জেনারেল সুগিয়ামা ঠিক করে দিলেন যে আপাতত আজাদ হিন্দ ফৌজের একটি ব্রিগেড যুদ্ধে যোগ দেবে। সেই ব্রিগেড যদি যুদ্ধে যোগ্যতার পরিচয় দেয় তবে পরবর্তীকালে আরও ফৌজ যুদ্ধে যোগ দেবে। সুভাষচন্দ্র তাতে খুশী হলেন। সিঙ্গাপুরে ফিরে এসে সবকটা ব্রিগেড থেকে বাছা বাছা সৈন্য নিয়ে তৈরী করলেন ১নং গেরিলা বাহিনী। তার নাম রাখা হল সুভাষ ব্রিগেড। শাহনওয়াজ খান হলেন এর কমান্ডার।

রেঙ্গুনে সদর দপ্তর করে যুদ্ধের আয়োজন চলল। অভিযানেব আগে ১৯৪৪ এর জানুয়ারীতে রেঙ্গুনে সুভাষচন্দ্র বৈঠকে বসলেন লে. জেনারেল কাওয়াবের সঙ্গে। মুশকিলের ব্যাপার ছিল তিনি নিজেই রাষ্ট্রপ্রধান, প্রধানমন্ত্রী, বিদেশমন্ত্রী, সমরমন্ত্রী, সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হবার ফলে বড় বড় সামরিক বৈঠকে একাই যোগ দিতেন। অবশ্য সহকর্মীদের কাউকে নিলেও বিশেষ লাভ হত না। সকলেই ছিলেন সুভাষের গুণাবলীতে একেবারে মোহিত। তার মতের বিপরীতে কোনরকম চিন্তা প্রকাশ করার মত কেউ ছিল না। যাইহোক কাওয়াবের সাথে বৈঠকে সুভাষচন্দ্র প্রস্তাব করলেন যে ভারত অভিযানে যে যৌথবাহিনী যাবে তার নেতৃত্ব দেবে আজাদ হিন্দ ফৌজ। প্রস্তাব শুনে কাওয়াবে ক্ষেপে আগুন হলেন। শেষ পর্যন্ত সুভাষ তার প্রস্তাব থেকে সরে এলেন। ঠিক হল মেজর জেনারেল ইয়ামমোতো হবেন ডিভিশনাল কমান্ডার। তার অধীনে যৌথ বাহিনী লড়বে। আবার কাওয়াবে জানালেন যে সুভাষ রেজিমেন্ট জাপানী ব্রিগেডের অনুসরণকারী দল হবে। সুভাষচন্দ্র সামরিক কৌশলের কথা না তুলে একটা আবেগের প্রশ্ন তুললেন। তিনি

বললেন যে ভারতের মাটিতে যে প্রথম রক্তবিন্দু পড়বে তা হবে আজাদ হিন্দ ফৌজের। শেষ পর্যন্ত কাওয়াবে সুভাষ রেজিমেন্টকে দিয়ে দুটো কাজ করাতে রাজী হলেন। একদিকে কালদান উপত্যকায় যে জাপানী বাহিনী যুদ্ধ করবে তাতে একটা ব্যাটেলিয়ান যোগ দেবে। আর দুটো ব্যাটেলিয়ান চীন পাহাড়ে জাপানী বাহিনীর বদলি হিসাবে কাজ করবে। যুদ্ধে অবশ্য সুভাষ রেজিমেন্টকে কার্যত অনুসরণকারী দল হিসেবেই থাকতে হয়েছিল। কারণ, জাপানী সৈন্যদের সাথে তাল মেলাতে পারে এমন উপযুক্ত যান-বাহন তাদের ছিল না।

একটা প্রশ্ন স্বভাবতই এসে যায়। ১৯৪৪ এ যে বাহিনী বর্মাসীমান্তে ইম্ফল পর্যন্ত এসেছিল সেই বাহিনী কাদের ছিল। ভারতের জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকেরা এমনভাবে লেখেন যেন আজাদ হিন্দ বাহিনী ভারত ভূখন্ড অধিকার করতে পেরেছিল। আবার বিদেশী, প্রায় সব দেশের সমর ঐতিহাসিকেরা লেখেন যে জাপানী বাহিনী ভারত ভূখন্ড সাময়িকভাবে দখল করেছিল। তারা আজাদ হিন্দ ফৌজের কথা উল্লেখই করেন না। প্রকৃত পক্ষে ইম্ফল আক্রমণ অভিযানে সুভাষ রেজিমেন্টের সৈন্য ছিল মাত্র তিন হাজার। তিনটি রেজিমেন্ট মিলে আজাদ হিন্দের হাজার আষ্টেক সেনা ইম্ফলে লড়েছিল। বর্মা অভিযানে জাপানী সৈন্য সংখ্যা ছিল মোট দুই লক্ষ তিরিশ হাজার। আর আজাদ হিন্দ সশস্ত্র সৈন্য মেরে কেটে পনেরো হাজারও হবে না।

১৯৪৪ এর শুরুতে জাপানী বাহিনী যে ভারত-সীমান্তে অভিযান করল তাকে পতনোন্মুখ একটা বাহিনীর মরিয়া অভিযান বলা যেতে পারে। একদিকে যেমন শত্রুপক্ষের শক্তি-সামর্থ্য সম্পর্কে যেমন যথেষ্ট তথ্য তাদের ছিল না, তেমনি যুদ্ধের উপযুক্ত যান-বাহন, রসদও ছিল অপ্রতুল। নিজেদের জয় সম্পর্কে জাপানী বাহিনী এতটা আত্মবিশ্বাসী ছিল যে তারা ধারণা করেছিল—পরাজিত বৃটিশ বাহিনীর রসদ দিয়েই তাদের কাজ চলে যাবে। উল্টোদিকে বৃটিশ বাহিনী ছিল অনেক বেশি তৈরী। ১৯৪২ এর আক্রমণের বিহ্বলতা কাটিয়ে দেড় বছর ধরে বর্মা সীমান্তে বৃটিশ বাহিনী নিজেদের অনেকটা সংহত করে নিতে পেরেছিল। জেনারেল উইলিয়াম শ্লিম এক বড় সৈন্যবাহিনী নিয়ে ভারত সীমান্তে ছিলেন। কিন্তু জাপানী বাহিনীও আয়তনে কম ছিল না।

ভারত অভিযানের সুযোগ এসেছে। সুভাষচন্দ্রের জীবনের অন্যতম স্বপ্ন আজ সফল হয়েছে। রেঙ্গুন থেকে অশ্রুসজল চোখে তিনি 'সুভাষ রেজিমেন্ট'কে বিদায় দিলেন। আওয়াজ তুললেন 'দিল্লী চলো'। এর আগে আজাদ হিন্দ সরকারের জাতীয় সংগীত ঠিক হয়ে গিয়েছে—'সব সুখ চায়েন কী বরখা বরষে, ভারত ভাগ হ্যায় জাগা'।

এটি রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমনঅধিনায়ক' গানের অনুকরণে তৈরী করেছেন হুসেন নামে আজাদ হিন্দ বাহিনীর এক সৈনিক। সুভাষচন্দ্র খুশি হয়ে তাকে দশ হাজার ডলার পুরস্কারও দিয়েছেন। যাইহোক সেনাদল এগিয়ে চলল। শুরু হল ভারত-সীমান্ত অভিযান।

এই অভিযান শুরু হবার আগে আজাদ হিন্দ থেকে বাহাদুর এবং গুপ্তচর গ্রুপের ছোট ছোট দল সীমান্ত এলাকায় পাঠানো হয়েছিল। আরাকান সেক্টর, বিষাণপুর সেক্টর এবং কোহিমা সেক্টরে এই দলগুলি কাজ করেছিল। আগেই বলেছি জাপানীদের এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ ছিল না। এই দলগুলোর না ছিল ঠিকমত প্রশিক্ষণ, না ছিল উন্নতমানের বেতার-প্রেরক যন্ত্র। তবু তারই মধ্যে আরাকান ফ্রন্টের গুপ্তচর দলটি মেজর এল এস মিশ্রের নেতৃত্বে আশ্চর্যজনক কাজ করে এবং শত্রুপক্ষ সম্বন্ধে যথেষ্ট তথ্য যোগাড় করে। তারই ফলশ্রুতিতে মায়ু উপত্যকায় বৃটিশ-ভারতীয় সেনবাহিনীর ৭ম ডিভিশন কিছুদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। জাপানী বাহিনীর অগ্রগতিও সম্ভব হয়। পুরো যুদ্ধে আজাদ হিন্দ বাহিনীর এটিই ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য।

যুদ্ধের কৌশলগত দিক থেকে ইম্ফল ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি। এক বিপুল বাহিনী নিয়ে জাপানী সামরিক শক্তি সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তুলনায় বৃটিশ-ভারতীয় বাহিনী সেখানে অনেক কম ছিল। জাপানী আক্রমণের মুখে তারা সরাসরি যুদ্ধে না গিয়ে সাময়িকভাবে পিছিয়ে গেল। ১৯ মার্চ জাপানী বাহিনী ভারত সীমান্ত অতিক্রম করল। ৮ এপ্রিল ১৯৪৪ তারা কোহিমা দখল করে নিল। ১৪ এপ্রিল ময়রাং দখল করে নিয়ে ক্রমে বিষেণপুর পর্যন্ত পৌঁছল। বৃটিশ-ভারতীয় বাহিনী পিছিয়ে এসে ইম্ফল রক্ষার লড়াই-এ শক্তি সন্নিবেশ করল। জাপানী বাহিনীর পিছন পিছন ছুটছিল আজাদ হিন্দের সুভাষ রেজিমেন্ট। তারাও জাপানী বাহিনীর সাথে ইম্ফল অবরোধে যোগ দিল। আরও হাজার তিনেক সৈন্য নিয়ে আজাদ হিন্দের ডিভিশনাল কমান্ডার কর্ণেল মহম্মদ কিয়ানী ইম্ফল অভিযানে যোগ দিলেন। সুভাষচন্দ্র এবং জাপানের সামরিক মহলের ধারণা আর কয়েকদিনের মধ্যেই ইম্ফলের পতন ঘটবে। যুদ্ধের অগ্রগতিতে উল্লসিত সুভাষ তার দপ্তর মান্দালয়ের পাশে ছোট পাহাড়ি শহর মিয়ামিতে নিয়ে এলেন। অধিকৃত ভারত ভূখণ্ডের প্রশাসক নিযুক্ত করলেন লে. কর্ণেল এ সি চ্যাটার্জীকে। সুভাষচন্দ্রের চোখে তখন স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন। তাড়াতাড়ি মুক্ত অঞ্চলের জন্য প্রশাসনিক কাগজপত্র ছাপিয়ে ফেললেন। মায় ডাকটিকিট পর্যন্ত ছাপা হল। কিন্তু এগুলো কোনদিনই কাজে লাগে নি। হায়, তখন কি তিনি জানতেন, জাপানের উদ্দেশ্যই নয় ভারতকে মুক্ত করা!

দিল্লী——দূর অস্ত্

সুভাষচন্দ্রের হিসাবে যখন সবই ঠিকঠাক চলছে, আজাদ হিন্দ ফৌজের সিপাই থেকে জেনারেল সকলেরই নিশ্চিত ধারণা কিছুদিনের মধ্যে তারা ভারতের অভ্যন্তরে দূর পর্যন্ত ঢুকে পড়বে। এমনকি বাহিনীর মধ্যে যাদের বাড়ী আসামে তারা আগে নিজের দেশে পৌঁছাবে বলে উল্লাস প্রকাশ করছে। কিন্তু বিপদ এল অন্যদিক থেকে। গোটা জাপ-বাহিনীতে রসদের দারুণ অভাব দেখা দিল। খাদ্য, যানবাহন, উপযুক্ত পোষাক, সবই ছিল কম। এখানে প্রশ্ন এসে যায় জাপানের মত উন্নত সামরিক বাহিনী যাদের দুনিয়া জোড়া খ্যাতি তারা এরকম আগোছালোভাবে যুদ্ধ করছিল কেন? তার কারণ আমরা আগেই উল্লেখ করেছি; জাপানের মূল লক্ষ্য চীন মাঞ্চুরিয়াসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাম্রাজ্য রক্ষা করা, ভারত অভিযান করা নয়। সে সময় জাপানের মোট ১০১ ডিভিশন স্থলবাহিনীর মধ্যে বর্মায় নিয়োজিত ছিল মাত্র ১০ ডিভিশন সেনা যেখানে চীন যুদ্ধে অংশ নিচ্ছিল ২৬টি ডিভিশন। আরও একটা ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে ভারত অভিযানে জাপানের কোন উৎসাহ ছিল না। জাপান তার বিমান বাহিনীর অতি সামান্যই বর্মা ফ্রন্টে ব্যবহার করছিল। লে. কর্নেল এ সি চ্যাটার্জী লিখেছেন——

যখন জেনারেল ইয়ামাসিতাকে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে আমেরিকান আক্রমণ ঠেকাবার জন্যে কমান্ডার-ইন-চিফ নিয়োগ করা হয় তখন তিনি টোকিওর ইম্পিরিয়াল জেনারেল স্টাফকে বলেন যে তার বাহিনীর পিছনে যথেষ্ট বিমান সাহায্য দেওয়া হবে——এই প্রতিশ্রুতি দিলে তবেই তিনি দায়িত্ব নেবেন। ফলে বর্মা রণাঙ্গন থেকে জাপানীরা যতটা সম্ভব বিমান তুলে নিয়ে তা ফিলিপাইন্সে ব্যবহার করে। জাপানের পতনের পর মার্শাল তেরাউচি এক বিবৃতিতে একথা বলেছেন (*ইন্ডিয়াস্ স্ট্রাগল ফর ফ্রীডম*)। যুদ্ধের প্রয়োজনীয় গোলাবারুদ, খাদ্য, রসদ সবই অন্য ফ্রন্টের তুলনায় কম যোগান দেওয়া হচ্ছিল। বর্মা ফ্রন্টে জাপ-বাহিনী এবং আজাদ হিন্দ ফৌজকে রসদ সরবরাহ করার দায়িত্বে ছিল হিকারি কিকান। যেটুকু রসদ আসছিল তা তারা জাপানী সেনাদের মধ্যেই বেশি বণ্টন করেছিল।

ফলে ফৌজের সেনারা অনাহারের মধ্যে পড়ল। যুদ্ধের শুরুতেই, যখন জাপানী বাহিনীর জয়যাত্রা অব্যাহত আছে, ৩০ মার্চ ১৯৪৪ সুভাষ রেজিমেন্টের কমান্ডার শাহনওয়াজ খান তার ডায়েরীতে লেখেন—"জাপানীরা INA সৈন্যদের মজুরের মত খাটাচ্ছে। খাদ্যশস্য ঠিকমত দিচ্ছে না, ফলে সেনারা না খেয়ে মারা যাচ্ছে। জাপানী বিমানের সাহায্যও মিলছে না।" এসমস্ত খবর সুভাষের কাছে ঠিকমত পৌঁছাত না। যুদ্ধের যেটুকু খবরাখবর তিনি পেতেন, সবই জাপানী সামরিক দপ্তরের মারফতে। হাসপাতালে আহত, রোগগ্রস্তদের কাছ থেকে তিনি যখন খবর পেলেন ওড়িঘড়ি করে লে কর্নেল এ সি চ্যাটার্জীকে আদেশ দিলেন স্থানীয়ভাবে খাদ্যশস্য কিনে যুদ্ধরত ফৌজকে পাঠাতে। কিন্তু সেই খাদ্য, রসদগুলোও জাপানী সেনারা আত্মসাৎ করে নিয়েছিল।অপরপক্ষে বৃটিশ ভারতীয় বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা জাপানী বাহিনীর তুলনায় কম থাকলেও তারা ছিল দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। তারা জাপানী আক্রমণের মুখে সাময়িকভাবে পিছু হটে এসে ইম্ফল রক্ষায় শক্তিসন্নিবেশ করল। যতটা সম্ভব ক্ষয়ক্ষতি এড়িয়ে আসন্ন বর্ষার জন্যে যুদ্ধ প্রস্তুতি নিতে থাকল। আর আজাদ হিন্দ ফৌজ তো বটেই জাপ-বাহিনীরও বর্ষার উপযোগী পোষাক, যুদ্ধোপকরণ ছিল না। আজাদ হিন্দ সরকারের মন্ত্রী লে. কর্নেল এ সি চ্যাটার্জী লিখেছেন—

যতদিন আবহাওয়া শুষ্ক ছিল এ ধরনের অসুবিধা তবুও কিছুদিনের জন্য সহ্য করা যেত, যদিও দিনকে দিন তা অসহনীয় হয়ে পড়েছিল। কিন্তু অবস্থা আরও অবর্ণনীয় হয়ে পড়ল যখন নির্ধারিত সময়ের আগেই বর্ষা এসে পড়ল। বিশেষত আমাদের সেনাদের যুদ্ধ করা অসম্ভব হয়ে পড়ল কারণ বেশির ভাগের কাছেই না ছিল রেইন-কোট, না ছিল ওয়াটারপ্রুফ-সেট। আমাদের কাছে এমন খবর ছিল যে বৃটিশ বাহিনী আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। কিন্তু আসল ঘটনা ছিল ইংরেজরা তখন অ্যারোপ্লেন থেকে তাদের বাহিনীকে শত শত টন খাদ্যশস্য যোগাচ্ছিল। তাদের সিংহলস্থিত দক্ষিন-পূর্ব এশিয়া কমান্ড থেকে ওয়ারলেসে খবর এসেছিল যে নির্ধারিত সময়ের আগেই ভয়ঙ্কর বর্ষা আসছে। বৃটিশ তার বাহিনীকে ইম্ফল রক্ষা করতে আদেশ দিল। তারা আমাদের রসদের অভাব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল এবং সেইমত তাদের বাহিনীকে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে বলল। তারা জানত যে বর্ষার মধ্যে আমাদের বা জাপ-বাহিনীর পক্ষে নিজের নিজের অবস্থানে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়বে। (*এ সি চ্যাটার্জী- ইন্ডিয়াস্ স্ট্রাগল ফর ফ্রীডম*)

জুন মাসের প্রথম দিনটিতেই এসে পড়ল প্রবল বর্ষা। বর্মা সীমান্তের পাহাড়ী এলাকায় ঘন জঙ্গলে বর্ষার কি চেহারা তা সমতলের মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। বর্ষার প্রথম ধাক্কাতেই জাপানী বাহিনীর পিছনের যোগাযোগ রক্ষাকারী সড়ক আর ব্রিজগুলো ভেঙ্গে গেল। একদিকে নিজস্ব রসদ নেই, অন্যদিকে রসদ আসার কোন রাস্তা নেই—সুবিশাল জাপানী বাহিনী ভয়ঙ্কর সংকটের মধ্যে পড়ল। আজাদ হিন্দ ফৌজের সাথে জাপ-বাহিনীর বন্ধুত্ব স্বভাবতই চটে গেল। জাপানীরা যেখানে ফৌজের সেনাদের আগে 'কমরেড ইন্ডিয়ান' বলে ডাকত সেখানে তাদের 'বিশ্বাসঘাতক' বলতে লাগল।

এই 'বিশ্বাসঘাতক' বলার পিছনে অবশ্য একটা কারণ ছিল। জাপানী সমরনায়কদের যেমন ধারণা ছিল যে পরাজিত বৃটিশ বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র, রসদ দিয়েই জাপ-বাহিনী তাদের প্রয়োজন মিটিয়ে নেবে, সুভাষচন্দ্রের তেমনই অন্ধ ধারণা ছিল যে আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারত সীমান্তে গিয়ে দাঁড়ালেই বৃটিশ বাহিনীর ভারতীয় সৈন্যেরা দলে দলে তাতে যোগ দেবে। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল তার কিছুই হল না। ইম্ফলে আজাদ হিন্দ ফৌজকে মুখোমুখি হতে হয়েছিল গূর্খা রেজিমেন্টের। এই পার্বতীয় উপজাতি বাহিনীর

মধ্যে কংগ্রেস রাজনীতির বিশেষ প্রভাব ছিল না। আমরা আগেই দেখেছি ভারতে থাকাকালীন সুভাষচন্দ্রের রাজনীতি শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের আহ্বানে তাই ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে বিশেষ প্রভাব পড়ল না বরং তারা আজাদ হিন্দের লোকদের 'জাপানী দালাল' বলে গালাগালি দিতে থাকল। বিপদ ঘটল উল্টোদিক থেকে। আজাদ হিন্দ ফৌজ থেকে সেনা এবং অফিসাররা গিয়ে বৃটিশ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে লাগল। দ্বিতীয় গেরিলা রেজিমেন্টের সেকেন্ড কমান্ডার চামোল তার বাহিনী নিয়ে বৃটিশ পক্ষে চলে যান। শুধু তাই নয়, তাকে দিয়ে ফৌজের সৈন্যদের উদ্দেশ্যে প্রচারপত্র লেখানো হল যে দলত্যাগীদের বৃটিশ বাহিনী আশ্রয় দিতে রাজী আছে। এর ফলে দলত্যাগীর সংখ্যা বেড়ে যায়। ইম্ফলের লড়াইয়ে যে সাত-আট হাজার আজাদ হিন্দ সেনা যুদ্ধ করেছিল তার মধ্যে অন্তত দু'হাজার দলত্যাগ করে বৃটিশ-ভারতীয় বাহিনীর কাছে আশ্রয় নেয়। এই ঘটনায় সুভাষচন্দ্র আঘাত পেয়েছিলেন সবচেয়ে বেশি।

১৯৪৪ এর ২৭ জুন আজাদ হিন্দ বাহিনীকে ইম্ফল ত্যাগ করে পশ্চাদপসরণ করার আদেশ দেওয়া হল। কিন্তু সে কাজও সহজ ছিল না। রাস্তা-ঘাট, যানবাহন, খাদ্য কিছুই নেই। জাপানীদেরও একই অবস্থা। ১নং গেরিলা রেজিমেন্টে ডাক্তার ছিলেন মেজর সত্যেন্দ্রনাথ বসু। তার লেখায় পাই কি ভাবে পথের ধারে জঙ্গলে হাজার হাজার জাপানীদের দেহ ফেলে রাখা হয়েছিল। এদের সকলেই মৃত ছিল না। বহু সেনাকে অর্ধমৃত অবস্থায় মৃতদের স্তূপে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। ডাঃ বসু লিখেছেন কিভাবে একটা মৃত কুকুরের পচা-গলিত দেহকে জাপানীরা কাড়াকাড়ি করে খেয়েছিল। *(ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু—আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে)* বর্মা যুদ্ধে নব্বুই হাজারের মত জাপানী সৈন্য প্রাণ হারিয়েছিল। পরে বিজয়ী বৃটিশ বুলডোজারে করে এদের মৃতদেহের স্তূপ সরায়। এই যখন অবস্থা তখন আজাদ হিন্দ ফৌজের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। কয়েক হাজার সেনা পায়ে হেঁটে দুর্গম নদী, জঙ্গল, পাহাড় দিয়ে ফিরে আসছে। পরনে পোষাক নেই, খাদ্য নেই, ওষুধ নেই। প্রায় সকলেই কলেরা বা আমাশয় বা ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত। পাঁচজন ডাক্তার আছে দলের সঙ্গে, কিন্তু তাদের কাছে কোন ওষুধ নেই, সর্বোপরি তারাই রোগে আক্রান্ত। ফেরার পথের এই রাস্তায় আজাদ হিন্দ ফৌজের অন্ততপক্ষে দেড় হাজার সেনা কেবল রোগে ভুগে আর অনাহারে মারা গেল।

ইতিমধ্যে সুভাষচন্দ্র মিয়ামি ছেড়ে রেঙ্গুন ফিরে এসেছেন। রেঙ্গুনে তিনি জাপানের পরাজয় সম্পর্কে কাউকে কিছু বললেন না। প্রতি বছর ৪ জুলাই থেকে সাতদিনের 'নেতাজী সপ্তাহ' পালন করা হত। সুভাষচন্দ্রের প্রথম সিঙ্গাপুর আসাকে স্মরণ করতেই এই উৎসব হত। এবারের উৎসব হল আরও জাঁকজমকপূর্ণ। তিনি যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শনকারী সৈন্যদের পুরস্কৃত করলেন, সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করলেন। কয়েকটি ভাষণও দিলেন। প্রত্যেক ভাষণেই বললেন যে আজাদ হিন্দের জয় অব্যাহত। ৯ জুলাই ১৯৪৪ তার এক ভাষণের প্রতিক্রিয়ায় এক প্রত্যক্ষদর্শী লেখেন—

নেতাজী আমাদের বিজয় সম্বন্ধে বলতে গিয়ে উৎসাহে একেবারে আত্মহারা হয়ে যান। কি গভীর বিশ্বাস! নেতাজীর অবস্থা দেখে আমি ত শিউরে উঠি। আমি ভাবি - যদি কোনরকমে আমাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয় তা হ'লে নেতাজীর অবস্থা কি হবে? *(এক বিদ্রোহিনী কন্যার রোজনামচা)*

ডায়েরিলেখিকা তখন জানতেন না যে সে পরিণতি শুরু হয়ে গিয়েছে। ২৬ জুলাই প্রকাশ্যভাবে ইম্ফল অভিযানে পিছু-হটার কথা স্বীকার করা হল। এর পর থেকে জাপানী বাহিনী আর ঘুরে দাঁড়াতে পারল না। বৃটিশ-ভারতীয় সেনারা একের পর এক বর্মার

বিস্তৃর্ণ এলাকা নিজের কব্জায় নিয়ে নিল। যুদ্ধে যাই হোক, রোগে ভুগে আর খাদ্যের অভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজ নিঃশেষ হয়ে যেতে লাগল। এমনকি সেনা হাসপাতালগুলোয় পর্যন্ত ওষুধ নেই। সে সময়কার এক মর্মান্তিক বিবরণ মেলে শাহনওয়াজ খানের লেখায়—

হাসপাতাল পরিদর্শনকালে নেতাজী বুঝলেন-ওষুধপত্রের সেখানে নিতান্ত অভাব,- বিশেষ করে আমাশয়ের। এই সব রোগীদের কষ্ট দেখে নেতাজীর দুঃখ হল-তিনি ঠিক করলেন, এদের কিছু মুখরোচক জিনিস খাওয়াবেন। নিজের বাড়ীতে কিছু জিলিপি তৈরী করিয়ে তিনি হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলেন। পরদিন হাসপাতালে গিয়ে তিনি একটি আমাশয়ের রোগীকে জিজ্ঞাসা করলেন তার ভাগের জিলিপি সে খেয়েছে কি না- আর কেমন লাগল জিলিপি। রুগ্ন সৈনিক উত্তর দিলে, "নেতাজী, জিলিপি আমার খুব ভাল লেগেছে,তা ছাড়া ডাক্তারের ওষুধের চেয়েও এতে উপকার বেশি। অনুগ্রহ করে আরও জিলিপির ব্যবস্থা করবেন।" *(মাই মেমোরিজ উইথ আই এন এ অ্যান্ড ইট্স্ নেতাজী)* কিন্তু জিলিপি দিয়ে তো আর রোগীর প্রাণ বাঁচে না। সৈন্যেরা মরতেই থাকল।

এদিকে জাপানী একনায়ক তোজো (সবকটি দায়িত্বভার নিজের হাতে তুলে নেবার জন্যে তাকে 'Total Tojo' বলা হত) পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। তার জায়গায় প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন জেনারেল কোইসে। তিনি বর্মা যুদ্ধের ব্যাপারে সুভাষচন্দ্র আর বর্মার প্রধানমন্ত্রী ব ম-কে টোকিওতে ডেকে পাঠালেন। এবার সুভাষচন্দ্র তার সাথে মন্ত্রীপরিষদের দু'জন সদস্যকে নিয়ে গেলেন। তার দরকারও ছিল। কারণ তারা জাপানী প্রধানমন্ত্রীকে বোঝাতে পারবেন যে হিকারী কিকানের ভুলের জন্যেই INA যুদ্ধে হেরেছে। কোইসে আর বুঝবেন কি, তিনি তো নিজেই মরমে মরে আছেন। এবারের আলোচনায় আগের দোষত্রুটিগুলো শোধরাবার ব্যবস্হা হল। কিন্তু এখন আর কোন ওষুধে কাজ হবে না, সুভাষ তা খানিকটা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি রাশিয়ার সাথে যোগাযোগ করতে চাইলেন। তিনি জাপানের কর্মকর্তাদের বোঝালেন যে তিনি নিজে মধ্যস্হতা করতে রাজী আছেন। কিন্তু জাপান সরকার আন্তর্জাতিক পরিস্হিতি সম্পর্কে ভালই অবহিত ছিল। তারা রাজী হল না। মরিয়া সুভাষ নিজেই টোকিওস্হ রাশিয়ান রাষ্ট্রদূতের সাথে দেখা করতে চাইলেন। কিন্তু রুশ রাষ্ট্রদূত একজন 'জার্মান-সহচর'-এর সাথে দেখা করতে রাজী ছিল না।

সুভাষচন্দ্র মালয় এবং সিঙ্গাপুর হয়ে রেঙ্গুনে ফিরলেন। তিনি চাইলেন তার পশ্চাৎবর্তী বাহিনীকে একটু মজবুত করতে। নতুন করে রঙরুট নিয়োগের চেষ্টাও চলল। রেঙ্গুনে ফিরে এসে শুরু করলেন যুদ্ধ পরিকল্পনা। এবার আর ভারত অভিযানের যুদ্ধ নয়। এবার জাপ-বাহিনীর বর্মা দখলে রাখার সহযোগিতার যুদ্ধ। কিন্তু বৃটিশ-ভারতীয় বাহিনীর অগ্রগতি রোখা সম্ভব হল না। ১৯৪৫ এর জানুয়ারীর প্রথম দিনটিতে তারা আকিয়াব দখল করল। ঐ জানুয়ারীতে ইরাবতী নদী পার হয়ে রেঙ্গুনের দিকে এগিয়ে চলল। এরই সাথে আজাদ হিন্দ বাহিনীতে দেখা গেল দলে দলে বাহিনী ছাড়ার হিড়িক। এবার আর শুধু সেনা নয়, বেশ কয়েকজন অফিসার গিয়ে বৃটিশের পক্ষে যোগ দিল। ক্ষুব্ধ সুভাষ শাহনওয়াজ খানের হাত দিয়ে মেজর জি এস ধীলনের কাছে চিঠি পাঠালেন—

গভীর দুঃখ ও বেদনার সাথে লে. হরিরাম এবং অন্যান্যদের বিশ্বাসঘাতকতার কথা শুনলাম। আমি আশা করি চতুর্থ রেজিমেন্টের সৈনিকেরা তাদের রক্ত দিয়ে এ কলঙ্কের চিহ্ন মুছে দেবে। শুধু তাই নয়, মান্দালয়ে তিনি চিঠি পাঠালেন

মান্দালয় থেকে যে সব সৈন্য ছাউনি ছেড়েছে আমার কাছে খবর আছে তারা মান্দালয় অঞ্চলেই আছে। এইসব ফেরারীদের গ্রেপ্তার করে প্রহরাধীনে রেঙ্গুন পাঠাতে

হবে। যদি গ্রেপ্তার করতে না পারেন, দেখামাত্র গুলি করবেন। ওদের গ্রেপ্তার অথবা গুলি করতে চেষ্টার যেন কোন ত্রুটি না হয়। *(হিউ টয়---দ্য স্প্রিঙ্গিং টাইগার)*

সেনাদের উৎসাহ দিতে তিনি রণাঙ্গনের দিকে গেলেন। গিয়ে কিন্তু বিপদে পড়লেন। তিনদিক থেকে বৃটিশ-ভারতীয় সেনা দিয়ে বেষ্টিত হয়ে পড়লেন। কোনমতে দ্রুতগতির কনভয়ে চেপে বিমান হানার মধ্যে দিয়ে রেঙ্গুন ফিরলেন। রেঙ্গুনে ফিরে ২ মার্চ ১৯৪৫ শুনলেন আরও দুঃসংবাদ। পোপা রণক্ষেত্রে আজাদ হিন্দ সেনারা বৃটিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। এসময় ক্ষুব্ধ সুভাষ নাকি কয়েকদিন কারও সাথে কথা বলেন নি। তিনি এমন ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে একদিন 'বিশ্বাসঘাতক দিবস'ও পালন করেছিলেন। সুভাষচন্দ্র বারবার বলতে থাকেন---যুদ্ধে যদি পরজিতও হই, বীরত্বের ক্ষেত্রে যেন কোন ঘাটতি না থাকে। কিন্তু দু'একটি ঘটনা বাদ দিয়ে সৈন্যেরা দলে দলে আত্মসমর্পণ করতেই থাকল। এই পর্যায়ের যুদ্ধে ক্যাপ্টেন বাগড়ির নেতৃত্বে একটা ছোট দল আশ্চর্যজনক বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিল। উপযুক্ত অস্ত্র তাদের ছিল না। কিন্তু শুধুমাত্র হাতবোমা সম্বল করে একটা বৃটিশ ট্যাঙ্কবাহিনীর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে শহীদের মৃত্যু বরণ করলেন। পরাজয় এবং আত্মসমর্পণের বাতাবরণে এই আত্মত্যাগ ছিল অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল।

১৯৪৫ এর ২০ এপ্রিল সুভাষ জানতে পারলেন যে জাপানীরা রেঙ্গুন ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। সুভাষ মন্ত্রীসভার বৈঠক ডাকলেন। সেখানে ঠিক হল সুভাষচন্দ্র তার মন্ত্রীসভার সদস্যদের নিয়ে রেঙ্গুন ছেড়ে চলে যাবেন। তাদের সঙ্গে যাবে ঝাঁসির রানী বাহিনীর মেয়েরা। লোগনাথন আজাদ হিন্দ ফৌজকে নিয়ে বৃটিশ-ইন্ডিয়া বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করবেন। সুভাষচন্দ্র বিমানে রেঙ্গুন ছাড়তে রাজী হলেন না। তিনি আর সবার সাথে সড়কপথে রেঙ্গুন ছেড়ে ব্যাঙ্ককের দিকে রওনা হলেন। যাওয়ার আগে শত্রুপক্ষের হাতে চলে যাওয়ার জন্য অপেক্ষমান সেনাদের বললেন—

আমি নিজের ইচ্ছায় ব্রহ্মদেশ ছেড়ে যাচ্ছি না। আমি এখানে থেকে তোমাদের সাময়িক পরাজয়ের দুঃখের ভাগ নিতে পারলে সবচেয়ে বেশি খুশি হতাম। কিন্তু মন্ত্রীমণ্ডলী এবং উচ্চপদস্থ অফিসারদের অনুরোধে আমাকে বাধ্য হয়ে চলে যেতে হচ্ছে। শ্যাম এবং মালয়ে এমন কিছু কাজ আছে যা আমি ছাড়া কেউ করতে পারবে না। আমি আজন্ম আশাবাদী, ভারতবর্ষ অচিরে মুক্ত হবে, এই আমার দৃঢ়বিশ্বাস। আমি চাই তোমরাও আমার আশায় আশান্বিত হও।

১৯৪৫ এর মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ব্যাঙ্ককে পৌঁছলেন। সেখানে তিনি ঝাঁসির রানী বাহিনীর মেয়েদের বাড়ীতে ফিরে যেতে বললেন। এর মধ্যে ৮ মে জার্মানির পতন ঘটেছে। হিটলারও আত্মহত্যা করেছেন। (জার্মানিতে এখনও বহু মানুষ আছে যারা হিটলার যে মরেছে তা বিশ্বাস করে না)। সুভাষচন্দ্র এক ভাষণে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধে জার্মানি যে সহযোগিতা করেছে তার জন্য অভিনন্দন জানালেন।

ততদিনে খোদ জাপানের অবস্থা ভয়াবহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাপানের রাজধানী টোকিওর উপর চলছে ক্রমাগত মার্কিন বিমান আক্রমণ। কোথায় আর তার সাম্রাজ্য, সে তখন নিজের জমিটুকু রক্ষা করতে ব্যস্ত। সুতরাং সুভাষচন্দ্রের ভারত অভিযানের পরিকল্পনা স্থগিত রাখতেই হল। তিনি সিঙ্গাপুর থেকে ক্রমাগত ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে বেতার বক্তৃতা দিয়ে যেতে থাকলেন।

১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে আমেরিকা এমন একটা কাজ করল যা হিটলারের নাৎসী নৃশংসতাকেও ছাড়িয়ে গেল। ৬ আগস্ট হিরোশিমায় এবং ৯ আগস্ট নাগাসাকিতে

অ্যাটমবোমা ফেলল। পৃথিবীর মানুষ এর বীভৎসতায় শিউরে উঠল। অনেকে বলে থাকেন যে জাপানী বাহিনীকে দ্রুত আত্মসমর্পণ করানোর জন্যেই আমেরিকা অ্যাটম বোমা ফেলেছিল। প্রকৃত ঘটনা, ভয়ঙ্করভাবে ক্ষতিগ্রস্ত জাপান তার আগেই আত্মসমর্পণের কথা চিন্তা করছিল। আর জাপান আত্মসমর্পণ করতে পারে এই চিন্তা করে আগেভাগেই আমেরিকা অ্যাটমবোমা ফেলল। কারণ তারা তাদের এই নতুন অস্ত্রটি মানুষের উপর পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছিল। আর তাদের লক্ষ্য ছিল যুদ্ধোত্তর দুনিয়ায় ক্রমেই প্রভাবশালী হয়ে ওঠা সোভিয়েত রাশিয়াকে টেক্কা মেরে তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ রক্ষা করা। এভাবেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়ঙ্করতম ঘটনাটি ঘটল।

১১ আগস্ট ১৯৪৫ সোভিয়েত রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। এটিও ছিল সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষে একটা নিন্দাজনক কাজ। যাইহোক, ১৩ আগস্ট রাত্রি দুটোর সময় সুভাষচন্দ্র খবর পেলেন যে জাপান আত্মসমর্পণ করেছে। তিনি সহকর্মীদের সাথে আলোচনা করতে চাইলেন। আয়ার বললেন—"আজ রাতটুকু আপনি বিশ্রাম করুন, কাল আলোচনা করা যাবে।" সুভাষচন্দ্র হেসে উত্তর দিলেন—"কাল থেকে তো অখন্ড বিশ্রাম।" সত্যিই এক অশান্ত মানুষের অখন্ড বিশ্রামের দিন এগিয়ে আসছিল।

আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্র

জ্ঞানী প্রীতম সিং, মোহন সিং-এর হাতে গড়া, পরে রাসবিহারী বসুর সংহত করা আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতৃত্ব সুভাষচন্দ্র বিনা মেহনতে পেয়ে গিয়েছিলেন। তিনি যখন ১৯৪৩ এর জুলাই মাসে সিঙ্গাপুরে এলেন ফৌজের সেনারা তাকে ঈশ্বর-প্রেরিত এক নেতা হিসাবেই মেনে নিল। জার্মানিতে সুভাষ অনেক চেষ্টা করেও হাজার তিনেকের বেশি সেনা যোগাড় করতে পারেন নি। এখানে তিনি একটা কুড়ি হাজারের সেনা বাহিনী শুধু পেলেন না, তার সাথে পেলেন একদল দক্ষ অফিসার, কুড়ি লক্ষ ভারতীয়ের সমর্থন, সর্বোপরি জাপ-প্রধানমন্ত্রী তোজোর সাহায্য। সুভাষচন্দ্র নিজে অত্যন্ত আবেগপ্রবণ মানুষ ছিলেন। তিনি এইসব প্রত্যাশী মানুষদের আবেগের জোয়ারে ভাসাতে থাকলেন। ১৯৪৩ এর ২৫ অক্টোবর জনসভায় তিনি যখন বৃটিশ এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন তখন সাধারণ ভারতীয়দের উপর তার প্রভাব দেখি শাহনওয়াজের লেখায়—

এই সংবাদ ঘোষণা করবার সঙ্গে সঙ্গে জনতা বিপুল উল্লাসে মহা হুঙ্কারে দিগন্ত প্রকম্পিত করে এর সম্বর্ধনা জানায়। প্রায় পনের মিনিট কাল পঞ্চাশ হাজারের উপর লোকের জনতা অস্থির উন্মত্তবৎ আচরণ করতে থাকে। উত্তেজিত জনতার শৃঙ্খলা রাখা কঠিন হয়ে উঠল, সবাই বক্তৃতা মঞ্চের কাছে যাবার জন্য ব্যস্ত। তখন নেতাজী সবাইকে বললেন—যে যেখানে আছেন সেখানেই দাঁড়িয়ে শুধু হাত তুলে তাঁদের অনুমোদন জানাতে,—সঙ্গে সঙ্গে এত হাত উঠল যে দেখে মনে হয় যেন এক মহারণ্য। এর পর ফৌজের সৈন্যেরা তাদের রাইফেল কাঁধে তুলে ঠিক এমনি করে তাদের সম্মতি জানাল। সেদিন যে দৃশ্য দেখেছি তা আর আমি জীবনে ভুলব না। ঝাঁসী রাণী বাহিনীর কয়েকজন মহিলা ভাবাতিশয্যে মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন। ভূমিতলে হতচেতনাবস্থায় শায়িত হয়েই মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ করে তাঁরা চীৎকার করছিলেন,—'চল দিল্লী, চল দিল্লী'।

সভাতে সভাতে চলল এমন 'ভাবাতিশয্য'। আজাদ হিন্দ সরকার ঘোষণা করল জাপান সরকারকে দশটি এ্যারোপ্লেন উপহার দেওয়া হবে। তার উপর বাংলার দুর্ভিক্ষে এক জাহাজ চাল পাঠানোর ঘোষণা। সুভাষচন্দ্র ভালই জানতেন যে বৃটিশ সরকার এই

চাল পাঠানোয় সম্মতি দেবে না। প্রকৃতপক্ষে এক জাহাজ চাল পাঠানোর মত অবস্থাও তার ছিল না। তবে তার এই রাজনৈতিক কৌশলটি বেশ ভালই কাজে লেগেছিল। সবমিলিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়রা ভাবছিলেন——এবার কিছু একটা নিশ্চয়ই হবে। এই আবেগের বশবর্তী হয়ে তিনি এমন সব আশ্বাস দিতে থাকেন যে তার সহকর্মীদের পক্ষেই তা যথেষ্ট বেশি বলে মনে হয়েছিল। *(এস. এ আয়ার)*

সরকার গঠনের পরের দিনই তিনি সামরিক পোষাক পরলেন। এ এম নায়ার তার স্মৃতিকথায় লিখেছেন যে প্রথমে তিনি জার্মান সমরনায়কদের মত পোশাক বানিয়েছিলেন। কিন্তু পরে তা বাতিল করে বৃটিশ-ভারতীয় বাহিনীর অফিসারের মত পোশাক পরলেন। জাপান সরকার তার জন্যে সিঙ্গাপুরে সমুদ্রতীরে অভিজাত কাতোং এলাকায় বিরাট একটা বাড়ীর ব্যবস্থা করেছিল। তিনি যেখানেই যেতেন তার সাথে যেত তার ব্যক্তিগত চাকরের দল, মায় পোশাক ঠিক করে দেবায় ভৃত্য পর্যন্ত (Volet)। তোজো সুভাষচন্দ্রকে একটা ১২ আসনযুক্ত এ্যারোপ্লেন উপহার দিয়েছিলেন, কিন্তু তার পাইলট ছিল জাপানী। সুভাষচন্দ্র ভারতীয় পাইলট নিযুক্ত করতে চাইলে তোজো মৃদু হেসে বলেন, "বিমানটি ভুল পথে চালিত হোক এই ঝুঁকি আমি নিতে চাই না"। নায়ার আরও লিখেছেন যে সুভাষচন্দ্র এর প্রতি মোহগ্রস্ত ছিলেন এবং এসবের ঘাটতি হলেই অত্যন্ত বিরক্ত হতেন। নায়ার এসব ব্যাপারের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, কিন্তু বর্তমান লেখকের মনে হয় না সুভাষ এসবের প্রতি মোহগ্রস্ত ছিলেন। কারণ, আবার আমরা পরে দেখেছি তার সেনাদের দুরবস্থার মধ্যে ফেলে দিয়ে সুভাষ পালিয়ে যান নি। আসলে সুভাষ জাঁকজমক পছন্দ করতেন। তিনি যে একটা স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, তিনি কারও চেয়ে কম যান না——অন্যদেশের রাষ্ট্রনায়ক এবং অফিসারদের দেখিয়ে দেওয়ার জন্যে ঐভাবে থাকতে চাইতেন।

ভারতে থাকাকালীন সুভাষ একদল এমন স্বেচ্ছাসেবক চেয়েছিলেন যারা হবে 'জার্মান নাৎসীদের মত কিংবা রাশিয়ার কমিউনিস্টদের মত' সুশৃঙ্খল এবং আদর্শের জন্যে উৎসর্গীকৃত প্রাণ। তিনি নাৎসীদের দল চালানোর পদ্ধতিতে অত্যন্ত প্রভাবিত ছিলেন যেখানে হিটলারের কথাই ছিল আইন। আজাদ হিন্দ সরকারে সুভাষ একাই ছিলেন সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী——অন্যরা সব নীরব শ্রোতা। প্রকৃতপক্ষে সুভাষের ভুল মতের বিরুদ্ধে বলার মত আত্মবিশ্বাসও কারো ছিল না। তাই এক ব্যক্তি-নির্ভর দল হিসাবে আজাদ হিন্দ সংগঠন চলত।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সবাই যে সুভাষের অন্ধভক্ত ছিলেন——তা নয়। কে পি কে মেনন লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। তিনি রাসবিহারী বসুর জাপানের অনুগত আচরণের বিরোধী ছিলেন। মেনন ছিলেন ভারতের স্বাধীনতার একজন সক্রিয় কর্মী কিন্তু তিনি জাপানকেও মনে করতেন এক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। সুভাষচন্দ্র যেখানে জাপানের 'সম উন্নতি অঞ্চল' পরিকল্পনাকে সমর্থন করেছিলেন কেশব মেনন বলতেন এটা জাপানের সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা। তিনি সুভাষচন্দ্রের একনায়কত্ব মনোভাবের বিরোধিতা করতেন এবং স্পষ্টবাক এই মানুষটি মুখের উপর তা বলেও দিতেন। স্বভাবতই সুভাষচন্দ্র এটা সহ্য করতে পারলেন না। ১৯৪৪ এর ২২ এপ্রিল ষাট বছরের বৃদ্ধ মেননকে ছ'বছরের জন্য কঠোর পরিশ্রমের কারাদন্ড দেওয়া হল। কারাবাসকালে মেননকে অসহনীয় কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল। তার স্ত্রী পুত্রের সাথেও দেখা করতে দেওয়া হয় নি। বাহ্যতঃ জাপানীরা তাকে এই কারাদণ্ড দিলেও এর মূলে ছিলেন সুভাষচন্দ্র। *(স্মৃতিকথা——এ এম নায়ার)*। মোহন সিং-কে গ্রেপ্তার যদি রাসবিহারীর কলঙ্ক হয়ে থাকে তো মেননের গ্রেপ্তার সুভাষের।

বর্মা অভিযানের আগে আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসারেরা সুভাষচন্দ্রকে অনুরোধ

করলেন মোহন সিং-এর সাথে দেখা করতে। তাদের অনুরোধে মোহন সিং-এর সাথে দেখাও করলেন। মোহন সিং আজাদ হিন্দ ফৌজে অংশগ্রহণ করতে চাইলেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র তাকে কোন আশ্বাস দিলেন না। তাকে মুক্ত করার চেষ্টাও করলেন না। কার্যত সুভাষ তাকে আজাদ হিন্দ ফৌজে ফিরিয়েও নেন নি। কারণ, মোহন সিং সম্বন্ধে তিনি জানতেন যে সব কথাতেই হ্যাঁ বলার পাত্র সে নয়। বন্দী মোহন সিং-এর কিছু সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করে দিয়ে তিনি কর্তব্য সমাপ্ত করলেন।

'অন্ধ সুভাষ পূজা' ছিল আজাদ হিন্দ ফৌজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রতি বছর অন্তত দুটি অনুষ্ঠান অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে পালন হত। 'নেতাজীর জন্মদিন উৎসব' এবং 'নেতাজী সপ্তাহ' পালন। ১৯৪৩ এর জুলাই মাসে তার প্রথম সিঙ্গাপুর পদার্পণকে স্মরণ করে প্রতি বছর সাতদিন ধরে চলত উৎসব। ২৩ জানুয়ারী তার জন্মদিন পালন হত সাড়ম্বরে। পৃথিবীর কোন সেনাবাহিনীতে তাদের জীবিত অধিনায়কের জন্মদিন এভাবে পালিত হত কিনা সন্দেহ। ১৯৪৫ এর জানুয়ারী মাসে যুদ্ধক্ষেত্রে আজাদ হিন্দ ফৌজ তথা জাপ-বাহিনীর অবস্থা ছিল ভয়াবহ। কিন্তু ২৩ জানুয়ারী উৎসবের কোন ঘটতি হল না। সোনা দিয়ে সুভাষচন্দ্রকে ওজন করা হল, একদল তরুণ-তরুণী নিজেদের রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা শপথ লিখে সুভাষের পায়ে সমর্পণ করল, গানও গাওয়া হল। কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে তার মাত্র দু'দিন আগে ২১ জানুয়ারী আজাদ হিন্দ ফৌজের অন্যতম সংগঠক রাসবিহারী বসু'র মৃত্যু হয়েছে। সে মৃত্যুর কোন ছাপই অনুষ্ঠানের জাঁকজমকে পড়ল না।

জাপ বাহিনী এবং আজাদ হিন্দের বর্মা অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। অন্তত নব্বই হাজার জাপানী সৈন্য এবং চার হাজার ফৌজের সেনা যুদ্ধে প্রাণ হারায়। এ ব্যর্থতা পুরোপুরি জাপানী সমন্বয়কদের। কিন্তু সুভাষচন্দ্রও তার দায় এড়াতে পারেন না। প্রশ্ন উঠতে পারে যুদ্ধে জয়-পরাজয় তো আছেই। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই বিপুল সেনাবাহিনীর খুব কম সংখ্যকই সম্মুখ যুদ্ধে গোলা-গুলির আঘাতে প্রাণ হারায়। বড় একটা অংশই মারা গিয়েছে অনাহারে আর রোগে ভুগে। এভাবে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করে সৈন্যদের যুদ্ধক্ষেত্রে কোন যোগ্য সমন্বয়ক পাঠায় না। জাপ-বাহিনীর সেনা নায়কদের অবশ্য এইসব ভুলের খেসারত দিতে হয়েছিল। বেশকিছু অফিসারের শাস্তিও হয়েছিল। জাপানী একনায়ক তোজো যে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন তার কারণগুলোর মধ্যে বর্মায় বিপর্যয়ও একটি। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের ভুল ধরবার সাহস তার বাহিনীর কারও হয় নি। একথাও অনস্বীকার্য যে সুভাষচন্দ্রের বিশেষ সামরিক শিক্ষা ছিল না। তবুও তিনি বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হয়েছিলেন। বাহিনীতে কিছু যোগ্য অফিসার ছিলেন। কিন্তু তারা 'নেতাজী মোহে' এতই আক্রান্ত ছিলেন যে সামরিক বুদ্ধিমত্তা দেখানোর সুযোগ পান নি। জাপানী উচ্চতর কর্তৃপক্ষের সাথে সুভাষ একাই কথা বলতেন। ফলে তার ব্যক্তিগত ভুলত্রুটি শোধরাবার সুযোগ থাকত না। আবেগ-প্রবণ সুভাষ যুদ্ধটাকে তার নিজের মতন করে ভেবেছিলেন। ভেবেছিলেন তার আহ্বানে দলে দলে সেনা বৃটিশ-ভারতীয় বাহিনী ছেড়ে তার ফৌজে যোগ দেবে। কিন্তু তার সে আশা ভুল প্রমাণিত হয়েছিল। উল্টে তিনি তার নিজের বাহিনীকেই সংহত রাখতে পারেন নি।

সব ভুলের গোড়াতেই রয়েছে জাপানের অভিসন্ধি সম্বন্ধে বুঝতে না পারা। জাপান যে ভারত অভিযান করছে না এটা তিনি কখনই বুঝতে পারেন নি। ফলে তিনি ভেবেছেন যেভাবে জাপান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় দ্রুতবেগে এলাকা দখল করেছে তেমনিভাবেই বুঝি ভারতের অভ্যন্তরে ঢুকে যাবে। তিনি সংবাদ সংগ্রহ থেকে খাদ্য সরবরাহ সব ব্যাপারেই জাপানের উপর নির্ভরশীল থেকেছেন। অবশ্য না থেকে উপায়ও ছিল না। জাপান আজাদ

াহন্দ ফৌজকে বর্মা দখলে রাখার লড়াইতেও ব্যবহার করেছিল। সুভাষচন্দ্রের পক্ষে বাধা দেওয়া সম্ভব হয় নি। সুভাষচন্দ্র জাপানীদের সাথে ব্যবহারে সর্বদাই আত্মমর্যাদার পরিচয় দিতে চাইতেন। একজন 'স্বাধীন' সরকারের রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে জাপান সরকারের কাছ থেকে শিষ্টাচারমূলক সমস্ত ব্যবহারই আদায় করতে পেরেছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে জাপ-সেনাপতি কাওয়াবের কাছ থেকে তার বাহিনীর কমান্ডারদের জাপানী সৈন্যেরা স্যালুট করবে এই প্রতিশ্রুতিও আদায় করেছিলেন। সুভাষচন্দ্রকেও তখন জাপানের প্রয়োজন ছিল। তার উপর এই ঋজু মনোভাব——সব মিলিয়ে তিনি জাপানীদের কাছ থেকে যথেষ্ট সমীহ আদায় করতে পেরেছিলেন। জাপানীদের কাছে তার সাহসী ও মর্যাদাসম্পন্ন মানুষের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল ছিল। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার ছিল, আজাদ হিন্দের আর কেউই জাপানীদের কাছ থেকে যোগ্য মর্যাদা পান নি। এমনকি আজাদ হিন্দ সরকারের মন্ত্রীদেরও জাপ-কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে উপেক্ষাই জুটেছে।

সুভাষচন্দ্রের বাহিনী যখন চরম বিপর্যয়ের মুখে তখন তিনি হাসপাতালে শিবিরগুলোতে ঘুরে ঘুরে তাদের দুঃখের সাথী হতে চেয়েছেন। নিজের ব্যক্তিগত চিকিৎসককেও সেনাদের চিকিৎসার কাজে লাগিয়েছেন। রেঙ্গুন পরিত্যাগের সময় ব.ম.র মত জাপানীদের প্লেনে পালিয়ে যান নি। মন্ত্রীসভার সদস্যবৃন্দসহ ছোট একটা দল নিয়ে গাড়ীতে এবং পায়ে হেঁটে ব্যাঙ্কক এসেছেন। তবুও তিনি শেষ পর্যন্ত তার সেনাদের পরিত্যাগ করেছিলেন। জাপানীরা দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছে, মিত্র-বাহিনী আসে নি——এরকম অভিভাবকহীন অবস্থায় ফৌজকে বেশ কিছুদিন সিঙ্গাপুর. মালয়, শ্যামে কাটাতে হয়েছে। কোন আদর্শ সেনাপতি কখনও এভাবে তার বাহিনীকে ফেলে রেখে চলে যায় না।

আজাদ হিন্দ ফৌজ কি বিপ্লবী বাহিনী

ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিয়েরা প্রায় সকলেই বলেছেন সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে ফৌজ এক বিপ্লবী বাহিনীতে পরিণত হয়েছিল। এইসব লেখকরা বিপ্লবী বাহিনী বলতে কি বোঝেন জানি না। কিন্তু আজাদ হিন্দ ফৌজ ছিল একটা পেশাদার সেনাবাহিনী। বিপ্লবী সেনাবাহিনী গড়ে ওঠে দেশের মধ্যেকার বিপ্লবী চেতনাসম্পন্ন চাষী-মজুর-ছাত্র-তরুণ নিয়ে। ফৌজ সেরকম কোন বাহিনী ছিল না। এই বাহিনী ছিল মূলত জাপানীদের হাতে যুদ্ধবন্দী ভারতীয় সৈনিকদের নিয়ে। প্রীতম সিং, মোহন সিং, রাসবিহারী বসু, ফুজিয়ারা, সুভাষের বক্তৃতা শুনে এরা রাতারাতি দেশভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন——এ ব্যাখ্যা অতি সরলীকরণ। এসব সেনাদের আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দেবার কারণগুলো নিয়ে বড় একটা আলোচনা হয় না।

১৯৪২ এর ৭ ডিসেম্বর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আক্রমণ সূচনা করে জাপান যত দ্রুতগতিতে শ্যাম, মালয়, সিঙ্গাপুর, বর্মা দখল করে নিল তা তাদের নিজেদের প্রত্যাশারও বাইরে। এই যুদ্ধজয়ে যে বিপুল সংখ্যক ভারতীয় সেনাকে তারা বন্দী করল তাদের নিয়ে কি করবে বুঝে উঠতে পারছিল না। জ্ঞানী প্রীতম সিং আগে থেকেই যোগাযোগ রাখছিলেন। ফুজিয়ারা তাকে ডেকে এনে সেনাবাহিনী গড়ার ভার দিলেন। প্রীতম সিং আর মোহন সিং-এর সাথে সাথে ফুজিয়ারা যে ঘুরে ঘুরে যুদ্ধবন্দী ভারতীয় সেনাদের বোঝাতেন তা নিশ্চয়ই ভারত-প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে নয়। যুদ্ধবন্দীদের যেভাবে জাপানীরা রাখত তা এককথায় অবর্ণনীয়। আজাদ হিন্দ ফৌজের মেজর ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু এরকম এক বন্দীশিবিরে ছিলেন। তার লেখা 'জাপানী বন্দী-শিবিরে' বইতে তার মর্মান্তিক কাহিনী বিবৃত করেছেন।

মনে রাখতে হবে যে মেজর বসু ছিলেন ডাক্তার। কোন বন্দী-শিবিরেই ডাক্তারদের উপর অত্যাচার কথা হয় না। তাদেরকে কাজে লাগানো হয়। জাপানী বন্দী শিবিরে তাকেও রেহাই দেওয়া হয় নি। খাবার খেতে না দিয়ে বন্দীদের রাস্তা, বাড়ী তৈরীর কাজ করানো হত। এমনকি হাসপাতালের বেড থেকে রোগী তুলে এনে তাদেরকেও পরিশ্রম করতে বাধ্য করা হত। বহু বন্দী কষ্ট সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছিল। আর অনাহারে, বিনা চিকিৎসায় রোগে ভুগে মৃত্যু ছিল নৈমিত্তিক ঘটনা। আজাদ হিন্দ সরকারের লে. কর্ণেল এ সি চ্যাটার্জ্জী লিখেছেন——

আমাদের কুড়ি হাজার সৈন্যের বাহিনীর মধ্যে সর্বমোট মারা গিয়েছিল চার হাজার। সেখানে জাপানীদের অধীনে ভারতীয় যুদ্ধবন্দী যে চল্লিশ হাজার ছিল তার মধ্যে এগারো হাজার সেনা প্রাণ হারিয়েছিল। *(ইন্ডিয়াস্ স্ট্রাগল ফর ফ্রীডম)*

একদিকে জাপানী বন্দী-শিবিরে অনাহার, রোগ-ভোগ, অমানুষিক পরিশ্রম অন্যদিকে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিলে ঘোরাফেরার স্বাধীনতা ছাড়াও মিলবে খাদ্য, পোষাক এমনকি বেতনও। অসামরিক ভারতীয় যারা সামান্য সংখ্যায় যোগ দিয়েছিল তাদের অনেকেরই চিন্তা ছিল সেনাবাহিনীতে একটা চাকুরির সুযোগ। দেশকে মুক্ত করার স্বপ্ন নিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজে কেউ যোগ দেয় নি, তা নয়। কিন্তু সে সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয়। তবুও সব যুদ্ধবন্দী সেনাই ফৌজে যোগ দেয় নি। ধর্মের নামে বৃটিশ-ভারতীয় বাহিনীর কাছে যে আনুগত্যের শপথ নিয়ে তারা বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল বেশির ভাগ সেনাই তা ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে পারে নি।

এরকম একটা সেনাবাহিনীর যা হয়ে থাকে, যুদ্ধক্ষেত্রে তাই হল। বৃটিশ-ভারতীয় বাহিনীর সাথে মোলাকাতের প্রথম সুযোগেই দল বেঁধে বেশ কিছু সেনা সেদিকে ভিড়ল। পুরো যুদ্ধের সময়জুড়ে দলত্যাগের হিড়িক চলতেই থাকল। সুভাষচন্দ্র কঠোর সাজার হুমকি দিলেন, দেশপ্রেমের কথা শোনালেন, সেনা অফিসারদের বকাবকি করলেন——কোন কিছুতেই কাজ হয় নি। পরিণামে জাপানী সেনাবাহিনীর চোখে ফৌজ ছোট হয়ে গেল, তারা উপহাসও করতে থাকল।

তার মানে এই নয় যে আজাদ হিন্দ বাহিনী যুদ্ধ করেনি বা সকলেই পালানো নিয়ে ব্যস্ত ছিল। বহু সৈনিক অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। কিন্তু বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করলেই কোন বাহিনী বিপ্লবী হয়ে যায় না। বৃটিশ-ভারতীয় বাহিনীর বহু সৈনিকও এই যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য বীরত্ব দেখিয়েছিল। যুদ্ধ শেষে তারা নানা উপাধি-পুরস্কারও পেয়েছিল। হিটলারের জার্মান বাহিনীর বীরত্বের খ্যাতি তো গোটা বিশ্বজুড়ে।

আজাদ হিন্দ ফৌজের আভ্যন্তরীন গঠনও ছিল যে কোন সাম্রাজ্যবাদী দেশের সেনাবাহিনীর মতই। শুধু পদ মর্যাদায় নয়, জীবন যাপনের উপকরণ ইত্যাদিতেও ছিল আকাশ-পাতাল প্রভেদ। সর্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্রের কথা ছেড়ে দিলেও অন্যান্য অফিসারদের সাথে সিপাহিদের বেতনের ফারাক ছিল অবাক করার মত। আজাদ হিন্দ সরকারের অর্থমন্ত্রী এ সি চ্যাটার্জ্জীর দেওয়া হিসাব অনুযায়ী বর্মা ফ্রন্টে একজন ফৌজের জওয়ান যেখানে মাসিক পকেট-মানি পেত তিরিশ ডলার, একজন কর্ণেলের মাসোহারা ছিল ৩৩০ ডলার আর মেজর জেনারেল পেত ৪২০ ডলার *(ইন্ডিয়াস্ স্ট্রাগল ফর ফ্রীডম)*। এরকম বেতন বৈষম্য কোন বিপ্লবী বাহিনী দূরস্থান, কোন সাম্রাজ্যবাদী সামরিক বাহিনীতেও ছিল না।

যে কোন বিপ্লবী বাহিনীর মূল বৈশিষ্ট্য তারা জনসাধারণের সাথে একই আশা-

আকাঙ্খার শারক। বিপদে জনসাধারণই বিপ্লবী বাহিনীকে সমস্তরকমভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। কিন্তু ফৌজের সাথে ভারতীয় জনসাধারণের সেরকম কোন সম্পর্ক ছিল না। লে. কর্ণেল এ সি চ্যাটার্জী আক্ষেপ করে লিখেছেন——

আমাদের লোক ভারতে পৌঁছুতে পেরেছিল এবং স্থানীয় লোকজনদের সাথে যোগাযোগ করেছিল। আমরা আনেকবার বেতারে প্রচার করেছি। কিন্তু মানুষ আমাদের লোকজন বা প্রচারকে বিশ্বাস করতে পারে নি। তারা ভেবেছিল এসবই জাপানী প্রোপাগণ্ডা। অন্যদিকে বৃটিশের প্রচার ছিল অনেক কার্যকরী এবং আমাদের দেশের মানুষকে বিশ্বাস করিয়েছিল। ফলে আমাদের নিজের দেশে খাদ্য পাই নি।

শুধু ভারতবর্ষে নয়, ব্রহ্মদেশেও আজাদ হিন্দ বাহিনী জনসাধারণের কাছ থেকে সহযোগিতা পায় নি। তাদের বিরুদ্ধে স্থানীয় অধিবাসীদের উপর অত্যাচার, লুঠ ইত্যাদির অভিযোগ বিশেষ ছিল না। কিন্তু জাপানীরা মালয়, শ্যাম, ব্রহ্মে অত্যাচার, হত্যা, লুঠতরাজ, বলাৎকার নামিয়ে এনেছিল। সেখানকার মানুষের জাপ-বাহিনীর প্রতি ছিল প্রবল ঘৃণা। আজাদ হিন্দ ফৌজ জাপানের সহযোগী হওয়াতে এই ঘৃণার ভাগ তাদেরও কুড়োতে হয়েছিল।

জাপ অধিকৃত অঞ্চলে জাপানের বিরুদ্ধে সেদেশের বিপ্লবী বাহিনী গড়ে উঠেছিল। বর্মায় এই বাহিনীর নেতা ছিলেন আউং সান। তিনি প্রথমে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জাপানের সাহায্য নিয়েছিলেন। জাপানীরা বর্মা দখল করার পর পুতুল সরকারে তাকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর পদেও বসিয়েছিল। কিন্তু আউং সান জাপানী সাম্রাজ্যবাদের রূপ দেখে তিনি তার বাহিনী নিয়ে জাপানী সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। জাপানীরা আজাদ হিন্দ ফৌজকে আউং সানের বিপ্লবী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লাগিয়ে দিতে চাইলেও সুভাষ রাজী হন নি। কিন্তু তিনি জাপানের পক্ষও ছাড়তে পারেন নি। জাপানের হাতের পুতুল ব ম-র সরকারকেই সমর্থন করে গিয়েছেন। আউং সানের বিপ্লবী বাহিনী তাই আজাদ হিন্দ ফৌজকে শত্রু বাহিনী হিসেবেই দেখেছে। পরে বর্মা মুক্ত হলে স্বাধীন বর্মার নেতা আউং সানকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভাড়াটে আততায়ীরা খুন করে।

আজাদ হিন্দ ফৌজের এই বিপ্লবী-বাহিনী বিরোধী ভূমিকা বর্মাবাসীরা কিন্তু ক্ষমা করে নি। আউং সানের মেয়ে সু চি বর্তমানে বর্মার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জনপ্রিয়তম নেত্রী। ১৯৯৫ এর ১২ ডিসেম্বর আনন্দবাজার পত্রিকায় সু চি-র এক সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। সেখানে সু চি-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে তার বইতে গান্ধী এবং জওহরলালের কথা শ্রদ্ধার সাথে আলোচনা করা হলেও সুভাষরচন্দ্রের নাম উল্লেখ করেন নি কেন, যেখানে তার বাবার সাথে সুভাষের একটা সম্পর্ক ছিল। এর জবাবে সু চি বলেন যে তার বাবার সাথে সুভাষচন্দ্রের সম্পর্ক ছিল নেহাতই পেশাগত। তিনি আরও বলেন যে ১৯৪৬ সালে শরৎচন্দ্র বসু যখন বর্মায় গিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে বিরূপতার কথা স্বয়ং আউং সান শ্রীবসুকে জানিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, ১৯৯৬ এর জানুয়ারীতে যখন আজাদ হিন্দ ফৌজের লক্ষ্মী সায়গল, জি এস ধীলন, প্রমুখ প্রাক্তন সেনানী ব্রহ্মদেশের মধ্যে দিয়ে সড়কপথে রেঙ্গুন থেকে ভারতসীমান্তে আসতে চেয়েছিলেন, ব্রহ্মদেশের সরকার সে অনুমতি দেয় নি। এই অভিযাত্রীদলের ইচ্ছে ছিল পথের দুধারে পুরনো দিনের মানুষের সাথে আলোচনা করবেন এবং সেদিনকার স্মৃতি ঝালিয়ে নেবেন। তাদের সে অভিজ্ঞতা অবশ্যই সুখকর হত না। এটা চিন্তা করেই বর্মা সরকার তাদের বিমানে করে রেঙ্গুন থেকে ইম্ফল পাঠিয়ে দেয়।

ব্রহ্মদেশের বিপ্লবীরা যেমন আজাদ হিন্দ ফৌজকে তাদের শত্রু ভাবত, একই রকম

ভাবে ফিলিপাইন্স, ভিয়েতনামের বিপ্লবীরা তাদের সাম্রাজ্যবাদী জাপানের দোসর ভেবেই এসেছে। বিপ্লবী সংগ্রামের সাথী ভাবতে পারে নি। আজাদ হিন্দ ফৌজকে যারা বিপ্লবী বাহিনী বলেন তারা ইতিহাস পরম্পরাশূণ্যভাবে অন্ধ জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর শিকার হন। এভাবেই ইতিহাস বিকৃতির জন্ম হয়।

মৃত্যুরহস্য এবং তা নিয়ে স্বার্থসিদ্ধির কৌশল

জাপান যে আত্মসমর্পন করতে চলেছে তা বিশ্ববাসী বুঝলেও সুভাষচন্দ্র বুঝতে চান নি। জার্মানি যখন আত্মসমর্পন করেছে, হিটলার আত্মহত্যা করেছেন, জাপান তার অধিকৃত ভূখন্ডগুলো হারিয়েছে, মার্কিন বোমারু বিমান খোদ টোকিও শহরের উপর প্রচন্ড বোমাবর্ষণ করছে, কেবল ৯ মার্চ এক রাতের বিমান আক্রমণে এক লক্ষ টোকিওবাসী নিহত হয়েছে—— তখন সুভাষচন্দ্র ১৮ জুন ১৯৪৫ সায়গন থেকে বেতার বক্তৃতায় বলছেন——

যুদ্ধ মানুষকে বিস্ময় উপহার দেয়। এবারের যুদ্ধের প্রথম বিস্ময় জার্মানির পরাজয়। যুদ্ধে আমাদের জন্যে আরও বহু বিস্ময় সঞ্চিত আছে। সেগুলি আমাদের শত্রুদের কাছে বাঞ্ছনীয় হবে না। ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হলেও পূর্ব এশিয়ার যুদ্ধ দীর্ঘদিন ধরে চলবে।

কিন্তু সত্যিই যখন জাপান আত্মসমর্পণ করল সুভাষচন্দ্র কি করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। ১২ আগস্ট থেকে ১৪ আগস্ট তিন দিন ধরে মন্ত্রীসভার সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করলেন। এতদিনকার পুরনো প্রথা ভেঙ্গে তিনি এসব আলোচনায় কথা বললেন কম. শুনলেন বেশি। প্রচারমন্ত্রী আয়ারের ভাষায়——

নেতাজী সেই আলোচনায় যোগ দিলেন নৈর্ব্যক্তিক নিরপেক্ষভাবে। একজন মন্ত্রী বললেন, "স্যার, আপনাকে যদি সিঙ্গাপুরে বন্দী করা হয় এবং বৃটিশ রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন বলে যদি এখানে বা ভারতে আপনার বিচার করে আপনাকে গুলি করে মেরে ফেলার আদেশ দেওয়া হয়, তবে সেই মুহূর্তেই সারা ভারতে বিদ্রোহ শুরু হয়ে যাবে এবং ভারত স্বাধীন হবে। পক্ষান্তরে ইংরাজরা যদি আপনাকে ছেড়ে দেয়, তবে তাও ভারতের অভীষ্ট সিদ্ধির সহায়ক হবে। যে পন্থাই তারা করুক না কেন, ভারত লাভবান হবেই।" *(স্টোরি অব দ্য আই এন এ)*

এইসব আলোচনা থেকে সুভাষ সিদ্ধান্ত নিলেন যে তিনি সিঙ্গাপুরেই থাকবেন।

কিন্তু ১৪ আগস্ট বিকেলবেলা আজাদ হিন্দ সরকারের আইন উপদেষ্টা এ এন সরকার এসে এত্তেলা দিলেন যে জাপান সরকারের উচ্চ পদস্থ অফিসারেরা সুভাষচন্দ্রকে ডেকে পাঠিয়েছে। কারণ কি, কেউ জানল না। "মন্ত্রীসভার সদস্যরা মোটামুটি অনুমান করে নিলেন যে, জাপানীরা নেতাজীকে রুশ অধিকৃত মাঞ্চুরিয়ায় পৌঁছে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েই এই বার্তা পাঠিয়ে থাকবে" *(স্টোরি অব দ্য আই এন এ)*। এই অনুমানের উপর ভিত্তি করেই সুভাষচন্দ্র, কর্ণেল হবিবুর রহমান, কর্ণেল প্রীতম সিং, এবং এস এ আয়ার চললেন ব্যাঙ্ককের উদ্দেশ্যে। পড়ে রইল আজাদ হিন্দ ফৌজ, কবে বৃটিশ বাহিনী আসবে আর তারা আত্মসমর্পণ করবে এই প্রতীক্ষায়। ব্যাঙ্কক থেকে একটা ছোট দলসহ সুভাষকে সায়গনে নিয়ে যাওয়া হল। দিনটা ১৭ আগস্ট ১৯৪৫। ঐ সায়গনেই জাপানী জেনারেল ইশোদা সুভাষকে বললেন একটা বিমান সায়গন ছেড়ে রুশ অধিকৃত মাঞ্চুরিয়ার দিকে যাচ্ছে তাতে আর একটা মাত্র আসন খালি। সুভাষচন্দ্র ইচ্ছে করলে একা যেতে পারেন। তার উপর চাপ সৃষ্টি করতে এমনকি বিমানের ইঞ্জিন পর্যন্ত চালু রাখা হয়েছিল——যেন

সুযোগটা ছাড়লেই বিমান ছেড়ে যাবে। সুভাষচন্দ্র নিতান্ত বাধ্য হয়েই রাজী হলেন। "আপন মনে সে সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েই ফেলেছেন, তাড়াতাড়ি একটা কিছু জবাব দেবার জন্য উপদেষ্টাদের ওপর চাপ দিলে তাঁরা অনিচ্ছার সঙ্গেই সম্মতি দিলেন" *(এস এ আয়ার)*। শেষ পর্যন্ত আর একজনকে জাপানীরা নিতে রাজী হলে কর্ণেল হবিবুর রহমান তার সাথী হল। সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দের অর্থ ও সম্পদ বেশ কিছু সিঙ্গাপুরে তার সাথীদের বিলিয়ে দিয়ে এসেছিলেন। এই যাত্রায় দুটো বড় বাক্স ভর্তি সোনা এবং দামী গহনা ইত্যাদি নিয়ে বিমানে উঠলেন। এই দুই বাক্স ভরতি সম্পদের হদিশ আজো মেলে নি।

এর পরের ঘটনা জাপানী সরকারের দেওয়া খবর অনুযায়ী বিমানটি তুরান হয়ে তাইহোকু পোঁছায়। ১৮ আগস্ট ১৯৪৫ দুপুর আড়াইটার সময় তাইহোকু ছাড়ার সময় এ্যারোড্রামের মধ্যে বিমানটি ৩০ ফুট উঁচু থেকে মাটিতে পড়ে এবং ভেঙ্গে যায়। কর্ণেল হবিবুর রহমানের বক্তব্য অনুযায়ী সুভাষচন্দ্রের মাথায় আঘাত লেগেছিল এবং বিমানের তরল জ্বালানিতে পোষাক ভিজে গিয়েছিল। ঐ অবস্হায় বিমানের সামনের দিক দিয়ে বেরোবার সময় তার গায়ে আগুন লেগে যায়। এতে সুভাষচন্দ্রের দেহ খুবই বিপজ্জনকভাবে পুড়ে যায় এবং ঐ দিনই রাত দশটা নাগাদ তিনি প্রাণ হারান।

এক্ষেত্রে লক্ষ্যনীয় যে সুভাষচন্দ্রের মন্ত্রীসভার সদস্যদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সিঙ্গাপুরে তার বাহিনীর সাথে থাকা সিদ্ধান্তটিই সঠিক ছিল। কিন্তু তিনি প্রথম সুযোগেই এই সিদ্ধান্তটি কার্যকর না করে জাপানী প্রলোভনে পা দিলেন। রাশিয়া যাওয়ার পরিকল্পনা করার আগে একবারও ভেবে দেখলেন না যে তখন সোভিয়েত রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে একমাত্র যুদ্ধরত দেশ। সোভিয়েত সরকার তাকে কি চোখে দেখে তাও চিন্তা করলেন না। যখন রাশিয়ার মানুষ আগ্রাসী জার্মান আক্রমণের সামনে মরণপণ লড়াই করছে, সুভাষ তখন নাৎসী জার্মানির হয়ে প্রচার চালিয়েছেন। তার প্রতি সোভিয়েত সরকারের বিতৃষ্ণা থাকা অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। এর আগে তিনি চাইলেও জাপানে সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত তার সাথে দেখা পর্যন্ত করেন নি। অন্যদিকে সুভাষ কি করে ভাবলেন যে জাপান তাকে তাদের শত্রু রাশিয়ার সাথে মিলতে দেবে। এর আগে ১৯৪৪ এর নভেম্বরে সুভাষচন্দ্র যখন নিজে থেকে জাপান আর সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে মধ্যস্হতার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, জাপ-কর্তৃপক্ষ রাজী হয় নি। এখন এই যুদ্ধের মধ্যে জাপানী বিমান তাকে রুশ অধিকৃত অঞ্চলে পৌঁছে দিতে পারে কি? আমরা এ বিষয়ে এ এম নায়ারের মন্তব্য উদ্ধৃত করব। নায়ার জীবনের অধিকাংশ সময় জাপানে কাটিয়েছেন এবং জাপান সরকারের হয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি লিখেছেন——

একথা বলা হয় যে, তিনি জাপানিদের সাহায্যে ব্যবস্হা করেছিলেন তাঁকে বিমানে করে রাশিয়ায় কিংবা রাশিয়া নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। জাপানি মনস্তত্ব সম্পর্কে যাদের প্রাথমিক জ্ঞান আছে তারা কেউই বিশ্বাস করবে না যে, কোনো জাপানি পাইলট তার বিমান নিয়ে রাশিয়ার মাটিতে নামবে, কিংবা এমনকি রাশিয়া নিয়ন্ত্রিত বিমানপথ দিয়ে যাবে। তার চেয়ে বরং তার আগেই সে অন্য কোন উপায়ে আত্মহত্যা করবে, খুব সম্ভবত ঐতিহ্যগত জাপানি প্রথা 'হারিকিরি' করে, কিংবা বিকল্প হিসাবে তার বিমানকে শত্রুপক্ষের গোলার আওতার মধ্যে নিয়ে গিয়ে নিজেকে বিধ্বস্ত করে ফেলবে 'কামি কাজে' বিমানের কায়দায়। এবং সেক্ষেত্রে একজন জাপানি কমান্ডার এমনভাবে তাঁর বিমানকে চালনার কাজে নিযুক্ত করবেন যাতে মনে হবে তখন তিনি তাঁর বিমানকে আর মাটিতে নামাতে চান না, কিংবা তার আরোহী হিসাবে নিজেকে আর

বাঁচাতে চান না। *(স্মৃতি-কথা)*। সুভাষচন্দ্র জাপানীদের চারত্রের এই দিকটি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না তা নয়। তবুও তিনি ঝুঁকি নিয়ে নিশ্চিত অনিশ্চয়তার মধ্যে নিজেকে ঠেলে দিয়েছিলেন। এর কারণ তার একরোখা এবং আত্মগরিমাপূর্ণ মনোভাব। তিনি যদি তার ফৌজের সঙ্গে সিঙ্গাপুরে থাকতেন তাহলে অবশ্যই যুদ্ধজয়ী বৃটিশ তাকে বন্দী করত। আর তাকে বন্দী করলে ভারতবর্ষের জনতার স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ আন্দোলনে ফেটে পড়ত। তাকে রোখার সাধ্য বৃটিশের ছিল না। আর এখানেই সুভাষের আপত্তি। তিনি জানতেন যে তার বন্দীত্বের ফলে ভারতে যে জন-আবেগ সৃষ্টি হবে তার পরিপূর্ণ ফয়দা তুলবে গান্ধী-জওহরলালেরা। তাকে মুক্ত করার দাবী নিয়ে গান্ধীই জোরদার আন্দোলন শুরু করবেন এবং সুভাষকে আবার সেই গান্ধীর নেতৃত্বই মেনে নিতে হবে। গান্ধী নেতৃত্বের কাছে আবার নতিস্বীকার তার কাছে মৃত্যুর সামিল বলে মনে হয়েছিল। তাই সুভাষ বেছে নিলেন চরমতম ঝুঁকির পথ। নিজের আত্মগরিমা অটুট রাখতে তিনি মৃত্যুবরণ করতেও পেছ-পা ছিলেন না।

দুর্ঘটনাটি আদৌ ঘটেছিল কিনা, ঘটলেও তাতে সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু হয়েছিল কিনা, মৃত্যু হলে সেটি কোন দুর্ঘটনার কারণে না কোন গভীর ষড়যন্ত্রের ফলে——এসব প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও তা আমাদের বিচার্য নয়। এসব নিয়ে বহু পুস্তকাদি লেখা হয়েছে। তবে দুঃখের বিষয় সেগুলি এক-একটা থ্রিলার ছাড়া আর কিছু নয়। সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু-রহস্য নিয়ে তথ্যসমৃদ্ধ বিশ্লেষণী আলোচনা আজও দুর্লভ। কিন্তু আমরা এখানে সুভাষচন্দ্রের একটা মূল্যায়নের চেষ্টা করছি, ঐ দিনই তার মৃত্যু হয়েছিল কিনা এ প্রসঙ্গে তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে তার ভূমিকাকে যুক্তিনিষ্ঠভাবে পর্যালোচনাই আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা শুধু এখানে তার মৃত্যু নিয়ে যেসব রাজনৈতিক এবং ব্যক্তিগত ফয়দা লোটার চেষ্টা হয়েছে বা হচ্ছে তারই রূপরেখা লক্ষ্য করব।

প্রথমতঃ সুভাষচন্দ্রের সংগঠনগুলো ছিল একেবারেই ব্যক্তিনির্ভর। সুতরাং তার মৃত্যুসংবাদ শোনার পর এসব সংগঠনের লোকেরা নিজেদের অসহায় মনে করতে লাগল। তারাই প্রথমে বলতে শুরু করে যে সুভাষচন্দ্র জীবিত আছেন। বাংলায় ফরোয়ার্ড ব্লকের পূর্বতন সদস্যরা এখবর বাংলায় খুব রটালেন। তাদের মধ্যমণি ছিলেন সুভাষচন্দ্রের বিশ্বস্ত সত্য গুপ্ত। সুভাষ যখন ভারতে ছিলেন, এই সত্য গুপ্ত তার বেশির ভাগ সফরে-সভায় মোটা লাঠি হাতে তার অনুগমন করতেন। সিঙ্গাপুর অঞ্চলেও রটনা হতে থাকল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কোথায় কোথায় সুভাষকে দেখা গেছে। এমনকি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে বৃটিশ সামরিক বাহিনীর গুপ্তচর বিভাগ থেকে এই মর্মে খবর পাঠাল যে জোর রটনা হচ্ছে সুভাষচন্দ্রকে সায়গনে দেখা গেছে, ক্ষমতা হস্তান্তরের সভায় তিনি দিল্লীতে উপস্থিত হবেন। সেইসময় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সাথে ইংরেজদের ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে কথা চলছিল। বৃটিশ দেখল এরকম রটনা তাদের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সেইজন্যে বৃটিশ রটিয়ে দিল যে সুভাষচন্দ্র রাশিয়া গিয়েছেন। সেখানে তাকে স্তালিন জেলে আটকে রেখেছে কিংবা তাকে গুলি করে হত্যা করেছে। পরে ১৯৪৯ সালে বোম্বাইয়ের 'ব্লিৎজ' পত্রিকা খবর প্রকাশ করল যে তুরস্কে বৃটিশ রাষ্ট্রদূত তাদের সরকারকে জানিয়েছে যে সুভাষচন্দ্র রাশিয়াতে আছেন। এসব রটনাও বেশ ফলবতী হয়েছিল।

এরপর স্বাধীন ভারতে নেহেরু সরকার শাহনওয়াজ খানের নেতৃত্বে এক তদন্ত কমিটি বসায়। ১৯৫৬ সালে ঐ কমিটি পূর্ব এশিয়া ঘুরে এসে রিপোর্ট দেয় যে বিমান দুর্ঘটনায় সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু হয়েছে। ঐ কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন সুভাষচন্দ্রের বড় দাদা সুরেশচন্দ্র বসু। তিনি কমিটির রিপোর্টের সাথে একমত হন নি। শুধু তাই নয়, তিনি

অভিযোগ করেন যে শাহনওয়াজ খান. এস এন মৈত্র এবং বিধানচন্দ্র রায় নেহেরুর স্বার্থে একজোট হয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন *(ডিসেন্সিয়েন্ট রিপোর্ট ৯৮.১০১.১৭৯)*। এর পর ১৯৭০ সালে ইন্দিরা গান্ধী সরকার জি ডি খোশলার নেতৃত্বে আর একটা কমিশন করেছিলেন। এরা রিপোর্ট দিয়েছিলেন যে বিমান দুর্ঘটনায় সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু হয়েছে এবং ভারত সরকার তা মেনে নেয়।

এদিকে ১৯৬১ সাল নাগাদ হল এক হৈ হৈ কান্ড। চারদিকে রটে গেল যে সুভাষচন্দ্র ফিরে এসেছেন। দলে দলে মানুষ ছুটল উত্তরবঙ্গের শৈলমারীতে এক 'সাধু'কে দেখতে। সত্য গুপ্ত এবং উত্তমচাঁদ বললেন——ইনিই নেতাজী। সত্য গুপ্ত একটা নতুন রাজনৈতিক দল পর্যন্ত স্থাপন করে ফেলেছিলেন। আর এক 'সাধু' বালক ব্রহ্মচারী বলে বেড়াতে লাগলেন —সুভাষচন্দ্রের সাথে তার নিয়মিত কথাবার্তা হয়। এতে বালক ব্রহ্মচারীর পসার খুব বেড়ে গিয়েছিল। অধ্যাপক সমর গুহ ছিলেন একজন সাংসদ। সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু-রহস্য নিয়ে বই লিখে খুব বাজার করেছিলেন।   সালের ২৩ জানুয়ারী সুভাষচন্দ্রের এক ছবি খবরের কাগজে দিলেন যাতে প্রমাণিত হয় যে তিনি বিমান দুর্ঘটনার পরেও বেঁচে আছেন। কিন্তু তার রহস্য ফাঁস হতে বিলম্ব হল না। শরৎ বসুর ধড়ের উপর সুভাষচন্দ্রের মুখের ছবি বসিয়ে দেখানো হয়েছে ফটোগ্রাফিক ধাপ্পাবাজি। এর পরেও সমর গুহ দিব্যি সম্মানীয় সাংসদ থেকে গেলেন। সুভাষচন্দ্রের পরিবারের সদস্যরা দু'ভাগ হয়ে মৃত্যুরহস্য নিয়ে দুরকম অবস্থান নিয়েছেন। একদল বলছেন জাপানের রেনকোজি মন্দিরে রয়েছে সুভাষচন্দ্রের চিতাভস্ম। অন্যদল বিমান দুর্ঘটনায় সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু হয়েছে মানতে রাজী নন। এই যে দুরকম অবস্থান তা কোন সত্যের প্রতি অনুরাগবশত——তা নয়। এর মধ্যে অন্যরকম ব্যাপার আছে।

সুভাষচন্দ্রের মৃত্যুর পর সুকৌশলে এমন ধারণা মানুষের মনে গেঁথে দেওয়ার চেষ্টা চলেছে যেন তিনি বেঁচে আছেন। তাই বারবার নানা গুজব রটেছে, নানা জাল ফটোগ্রাফ প্রকাশিত হয়েছে, নানা সূত্রে বেঁচে থাকার খবর প্রচারের চেষ্টা চলেছে। এই চেষ্টা সত্তরের দশক পর্যন্তও খুব প্রবল ছিল। আজ যখন সুভাষচন্দ্রের জন্মের পর একশো বছর কেটে যাচ্ছে, বেঁচে থাকার প্রচার যখন মানুষকে হজম করানো যাচ্ছে না, তখন বস্তা থেকে আবার সেই পুরানো গুজব টেনে বার করা হচ্ছে। সুভাষচন্দ্রের পালিয়ে রাশিয়া চলে যাবার গুজব। কেউ তাকে সাইবেরিয়ায় ভেড়া চরাতে দেখেছে, কেউ দেখেছে ইউক্রেনে শ্রমিক মহল্লায়, কেউ দেখেছে রুশ বন্দীশালায়। এসব প্রচারের জন্যে অনেক স্বঘোষিত গবেষকের উদ্ভব হয়েছে। তাদের মদত দেওয়ার জন্যে প্রভাবশালী মহলের অভাব নেই। জনসাধারণের মনে সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু নিয়ে বিপুল কৌতূহল সৃষ্টিতে ভারত সরকারের বিশেষ অবদান আছে। এ নিয়ে মানুষের কৌতূহল নিরসন শাসকদের উদ্দেশ্য নয়। সাধারণ মানুষকে মাতিয়ে রাখার ক্ষেত্রে এটা একটা কৌশল। ১৯৯৫ তে কেন্দ্রীয় সরকার রেনকোজি মন্দির থেকে চিতাভস্ম আনতে চাইছেন বলে জানালেন। বিদেশমন্ত্রী প্রণব মুখার্জী উদ্যোগ নিলেন। সুভাষচন্দ্রের ভাইপো শিশিরকুমার বসুর সমর্থন নিয়ে তিনি এমেলি শেঙ্কেল-এর সাথে দেখা করলেন। সরকার কিন্তু ভালমতই জানত যে জনমতের একটা অংশ এতে সায় দেবে না। প্রকৃতপক্ষে সরকার চিতাভস্ম আনতেও চায় নি। শুধু মাঝখানে জনসাধারণের ভাবাবেগ একটু উস্কে দিতে চেয়েছিল। মানুষ যেন এই ঘটনা নিয়ে মেতে থাকে। সুভাষচন্দ্রের মৃত্যুরহস্য ভারতবর্ষের শাসকদের, কিছু রাজনৈতিক দলের, কিছু ব্যক্তির বহমান স্বার্থের রক্ষক। তাই এই রহস্য উন্মোচনের আশা সুদূর পরাহত।

INA যুদ্ধবন্দীদের বিচার ও ক্ষমতা হস্তান্তর

১৯৪৫ সালেই বৃটিশের হাতে যুদ্ধবন্দী আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যদের দিল্লী আনা হল। যারা ধ্বনি তুলেছিল 'দিল্লী চলো', যারা স্বপ্ন দেখেছিল দিল্লীর লালকেল্লায় স্বাধীন ভারতের পতাকা তুলবে তারাই আজ লালকেল্লায় বন্দী। বৃটিশ শাসন তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে বিশ্বাসভঙ্গের, অভিযোগ বিশৃঙ্খলার। আরও বড় কিছু অভিযোগ আছে. যা হল জাপানের হাতে ভারতীয় যুদ্ধবন্দী——যারা আজাদ হিন্দে যোগ দেয়নি তাদের উপর অত্যাচার করার। ভারতবাসীর কাছে যা ছিল দেশপ্রেম , বৃটিশের কাছে তা বিশ্বাসঘাতকতা।

এই বন্দী আজাদ হিন্দ ফৌজই কংগ্রেসকে বাঁচিয়ে দিল। কংগ্রেস তখন মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে। ৪২ এর ভারত-ছাড় আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। বৃটিশ সরকার কংগ্রেস নেতাদের জেল থেকে মুক্তি দিলেও যারা ছিল প্রকৃত অন্দোলনকারী তাদের কারাবন্দী করে রখেছে। আন্দোলনের অন্যতম নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ তখনও জেলে আটক। নেতারা জেল খেকে বেরিয়েই ভারত ভাগ করে কতটা শাসন ক্ষমতা পাওয়া যাবে ইংরেজ আর জিন্নার সাথে সেই হিসাব কষতেই ব্যস্ত। কিন্তু সেখানেও তারা লাভ করতে পারে নি। আলোচনা ভেস্তে গিয়েছে। রাজনীতি-সচেতন মহলে আলোচনা হচ্ছে স্বাধীনতা কত বছর পিছিয়ে গেল তা নিয়ে। আমরা আগেই দেখেছি 'ভারত ছাড়' আন্দোলন অহিংস থাকে নি। আন্দোলন গান্ধী বা গান্ধীপন্থীদের নেতৃত্বেও হয় নি। যারা এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তারা অহিংসবাদী ছিলেন না। জনসাধারণও অহিংস সত্যাগ্রহ ইত্যাদির উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিল। মোটকথা কংগ্রেস তখন ছন্নছাড়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায়। INA বন্দীদের বিচার কংগ্রেসকে রক্ষা করল। কংগ্রেস নেতারা এমন একটা বিষয় অন্তত পেল যা নিয়ে তারা আন্দোলন করতে পারে। নেহরু এগিয়ে এলেন। তিনি এক বিবৃতিতে বললেন :——

যে কোন সময়েই এদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর আচরণ করা ভুল হবে, কিন্তু বর্তমান সময়ে——যখন ভারতে বড় রকমের পরিবর্তন আসছে বলা হচ্ছে——এদের প্রতি সাধারণ বিদ্রোহীর মত আচরণ করলে গুরুতর ভুল করা হবে এবং তার ফল হবে সুদূরপ্রসারী। তাদের শাস্তি দেওয়া হলে কার্যত সারা ভারত এবং সকল ভারতীয়কেই শাস্তি দেওয়া হবে এবং কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হবে।

এ কোন নেহরু কথা বলছেন? একি সেই নেহরু যিনি সুভাষ সম্পর্কে এর আগে বলেছেন——

আমি অনুধাবন করতে পারি যে তিনি ভুল পথে চলেছেন। তার পথ আমি কোনমতেই গ্রহণ করতে পারি না। তিনি যদি সত্যিই ভারত অভিযানে আসেন আমি অবশ্যই তার বিরোধিতা করব। কারণ বাইরে থেকে যে শক্তি আসবে তা হবে জাপানের হাতের পুতুল মাত্র। *(জে এল নেহরু সিলেক্টেড ওয়ার্কস্ Vol. 12)*

সেই নেহরু এখন ফৌজের বন্দীদের পক্ষে দাঁড়ালেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিও INA বন্দীদের সমর্থন জানাল। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে কংগ্রেস এই সমর্থন জানাচ্ছে তা বোঝা যায় নেহরুর কথায়। যখন তিনি বলেন যে ভারতের জনসাধারণ জানে যে রাজার নামে শপথ নিয়ে তা ভাঙলে শাস্তি দিতে হয়। কিন্তু বৃটিশ শাসকেরা বুঝছে না যে যুদ্ধের পর ভারতবাসী স্বাধীনতার জন্য কিরকম উদগ্রীব। বৃটিশের বোঝা উচিত INA-র কাহিনী ভারতবাসীর উপর কতটা প্রভাব সৃষ্টি করবে। *(সিলেক্টেড় ওয়ার্কস Vol. 14)*

সুতরাং কংগ্রেস নেতারা ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আদালতে INA সেনার পক্ষে সমর্থন করার জন্যে কংগ্রেসের বাঘা বাঘা আইনজীবী নিয়ে ডিফেন্স কমিটি তৈরী করা হল। খোদ নেহরু তার ব্যারিস্টারি পোষাক (শামলা) পরলেন দীর্ঘ পঁচিশ বছর পরে। ভুলাভাই দেশাই, তেজবাহাদুর সপ্রু, আসফ আলিও ডিফেন্স কমিটিতে ছিলেন। এইভাবে কংগ্রেস স্বাধীনতা আন্দোলনে তার বিশ্বাসযোগ্যতা টিঁকিয়ে রাখল।

ভারতের কমিউনিস্টরাও তাদের আগের অবস্থান পাল্টে ফেলে INA বন্দীদের মুক্তির দাবীতে জোরদার আন্দোলন শুরু করলেন। আন্দোলন সবচেয়ে ব্যাপক এবং জঙ্গী হল বাংলায়। বেশ কিছু কল-কারখানায় ধর্মঘট করা হল, কলকাতায় বামপন্থী ট্রাম-শ্রমিকরাও ধর্মঘট করলেন। অত্যন্ত সঠিকভাবেই তারা INA বন্দীদের মুক্তির দাবীতে আন্দোলন করেছিলেন। কিন্তু INA বাহিনীর যথাযোগ্য মূল্যায়ন তারা জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেন নি। সেদিনের সেই পরিবেশে তারা সে সাহস অর্জন করতে পারেন নি।

ইংরেজরা বন্দী INA বাহিনীর মধ্যে ভাঙ্গন ধরানোর চেষ্টা করেছিল। তারা চেয়েছিল সেনাদের বড় অংশ ভুল স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থণা করুক। কিন্তু তাদের পরিকল্পনা আংশিক মাত্র সফল হয়েছিল। INA সৈন্যদের একই জায়গায় রাখায় দীর্ঘদিন পরে সৈন্যরা আবার একসাথে মিলিত হয়েছিল। ফলে তাদের উদ্দীপনা বেড়ে গিয়েছিল, সর্বোপরি লালকেল্লায় তাদের সঙ্গে বন্দী ছিলেন INA-এর প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং মোহন সিং। বন্দী সৈন্যরা সহজে নতি স্বীকার করল না।

গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে যে অস্থিরতা চলছিল তার কারণ কেবলমাত্র INA-এর বিচার ছিল না। দেশে তখন নিদারুণ সংকট চলছে। কংগ্রেস খালি টেবিলের রাজনীতিতে ব্যস্ত। ইংরেজ শাসনের এই শিথিলতার সময়ে দেশীয় শিল্পপতি, জমিদারেরা তাদের শোষণ বহুগুণ বাড়িয়ে দিল। সেই শোষণ অত্যাচার চাষী মজুরেরা মুখ বুঝে মেনে নিল না। ইতিহাস লিখিয়েরা এমনভাবে লিখেছেন যেন পরবর্তীকালে বিক্ষোভ-বিদ্রোহগুলো সব INA-র প্রভাবের ফলেই হয়েছে। তারা এটা করেন গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামকে খাটো করার উদ্দেশ্যেই। অন্ধ্রপ্রদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল তেলেঙ্গানায়, বাংলার গ্রামাঞ্চলে, বহুদূর ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে INA বন্দীদের কথা পৌঁছলেও তা নিয়ে উন্মাদনা সৃষ্টি হয় নি। সেখানকার গণ-আন্দোলন একেবারে তাদের নিজস্ব।

ঐতিহাসিক নৌ-বিদ্রোহের সেনানীরা INA-এর ঘটনায় অবশ্যই অনুপ্রাণিত হয়েছিল। কিন্তু তার ফলেই তারা বিদ্রোহ করে একথা বললে নৌ-বিদ্রোহকে ছোট করা হয়। নৌ-বিদ্রোহের সবচেয়ে লক্ষ্যনীয় দিক ছিল স্থানীয় শ্রমজীবী মানুষের ব্যাপক সমর্থন। কেন্দ্রীয় নৌ-ধর্মঘট কমিটি তাদের শেষ বক্তব্যে সঠিকভাবে বলে—"আমাদের ধর্মঘট জাতির জীবনে এক ঐতিহাসিক ঘটনা। এই প্রথম সামরিক বাহিনী আর সাধারণ মানুষের রক্ত রাস্তায় বয়ে গেল একই সঙ্গে, একই উদ্দেশ্যে।" উল্লেখ করা যেতে পারে যে কংগ্রেস নেতারা INA কে সমর্থন করলেন, তারাই আবার নৌ-বিদ্রোহে পিছন থেকে ছুরি মারলেন। ১ মার্চ ১৯৪৬ অন্ধ্রের কংগ্রেস নেতা বিশ্বনাথনকে বল্লভভাই প্যাটেল চিঠিতে লেখেন—"সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা নিয়ে কোন আপোস চলে না.........স্বাধীন ভারতেও আমাদের সেনার প্রয়োজন হবে" *(সরদারস্ লেটারস্ Vol. IV)*। অরুণা আসফ আলি ছিলেন এই বিদ্রোহের একজন সক্রিয় সমর্থক। বিদ্রোহের সমর্থনে তিনি জওহরলালকে বোম্বাই আসতে অনুরোধ করেন। জওহরলাল প্রথমে রাজী হলেও পরে তিনি "হিংসার উন্মত্ত বহিঃপ্রকাশ রোধ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন" *(এন ম্যানসর সম্পাঃ—ট্রানস্ফার অব পাওয়ার Vol. VI)*। আর গান্ধী! তিনি বলেন যে চাকরি নিয়ে রেটিংদের যদি কোন অভিযোগ থাকে

তবে তাদের উচিত শান্তিপূর্ণভাবে পদত্যাগ করা। নৌ-বিদ্রোহের সৈনিকেরা কমিউনিস্টদের কাছে নেতৃত্ব চেয়েছিল। কিন্তু ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বিদ্রোহের সমর্থনে ধর্মঘট, বিক্ষোভ, ইত্যাদি করলেও নেতৃত্ব দেওয়ার সাহস দেখায় নি। পরবর্তিকালে স্বাধীন ভারতে নৌ-বিদ্রোহের সৈনিকদের যোগ্য মর্যাদাও দেওয়া হয় নি।

ভারতের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের বিস্তৃর্ণ এলাকা জুড়ে দেখা দিয়েছিল বিদ্রোহ। ১৯৪৬ থেকে শুরু হওয়া অন্ধ্রপ্রদেশের তেলেঙ্গানা বিদ্রোহ তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। ষোলো হাজার বর্গমাইল এলাকা জুড়ে তিন হাজার গ্রামের তিরিশ লক্ষ মানুষ এই বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিল। এরা একটা সমান্তরাল প্রশাসন পর্যন্ত গড়ে তুলতে পেরেছিল। এই বিদ্রোহ এতো দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল যে ১৯৪৮ সালে স্বাধীন ভারত সরকার মিলিটারী নামিয়ে কৃষকদের সাথে প্রত্যাক্ষ যুদ্ধ করে একে দমন করে।

ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে (বর্তমান কেরল) শেরতৈল-আলেপ্পে-আম্বালপূজা এলাকার জেলে, পাসি (যারা তাড়ি তৈরী করে), নারকেল ছোবরা কারখানার শ্রমিক, কৃষি-মজুরেরা এক তীব্র সংগ্রাম গড়ে তোলে। বিদ্রোহী শ্রমিকেরা একটা পুলিশ ফাঁড়ি পর্যন্ত দখল করে নেয়। ১৯৪৬ সালের ২৭ আগস্ট সেনাবাহিনী অভিযান চালিয়ে সংগ্রামী শ্রমিকদের খুন করে। 'পুন্নত্র-বয়লার' নামে পরিচিত এই অভ্যুত্থানে প্রায় ৮০০ জন শ্রমিক নিহত হয়।

এই ১৯৪৬ সালেই বাংলার গ্রামাঞ্চলের বর্গাদারদের গড়ে তোলা তেভাগা আন্দোলনও ছিল এক বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম। জোতদার আর পুলিশের সম্মিলিত আগ্নেয়াস্ত্রের সামনে বর্গাদারেরা শুধুমাত্র লাঠি নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। এই লড়াইয়ে ৪৯ জন কৃষক নিহত হয় যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় ছিল আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষ।

এইসব বিদ্রোহের কথা উল্লেখ করলাম এই জন্যে যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিস্তৃর্ণ অঞ্চলের এই লাখো লাখো কৃষকের আত্মদানকে মর্যাদা দেওয়া হয় না। যদি প্রশ্ন করা হয় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে লড়াইয়ের ধারা কোনগুলি? ইতিহাস লিখিয়েরা প্রথমেই বলেন গান্ধীর নেতৃত্বে অহিংস আন্দোলনের কথা, তারপর তারা উল্লেখ করেন সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে আই,এন,এ-র নাম। এরসাথে কেউ কেউ জুড়ে দেন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ধারাকে। কিন্তু শ্রমজীবী মানুষের এই লড়াইয়ের কথা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অনুল্লেখিতই থেকে যায়। কারণ স্বাধীন ভারতেও শাসক শ্রেণী ভুলিয়ে দিতে চায় ভারতের চাষী-মজুরের সংগ্রামী ঐতিহ্যের কথা। এই ঐতিহ্য তাদের কাছে ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন। এক্ষেত্রে বামপন্থী লেখকেরাও তাদের ইতিহাস চেতনার পরিচয় দেন নি। মুষ্টিমেয় দু'একজনের লেখা বাদ দিলে, তারাও শাসকের তৈরী মসৃণ রাজপথ দিয়েই চলেছেন। এমনকি বিশিষ্ট লেখক সুধী প্রধানের সুলিখিত গ্রন্থ 'সুভাষচন্দ্র, ভারত ও অক্ষশক্তি'তেও তার উদাহরণ দেখি। বইয়ের প্রচ্ছদে পুস্তক পরিচিতিতে অ্যাটলীর উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে বৃটিশ সরকার সুভাষচন্দ্রের ভয়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছিল! বইটির রচয়িতাদের মতে "ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের এ ইতিহাসটা সরকারী ইতিহাসকারেরা ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা করে আসছে।"(তাদের এই মনোকষ্ট শীঘ্রই দুর হয়ে যাবে। সে কথায় পরে যাব)। এখানে হস্তান্তরের ক্ষেত্রে শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের ভূমিকা ভুলে যাওয়া হয়েছে। গান্ধী অথবা সুভাষচন্দ্রের জন্য স্বাধীনতা এসেছে——এ ধরনের চিন্তা অতি সরলীকৃত। বিশ্ব-পরিস্থিতির বিশ্লেষণ এখানে অনুপস্থিত।

ইতিহাসের একটা নির্দিষ্ট সময়ে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকায় বহু দেশ দখল করে বসে। এটা ছিল ঔপনিবেশিক শোষণের যুগ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সাথে সাথে ইতিহাসের নিয়মেই এই ঔপনিবেশিক শাসনের যুগ শেষ হয়ে

এল। বস্তুত পক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে থেকেই অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের যুগ শুরু হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছিল ইতিহাসের সেই সন্ধিক্ষণ যেখানে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ সরে জায়গা ছেড়ে দিল অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদকে। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের জগৎ-প্রভু ছিল বৃটেন। আর অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের ক্ষেত্রে সিংহাসনটা দখল করল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। আটলান্টিক সনদে সই করলেন দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রতিনিধি মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট আর বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল। এটাও লক্ষণীয় যে চার্চিল এশিয়ার ক্ষেত্রে সনদ মানতে রাজী হচ্ছিল না। কিন্তু তার তখন উপায় নেই। ততদিনে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের পরাজয় ঘটে গিয়েছে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের কাছে। উপনিবেশগুলির মুক্তি ছিল আটলান্টিক সনদের মূল প্রতিপাদ্য। মনে রাখতে হবে এটি রচনা করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট। তিনি তার সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ অক্ষুন্ন রেখেই উপনিবেশগুলির মুক্তির সনদ তৈরী করেছিলেন। কিন্তু বিপদ ঘটল অন্য জায়গায়। ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি লাভের সময় কোন কোন দেশের বিপ্লবী জনতা নিজের দেশকে সমস্ত রকম অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্ত করে ফেলল। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর মুখ্য কাজই হয়ে দাঁড়ালো রাস্ট্র বিপ্লব এড়িয়ে উপনিবেশগুলোর ধনিক শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর। এতে তাদের দেশের যে সমস্ত কম্পানি সে দেশে বাণিজ্য করছে তাদের স্বার্থ রক্ষিত হবে। তাই ভারত যে স্বাধীন হচ্ছে সেটা বুঝতে কারো বাকি ছিল না। গান্ধী, জওহরলাল, প্যাটেল সবাই জানত স্বাধীনতা প্রাপ্তি শুধু সময়ের অপেক্ষা মাত্র। সুভাষচন্দ্র যে পরাজিত হয়েও বার বার বলেছেন——ভারত স্বাধীন হবেই, তা এমনি নয়। গান্ধীর ভারত-ছাড় আন্দোলনের ব্যর্থতা, সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ বাহিনীর পরাজয়, সন্ত্রাসবাদী সমস্ত শক্তিকে চূর্ণ করার পরও এই কারণে বৃটেন ভারত ছেড়ে চলে গিয়েছিল। এই চলে যাওয়াটা আরও বিলম্বিত হতে পারত, যদি না ভারতের শ্রমজীবী মানুষেরা অমন রুখে দাঁড়াতো। কংগ্রেস নেতারা প্রথমে এসব আন্দোলনের মধ্যে ঢুকে তার সর্বনাশ করতে চাইল। জওহরলালের বিপ্লবী বুলির তুবড়ি ছুটল। শিল্পপতিরা তাতে কিন্তু আতংকিত হল না। জওহরলালকে তারা চিনে নিয়েছে। ঘনশ্যাম দাস বিড়লা বৃটেনের এক সরকারী প্রতিনিধিকে এই বলে আশ্বস্ত করলেন——"জওহরলাল নেহেরুসহ ভারতে এমন কোন রাজনৈতিক নেতা নেই যিনি কোন রকম সংকট বা হিংসা দেখতে চান——গণ-অস্থিরতা আর চালু পরিস্থিতির জন্যেই নেহেরুকে অমন উগ্র বক্তৃতা দিতে হচ্ছে। এমনকি নেতাদেরও অনেক সময় ঐ পথে চলতে হচ্ছে। তবে আমার মনে হয় নিকট ভবিষ্যতে ক্রমেই ভাষা আরও নিয়ন্ত্রিত হয়ে যাবে।" *(এন ম্যানসার সম্পাদিত :- ট্রান্সফার অব পাওয়ার Vol. VI)*। কিন্তু জওহরলালের এসব চেষ্টা বিফলে গেল। এ আন্দোলনগুলো শহরের শিক্ষিত মানুষের ছিল না। এখানে জওহরলালরা দাঁত ফোটাতে পারল না। কংগ্রেস এবং ইংরেজ শাসক আতঙ্কিত হতে থাকল। আন্দোলনের তীব্রতা বাড়ছে এবং ক্রমেই নতুন নতুন এলাকায় বিদ্রোহের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। আতঙ্কিত ইংরেজ এবং কংগ্রেস আর মুসলিম লীগ দ্রুত ক্ষমতা ভাগাভাগি করে নিতে চাইল। ধনিক শ্রেণীর দুই দল কংগ্রেস আর মুসলিম লীগ ভারতকে ভাগাভাগি করে শাসন ক্ষমতা দখল করে নিল।

অষ্টম পর্ব

সুভাষচন্দ্র——সেই সময় এবং আজ

সুভাষচন্দ্র ও সহিংস আন্দোলন

সুভাষচন্দ্রের ২৪ বছরের রাজনৈতিক জীবনে দীর্ঘ আঠারো বছর কেটেছে কংগ্রেসে, অহিংসার চোহদ্দিতে সীমাবদ্ধ আন্দোলনে। এর পরের ফরোয়ার্ড ব্লকের রাজনীতিও ছিল কংগ্রেসী পুটপাকে বাঁধা। কেবল শেষ তিনবছর তিনি সেনাবাহিনী নিয়ে সশস্ত্র লড়াই-এর মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ শাসন হটানোর প্রয়াস করেছিলেন। তবু সুভাষকে ঘিরে ভারতের জনসাধারণের মধ্যে যে তৈরী হয়েছে এক সংগ্রামী ভাবমূর্তি, মানুষের ইচ্ছাপূরণের মিথ, ইতিহাসের এক অনন্য নায়কের প্রতিচ্ছবি——সবই ঐ শেষ তিনবছরের কার্যাবলীর জন্যেই। যদি ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে সুভাষ না আসতেন, তাহলে ভারতবর্ষের মানুষ তাকে এভাবে মনে রাখত না। শাসক শ্রেণীও তাকে এক 'আইডল' হিসেবে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরতে উৎসাহী হত না।

কিন্তু আই এন এ বাহিনীর লড়াই ছাড়াও সুভাষচন্দ্র বারবার দাবী করেছেন যে ভারতে থাকাকালীন তিনি সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন, এমনকি তার নেতৃত্বও দিয়েছেন। ১৯৪৩ এর ৯ জুলাই সিঙ্গাপুরে এক জনসভায় ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির সর্বাধিনায়ক হিসেবে এক ভাষণে তিনি বলেছেন——

বিগত কুড়ি বৎসর ধরিয়া আমি আইন অমান্য আন্দোলনের সকল প্রকার কর্মসূচীর সহিত যুক্ত ছিলাম। সহিংস এবং অহিংস——সর্বপ্রকার বিপ্লবাত্মক আন্দোলনে আমার নিবিড় সংযোগ ছিল। এই জন্য আমাকে বারংবার বিনা বিচারে কারাবন্দী থাকিতে হইয়াছে। সুতরাং আমি যদি এই দাবী করি——স্বাধীনতা আন্দোলনের সকল ধারায় নেতৃত্বের আমার যেরূপ অভিজ্ঞতা, ভারতের আর কোনও জাতীয়তাবাদী নেতা সেরূপ দাবী করিতে পারেন না——তাহা হইলে অত্যুক্তি করা হইবে না।

মনে রাখতে হবে সুভাষচন্দ্র এ দাবী করছেন গান্ধী নেতৃত্বে থাকা সত্ত্বেও। তবে যার জন্যে সুভাষের এত অহংকার এবং ভারতের শ্রেষ্ঠ নেতা হিসাবে নিজেকে দাবী করছেন——সেই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সাথে তার যোগাযোগ কতদূর ছিল? তিনি কি সত্যিই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের নেতা ছিলেন?

সুভাষচন্দ্র বাংলায় কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন ১৯২১ সালে। ইতিমধ্যে চিত্তরঞ্জন কংগ্রেসের নেতৃত্ব নিয়ে বেশ কিছু সন্ত্রাসবাদীকে পথ পরিবর্তন করিয়ে তার দলে ভিড়িয়েছেন।

সে সময় বৃটিশ শাসনের প্রবল দমন-পীড়নে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। চিত্তরঞ্জন সুভাষকেও সন্ত্রাসবাদীদের স্বমতে আনার কাজে লাগালেন। সেই সূত্রে বেশ কিছু সন্ত্রাসবাদীর সাথে তাকে যোগাযোগ করতে হয়েছিল। চিত্তরঞ্জনের সাথে গান্ধীর দ্বন্দ্বে বাংলার সন্ত্রাসবাদী দলগুলোর সদস্যরা সকলেই চিত্তরঞ্জনের পক্ষে ছিল। ১৯২৪ সালে চিত্তরঞ্জন যখন কর্পোরেশনের মেয়র আর সুভাষচন্দ্র চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার তখন বহু সন্ত্রাসবাদীকে কর্পোরেশনে চাকরি দেওয়া হয়েছিল। এই সময়ই বেশকিছু প্রাক্তন সন্ত্রাসবাদীর সাথে সুভাষকেও গ্রেপ্তার করা হল। এই গ্রেপ্তার নিয়ে নানারকম কথা রটেছিল তার কথা আগেই বলেছি। কিন্তু এই গ্রেপ্তারের পেছনে আরও একটা ব্যাপার ছিল। কংগ্রেসের নেতারা ইংরেজ শাসকদের চাপে রাখার জন্যে মাঝেমধ্যেই সন্ত্রাসবাদী জুজুর ভয় দেখাতেন। তারা ইংরেজদের বোঝাতেন কংগ্রেসের দাবী-দাওয়ায় সাড়া না দিলে দেশে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন বাড়বে। ১৯২৯ এর আমেদাবাদ কংগ্রেসেও বিঠলভাই প্যাটেল বৃটিশকে এইরকম বলে চাপ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।

অবশেষে ১৯২৪ সালে দেশবন্ধু ও মতিলাল নেহেরু প্রকাশ্য বিবৃতি দেন যে, বাংলায় বিপ্লবীদের হাতে বিপুল পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র এসে গিয়েছে। আমরা কিছু লোক সে সময়ে জেলে (১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বরে গ্রেপ্তার হয়েছিলাম); কিন্তু দেশবন্ধুদের বিবৃতির অজুহাতে ব্রিটিশ সরকার বেড়াজালে ঘিরে বাংলায় বিস্তর দেশপ্রেমিকদের গ্রেপ্তার করেছিল। তাতে সুভাষ, অনিলবরণ, সত্যেন মিত্র, পূর্ণ দাস, সুরেন ঘোষ, হরিকুমার চক্রবর্তী প্রভৃতি ছিলেন। অথচ দেশবন্ধুর বিবৃতি ছিল সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন——আসলে রাজনৈতিক হুমকিমাত্র। সরকার বলত——নেহেরু-দাশের উক্তিই তো যথেষ্ট। ঐ লোকগুলিকে বিশেষ আইনের কবলে ফেলা ছাড়া গত্যন্তর নেই। অনুশোচনায় দেশবন্ধু বললেন, "They take my diagnosis but not my treatment"——ওঁরা আমার রোগনির্ণয় গ্রহণ করেছেন, কিন্তু আমার ব্যবস্থা নয়'। *(যদুগোপাল মুখোপাধ্যায় বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি)*

এই জন্যেই সুভাষচন্দ্রের রুল থ্রী'তে গ্রেপ্তার। এই সময় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ভাঙ্গনের মুখে সব দলগুলোর সদস্যরাই কংগ্রেসে যোগ দিলেন। চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর বাংলা কংগ্রেসে যে প্রবল গোষ্ঠীকোন্দল দেখা দিল——এই দলগুলো এক একটা পক্ষে ভিড়ে গেল। যুগান্তর গোষ্ঠী সমর্থন করেছিল সুভাষচন্দ্রকে আর অনুশীলনী গোষ্ঠী যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে। আগেও এই দুটো দল ছিল পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী, তাই তারা কংগ্রেসের দুই বিপরীত শিবিরেই থেকে গেল। তাছাড়া যুগান্তর গোষ্ঠী ছিল মূলত কলকাতার দল আর অনুশীলনী গোষ্ঠী ঢাকার। সুভাষচন্দ্র ছিলেন কলকাতার বাসিন্দা এবং যতীন্দ্রমোহন পূর্ববঙ্গের লোক——এসব ব্যাপারও ছিল। এই দুই নেতাকে সামনে রেখে দল দুটো পরস্পরের সাথে পাঞ্জা কষতে লাগল। গালাগালি খেউর মারামারি কোনকিছুই বাদ ছিল না। কলকাতা কংগ্রেসে অবশ্য সবকটা দলের কর্মী নিয়েই তৈরী করা হয়েছিল সুভাষের স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী। কিন্তু তাতেও ঝাগড়া থামানো যায় নি। সত্য গুপ্তের নেতৃত্বে একটা দল আর একটা দলের ছেলেদের বেজায় মারধর করে। সুভাষচন্দ্র সত্য গুপ্তকে একদিনের 'সাজা' দেন। *(সুধী প্রধান——সুভাষচন্দ্র, ভারত ও অক্ষশক্তি)*।

সে সময় কংগ্রেসের গোষ্ঠীদুটোরই মূল শক্তি ছিল এই প্রাক্তন সন্ত্রাসবাদীরা। ১৯৩০ সালে কুমিল্লা জেলার কৃষ্ণদাস ছিলেন গান্ধীর নিজস্ব সচিব। তিনি বাংলার পরিস্থিতি সরজমিনে তদন্ত করতে এলে বৃটিশ পুলিস তাকে গ্রেপ্তার করে। বাংলার কংগ্রেস সম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতা একটা রিপোর্ট লিখে ডাকযোগে গান্ধীকে পাঠান। ইংরেজ গোয়েন্দা পুলিশ সেটা মাঝপথে আটকে দেয়। পরে ভারত সরকারের আইন সচিব নৃপেন্দ্রনাথ

সরকার সেটা প্রকাশ করে দেন। সেই রিপোর্টে কৃষ্ণদাস লিখেছিলেন——বাংলায় সুভাষ বসু কিংবা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত আসল নেতা নন, আসল নেতা বিপ্লবীদের দুটো দলে অবস্থান করে। তারাই এঁদের চালান। কৃষ্ণদাসের মূল্যায়নটি নেহাত বেঠিক ছিল না। এই সন্ত্রাসবাদীরাই সুভাষকে বাংলা কংগ্রেসের সভাপতি বানিয়েছিল। যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের ভাষায়——সুভাষচন্দ্র তখন দেশের কাজে দ্বিতীয় ধাপে পা দিয়েছেন মাত্র। তাঁকে এগিয়ে দেওয়া হতে লাগল সবদিক দিয়ে। সুভাষবাবুকে কংগ্রেসের সভাপতি করে দেওয়া হল বাংলাদেশে। অত কমবয়সে আর কেউ ইতিপূর্বে সভাপতি হন নি। *(বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি)*। সুতরাং সন্ত্রাসবাদীদের একটা বড় অংশকে তিনি নিজের কাজে লাগিয়েছিলেন, সার্থকভাবে গোষ্ঠীকোন্দলে নিজের অবস্থানকে সুদৃঢ় করতে পেরেছিলেন--- সুভাষচন্দ্র গর্ব করতে পারেন বৈকি।

আবার একই সময়ে সভায় সভায় অহিংসার জয়গান করে গান্ধীর আস্থা অর্জনের চেষ্টা করেছেন। সে-সব সভাতে তিনি অহিংসা, বিদেশী বয়কট, আর কংগ্রেসী নীতির প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে জনমত তৈরী করেছেন। ১৯৩০এ সন্ত্রাসবাদী দলের তিন তরুণ বিনয়-বাদল-দীনেশ রাইটার্স বিল্ডিং-এ এক বীরত্বপূর্ণ সশস্ত্র অভিযান চালায়। পরে তারা ধরা পড়েন এবং তাদের শহীদের মৃত্যু বরণ করতে হয়। ১০ ডিসেম্বর ১৯৩০ কলকাতা কর্পোরেশনের সভায় ঐ অভিযানে মৃত ইংরেজ আমলা কর্ণেল সিম্পসনকে স্মরণ করে এক প্রস্তাব নেওয়া হল। মেয়র সুভাষচন্দ্র ঐ প্রস্তাব সমর্থন করে বললেন——

সোমবার যে বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটিয়াছে তজ্জন্য আমি আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। এ দেশের তরুণ সম্প্রদায়কে কংগ্রেসী কর্মসূচী কংগ্রেসী নেতারা পুরোপুরি প্রভাবিত করিতে পারেন নাই। (তিনি নিজে তখন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি——লেখক)। সেই ব্যর্থতা স্বীকার করার উদ্দেশ্যেই আমি এই কথাগুলি বলিতেছি।

ঐ বক্তৃতায় তিনি সন্ত্রাসবাদী কাজ বেড়ে যাওয়ার জন্যে সরকারী দমনমূলক আইনগুলোকেই দায়ী করলেন। শেষে বললেন——

আমি প্রত্যেককেই——তিনি আমার স্বদেশবাসী হোন কিংবা ইংরেজই হোন, আশ্বস্ত করিতে পারি যে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পক্ষে শ্রেষ্ঠ ও সহজতম পথ হিসাবে অহিংসার পথই ভারতবর্ষ গ্রহণ করিয়াছে। আমার বিশ্বাস, সাময়িক বিচ্যুতি সত্বেও আমাদের দেশবাসী এই পথ আঁকড়াইয়া থাকিবে ও এই পথ অনুসরণ করিয়া নিকট ভবিষ্যতে স্বাধীনতা অর্জন করিবে।

তার মানে, বিনয়-বাদল-দীনেশের বীরত্বপূর্ণ লড়াই সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিতে বিচ্যুতি। গান্ধীর সাথে তার চিন্তার কোন ফারাক আছে কি? থাকার কথাও নয়, কারণ সুভাষ এ সময় কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে এসে গিয়েছেন, আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার চিন্তায় মশগুল।

১৯৩৪ সালে সুভাষচন্দ্র ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে ইতিহাস গ্রন্থ লিখলেন——'দ্য ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল'। তাতে তিনি রাইটার্সের এই অলিন্দ-যুদ্ধ নিয়ে লিখেছিলেন মাত্র একটা লাইন। মজার কথা, সেখানেও বিনয়-বাদল-দীনেশের নাম ছিল না। লেখা হয়েছিল——"১৯৩০ সালের শেষদিকে কলকাতায় গভর্ণমেন্টের সদর দপ্তরে বাংলার জেলবিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল লেফটেন্যান্ট কর্ণেল সিম্পসনকে তার অফিসে হত্যা করা হয়।" এই বইতে অনেক তুচ্ছ ঘটনা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হলেও সন্ত্রাসবাদীদের জন্য বরাদ্দ মাত্র কয়েকটা লাইন। শান্তি ঘোষ আর সুনীতি চৌধুরী ঠাঁই পেয়েছেন ফুটনোটের একটা লাইনে। মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট পেডিড যে গুলিতে নিহত হয়েছিল সে কথা লেখা

হয়েছে, কিন্তু এই ঘটনায় ফাঁস দেওয়া হয়েছিল যাদের সেই প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য, নির্মলজীবন ঘোষ——এদের কথা লেখা হয় নি। যে সূর্য সেন ছিলেন সুভাষচন্দ্রের একনিষ্ঠ সমর্থক, তার সেই চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুঠ করে এক অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টার উল্লেখ করা হয়েছে অত্যন্ত দায়সারাভাবে। এগুলোর তবু তো উল্লেখ করা হয়েছে——সন্ত্রাসবাদী দলগুলোর বিভিন্ন বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের কথা তো সুভাষচন্দ্র তার বিখ্যাত 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম'-এর ইতিহাসে লেখেনই নি। লিখবেন কি করে, সে সময় তিনি তার গা থেকে 'সন্ত্রাসবাদী দলের সাথে যুক্ত' লেভেলটা তুলে ফেলতে উদগ্রীব। ১৯৩৫ এর ৩১ আগস্ট 'বৃটিশ জনগণের উদ্দেশ্যে প্রচারিত এক আবেদনে' তিনি বললেন——

ইংল্যান্ড হইতে আসা কয়েকজন বন্ধুর নিকট হইতে জানিতে পারিয়াছিলাম যে সেখানে এই প্রচার হইতেছে যে আমি নাকি ভারতে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সহিত যুক্ত ছিলাম। সন্ত্রাসবাদী এবং তাঁহাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যক্তিকে সাজা দিবার জন্য বঙ্গীয় সরকারের নিকট অত্যন্ত ব্যাপক ও শক্তিশালী আইন আছে। এই অভিযোগের সামান্যতম সত্যতা থাকিলে তাঁহারা আমাকে বহু পূর্বেই আদালতের সম্মুখে টানিয়া লইয়া যাইতেন। আমি তো বারংবার আদালতে আমার বিচার প্রার্থনাই করিয়াছিলাম। সন্ত্রাসবাদের সমস্যা সম্পর্কে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী আমি পরিস্কার ব্যাখ্যা দিয়াছি আমার বই 'দ্য ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল'-এ।

তো সন্ত্রাসবাদের সমস্যা সম্পর্কে কি ব্যাখ্যা আছে ইন্ডিয়ান স্ট্রাগলে। 'বাংলার পরিস্থিতি'——নামের পরিচ্ছেদে সুভাষচন্দ্র সন্ত্রাসবাদের কারণ হিসেবে ইংরেজদের দমন-পীড়নকে চিহ্নিত করেছেন। এই সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে চিন্তা প্রকাশ করেছেন, এর থেকে পরিত্রাণের রাস্তা খোঁজার চেষ্টা করেছেন——

বাংলার মাটিতে এই ভাবেই বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে উঠেছে। এর প্রতিকার কি? গভর্ণমেন্টের সামনে দুটি পথ খোলা আছে——প্রথমতঃ জনগণের কছে প্রমাণ করা রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বৈপ্লবিক পন্থা গ্রহণের কোন আবশ্যকতা নেই, এবং দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক বিপ্লবীকে শান্তিপূর্ণ ও গঠনমূলক ধারায় দেশসেবার সুযোগ দান করা।

সে সময়ের সব বড় কংগ্রেস নেতাদের ঐ একই কথা ছিল। সরকার কংগ্রেসের দাবী-দাওয়া একেবারেই মানছে না বলে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন বাড়ছে। সরকার কংগ্রেসকে কিছু কিছু ছাড় দিলেই সন্ত্রাসবাদ স্তিমিত হয়ে পড়বে। আর তখন তাদেরকে কিছু কিছু চাকরি-বাকরি দিলেই সমস্যার সমাধান হবেন। এ চিন্তা সন্ত্রাসবাদের পক্ষে চিন্তা না তাকে শিকড়শুদ্ধ উপরে ফেলার মতলব? ঐ পরিচ্ছেদেই সুভাষচন্দ্র লিখলেন——

মূলগতভাবে বৈপ্লবিক পন্থা চরম হতাশার প্রকাশ। যদি এই হতাশা একবার দূরীভূত হয় তা হলে বিপ্লবীদের সঙ্গে বোঝাপড়া নিশ্চয়ই সম্ভব। এর অর্থ এই নয় যে তারা আর দেশপ্রেমিক থাকবেন না কিংবা দেশসেবার কাজ তাঁরা ত্যাগ করবেন। এর অর্থ কেবলমাত্র এই যে তাঁরা তাঁদের কার্যকলাপ অন্যপথে পরিচালিত করবেন। পরিস্কার কথায়——সন্ত্রাসবাদীরা কংগ্রেসে যোগ দেবে। এটাই ছিল সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পনা।

সুভাষচন্দ্র ইউরোপ থেকে ফেরার কিছুদিন পর গান্ধীর দরকার হয়ে পড়েছিল তাকে কংগ্রেস সভাপতি বানাবার——এ আমরা আগেই দেখেছি। গান্ধী তাকে পরখ করার জন্যে নিভৃতে আলোচনা করতে এলেন। তখন সুভাষ তার মন রাখার জন্যে তাকে বিপ্লবী বলে অভিহিত করলেন।

হাসি স্তিমিত করে বলেছিলেন গান্ধী "আমি কি বিপ্লবী"?

"সবচেয়ে বড় আর বিপজ্জনক।"

আবার হাসি। খুশি উপচে পড়ছিল গান্ধীজির চোখ-মুখ থেকে। আর কেউ এ-কথা বলেনি। বলেছে সুভাষ, বিপ্লবীর রাজা সুভাষ। মন খুশিতে ভরে উঠবে না?

"কিন্তু আমি তো হিংসায় বিশ্বাস করিনে।"

"কেউই আজ আর করে না।" *নরেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্তী নেতাজী : সঙ্গ ও প্রসঙ্গ. ১ম খণ্ড)* গান্ধীকে খুশি করার জন্যে সুভাষ সন্ত্রাসবাদীদের চোখ-বুজে বিসর্জন দিলেন। আবার সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হচ্ছেন জেনে তিনি ইউরোপ সফরে বেরোলেন। ঐ ইউরোপ যাবার প্রাক্কালে দেশবাসীর প্রতি এক বিবৃতিতে ১৮ নভেম্বর ১৯৩৭ তিনি বললেন——

আমি পুনরায় জোর দিয়া বলিতে চাই যে বাংলা যদি আবার আত্মস্থ হইতে চায়, তাহা হইলে তাহাকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নীতি ও কর্মসূচী অনুসারী হইতে হইবে। সর্বোপরি, তাহাকে হিংসার পদ্ধতি পরিত্যাগ ও নিন্দা করিতে হইবে। সুতরাং যদি আজ গুপ্তগোষ্ঠী ও গোপন কার্যাবলী থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে সেগুলিকেও চিরদিনের মতো বিলুপ্ত করিতে হইবে।

যখন গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে বিব্রত সুভাষের সন্ত্রাসবাদীদের দরকার ছিল তখন তার চিন্তা ছিল একরকম। আজ যখন প্রয়োজন ফুরিয়েছে, আকাঙ্খিত নেতৃত্ব যখন পাওয়া গিয়েছে, তখন আর ও-সবের দরকার কি। হরিপুরা কংগ্রেসেও তিনি তার বিখ্যাত সভাপতির ভাষণে বললেন——

আমি আগের চাইতে এখন অধিক বিশ্বাস করি যে কংগ্রেসের সংগ্রামের পদ্ধতি হইবে সত্যাগ্রহ। কিংবা ইহাকে ব্যাপক অর্থে আইন অমান্যসহ অহিংস অসহযোগ বলা যাইতে পারে। আমার মতে সত্যাগ্রহ কেবলমাত্র নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নয়——ইহা এক সক্রিয় প্রতিরোধও বটে, যদিও এই প্রতিরোধকে অবশ্যই অহিংস হইতে হইবে।

তিনি ১৫ এপ্রিল ১৯৩৮ কলকাতায় শ্রদ্ধানন্দ পার্কের এক জনসভায় বললেন——
বাংলায় কংগ্রেসের সদস্যপদ সম্বন্ধে আমি একটি সাবধানবাণী উচ্চারণ করিতে চাই। একমাত্র যাঁহারা 'খাঁটি' কংগ্রেসসেবী এবং যাঁহারা আন্তরিকতার সহিত কংগ্রেসী আদর্শ অনুসরণ করতে চান তাঁহাদেরই শুধু কংগ্রেস সদস্য হিসাবে তালিকাভুক্ত করা উচিত।

অর্থাৎ, যারা সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী তাদের ঠাঁই কংগ্রেসে আর হবে না। দীর্ঘদিন যাদের কাজে লাগিয়েছেন সেই সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি উপযুক্ত প্রতিদানই বটে। সুভাষচন্দ্রের এই-সব ভূমিকার জন্যেই গান্ধীর সাথে তার সংঘাতের সময় বাংলার সন্ত্রাসবাদী বা প্রাক্তন সন্ত্রাসবাদী যারা এতদিন তার পাশে ছিলেন তাদের সকলের কাছ থেকে পুরোপুরি সমর্থন সুভাষ পান নি।

কিন্তু একথা তো সত্যি, সুভাষচন্দ্র ভগৎ সিং-এর ফাঁসির বিরুদ্ধে ভারত সরকারকে চাপ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ২৮ মার্চ ১৯৩১ করাচীতে নিখিল ভারত নওজোয়ান সভার অধিবেশনে তিনি যা ভাষণ দেন তাতে তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দিহান না হয়ে পারা যায় না——

আর গভর্ণমেন্ট তাহাদের দাবী বাতিল করিয়া দিলে, কর্তব্যসাধনের তৃপ্তি ভোগ করিত এবং ভগৎ সিং ও তাঁহার সহযাত্রীদের প্রাণরক্ষার জন্য সর্বতোভাবে সচেষ্ট হয় নাই——কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ বা ক্ষোভ কেহ পোষণ করিত না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে এই চাপ সৃষ্টি করার পিছনে দোষ স্খালনের ইচ্ছাটাই প্রবল ছিল।

আমরা আগেই দেখেছি যে তিনি ফরোয়ার্ড ব্লক তৈরী করেছিলেন কংগ্রেসে তার নেতৃত্ব পুনঃস্থাপিত করার জন্যে। স্বভাবতঃই ফরোয়ার্ড ব্লকের কর্মসূচী ছিল অহিংস। আমি ইতিপূর্বেই যেমন ঘোষণা করিয়াছি ফরোয়ার্ড ব্লক কংগ্রেসের মধ্যে একটি ব্লক। সেইজন্যে ইহার কংগ্রেসের সংবিধান ও আদর্শ মানিয়া চলা আবশ্যক। অধিকন্তু, ইহা ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের উপায় হিসাবে অহিংস অসহযোগের পন্থা গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু তার ফরোয়ার্ড ব্লক গঠনের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি দেশের বাইরে থেকে ইংরেজ-বিরোধী লড়াই সংগঠিত করলেন। এবং সে লড়াই সশস্ত্র, সহিংস। স্বভাবতই অহিংসা আর সন্ত্রাসবাদী দল নিয়ে তার মতামত গেল পাল্টে।

১৯৪২ এর ৩১ আগস্ট সুভাষচন্দ্র বার্লিন থেকে এক বেতার বক্তৃতায় ভারতীয় জনসাধারণকে গেরিলা বাহিনী গড়ে তুলতে ডাক দিলেন। এই বাহিনীর কাজ হিসাবে তিনি চিহ্নিত করলেন কারখানায়——'নাট, বল্টু প্রভৃতি সরাইয়া অন্তর্ঘাতমূলক কাজ করা', 'যুদ্ধের জন্য কাজ করিতেছে এরূপ সরকারি অফিস ও কারখানাগুলিতে অগ্নিসংযোগ করা' এবং 'বিচ্ছিন্ন এলাকায় থানা, রেল স্টেশন ও কারখানা ধ্বংস করা'। এছাড়াও নানা সভায় এবং সৈন্যদলের কাছে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে তিনি ভারতের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের 'গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার' কথা বারবার উল্লেখ করেছেন। ১৯৪৪ সালে ভারতে চরবৃত্তি করার জন্যে সুভাষচন্দ্র যে সার্ভিস মিশন ডুবোজাহাজে করে ভারতে পাঠান তার অন্যতম সদস্য ছিলেন ডাঃ পবিত্রমোহন রায়। ভারতে পাঠানোর অব্যবহিত আগে সুভাষচন্দ্র এক রুদ্ধঘরে শ্রীরায়ের সঙ্গে আলোচনা করেন। তখন তিনি বলেন——এইজন্য আমি বিপ্লবীদের বরাবর ভালোবাসতুম, ভালবেসেছি, ভালবাসি। কারণ——কিছুটা বাঙালীর লজ্জা ওরাই রেখেছিলেন। যদি কারও এক-আধটু বুকের জোর দৃঢ়তা করবার কি মরবার পণ কাদেরও ভিতর থাকে——তা একমাত্র এই বিপ্লবীদের মধ্যেই আছে। *(ডাঃ পবিত্রমোহন রায়——নেতাজীর সিক্রেট সার্ভিস)* কিন্তু তখন সেই সন্ত্রাসবাদী দলেরা আর কোথায়। যুগান্তর গোষ্ঠীর বহু সদস্য কংগ্রেসে কাজ করছেন——অনেকেই হয়েছেন কমিউনিস্ট। অনুশীলনী দলের অধিকাংশ সদস্য মিলে তৈরী করেছে নতুন দল আর এস পি। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

ভারতের সন্ত্রাসবাদী দলগুলোর সাথে সুভাষচন্দ্রের সম্পর্ক পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে তিনি এইসব দলগুলোকে পুরোপুরি নিজের কার্যোদ্ধারের স্বার্থে ব্যবহার করেছেন। সন্ত্রাসবাদী দলগুলোর সদস্যদের কংগ্রেসের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে এই আন্দোলনের মেরুদণ্ড ভেঙে দেবার যে চক্রান্ত চিত্তরঞ্জন করেছিলেন তিনি ছিলেন তার বিশ্বস্ত সহকারী। আবার তাদেরকে কংগ্রেসে ঢুকিয়ে নিয়ে কংগ্রেসের গোষ্ঠী কোন্দলে সুভাষ তাদের ব্যবহার করেছেন। এইসব তরুণদের তার প্রতি ছিল গভীর আস্থা। তারা ভেবেছিলেন গান্ধীর আপোসমুখী রাজনীতির বিপক্ষে সুভাষ একটা বিকল্প সংগ্রামী ধারা গড়ে তুলবেন। কিন্তু সুভাষ মুখে বিপ্লবী কথা বলে জনপ্রিয়তা অর্জন করে সর্বভারতীয় কংগ্রেসে গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব পেলেন। তখন তিনি সন্ত্রাসবাদের কলঙ্ক মুছতে পারলে বাঁচেন। গান্ধীর তিনি তখন একনিষ্ঠ অনুরাগী। পরে আবার গান্ধীর হাত থেকে নেতৃত্ব কেড়ে নেবার লড়াই-এ নতুন করে সন্ত্রাসবাদীদের কাছ থেকে মদত চাইলেন। কিন্তু ততদিনে একদিকে ইংরেজ শাসনের প্রচণ্ড দমন-পীড়ন, অন্যদিকে সুভাষসহ কংগ্রেসের নেতাদের বারবার বিশ্বাসঘাতকতায় সন্ত্রাসবাদীরা হতাশায় ভেঙে পড়েছেন। তারা নতুন দল নতুন পথের সন্ধানে নেমে পড়েছেন।

সুভাষচন্দ্রের জীবনদর্শন

ইতিহাসের কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের ভূমিকা পর্যালোচনা করতে গেলে তার জীবনাদর্শের ক্রম-বিবর্তনকে লক্ষ্য করা অত্যন্ত জরুরী। এটা স্বাভাবিক যে একজন মানুষের চিন্তা-চেতনা একই জায়গায় দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে না——চেতনার সেই অচলায়তন কাম্যও নয়। কিন্তু সেই বিবর্তনেরও একটা গতি-প্রকৃতি থাকে, একটা চরিত্র থাকে। সেই চরিত্রই ঠিক করে দেয় সেই ব্যক্তি সমাজের আভ্যন্তরীন সংগ্রামে কোন অবস্থানে দাঁড়াবে। বিশ্ব ইতিহাসে যে সব মনীষা সভ্যতার অগ্রগতির পক্ষে অবদান রেখে গিয়েছেন, তাদের চিন্তা-চেতনার বিবর্তন লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে তা বাস্তব পৃথিবীর সাথে ঘাত প্রতিঘাতে ক্রমেই উচ্চতর আদর্শ রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতি কাকে বলব? সমাজের মধ্যেকার অল্পকিছু মানুষ বিজ্ঞানে, প্রযুক্তিতে, দর্শনে, সাহিত্যে, লালিত কলায়, ইত্যাদিতে নিজেদের উৎকর্ষতাকে একটা উচ্চতায় নিয়ে গিয়ে সমাজকে দিকনির্দেশ করবে। আর তাদের সেই সুকর্মের ফলও ভোগ করবে সমাজের মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ। অবশিষ্ট কোটি কোটি মানুষ খালি নিজেদের হৃদপিন্ডের স্পন্দনটুকু মাত্র বজায় রাখতে গিয়ে অমানুষিক পরিশ্রম করে যাবে। গুণসম্পন্ন হোক বা না হোক তাদের জন্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার কোন সুযোগই থাকবে না। মানব সভ্যতার এ হেন বাতাবরণেই আজ শ্রেষ্ঠ 'মহাপুরুষ-ইতিহাসপুরুষ-প্রতিভাধর'-এরা প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। কিন্তু এই চিত্রটাই সব নয়। সমগ্র মানব প্রজাতির বিকাশ, বিশ্বের জনসমষ্টির সবচেয়ে বড় অংশ শ্রমজীবী মানুষের গুণাবলীর স্ফূরণ, শ্রমকেও যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিস্থাপিত করা—— এই আধারেও সভ্যতার অগ্রগতি নিরূপিত হয়েছে। সুতরাং কোন মনীষীর ভূমিকার মূল্যায়নে এটা জরুরী, তার চিন্তা তার কার্যাবলী সভ্যতার অগ্রগতি সম্পর্কে প্রচলিত ধারনার অনুবর্তী হয়েছে, না বিশ্বের বৃহত্তম জনসমষ্টি সমাজের তলায় পড়ে থাকা মানুষের স্বার্থে পরিচালিত হয়েছে। আমরা সুভাষচন্দ্রের জীবনাদর্শের উত্তরণকে পর্যালোচনা করে দেখব তা সমাজের উর্দ্ধে এক উচ্চতর ব্যক্তি 'মহাপুরুষ'-এ পরিণতি পেতে চেয়েছে, না সমাজের মধ্যেকার দ্বন্দ্বে শোষিত লাখো মানুষের হাতিয়ার হতে পেরেছে।

সুভাষচন্দ্রের জন্ম এক রক্ষণশীল উচ্চ-মধ্যবিত্ত পরিবারে। সেযুগের আর দশটা মধ্যবিত্ত পরিবারের মতই তাদের চিন্তা ইংরেজ শাসনের সুযোগ নিয়ে ছেলেদের প্রতিষ্ঠা পাওয়া——অর্থাৎ বৃটিশ সরকারে মোটা টাকা মাইনের চাকরি করা বা ব্যারিস্টারি, ডাক্তারি করে ধনী হওয়া। লক্ষ্য করার বিষয় হল সুভাষচন্দ্রের ভাইয়েরাও কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ ব্যারিস্টার। জানকীনাথ বসু যেমন একদিকে ইংরেজদের প্রিয় 'রায়বাহাদুর' অন্যদিকে কংগ্রেসের সভাতেও মাঝেমধ্যে যান। মনে রাখতে হবে কংগ্রেস তখন ছিল ধনী এবং মধ্যবিত্তের স্বার্থে সরকারকে একটা চাপদানকারী সংস্থা। ছেলেদের প্রতিষ্ঠার সুযোগ দিতেই, তাদের ভরতি করা হয়েছিল ইউরোপীয়ান স্কুলে——ঠিক যেমন আজও ভাল চাকরির জন্যে ছেলেমেয়েদের ইংরেজী স্কুলে ভরতি করা হয়। কিন্তু ঐ ইউরোপীয়ান স্কুলে ভরতি হয়েই যত বিপত্তি। ভারতীয় এবং ইউরোপীয় ছাত্রদের মধ্যে বৈষম্য বালক সুভাষকে অত্যন্ত আঘাত দিল। এই আঘাতের চিহ্ন সুভাষের জীবন থেকে কখনও মুছে যায় নি। তা উত্তরোত্তর বেড়েই গিয়েছে।

সুভাষচন্দ্রের মা ছিলেন আর দশটা মধ্যবিত্ত বাঙালী গৃহবধূর মতই 'ধর্মপ্রাণা'। তার কাছেই সুভাষের প্রাথমিক ধর্মশিক্ষা। এরপর হঠাৎই পেয়ে গেলেন বিবেকানন্দ রচনাবলী। সেই বইয়ের 'কয়েকটি পৃষ্ঠা উল্টিয়ে বুঝলাম, এতে এমন কিছু আছে যা আমি খুঁজে মরছি।" সেই বইগুলি 'দিনের পর দিন মাসের পর মাস' পড়ে বুঝলেন——"আত্মানো

মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়——তোমার নিজ মুক্তি ও মানবসেবা——এই হবে জীবনের লক্ষ্য।" তিনি তখন যে শুধু বিবেকানন্দের রচনাই পড়তেন তা নয়। হিন্দু ধর্মের যত বই পেতেন, গভীর মনোযোগের সাথে পড়তেন। সেই চিন্তাই তার জীবনের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান হয়ে গেল। এইসময় তার মাকে চিঠিতে লেখেন——

কিন্তু হায়! যখন ভাবি সেই পূণ্যশ্লোক ঋষিকুল কোথায়? তাঁহাদের সেই পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ কোথায়? তাঁহাদের সেই যাগযজ্ঞ, পূজা হোম প্রভৃতি কোথায়? ভাবিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। ....হায়! পরমেশ্বর! ....এ তো তোমারই দেশ কিন্তু দেখ ভগবান, তোমার দেশের কি অবস্থা! তোমার অবতারগণ যে সনাতন ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহা কোথায়? আমাদের পূর্বপুরুষ আর্যগণ যে জাতি এবং যে ধর্ম গঠিত ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহা এখন ছারখার হইয়াছে। দয়া কর, রক্ষা কর, ওহে দয়াময় হরি!

কিশোর সুভাষ কোনো চিঠিতে লেখেন——

ধিক সেই শিক্ষা——যাহাতে ঈশ্বরের নাম নাই——নিষ্ফল তাহার মানব জন্ম যাহার মুখে ঈশ্বরের নাম শুনিতে পাওয়া যায় না! লোকে তৃষ্ণার্ত হইলে পুষ্করিনী বা নদীর জল পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করে, কিন্তু তাহাতে কি মানসিক তৃষ্ণা মিটে? কখনই না——মানসিক তৃষ্ণার নিবৃত্তি কখনও হয় না। এই জন্যই আমাদের শাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন :

"ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে।"

এমনকি ঐ পনোরো বছর বয়সেই লেখেন——

আমি এই অমূল্য ক্ষণস্থায়ী মানুষ জীবনের এত সময় নষ্ট করিয়া ফেলিলাম, তজ্জন্য মনে দিনরাত ভয়ানক কষ্ট হয়। সময়ে সময়ে অসহ্য বোধ হয়।

যদি মানুষজন্ম লাভ করিয়া মানুষজীবনের উদ্দেশ্য না সফল করিতে পারিলাম——যদি গন্তব্যস্থানে পঁহুছিতে না পারিলাম তবে আর কি হইল? যেমন সকল নদীর গন্তব্য স্থান সমুদ্র সেইরূপ সমস্ত জীবনের গন্তব্যস্থান ঈশ্বর। যদি মানুষ ঈশ্বর লাভ না করিতে পারে তবে মানুষজন্ম বৃথা——আর পূজা, জপ, ধ্যান সবই বৃথা——সব কেবল ভণ্ডামী।

এই সময়ের মাকে এবং দাদাকে লেখা চিঠিগুলিতে কেবল এই চিন্তারই প্রতিফলন মেলে। এই চিন্তা সবই তার উপলব্ধির ব্যাপার ভাবলে ভুল হবে——সেই সময়ের পড়া ধর্মপুস্তকগুলো তার মাথায় গিজগিজ করছিল। কিন্তু এইসব ধর্মের কথা শুনলে মানুষ যতই ভক্তিতে আপ্লুত হোক না কেন, নিজের ছেলের বেলায় কেউই তা পছন্দ করে না। সুতরাং সুভাষকে শাসন, বোঝানো, অনুরোধ সবই করা হল। কিন্তু কোন কাজ হল না। তার উপর চলল রামকৃষ্ণের দেওয়া পথ অনুযায়ী সাধনা। তিনি 'অধ্যাত্মিকতার পথে অগ্রসর' হওয়ার জন্যে সাধনা শুরু করলেন।

কেউ আধ্যাত্মিকতার পথে অগ্রসর হলে অন্তরের ভিতর বহু আধিদৈবিক এবং সেই সঙ্গে অসাধারণ শক্তির আবির্ভাব ঘটে থাকে, এ কথা রামকৃষ্ণ প্রায়ই বলতেন এবং এতে উল্লসিত বোধ করা বা যে কোন প্রকারের আত্মপ্রচার বা আত্ম-সম্ভোগকে প্রশ্রয় দেওয়ার বিষয়ে তিনি তাঁর শিষ্যদের সাবধান করে দিয়েছিলেন। আধ্যাত্মিক চেতনার উচ্চতর স্তরে পৌঁছতে হলে এই সব আধিদৈবিক অভিজ্ঞতা ও শক্তিকে অতিক্রম করতে হবে। কায়েকমাস চেষ্টার পরেও দেখলাম এই রকম কোন অভিজ্ঞতা আমার হয় নি। *(ভারত পথিক)*

হওয়ার কথাও নয়। নিজের মস্তিষ্কের মধ্যেকার কর্মপদ্ধতির মধ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়েই

কেবলমাত্র এরকম অনুভূতি মিলতে পারে। যারা এইসব আধিদৈবিক ইত্যাদি অভিজ্ঞতা পান, তারা নিজের অগোচরে তাই করেন। কিন্তু সুভাষ ভাবলেন তার নিজেরই কোন ত্রুটি হচ্ছে। "ভাবলাম গুরুর অভাবেই বোধহয় এটা হয়েছে, কেননা লোকে বলে গুরু ব্যতীত যোগসাধনা সম্ভব নয়। অতএব শুরু হল আমার গুরুর সন্ধান।" এই গুরুর সন্ধানে তিনি বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লেন। তীর্থে তীর্থে ঘুরেও গুরুর সন্ধান মিলল না। কারণ একটু কাছ থেকে সাধু সন্ন্যাসীদের যে রূপ তিনি দেখলেন তা ভক্তি চটে যাবার পক্ষে যথেষ্ট। তখন তিনি বই পড়ে ধর্মচর্চা চালাতে থাকলেন।

কলকাতায় পড়তে এসে তিনি তার ধর্ম-কর্মের বহু সঙ্গীসাথী পেয়ে গেলেন। এমনকি নদীয়ার শান্তিপুরে গিয়ে কয়েকদিন সন্ন্যাসী হয়েও কাটিয়ে দিলেন। তারা তখন মনে করতেন যে রামকৃষ্ণ মিশন যথাযথ বিবেকানন্দের অনুসারী নয়। তারা হবেন যথার্থ অনুসারী। প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রদের মধ্যে সন্ত্রাসবাদীদের একটা দল থাকলেও সুভাষ তাতে কখনও যোগ দেন নি। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অনুসারী হতে গিয়ে একটা বিপদে সুভাষচন্দ্র পড়লেন। একদিকে রামকৃষ্ণ-বিবেকান্দের অনুগামী হতে গিয়ে কাম-প্রবৃত্তিকে দমনের প্রবল প্রচেষ্টা অন্যদিকে বয়ঃসন্ধিকালের স্বাভাবিক প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া দুইয়ের মাঝে পড়ে সুভাষ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেলেন——

১৯১৩ সালে যখন আমি কলেজে ভর্তি হই তখন আমার মনে এ ধারণা প্রায় বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, আধ্যাত্মিকতার পথে চলতে গেলে কামজয় প্রয়োজন, এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি ব্যতীত মানুষের জীবনের মূল্য অতি তুচ্ছ। কিন্তু আমি দৃঢ়ভাবে কামরিপুকে যদিও সংযত করে রেখেছিলাম, তাকে বশে আনতে পারি নি। *(ভারত পথিক)*

পরবর্তীকালে এ বিষয়ে সুভাষচন্দ্র কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছিলেন——

প্রাণীজগতে যেমন, মানবপ্রকৃতিও তেমনি যা জন্মগত প্রবৃত্তি তাকে সমূলে বিনষ্ট কিংবা মহত্তর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করতে গিয়ে আমাদের এত বেশী সময় ও শক্তি ব্যয় করা উচিত কি না——এটা একটা সঙ্গত প্রশ্ন। অবশ্য বাল্যে ও যৌবনে শুদ্ধতা এবং মিতাচারের প্রয়োজন আছে, কিন্তু রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ যা চেয়েছিলেন তা ছিল তার চেয়ে অনেক বেশী, যৌন চেতনাকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করা। যাই হোক, আমাদের দৈহিক ও মানসিক শক্তির সঞ্চয় সীমিত। কামজয়ের চেষ্টায় তাকে এত বেশী পরিমাণে ব্যয় করার সার্থকতা কি? প্রথমতঃ আধ্যাত্মিক উন্নতি জন্য পুরোপুরি কামজয় অর্থাৎ যৌন-প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করা বা মহত্তর লক্ষ্যে তাকে চালিত করা কি অপরিহার্য? দ্বিতীয়তঃ যদি বা তা হয় যে জীবন আধ্যাত্মিক সাধনা অপেক্ষা সমাজসেবায়——অর্থাৎ অধিকাংশ জনগণের সর্বোত্তম কল্যাণ প্রচেষ্টায় নিয়োজিত, সে জীবনে যৌন-সংযমের আপেক্ষিক গুরুত্ব কতটা?

মনে রাখতে হবে, সুভাষচন্দ্র 'ভারত-পথিক' লিখেছেন ১৯৩৮ সালে। সে সময় এমেলি শেঙ্কেল-এর সাথে তিনি গভীর প্রণয়-সূত্রে আবদ্ধ। তাই তিনি লেখেন——"নতুন করে আবার যদি আমার জীবন শুরু করতে পারতাম তা হলে খুব সম্ভবতঃ আমি যৌন বিষয়ে অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করতাম না, বাল্যে ও যৌবনে যা করেছি।"

এ শিক্ষা সুভাষচন্দ্রকে জীবন থেকে পেতে হয়েছে। প্রসঙ্গত জানাই, সুভাষচন্দ্রের যৌনতা ও প্রেম সম্পর্কে ধারণা এবং তার ক্রম বিবর্তন অতি চিত্তাকর্ষক আলোচনা। বর্তমান পুস্তকে তা করা গেল না। বইখানি যদি আদরনীয় হয় পরে এ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার ইচ্ছা রইল।

প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময় আর একজনের লেখা সুভাষকে প্রবল আকৃষ্ট করল——তিনি অরবিন্দ। অরবিন্দ তখন পন্ডিচেরি আশ্রমে বসে ঈশ্বর সাধনা করছেন এবং দর্শন বিষয়ে লেখালেখি করছেন। কিন্তু যা আমাকে স্থায়িভাবে প্রভাবিত করেছিল তা এরূপ চমকপ্রদ উক্তিগুলো নয়। তার গভীরতর দর্শন আমাকে মুগ্ধ করেছিল।...........এক ও বহু এবং ঈশ্বর ও সৃষ্টির মধ্যে সমন্বয় রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ যা প্রচার করেছেন, বাস্তবিকই আমার মনে রেখাপাত করেছিল কিন্তু তখনও পর্যন্ত তা মায়ার বন্ধন থেকে আমাকে মুক্তি দিতে পারে নি। এই মুক্তির পথে অরবিন্দ আমার আর এক সহায়রূপে দেখা দিলেন। *(ভারত পথিক)*

বন্ধু দিলীপকুমার রায়কে চিঠিতে সুভাষচন্দ্র অরবিন্দকে দার্শনিকরূপে বিবেকানন্দের উপরে স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, সুভাষচন্দ্র বারবার বিবেকানন্দের দর্শন, অরবিন্দের দর্শন, রামকৃষ্ণের দর্শন, ইত্যাদি বললেও এরা কেউই দর্শনের কোন পৃথক শাখা নয়। এরা সকলেই হিন্দু আধ্যাত্মিক দর্শনের রকমফের। প্রকৃত অর্থে রামকৃষ্ণের দর্শন, বিবেকানন্দের দর্শন বা অরবিন্দের দর্শন বলে কিছু নেই। পুরনো হিন্দু ভাববাদী দর্শনের বাইরে এদের নতুন কোন কথাও নেই। সুতরাং আদতে সুভাষচন্দ্র যার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন, তা হল——হিন্দু ধর্মীয় দর্শন।

প্রবল ধর্মচর্চার ফলে পরীক্ষার ফল ভাল হল না। প্রথম বিভাগে পাশ করলেও তালিকায় অনেক নীচের দিকে স্থান মিলল। "ক্ষণিকের জন্য আমার তীব্র অনুশোচনা হল, এবং আমি সংকল্প করলাম ডিগ্রী পরীক্ষায় ভাল ফল করব।" B. A. তে দর্শনে অনার্স নিলেন। দর্শন পড়তে গিয়ে তিনি পাশ্চাত্য দর্শনের সাথে পরিচিত হলেন। এর ফলে তার দার্শনিক চিন্তায় এক পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল।

সমলোচকের দৃষ্টিতে সবকিছুকে তা *(পাশ্চাত্য দর্শন)* বিচার করে। বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে কোন কিছুকে মেনে নেয় না; আর যুক্তির সাহায্যে তর্ক করতে এবং ভুলগুলি ধরতে ইহা আমাদের শিক্ষা দেয়। অন্য কথায় বলা যায়, পূর্বের বদ্ধমূল ধারণাগুলি থেকে এটি আমাদের মনকে মুক্ত করে। এতে আমার প্রথম প্রতিক্রিয়া হল, যে বেদান্তকে অবলম্বন করে আমি গড়ে উঠেছি তার সত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা। নিতান্তই জ্ঞানানুশীলনের জন্য, জড়বাদের সমর্থনে বহু প্রবন্ধ লিখতে শুরু করলাম। শীঘ্রই আমাদের দলের আবহাওয়ার সঙ্গে আমার সংঘর্ষ বেধে গেল। এই প্রথম আমি বুঝতে পারলাম যে সত্যিকারের কোনও মুক্ত ব্যক্তির পক্ষে প্রমাণ ও যুক্তি ভিন্ন কিছু গ্রহণ করা উচিত হয়, কিন্তু এদের মতগুলির মধ্যে গোঁড়ামি আছে, অনেক কিছু তারা বিনা যুক্তিতেই মেনে নিয়েছে। সুভাষচন্দ্রের চিন্তা এভাবে অগ্রসর হলে হয়তো তার জীবনের গতি অন্যভাবে নিরূপিত হত। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি অন্য পথে চলল। আমরা আগেই দেখেছি কলকাতার পথে-ট্রামে-অফিসে ইংরেজ সামরিক ও অসামরিক লোকেরা ভারতীয়দের প্রতি কি অপমানকর ব্যবহার করত। অনেক ঘটনা সুভাষের সামনেও ঘটেছিল।

যখনই এরকম কোন ঘটনা ঘটতে দেখতাম আমার স্বপ্নগুলি প্রচণ্ড আঘাত পেত, এবং শঙ্করাচার্যের মায়াবাদের ভিত্তিমূল পর্যন্ত একেবারে নড়ে উঠত। নিজেকে বোঝানো সম্পূর্ণ অসম্ভব হত যে কোনও বিদেশীর হাতে অপমানিত হওয়া একটা মায়া, যা উপেক্ষণীয়।

এই সব ঘটনা সুভাষচন্দ্রের মধ্যে ইংরেজদের প্রতি বিতৃষ্ণা আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। এরই মধ্যে ঘটল ওটেনের ঘটনা। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হয়ে কটকে ফিরে গেলেন।

বিদেশী শাসনের নিদারুণ অপমানে দগ্ধ হতে থাকলেন। কটকে সুভাষচন্দ্রের কার্যত কোন কাজ ছিল না। এই সময়টা তিনি সমাজসেবায় নিজেকে নিয়োগ করতে চাইলেন। আর প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে দেখতে পেলেন প্রকৃত ভারতের চেহারা, রোগজীর্ণ মানুষের মৃত্যুর জন্যে প্রতীক্ষা। তার আধ্যাত্মিক মানসিকতা প্রতি মুহূর্তে ধাক্কা খেতে থাকল।

দু'বছর পরে পুনরায় ভরতি হবার অনুমতি পেয়ে পড়া শুরু করলেন স্কটিশ চার্চ কলেজে। এই কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন এ্যাকুহার্স্ট। তিনি ছিলেন দর্শনের অধ্যাপক এবং ব্যক্তিগত বিশ্বাসে প্র্যাগমাটিস্ট। তার প্রভাব সুভাষচন্দ্রের উপর যথেষ্টই পড়েছিল। পরবর্তীকালে সুভাষচন্দ্র নিজেই বলেছেন যে তিনি মূলত একজন প্র্যাগমাটিস্ট। *(নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী——নেতাজী সঙ্গ ও প্রসঙ্গ, ২য় খণ্ড)*। এটা ঘটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। একদিকে ধর্মীয় ভাববাদের উপর প্রবল বিশ্বাস, অন্যদিকে সমাজজীবনে ঘটে যাওয়া অত্যাচার, নিপীড়ন, দুঃখ-দারিদ্র্য। কিভাবে এর থেকে পরিত্রাণ মিলবে, কোন পথে মিলবে মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য মোচনের চাবিকাঠি। ধর্মশাস্ত্রে তার উত্তর মেলে না। দুঃখজনকভাবে সুভাষ সঠিক দর্শনের সন্ধান পান নি। গ্রহণ করলেন প্র্যাগমাটিজম্।

আর একটা পরিবর্তন সুভাষের মধ্যে দেখা দিল। যে ইংরেজ বিতৃষ্ণা তার বাল্যে শুরু হয়েছিল, তা হয়ে দাঁড়াল তীব্র ইংরেজ-বিদ্বেষ। এই তীব্র ইংরেজ জাতি-বিদ্বেষ তাকে সারাজীবন তাড়া করে নিয়ে বেড়িয়েছে। এমনকি কংগ্রেসের উচ্চতম নেতৃত্বের সাথে এনিয়ে তার বারবার মতদ্বন্দ্ব হয়েছে। জওহরলাল নিজে ছিলেন অত্যন্ত ইংরেজ-গুণগ্রাহী। গান্ধীও কম যান না। সুভাষ সততই এদের সন্দেহ করতেন যে এরা তলে তলে বৃটিশের সাথে না সমঝোতা করে ফেলে। অবশ্য তার এ আশঙ্কা একেবারে অমূলক ছিল তা নয়। ইংরেজ-বিদ্বেষ তাকে দেশত্যাগে উদ্বুদ্ধ করেছিল, এমনকি জাপানের পরাজয়ের পর এক অজানা পথে নিশ্চিত ঝুঁকির মধ্যে নিজেকে সমর্পণ পর্যন্ত করেছিলেন। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল সুভাষচন্দ্রের নতুন এক দার্শনিক চিন্তা——অতিমানববাদ। এর উদ্গাতা জার্মান দার্শনিক নীৎসে।

সুভাষচন্দ্র ছাত্র-যুবকদের সভায় সভায় নীৎসে-র আদর্শে অনুপ্রাণিত হবার আহ্বান জানালেন। একই সঙ্গে বললেন যে তিনি নিজেও নীৎসের অতিমানববাদ আদর্শে বিশ্বাসী।

জিজ্ঞাসা করা যায়, মানবজীবনের প্রকৃত আদর্শ ও সাধনা কী? ঐ আদর্শে পৌঁছাইতে হইলে ছাত্রজীবনের আচরণবিধি কী হওয়া উচিত? জার্মান জাতিকে মহান ও আদর্শস্থানীয় রূপে গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্যে নীট্শে অতিমানবের তত্ত্ব উত্থাপন করিয়াছেন। এই তত্ত্ব আমিও প্রাসঙ্গিক মনে করি। নীট্শে প্রচলিত চিন্তাপদ্ধতিতে কিছু পরিবর্তন ঘটাইতে বলিয়াছেন ও একটি আচরণ বিধিও বাতলাইয়াছেন। *(১৭ আগস্ট ১৯২৯ রাজশাহীতে জেলা ছাত্র সম্মেলনে ভাষণ)*

এই 'অতিমানববাদ' দর্শনটি কি যাকে সুভাষ বলছেন মানবজীবনের প্রকৃত আদর্শ ও সাধনা। আমরা এখানে অল্প দু'একটি কথায় নীৎসে-র অতিমানববাদ নিয়ে আলোচনা করব।

জার্মান দার্শনিক ফ্রেডরিক নীৎসে *(১৮৪৪-১৯০০)* ছিলেন এক অসুস্থ শরীর অথচ প্রখর বুদ্ধিমান পণ্ডিত ব্যক্তি। নীৎসের মতে মানুষের জীবনের সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য হল প্রভুত্ব-প্রেম, আর সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ হল মহামানব সৃষ্টি। শুধু একজন মহামানবই সৃষ্টি হবে না——সৃষ্টি হবে মহান পুরুষের জাতি, দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ বীরের জাতি। এই বীরের জাতি গোটা বিশ্বকে জয় করবে, তাকে শাসন করবে——কারণ, নিম্নতর জাতিকে শাসন করবার

জন্যেই তাদের জন্ম। তিনি মনে করতেন যুদ্ধই মানবজাতির শ্রেষ্ঠ কর্ম——শান্ত হচ্ছে মৃত্যুর পূর্বলক্ষণ। দুর্বল যে সবলের হাতে অত্যাচারিত হবে, এতে অন্যায় কিছু নেই। উল্লেখ করা যেতে পারে যে হিটলার ছিলেন নীৎসে-র পরম ভক্ত। তিনি অতিমানববাদের তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে জার্মান জাতিকে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন এবং পৃথিবী শাসনের স্বপ্ন দেখতেন। নীৎসে-র দর্শনে আরও বলে যে মহান পুরুষের জাতি পৃথিবীতে আরাম সুখভোগ করতে আসে নি। তার জীবনের একটাই উদ্দেশ্য——হয় যুদ্ধ জয় করবে নতুবা মৃত্যুবরণ করবে। নীৎসের মতে জন্মসূত্রেই উচ্চবর্গের মানুষেরা বেশি সুযোগসুবিধে ভোগ করার অধিকার পায় কারণ তারাই পৃথিবী শাসনের দায়িত্ব নেয় এবং তাদের কাজ গুরুত্বপূর্ণ। অতিমানব যিনি তিনি সমস্ত দয়া মায়ার উর্ধ্বে সকলের প্রভু। নীৎসের মতে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ এগুলো মানব সভ্যতার পক্ষে অতীব ক্ষতিকর। তবে নীৎসের অভিমত সবচেয়ে অভিনব নারীজাতির ক্ষেত্রে। নীৎসের মতে শ্রেষ্ঠ জাতির পুরুষকে শিক্ষা দেওয়া উচিত যুদ্ধের আর মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া উচিত যোদ্ধাদের মনোরঞ্জন করার। তিনি পুরুষকে উপদেশ দিয়েছেন——যখন কোন নারীর কাছে যাবে, সঙ্গে বেত নিতে ভুলো না। পুরুষের মনোরঞ্জনের যেটুকু গুণ নারীর দেখা যায় সেটাও পুরুষের কঠোর শাসনের আওতায়। একটু স্বাধীনতা মিললেই নারী অসহনীয় হয়ে যায়। *(বার্ট্রাণ্ড রাসেল——হিস্ট্রি অব ওয়েস্টার্ন ফিলোজফি, রাহুল সাংস্কৃত্যায়ন——দর্শন দিগদর্শন)*

যে সুভাষ ভারতীয় হিন্দু দর্শনের অনুরাগী, বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের ভক্ত, তিনি নীৎসেকে প্রাসঙ্গিক বলেন কি করে? কিন্তু একটু গভীরে চিন্তা করলেই কোন স্ববিরোধিতা পাওয়া যাবে না। হিন্দু ধর্মের অবতারবাদ কি একথা বলে না? আর্যজাতি কি একইভাবে অনার্যদের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করে নি? বিবেকানন্দ কি বারবার বলেননি——এসেছিস যখন একটা দাগ রেখে যা? বিবেকানন্দ সর্বধর্মের মধ্যে সত্য আছে বলেও বলেছেন হিন্দুত্বই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। নারী সম্পর্কে শঙ্করাচার্য বলেছেন নারী নরকের দ্বার। বিবেকানন্দ ব্রহ্মচারীর শুদ্ধতায় বিশ্বাসী। সুতরাং এগুলোর সাথে মিলিয়ে সুভাষচন্দ্র অতিমানববাদে বিশ্বাসী হবেন তাতে আশ্চর্য কি? তার আর একটি বক্তৃতায় এর সমর্থন মেলে——

বর্তমান যুগে প্রাচ্যে, কী পাশ্চাত্যে আমরা Superman (অতিমানুষ) এর কথা শুনিতে পাই। Superman-এর মতবাদ অনেকে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা উপহাস করিবার বিষয় নয় কারণ ইহার মধ্যে একটা মহান সত্য নিহিত আছে। Superman-এর যে রূপ জার্মান দার্শনিক Nietzsche (নীট্‌শে) দিয়াছেন অথবা ভারতের কোনো মনীষী দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা আপনারা অখণ্ড সত্য বলিয়া গ্রহণ না করিতে পারেন কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্য যে সাধু ও মনুষ্যজাতির পক্ষে কল্যাণকর এবং তাঁদের প্রচেষ্টা যে প্রশংসনীয় সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। যে জাতির শ্রেষ্ঠ মনীষীগণ Superman-এর স্বপ্ন দেখেন না সে জাতির কি idealism বা আদর্শবাদ আছে? *(২৭ ডিসেম্বর ১৯২৯ মেদিনীপুর জেলা যুব সম্মেলনে ভাষণ)*

পাঠক লক্ষ্য করুন সুভাষ বলছেন 'ভারতের কোনো মনীষী' নীৎসের মতই Superman-এর তত্ত্ব প্রচার করছেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথার উল্লেখ না করে পারছি না। সুধী প্রধান তার 'সুভাষচন্দ্র ভারত ও অক্ষশক্তি' বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন——"স্বামী বিবেকানন্দের সেই মহান উক্তি 'ভারতের মাথা হবে বেদান্ত ও দেহ হবে ইসলাম' সবসময় তাঁর (সুভাষচন্দ্রের) মনে জাগরূক থাকত।" কিন্তু বিবেকানন্দের এই উক্তিটির মধ্যে দিয়েই বেদান্ত ধর্ম যে ইসলাম ধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ একথাটা বলা হয় নি কি?

যাইহোক, সুভাষচন্দ্রের জীবনে যে আদর্শগুলির সমন্বয় আমরা দেখতে পাই, সেগুলো পরস্পরের পরিপূরক। হিন্দু আধ্যাত্ম দর্শন, প্র্যাগমাটিজম, বিবেকানন্দ অরবিন্দের বাণী, আর নীৎসের অতিমানববাদ——এই চারের সমন্বয়ে সুভাষচন্দ্রের জীবনদর্শন তৈরী হয়েছে। তারসাথে অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে তীব্র ইংরেজ-বিদ্বেষ। সব মিলিয়ে তার পরবর্তী কার্যকলাপের গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা পেতে অসুবিধা হয় না। কেন তিনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে তার প্রভুত্বকারী মনোভাব দেখিয়েছিলেন, কেন ফরোয়ার্ড ব্লক করলেন, কেন করলেন দেশত্যাগ, শত্রুর শত্রু আমার মিত্র——নীতি কেন গ্রহণ করলেন, জাপানেই বা কেন গেলেন——এগুলি পরিস্কার হয়ে আসে। আজাদ হিন্দ বাহিনীর উপর একনায়কত্ব তিনি কেন করেছিলেন, কেন তিনি বারবার বলেছিলেন——স্বাধীন ভারত অন্তত কুড়ি বছর থাকবে কল্যাণকামী ডিকটেটরের হাতে, কেন তিনি বারবার ফ্যাসিবাদের প্রশংসা করেছেন——তাও প্রাঞ্জল হয়ে যায়।

সমাজতন্ত্র——সুভাষ-চিন্তায়

আজকের ভারতের বড় বড় কমিউনিস্ট দলগুলো যারা দেশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করতে লড়াই করছে বলে দাবী করে——সকলেই একবাক্যে বলছে সুভাষচন্দ্র ছিলেন এক মস্তবড় সমাজতন্ত্রী। বস্তুতপক্ষে সুভাষচন্দ্র নিজেকে কয়েকবার সমাজতন্ত্রী বলে পরিচয়ও দিয়েছেন। তার বক্তৃতা বা লেখা থেকে সমাজতন্ত্রের সপক্ষে কিছু কিছু উদ্ধৃতি এনে হাজির করাও অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু এইসব কমিউনিস্ট দলগুলো তাকে সমাজতন্ত্রী আখ্যা দেওয়ার আগে সুভাষচন্দ্রের ভাবনার বিবর্তন কি লক্ষ্য করেছেন? লক্ষ্য করেছেন, কোন কোন পরিস্থিতিতে তিনি সমাজতন্ত্রের পক্ষে কথা বলেছেন, তিনি যে সমাজন্ত্রের কথা বলেছেন তা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র ছিল কি না?

আধুনিক সমাজতন্ত্র সম্পর্কে ভাবনা ইউরোপে পুরনো হলেও ভারতে তা আসে রুশ বিপ্লবের পরে। তবুও সে সম্পর্কে পত্র-পত্রিকা পুস্তকাদি বা সোভিয়েত রাশিয়ার খবর ভারতে যাতে না আসতে পারে সেইজন্য [illegible] সরকার অত্যন্ত সচেষ্ট ছিল। এগুলি সংগ্রহ করা [illegible]য়দের পক্ষে য[illegible]্যই ছি[illegible]ের অব্যবহিত পরেই সুভাষ[illegible] ইংল্যান্ডে পড়তে যান। [illegible] তো [illegible]ধীন দেশ ছিল না, সেখানে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে [illegible]ভাব ছিল না। তার উপর সদ্য ঘটে যাওয়া রুশ বিপ্লবের আলোড়নে তখন গোটা ইউরোপ কাঁপছে। ইউরোপের কলেজে ইউনিভার্সিটিতে ছাত্র যুবকদের মধ্যে তা নিয়ে [illegible] আলোচনা-উন্মাদনা। সুভাষচন্দ্র অল্পবিস্তর এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল থাকলেও এর আঁচ নিজের গায়ে লাগতে দেন নি। তার মূল লক্ষ্য ভাল রেজাল্ট করে ইংরেজদের দেখিয়ে দেওয়া যে ভারতবাসীও পারে। 'নিজের ঘরে এসে জব্দ করতে পারি তবেই তো'। তার উপর ভারতবর্ষে গান্ধী বলেছেন তিনি একবছরের মধ্যে স্বরাজ এনে দেবেন। পড়াশোনার বাইরে সুভাষের দৃষ্টি ভারতবর্ষের উপরই কেবল নিবদ্ধ ছিল।

ভারতে রাজনীতিতে এসে সুভাষচন্দ্র চিত্তরঞ্জনের দক্ষিণহস্ত হলেন। সাথে সাথে রাজনীতির কূটকৌশলেও হাত পাকালেন। সেই সময় বামপন্থীরা সংখ্যায় অত্যন্ত কম ছিলেন। রাজনীতিতেও তাদের উল্লেখযোগ্য প্রভাব ছিল না। বর্মায় দীর্ঘ কারাবাস শেষে সুভাষচন্দ্র যখন ফিরে এলেন, বাংলার রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর কংগ্রেসের সেই একছত্র আধিপত্য নেই। ওয়াকার্স এ্যান্ড পীজান্টস পার্টি নাম নিয়ে কমিউনিস্টরা শ্রমিক কৃষকদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী হয়ে

উঠেছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও তারা সংগঠিত হয়েছে। মুজাফফর আহমেদ তার 'সমকালের কথা' বইতে লিখেছেন যে সাইমন কমিশন যখন কলকাতার উপর দিয়ে ট্রেনযোগে আসাম যায় সুভাষচন্দ্র তার বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ দেখাতে যান, তাতে বিশেষ সাড়া মেলে না। তখন বাধ্য হয়ে সুভাষ ওয়াকার্স এ্যান্ড পীজান্টস্ পার্টিকে সঙ্গে ডাকেন এবং সাইমন কমিশন যখন কলকাতায় আসে বিক্ষোভ সমাবেশ দারুণ সফল হয়। এরকম যখন পরিস্থিতি, সুভাষচন্দ্রকে বাংলায় কংগ্রেসের রাজনীতি করতে হয় বামপন্থী মতাদর্শের বিরোধিতা করেই। তিনি সরাসরি শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্বের বিরোধিতা করলেন——

এখন খোলাখুলিভাবে শ্রেণী-সংগ্রামের কথা প্রচার করা এবং তা বাস্তবে রূপ দেওয়ার উদ্যোগ করে আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টাকে আমি জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে অপরাধ বলে মনে করি। আমাদের দেশের শ্রমিক আন্দোলনের সাথে সম্পর্কিত কিছু লোক যাদের কমিউনিস্ট বলা যেতে পারে, লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে তাদের কার্লমার্ক্স ও বাকুনিনের মতবাদ বদহজম হয়েছে। *(৩ মে ১৯২৮ পুণায় মহারাস্ট্র প্রাদেশিক সম্মেলনে ভাষণ)*

ধনী-দরিদ্র, শ্রমিক-মালিকের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করলে না হয় জাতীয়তাবোধ ক্ষুন্ন হবে। তাহলে কি করতে হবে ভারতবাসীর? তার উত্তর মেলে সুভাষের আর এক বক্তৃতায়——

দেশ, কোন ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষের সম্পত্তি নয়। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি শ্রমিক, কি ধনিক——কোন সম্প্রদায় একা স্বরাজ লাভ করতে পারবে না। স্বরাজলাভ হবে সকল সম্প্রদায়ের সহযোগিতায়। *(১৭ ডিসেম্বর ১৯২৮ নিখিল বঙ্গ যুব সম্মেলনে ভাষণ)* তাহলে কোন ধরনের সমাজতন্ত্র সুভাষ চান——যে সমাজতন্ত্রে ধনী আর দরিদ্রের মধ্যে, শ্রমিক আর কারখানা মালিকের মধ্যে কোন বিরোধ থাকবে না।

পূর্ণ স্বাধীনতা মানুষে মানুষে সাম্যের সমাজতান্ত্রিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। রাশিয়া একটা মতবাদ গ্রহণ করিয়াছে, আজকের ইতালি একটি, এবং ভারতবর্ষও সাম্য ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সম্পর্কে তার নিজের ভাষ্য গ্রহণ করিবে। ভারতীয় দর্শন বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যস্থাপনের শিক্ষা দেয়। উপনিষদ হইতে শুরু করিয়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পর্যন্ত ইহাই ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতের ভিত্তি বলিয়া গণ্য হইবে। *(১৪ মে ১৯৩১ নোয়াখালি 'দেবালয়' প্রাঙ্গণে ভাষণ)*

সুভাষের কথায় রাশিয়া এক ধরনের সমাজতন্ত্র গ্রহণ করেছে, ইতালির ফ্যাসিস্ট মুসোলিনি নিয়েছে আর এক ধরনের সমাজতন্ত্র। ভারতও নেবে এক নতুনতর সমাজতন্ত্র যার ভিত্তি হবে——উপনিষদ থেকে শুরু করে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পর্যন্ত। আর এই সমাজতন্ত্র হল তার ভাষায়——

এই তো বাংলার Socialism। এই Socialism-এর জন্ম কার্ল মার্কসের পুঁথিতে নয়। এই Socialism-এর জন্ম ভারতের শিক্ষাদীক্ষা ও অনুভূতি হইতে। যে গণ-আন্দোলনের সূচনা বিবেকানন্দের উক্তির মধ্যে পাই তাহা আরো পরিস্ফুট হইয়াছে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বাণী ও সাধনার মধ্যে। *(৩০ মার্চ ১৯২৯ রংপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে ভাষণ)*

সুভাষচন্দ্রের এই শিক্ষা অবশ্য বিফলে যায় নি। ভারতের কমিউনিস্টদের মধ্যে একটা বড় অংশই এই শিক্ষা নিয়েছে। দু-এক বছর আগে সি পি আই এম পার্টির মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সাথে রাইটার্স বিল্ডিং-এ প্রেস কর্ণার ভাঙ্গা নিয়ে সি পি আই নেত্রী গীতা মুখার্জীর একটা আপোসে ঝগড়া মত হয়েছিল। সেসময় গীতা মুখার্জী বেশ কড়া করে

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে শুনিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি মার্কস লেনিন পড়ে কমিউনিস্ট হন নি, তিনি কমিউনিস্ট হয়েছেন বিবেকানন্দ পড়ে। (বোধকরি, বর্ষীয়ান নেত্রী বোঝাতে চেয়েছেন বিবেকানন্দ-পড়া কমিউনিস্টরা উচিত কথা বলতে ভয় পান না, মার্কস লেনিন-পড়া কমিউনিস্টরা তা পান)।

যাইহোক, সুভাষচন্দ্রের সমাজতান্ত্রিক চিন্তায় এই হল আদর্শগত ভিত্তি, কিন্তু রাষ্ট্রের জীবনে তা প্রয়োগ হবে কিভাবে? সুভাষচন্দ্র এ সমস্যার সমাধান করলেন এক অদ্ভুতভাবে। তিনি বললেন——

সবকিছু বিবেচনা করে দেখলে এই মতই পোষণ করতে হয় যে বিশ্ব-ইতিহাসের পরবর্তী পর্যায়ে কম্যুনিজম্ ও ফ্যাসিবাদের মধ্যে একটা সমন্বয় সৃষ্টি হবে; এবং এই সমন্বয় যদি ভারতেই সৃষ্টি হয় তাহলে বিস্ময়ের কি আছে? *(দ্য ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল)*

শুধু ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল বইতে লেখাই নয়, ভারতের বিভিন্ন সভাতে তিনি এই মতই সোচ্চারে বলে এসেছেন। শুধু তাই নয়, তার মতে সাম্যবাদ মানে হল ——সমন্বয়। এই ফ্যাসিবাদ আর সমাজতন্ত্রের মিলনই তার কাছে সাম্যবাদ *(দ্য ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল)*। এই হল সাম্যবাদ এবং সমাজতন্ত্র সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের ধারণা।

আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে সুভাষচন্দ্র যখন ইউরোপে চিকিৎসার জন্য ছিলেন এবং ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল বই লিখছিলেন, ভারতবর্ষে তখন কংগ্রেসের মধ্যেকার একদল তরুণ 'কংগ্রেস সমাজবাদী দল' তৈরী করেছিলেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের সেরা সেরা কংগ্রেসকর্মী এই দলে যোগ দিয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র দেশে ফিরে এই দলের সমর্থন পেলেন। আবার গান্ধীর সাহায্যে কংগ্রেস সভাপতিও হলেন। কংগ্রেস সভাপতি হয়ে সুভাষচন্দ্রের লক্ষ্য রইল দু'দিকেই। একদিকে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতাদের মন যুগিয়ে চলা, অন্যদিকে সমাজবাদী দল এবং বেআইনী কমিউনিস্ট পার্টি যারা তাকে সমর্থন করছে——সেই সমর্থন অটুট রাখা। এটা করতে গিয়ে সুভাষচন্দ্র নিলেন এক চমৎকার কৌশল। সভায় সভায় বক্তৃতায় বামপন্থী কথা বলে এবং কাজে দক্ষিণপন্থীদের মনোমত সবকিছু করতে থাকলেন। (এই সময়কার তার কাজের বিবরণ আগে 'সুভাষচন্দ্র——কংগ্রেসের সেরা সভাপতি ' অধ্যায়ে দিয়েছি)। এ বিদ্যেটা অবশ্য তার চেয়ে জওহরলালেরই বেশি জানা ছিল। সুভাষচন্দ্র হরিপুরায় তার সভাপতির ভাষণে সমাজতন্ত্রের কথা বললেন, জমিদারী বিলোপের কথা বললেন, শ্রমিক কল্যাণের কথা বললেন। সাথে সাথে আবার ভারতীয় শিল্পপতিদের স্বার্থে তিনি সদা সচেষ্ট এটাও বুঝিয়ে দিলেন। তিনি বিদেশী বিনিয়োগকারীদের তুলনায় দেশীয় শিল্পপতিদের বিশেষ সুবিধাদানের পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখলেন এবং জাহাজশিল্পে ভারতীয় মালিকদের স্বার্থরক্ষার কথাও বললেন। এই হরিপুরা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিশন স্থাপন করবার প্রয়োজনীয়তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করলেন।

ন্যাশনাল প্ল্যানিং নিয়ে একদল ঐতিহাসিক দারুণ উচ্ছ্বসিত। এটা ছিল নাকি এমন যুগান্তকারী পরিকল্পনা যে তা গ্রহণ করলে ভারতের সোনায়-মোড়া ভবিষ্যৎ হয়ে যেত। ভারতের শাসন সংস্কারের সুযোগ নিয়ে যখন প্রদেশে প্রদেশে কংগ্রেস ক্ষমতায় এল তখন তার নেতারা বুঝতে পারল ধাপে ধাপে স্বাধীনতা পেতে বেশি দেরি নেই। আমরা আগেই দেখেছি ভারতীয় পুঁজি তখন প্রায় স্বাধীন পুঁজিতে পরিণত হতে পেরেছিল। সুতরাং দেশের শিল্পনীতি কি হবে তা নিয়ে ভাবতে কংগ্রেস বাধ্য হল। ১৯৩৭ সালে জওহরলাল যখন কংগ্রেস সভাপতি সেই সময় ওয়ার্কিং কমিটি সিদ্ধান্ত নেয় যে ন্যাশনাল প্ল্যানিং-

কামাট গঠন করা হবে। পরের বছর সভাপতি হয়ে সুভাষচন্দ্র কামাট গঠন করলেন, নেহেরু হলেন তার সভাপতি। এই প্ল্যানিং কমিটির প্রথম অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা নাকি সমাজতন্ত্রের একেবারে পরকাষ্ঠা। কি বলেছিলেন তিনি সেই সভায়? বলেছিলেন দেশে শিল্পায়ন করতেই হবে। তা না করলে দেশে উন্নয়ন হবে না। কিন্তু তা বলে দেশের কুটির শিল্পকে অবহেলা করা যাবে না। দেশের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্র তিনটি বিভাগ করলেন । প্রথম হচ্ছে ভারি বা বুনিয়াদি শিল্প, দ্বিতীয় মাঝারি শিল্প এবং তৃতীয় হচ্ছে কুটিরশিল্প। বুনিয়াদি শিল্পগুলো স্থাপন করবে রাষ্ট্র, মাঝারি শিল্পগুলো বেসরকারী শিল্পপতিদের উপর ছেড়ে দেওয়া হবে এবং কুটিরশিল্প গড়ে তুলবে কারিগররা। সমাজতন্ত্র ইত্যাদির কথা অনেকবার উচ্চারণ করলেও এই ছিল সুভাষচন্দ্রের বক্তব্যের মূলকথা।

অনেক আলোচক বলে থাকেন যে, এই প্ল্যানিং কমিশনে সুভাষচন্দ্র শিল্পায়নের উপর বিশেষ জোর দেওয়াতেই গান্ধী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন, কারণ গান্ধী ছিলেন শিল্পায়নের ঘোর বিরোধী। তাদের মতে এরই পরিণামে সুভাষচন্দ্রকে দ্বিতীয়বার সভাপতি হিসাবে গান্ধী মানেন নি। তখনকার ভারতের অর্থনীতি বিশ্লেষণ করলে এই যুক্তির অসারতা ধরা পড়ে। আমাদের বুঝতে হবে নামে স্বদেশী আন্দোলন হলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগের স্বদেশী আর পরবর্তীকালের স্বদেশী এক ছিল না। প্রথম যুগে ভারতীয় শিল্প ছিল কমজোর, উৎপাদিত পণ্য ছিল নিম্নমানের । অপর দিকে বৃটিশ পণ্য ছিল দামে সস্তা, গুণমানেও ভাল। সাধারণ মানুষ তো বিলাতী কাপড় কিনবেই। তাই গান্ধী আনলেন কৃচ্ছ্রতাসাধনের তত্ত্ব, সরল জীবন যাপনের তত্ত্ব, স্বয়ম্ভর গ্রামের তত্ত্ব। গ্রামের লোক নিজের কাপড় নিজেই তৈরী করবে, গান্ধী আনলেন চরকা। এই ভাবে মানুষকে বোঝান হল দেশকে ভালবেসে মোটা কাপড় পরা অনেক ভাল। দেশীয় কলে তৈরী পণ্য খারাপ হলেও ওটাই কেনো। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। ভারতীয় শিল্পপতিদের মালিকানাধীন অনেক কলকারখানা স্থাপন হল। ১৯২৯-৩০ সালের মন্দার পর ভারতীয় পুঁজি বৃটিশ পুঁজিকে ছাড়িয়ে যেতে চাইল। উৎপাদিত পণ্য গুণমানে বৃটিশদের পণ্যের সাথে টক্কর দিতে পারল। নতুন নতুন যন্ত্রপাতি স্থাপনের ফলে বিপুল পরিমাণ পণ্যও উৎপাদিত হতে থাকল। এখন কৃচ্ছ্রতাসাধনের নীতি চলবে কেন? লোকে যদি সরল জীবন যাপন করে, উৎপাদিত পণ্য না কেনে, শিল্পপতিদের চলবে কেন? গ্রামগুলি যদি স্বয়ম্ভর হতে চায়, নিজের কাপড় নিজেরাই তৈরী করে নেয়, মিল মালিকেরা কাপড় বেচবে কোথায়? আগের সেই ত্যাগের আদর্শ ভারতীয় শিল্পপতিদের এখন দরকার নেই, এখন চাই ভোগের আদর্শ। সুতরাং গান্ধী নীতি বর্জন শুরু হয়ে গেল। আর পয়লা পয়লা নম্বর গান্ধীপন্থীরা সব শিল্পোন্নয়নে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে গেলেন। বস্তুতপক্ষে, গান্ধীকে মাথার উপর রেখে গান্ধীপন্থার পরিকল্পনাকে আগেই বিদায় দেওয়া হয়েছিল। বড় বড় শিল্পপতির মুরুব্বি হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন প্যাটেল জওহরলালেরা। এরপর আমরা দেখব গান্ধী দুঃখ করে একে ওকে বলছেন যে তার নীতি কংগ্রেসে কেউ মানে না। সুতরাং শিল্পায়নের নীতির পক্ষে সুভাষ যে বক্তব্য রেখেছিলেন, কংগ্রেসে সেটা নতুন কিছু ছিল না। এর পরেও যিনিই কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছেন, তিনিই শিল্পায়নের পক্ষে সওয়াল করেছেন।

বুনিয়াদী এবং মাঝারি শিল্প নিয়ে সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য ছিল প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় শিল্পপতিদের আকাঙ্খারই প্রতিফলন। সুভাষের মতে বুনিয়াদী শিল্পগুলি স্থাপন হবে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় আর মাঝারি শিল্পগুলি শিল্পোদ্যোগীদের ছেড়ে দেওয়া হবে। এ কথা সকলেই জানেন যে বুনিয়াদী শিল্প যেমন লৌহ ও ইস্পাত, বিদ্যুৎ উৎপাদন ইত্যাদিতে

বিনিয়োগ অনেক বেশি, তুলনায় মুনাফা ততবেশি নয়। মুনাফা আসেও একটু দেরীতে। তাছাড়া ভারতীয় শিল্পপতিরা তখনও এত বিনিয়োগ করার মত অবস্থায় আসে নি। সুতরাং তারা চেয়েই ছিল বুনিয়াদী শিল্পগুলো রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন থাকুক। আর মাঝারি শিল্পে বিনিয়োগ করতে হয় কম, মুনাফাও বেশি এবং হাতে আসেও তাড়াতাড়ি। সুতরাং পরিকল্পনাটি যে শিল্পপতিরা লুফে নেবে এতে আর সন্দেহ কি? অথচ এই পরিকল্পনাটিকেই সুভাষচন্দ্র বড় গলা করে 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচ' বলেছেন। মনে রাখতে হবে যে স্বাধীন ভারতে নেহেরুও মানুষকে এই একই 'সমাজতান্ত্রিক' ধোঁকাটি দিয়েছেন। নেহেরুর সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে ইস্পাতশিল্প, রেল, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ উৎপাদনের মত বুনিয়াদী শিল্পগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছিল। রাষ্ট্রায়ত্ত এই সংস্থাগুলি দেশের সেবা করে নি, করেছে ভারতীয় শিল্পপতিদের সেবা। নিজেরা লোকসান করে এই সংস্থাগুলি ভারতীয় পুঁজির মালিকদের মুনাফার সেবা করেছে। আর নেহেরু বলেছেন তিনি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করছেন। (এখন অবশ্য ভারতীয় পুঁজির পরিস্থিতি ভিন্ন, সে আলোচনা স্বতন্ত্র)।

এই হচ্ছে বহু প্রচারিত 'সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা'। দশ জনের প্ল্যানিং কমিটি স্থাপন করা হল। নেহেরু হলেন চেয়ারম্যান। তখনকার বড় বড় শিল্পপতি অম্বালাল সারাভাই, পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাসকে কমিটির সদস্য করা হল। এছাড়াও যে ২৯ টি উপসমিতি গড়া হল সবগুলোতেই শিল্পমালিকদের উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধিত্ব রাখা হল। জওহরলাল প্ল্যানিং কমিটিতে একজন শ্রমিক প্রতিনিধি রাখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সুভাষ রাজী হন নি *(টাইমস্ অব ইন্ডিয়া, ডিসেম্বর ১৯৩৮)*। সুভাষচন্দ্রের 'সমাজতান্ত্রিক' চিন্তার আরও উদাহরণ মেলে যখন তিনি হরিপুরা কংগ্রেস থেকে ফেরার পথে ২৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮ বোম্বাইয়ের ইন্ডিয়ান মার্চেন্টস্ চেম্বারের একটি টি-পার্টিতে যোগ দেন। সেখানে বোম্বাইয়ের ব্যবসায়ীদের তিনি আশ্বাস দেন যে এখনই তিনি শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করার কথা ভাবছেন না। সর্বোপরি তিনি বললেন——"উৎপাদনে নিরত ব্যবসায়ীরা প্রতিক্রিয়াশীল নন।" *(অমৃতবাজার পত্রিকা, ২৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮)*। আবার ঠিক চারদিন পর ২ মার্চ এক শ্রমিক সমাবেশে সুভাষচন্দ্র বললেন যে গরীবী দূর করা যেতে পারে কেবল বৈজ্ঞানিক পন্থায়। সেই পন্থাটি হল——সমাজতন্ত্র। *(অমৃতবাজার পত্রিকা ৩ মার্চ ১৯৩৮)*। তো এই যখন সুভাষচন্দ্রের ন্যাশনাল প্ল্যানিং, ভারতের শিল্পদ্যোগী মহল থেকে যে তা খুব সাবাশী পাবে এ আর নতুন কী। তখনকার পুঁজিপতিদের সবকটি কাগজ ন্যাশনাল প্ল্যানিংকে স্বাগত জানিয়েছিল। ততদিনে ভারতের শিল্পপতিরা বুঝে গিয়েছেন—— জওহরলাল আর সুভাষচন্দ্র কি ধরনের সমাজতন্ত্রী।

এর আগেই আমরা দেখেছি যে, সুভাষচন্দ্র তার ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল বইতে লিখেছেন যে ভারতে সমাজতন্ত্র চলবে না, সেখানে চাই সমাজতন্ত্র ও ফ্যাসিবাদের সমন্বয়। এরপর ভারতে বামপন্থীরা শক্তিশালী হলে তিনি ইউরোপে বসেই তাদের অত্যন্ত প্রশংসা করলেন। ভারতে এসে বামপন্থীদের পুরোপুরি সমর্থনও পেলেন। গান্ধীর দ্বারা কংগ্রেস সভাপতি মনোনীত হবার পর তিনি ইউরোপের অন্য দেশ ঘুরে ইংল্যান্ডে গেলেন। তখন বৃটেনের লোক জেনে গিয়েছে যে তিনি কংগ্রেসের সভাপতি হচ্ছেন। এই সময় বৃটেনে প্রবাসী ভারতীয় কমিউনিস্ট তাত্ত্বিক নেতা রজনী পাম দত্ত তার একটি সাক্ষাৎকার নেন। সেখানে রজনী পাম দত্ত তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে সুভাষ তার ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল বইতে কমিউনিজম সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন সে বিষয়ে তার মন্তব্য কি? সুভাষচন্দ্রের তখন ভারতীয় কমিউনিস্ট এবং সোসালিস্টদের বড় প্রয়োজন। তিনি উত্তরে জানালেন——তিন বছর আগে ঐ গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তারপরে আমার চিন্তাধারা অনেক পরিণতি লাভ করেছে।

আমি সঠিক যা বলতে চেয়েছিলাম তা হল আমরা ভারতবাসী, জাতীয় স্বাধীনতা কামনা করি এবং তা অর্জন করবার পর স্যোসালিজম অর্থাৎ সমাজবাদের পথে অগ্রসর হতে চাই। "কমিউনিজম ও ফ্যাসিজমের মধ্যে সমন্বয়" বলতে আমি এ কথাই বুঝিয়ে ছিলাম। হয়তো আমার ব্যবহৃত শব্দগুলি সুষ্ঠু হয় নি। কিন্তু আরও একটা কথা মনে করা দরকার। আমি যখন বইটি লিখেছিলাম তখনও ফ্যাসিজম সাম্রাজ্যবাদী অভিযানের পথে অগ্রসর হতে শুরু করে নি। এবং আমার কাছে এটাই জাতীয়তাবাদের এক উগ্র রূপ হিসাবে প্রতিভাত হয়েছিল। *(২৪ জানুয়ারী ১৯৩৮ লন্ডনের 'ডেইলী ওয়ার্কার' পত্রিকায় রজনী পাম দত্তের সঙ্গে সাক্ষাৎকার)*।

ঠিক কথাই তো, মানুষ মাত্রই ভুল বুঝতে পারে। এতে অন্যায়ের কিছু নেই। এর পরেও বামপন্থী সমন্বয় কমিটির নেতা হিসাবে সুভাষচন্দ্র বার বার ভারতবর্ষে সমাজতন্ত্র কায়েমের কথা বলেছেন। ভারতের বামপন্থীরা তার কথাতে আস্থা জ্ঞাপন করেছে।

সেই সুভাষচন্দ্রই জার্মানি বা জাপানের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করার পর, সমাজতন্ত্র সম্পর্কে নতুন করে পরিণতি লাভ করলেন। ১৯৪৪ সালে টোকিওতে ইম্পিরিয়াল ইউনিভার্সিটিতে তার ভাষণে বললেন——

প্রথমতঃ শ্রেণী সংগ্রাম এমন একটি জিনিস ভারতে যাহার কোনো প্রয়োজন নাই। যদি স্বাধীন ভারতের সরকার জনতার যন্ত্র হিসাবে কাজ করে তাহা হইলে শ্রেণী বিরোধের প্রয়োজন নাই। আমরা রাষ্ট্রকে জনতার সেবকরূপে সংগঠিত করিয়া আমাদের সমস্যাগুলির সমাধান করিতে পারি। সুতরাং ধনী থাকবে, দরিদ্র থাকবে, মালিক থাকবে, শ্রমিক থাকবে——অথচ শ্রেণী-বিরোধ থাকবে না এটাই সুভাষচন্দ্রের সমাজতান্ত্রিক চিন্তা। শুধু তাই নয়। ঐ বক্তৃতায় তিনি সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তার পুরনো ধারণায় ফিরে গেলেন——

স্বাধীন ভারতে আমরা কিরূপ রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক পদ্ধতি গ্রহণ করিতে চাই সেই বিষয়ে আমার মতামত দশ বছর আগে আমার 'দ্য ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল' গ্রন্থে লিখিয়াছি।আমি বুঝিতে পারি না একদিকে ফ্যাসিবাদ (যাহাকে আপনারা ন্যাশনাল সোসালিজম বলিতে পারেন) এবং অন্যদিকে কমিউনিজমের ভালো দিকগুলি লইয়া একটা সমন্বয় গড়িয়া তোলা যাইবে না। সুতরাং যারা সুভাষচন্দ্রকে সমাজতন্ত্রী বলেন, তাদের এই সমাজতন্ত্রের স্বরূপটিও চিহ্নিত করা উচিত। মনে রাখতে হবে হিটলারের 'নাৎসী দলেরও পুরো নামটি ছিল——ন্যাশনাল সোসালিস্ট পার্টি। সুভাষচন্দ্র নাৎসী মতাবলম্বী অবশ্যই ছিলেন না। কিন্তু তিনি যে সমাজতন্ত্রের কথা বলতেন তা কখনই 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' নয়।

সুভাষচন্দ্র কি 'ফ্যাসিস্টদের পুতুল' ছিলেন

কংগ্রেস থেকে পরিত্যক্ত হয়ে সুভাষ নতুন দল স্থাপন করেছিলেন-ফরোয়ার্ড ব্লক। সমস্ত বামপন্থী দলগুলো নিয়ে একটা বামপন্থী সমন্বয় কমিটিও গড়েছিলেন। কিন্তু বামপন্থী সমন্বয় কমিটি কালক্রমে ভেঙ্গে গেল। ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রভাব দিনে দিনে কমে আসতে থাকল। এই নিদারুণ ব্যর্থতা সুভাষ মেনে নিতে পারেন নি। তিনি দেশত্যাগ করে বিদেশের সহায়তায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতার কথা চিন্তা করলেন। কারণ, বিশ্বজুড়ে যে যুদ্ধ হচ্ছে তাতে বৃটেন হারছেই। সুতরাং এই যুদ্ধের সুযোগে যদি দেশের বাইরে থেকে সেনা যোগাড় করে ভারত সীমান্তে আসা যায় তবে ভারতকে স্বাধীন করা যাবে। এই ছিল সুভাষের চিন্তা।

আমরা আগেই দেখেছি, সুভাষচন্দ্রের জীবনে ইংরেজ-বিরোধিতা একটা জীবনদর্শনের মত ব্যাপার ছিল। সুতরাং যে কোন উপায়ে ইংরেজ হটাতে হবে। তার জন্য কোন পথ অবলম্বিত হল সেটা বড় কথা নয়। তার উপর সুভাষ প্র্যাগম্যাটিস্ট।শত্রুর দুঃসময়ের সুযোগ নাও——আর শত্রুর শত্রু, আমার বন্ধু। এই চিন্তাতেই সুভাষের জার্মান-যাত্রা,যে জার্মানিতে সুভাষের অতীত অভিজ্ঞতা সুখের নয়। ফ্যাসিস্ট মুসোলিনির সাথে তার সুসম্পর্ক থাকলেও সুভাষ ইতালি যান নি কারণ তার অভীষ্ট পূর্ণ করতে পারে একমাত্র জার্মানি। সুতরাং জার্মানির বিশেষতঃ সর্বশক্তিমান হিটলারের ভারত অথবা ভারতবাসী সম্পর্কে অত্যন্ত হীন ধারণা আছে একথা জেনেও তিনি সেখানেই গেলেন।

হিটলারও তখন ভারত সম্পর্কে আগ্রহী। ভারত অভিযানের জন্য যত নয়, প্রচারের মাধ্যমে ভারতে যতটা অস্থিরতা সৃষ্টি করা যায় সেটাই হিটলারের লাভ। বৃটিশ তাহলে বড় একটা ফৌজ ভারতের মাটিতে রাখতে বাধ্য হবে, জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠাতে পারবে না। সেই প্রচারের কাজটা করাতে চাইলেন সুভাষচন্দ্রকে দিয়ে। সুভাষচন্দ্র তো প্রচার করতে তৈরীই, কিন্তু তিনি তার সাথে চান অক্ষশক্তি ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে ঘোষণা করুক। কিন্তু হিটলার তা করবেন না। শুধু নিজে করবেন না তা নয়, জাপান বা ইতালিকেও করতে দেবেন না। একথাটা কিন্তু হিটলার সুভাষকে বুঝতে দিলেন না। তাকে আশা দিয়ে ঝুলিয়ে রাখলেন।সুভাষচন্দ্র ব্যার্লিন থেকে বেতার প্রচার করতে থাকলেন। যে দুবছর প্রায় তিনি জার্মানিতে ছিলেন তা ছিল হিটলার দ্বারা সুভাষচন্দ্রকে প্রতারণার ইতিহাস। হিটলার তাকে দিয়ে শুধু নিজের কাজটুকু করিয়ে নিয়েছেন, বিনিময়ে ভারতকে কিছু দেন নি। স্বভাবতঃই ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাকে হিটলারের দোসর ভেবেছে। নেহেরু গৌহাটিতে বলেছেন সুভাষ যদি জাপানী ফৌজ নিয়ে ভারতে আসে আমি তরবারি হাতে তার মোকাবিলা করব। কমিউনিস্টরা বলেছেন-সুভাষ ভারতের কুইসলিন। বিশ্বযুদ্ধের সেই পরিস্থিতিতে তাদের এই বক্তব্যের জন্য দোষ দেওয়া যায় না।

সুভাষ কিন্তু কখনই হিটলারের হাতের পুতুল ছিলেন না। কুইসলিনের উদাহরণ তো আনাই চলে না। সুভাষচন্দ্র অবশ্যই নাৎসীদের সাথে বন্ধুত্ব করেছিলেন,সে বন্ধুত্ব ইতিহাসের বিচারে একেবারেই ক্ষমার্হ নয়——কিন্তু মনে রাখতে হবে তিনি অক্ষশক্তির বিশ্বজয়ের একজন অংশীদারও ছিলেন না। তার লক্ষ্য একমুখী ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। এবং এই লক্ষ্যের জন্য মানবতার শত্রু নাৎসীদের সাথে হাত মিলিয়েছেন, পরিণামে মিলেছে শুধুই প্রতারণা। আর এই প্রতারণার ফলশ্রুতিতে যারা তাকে হিটলারের পুতুল ভেবেছেন, তাদের সে ভাবনা তৎকালীন সময়ে অস্বাভাবিক ছিল না। আজ যখন আমরা নির্মোহ দৃষ্টিতে সুভাষচন্দ্রের ভূমিকাকে বিশ্লেষণ করব, আমরা দেখব এসবের মূলে তার জীবনদর্শনের ভ্রান্তি, বিশ্বাসঘাতকতার প্রশ্ন তোলা এখন গভীর অন্যায় মাত্র।

হিটলারের দ্বারা প্রতারিত সুভাষচন্দ্র জাপানে গেলেন। সেখানে পেলেন লাখো মানুষের সক্রিয় সমর্থন। তিনি আবেগে আপ্লুত হলেন স্বপ্ন সার্থক হওয়ার সম্ভাবনায়। আগের অভিজ্ঞতার ফলে জাপানে সুভাষ ছিলেন অনেক বেশি সতর্ক। জাপ-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তায় আরও সাবধানী। বেশ কিছু দাবী আদায়ও করলেন। কিন্তু যুদ্ধ পরিকল্পনার প্রশ্নে জাপানও তাকে প্রতারিত করল।জাপান যে ভারত অভিযান করবে না, তা সুভাষ বুঝতে পারেন নি। জাপানও বুঝতে দেয় নি। আজ যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দলিল-পত্রাদি গবেষকদের সামনে আসছে, জাপানী প্রতারণার এই স্বরূপও উদ্ঘাটিত হয়ে পড়েছে। যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হতে হতে মরিয়া জাপ-সামরিক কর্তৃপক্ষ শুধু কুড়ি হাজার আজাদ হিন্দ ফৌজকে মৃত্যুমুখে ফেলে দেয় নি, ফেলে দিয়েছে নিজের দেশের দুই লক্ষ তিরিশ হাজার সেনাকে। পরিণামে প্রাণ হারিয়েছে চার হাজার আজাদ হিন্দের সেনা,

আর জাপানী সৈন্য অন্ততঃ নব্বই হাজার। এটা নেহাতই যুদ্ধে মৃত্যু নয়, এটা নিজেদের সেনাদলের প্রতি চরম বিশ্বাসহন্তার কাজ।

জাপানে সুভাষচন্দ্র তার সেনাবাহিনীর মর্যাদার জন্য,তার অস্থায়ী সরকারের মর্যাদার জন্য, সর্বদাই সচেষ্ট থেকেছেন। অনেক সময় মর্যাদা আদায় করতে পেরেছেন,অনেক সময় পারেন নি। মনে রাখতে হবে রসদ হোক, অর্থ হোক, কূটনৈতিক সহায়তা হোক, সব ব্যাপারেই তাকে জাপানের সাহায্য নিতে হয়েছিল। তার মধ্যে থেকে তিনি যেটুকু জাপ-কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আদায় করতে পেরেছিলেন সেটাও কম নয়। জাপানী একনায়ক তোজোর কাছ থেকে তিনি যোগ্য মর্যাদা পেতে চেয়েছিলেন। তার হাতের পুতুল তিনি কখনই ছিলেন না।

সুভাষচন্দ্রের মূল ভ্রান্তি ছিল দর্শনগত। তিনি ভারতের স্বাধীনতার সাথে অক্ষশক্তির বিজয়কে সমার্থক বলে ধরেছিলেন। তার মতে -"যুদ্ধে অক্ষশক্তি হারলে ভারত ১০০ বছরেও স্বাধীনতা পাবে না।" তার এ ধারণা ভুল ছিল। তিনি আটলান্টিক সনদের গুরুত্ব বুঝতে ভুল করেছিলেন। তিনি বলেছেন-"ওটা উইলসনের চোদ্দ-দফার মত বাজে কাগজমাত্র।" উল্টোদিক থেকে তিনি কি করে ধারণা করলেন যে জার্মানির নেতৃত্বে অক্ষশক্তি বিজয়ী হলে ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে। জার্মানি অধিকৃত ইউরোপের দেশগুলোর অভিজ্ঞতা দেখেও কি তিনি শিক্ষালাভ করতে পারেন নি! তিনি কি দেখেন নি হিটলারের নাৎসী বাহিনী কি নৃশংস অত্যাচার সেখানে করেছে! তিনি কি দেখেন নি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপানী বাহিনীর অত্যাচার, খুন, ধর্ষণ! কি করে তিনি ভাবলেন, তারা ভারতে অনুরূপ অত্যাচার নামিয়ে আনবে না! অক্ষশক্তি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী হলে বিশ্বের বুকে যে ভয়াবহতা ঘনিয়ে আসত তা বোঝার মত বিশ্ব-বীক্ষা কি সুভাষচন্দ্রের ছিল না? নাকি তীব্র ইংরেজ বিদ্বেষ আর গান্ধী জওহরলালের সাথে তার নেতৃত্বের লড়াই তার বিশ্ব-বীক্ষণকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল ? মনে রাখতে হবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির জয়ের ফলশ্রুতিতেই ভারতসহ বহু দেশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হয়েছিল।(সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়া ততদিনে শোষণের নতুন কৌশল আয়ত্ত করেছে——সে প্রসঙ্গ অন্য)।

সেই সময়কার ভারতবর্ষের যে সব মানুষ ফ্যাসিবাদের লক্ষ্য এবং তার ভয়াবহতা উপলব্ধি করে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, তারা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই সুভাষচন্দ্রের বিরোধিতা করেছিলেন। যে ভাষায় তারা সে বিরোধিতা করেছিলেন তা নিয়ে আপত্তি থাকতে পারে কিন্তু সেই বিরোধিতার যৌক্তিকতাকে অস্বীকার করা যাবে না। যারা আজ সেইসব মানুষদের প্রতি কটূক্তি করেন, তারা হয় ইতিহাস -বিমূর্তভাবে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেন নতুবা তাদের এই প্রচার বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

সুভাষচন্দ্র ও ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন

এই প্রসঙ্গ উঠলেই ভারতের কমিউনিস্টরা বড় বিপন্ন বোধ করেন। কোন প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন না, অপরাধীর মত মাথা নীচু করে থাকেন। মাথা তুলবেন কি করে, তাদের তাবড় নেতারা বারবার বলেছেন সুভাষচন্দ্রের প্রশ্নে তাদের পূর্বসূরী কমিউনিস্ট নেতারা সব বড় বড় ভুল করেছেন। এই ভুল স্বীকার শুরু স্বাধীনতার কিছুদিন পর থেকেই। সালে লোকসভা নির্বাচনের এক জনসভায় সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে তখনকার অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক অজয় ঘোষ বললেন যে সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা মূল্যায়নে আমরা ভুল করেছিলাম। আর এক কমিউনিস্ট নেতা রাজ্যেশ্বর রাও সালের ২৭ ডিসেম্বর বোম্বাইয়ের 'ব্লিৎজ' পত্রিকার সাথে এক সাক্ষাৎকারে একইভাবে

ভুল স্বীকার করলেন। সি পি আই এম নেতারাই বা পিছিয়ে থাকবেন কেন। ১৯৭০ সালের ২৩ জানুয়ারী পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার উপ-মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু প্রকাশ্য সভাতে ভ্রান্তি স্বীকার করলেন। আবার ঠিক আট বছর পর মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তিনি সালের ২৩ জানুয়ারী সুভাষচন্দ্রের জন্মদিবসে একইভাবে তার পূর্বসূরীদের হয়ে ভুল স্বীকার করলেন। আর এক কমিউনিস্ট নেতা এস ইউ সি আই পার্টির প্রভাস ঘোষ আরও একধাপ এগিয়ে সেদিনকার কমিউনিস্ট নেতাদের সুবিধাবাদী ও বিশ্বাসঘাতক বলে উল্লেখ করলেন। বস্তুবাদী লেখকরাও সব ছেড়ে কথা বলেন নি। বিশিষ্ট বামপন্থী বুদ্ধিজীবী গৌতম চট্টোপাধ্যায় তার লেখায় তার পূর্বসূরী কমরেডদের 'মারাত্মক অন্যায়' এবং 'ঐতিহাসিক অসত্য ভাষণ'-এর দায়ে অভিযুক্ত করেছেন। প্রবীণ বামপন্থী পন্ডিত হীরেন্দ্রনাথ মুখার্জীও দুষতে ছাড়েন নি।আর এক বামপন্থী লেখক সুধী প্রধান লিখেছেন যে সেই সময়ে তিনি নাকি মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন কিন্তু শৃঙ্খলার খাতিরে প্রতিবাদ করেন নি। তো এই যখন বাঘা বাঘা কমিউনিস্ট নেতাদের অভিমত, বেচারা কর্মীরা তো লজ্জায় মুখ লুকোবেই। এখন অন্যায় যদি হয়েই থাকে, বিশ্বাসঘাতকতা যদি করেই থাকেন——তাহলে ভুল স্বীকার তো করাই উচিত। আসুন আমরা একটা যুক্তিনিষ্ঠ মূল্যায়নের চেষ্টা করি কতটা এবং কি ভুল সেদিনের কমিউনিস্টরা করেছিলেন।

সমালোচকদের মতে অনেক ছোটখাট ভুল বাদ দিলেও চারটি ভুল অতি গুরুতর। প্রথম ভুল : সুভাষচন্দ্রের দ্বিতীয়বার কংগ্রেস সভাপতি পদে নির্বাচনে সমর্থন করেও ত্রিপুরীতে পন্থ-প্রস্তাবে বিরোধিতা করতে দ্বিধা দেখানো। দ্বিতীয় ভুল : বামপন্থী সমন্বয় কমিটি ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া। তৃতীয় ভুল : ভারত-ছাড় আন্দোলনের বিরোধিতা করা। চতুর্থ ভুল : সুভাষ যখন জার্মানি ও জাপানের সাথে বন্ধুত্ব করে ভারত সীমান্তে অভিযান করেছেন তখন তার বিরোধিতা করা। আমরা এই চারটি প্রশ্ন নিয়ে অবশ্যই আলোচনা করব। তার আগে সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের সাথে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের যে সম্পর্ক ও সংঘাত, তা নিয়ে আমরা সংক্ষিপ্ত একটা আলোচনা করে নিই।

সুভাষচন্দ্র যে সময় রাজনীতিতে প্রবেশ করলেন ১৯২১ সালে, ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূচনাও সমসাময়িক। আন্দোলনের শুরুতেই কমিউনিস্ট পার্টি ঠিক গড়ে ওঠে নি, কিছু কিছু করে সাংগঠনিক ক্রিয়াকলাপ চলছিল মাত্র। এই সময় ১৯২২ সালে সোভিয়েত রাশিয়ায় অনুষ্ঠিতব্য কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের চতুর্থ কংগ্রেসে ভারত থেকে নিমন্ত্রিত হলেন শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে, সুভাষচন্দ্র বসু এবং চিত্তরঞ্জনের পুত্র চিররঞ্জন দাশ। অনেক সমালোচকের মতে এই আমন্ত্রণই প্রমাণ করে যে সেসময় কমিউনিস্টদের সাথে সুভাষচন্দ্র ও চিত্তরঞ্জনের সম্পর্ক অতি মধুর ছিল। আর একজন ইতিহাস লেখক গৌতম চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন——"ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের লৌহ যবনিকা ভেদ করে সোভিয়েত ইউনিয়নে গিয়ে কমিন্টার্নের মহাসম্মেলনে কেউই যোগ দিতে সক্ষম হন নি—— না ডাঙ্গে, না সুভাষচন্দ্র।" *(সুভাষচন্দ্র বসু ও ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন)*। কিন্তু সত্য ঘটনা হল সুভাষচন্দ্র সে আমন্ত্রণ গ্রহণই করেন নি। শুধু তাই নয়, ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যমত পথিকৃৎ মুজফফর আহমেদের লেখায় আমরা পাই এই আমন্ত্রণের রহস্যও।

এর পরে নলিনী গুপ্ত বার্লিনে ফিরে গিয়ে মানবেন্দ্রনাথ রায়কে আরও একবার "হাইকোর্ট দেখালেন"। তার ফলে আমরা দেখতে পেলাম যে রায়ের নিকট হতে লম্বা লম্বা চিঠি আসছে চিত্তরঞ্জন দাশের নামে, তাঁর পুত্র চিররঞ্জন দাশের নামে এবং সুভাষচন্দ্র

বসুর নামেও। সুভাষ বসুর নামীয় পত্রখানা প্রথমে আমার নিকটে এসেছিল। আমি তা ভূপেন্দ্রকুমার দত্তকে দেখাই। দত্ত যখন সংস্কৃত কলেজে পড়ছিলেন তখন তাঁকে প্রেসিডেন্সি কলেজে ফিলসফির অনার্স ক্লাসে যোগ দিতে হতো। এই ক্লাসে সুভাষ তার সহপাঠী ছিলেন। এই জন্যে উৎসাহভরে তিনি বললেন, "সুভাষের পত্রখানা আমিই তাকে পৌঁছিয়ে দেবো"। কিন্তু ফিরে এসে তিনি আমায় জানালেন যে "সুভাষ পত্রখানি নিল না"। আমি পড়লাম মুশকিলে। এই পত্র নিয়ে সুভাষ বসুর সঙ্গে আমায় দেখা করতে বলা হয়েছিল। সুভাষ যখন তাঁর সহপাঠী ভুপেন দত্তের নিকট হতে পত্রখানি গ্রহণ করেননি তখন এটা নিশ্চিত ছিল যে আমার নিকট হতেও তিনি তা গ্রহণ করবেন না। আমার সঙ্গে আগে তাঁর কোনো পরিচয়ও ছিল না। তবুও আমি একদিন সুভাষের নিকটে গেলাম। তিনি বললেন যাঁরা তাঁকে পত্র লিখতে চান তাঁরা যেন সোজাসুজি লেখেন। সিবিল সার্বিস পাস করে চাকরী গ্রহণ না করার অহঙ্কারে তাঁর তখন মাটিতে পা পড়ছিল না, তা ছাড়া হয় তো একথাও ভেবেছিলেন যে এর-ওর মারফতে চিঠি-পত্র গ্রহণ করে কেন তিনি মিছামিছি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে যাবেন। *(মুজফ্‌ফর আহ্‌মেদ আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি)*

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রতি তার অনুরাগের জন্য সুভাষকে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালে আমন্ত্রণ জানান হয় নি এবং তিনি আমন্ত্রণ নিতে উৎসাহিতও ছিলেন না। আর একজন নিমন্ত্রিত চিররঞ্জনের ঘটনা তো আরও রহস্যজনক। গোটা স্বাধীনতা আন্দোলনে তার অবদান বলতে তো শুধুমাত্র তার বাবা তাকে একবার আইন অমান্য করতে পাঠিয়েছিলেন, সেই সুবাদে কিছুদিনের জন্যে কারাবাস। কমিউনিস্ট মতাদর্শ ও আন্দোলনের ধারেকাছেও তিনি ছিলেন না। এমনকি তার নানা চারিত্রিক ত্রুটি ছিল এবং সাংসারিক দায়িত্বটুকু পর্যন্ত পালন করেন নি। সুভাষচন্দ্র যখন বর্মার জেলে তখন শরৎচন্দ্র বসু উদ্বিগ্ন হয়ে চিঠিতে লেখেন——

চিররঞ্জন ধরতে গেলে কিছুই করছে না। ও ওর মা এবং পরিবারের জন্য হাজরা লেনে মোটামুটি ভালই একটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছে। প্রথমে ভেবেছিলাম ও এবার বোধহয় উন্নত মানের জীবনযাত্রার পথ ধরবে, কিন্তু তা নয়, ও আবার ওর পুরনো পথে ফিরে গেছে; তিন-চারদিন যাবৎ ওর কোনও খবর পাওয়া যায় নি। *(২৪ অক্টোবর ১৯২৫, শরৎচন্দ্র বসুর লিখিত পত্র)*

এ হেন চিররঞ্জনকে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। যদি ধরা যাক বাবা চিত্তরঞ্জনের কর্মগুণে এই নিমন্ত্রণ——তবুও প্রশ্ন এসে যায় বাবার গুণে ছেলেকে নিমন্ত্রণ, নিমন্ত্রণ কর্তার এই বা কোন কমিউনিস্টসুলভ মানসিকতা?

সুভাষচন্দ্র যখন বর্মার জেল থেকে বাংলায় এলেন তখনও কমিউনিস্টদের সাথে তার সুসম্পর্ক ছিল না। শ্রেণী-সংগ্রামের প্রতি তার প্রবল বিতৃষ্ণা এবং তার বিরুদ্ধে পুণার বক্তৃতার তীব্র সমালোচনা আমরা আগেই দেখেছি। সেই সময়ে কমিউনিস্টদের সাথে তার সম্পর্ক কেমন ছিল তা আমরা পাই মুজফফর আহ্‌মেদের লেখায়। বিজয়কুমার বসু তখন সুভাষচন্দ্রকে হারিয়ে কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র। তাকে জব্দ করার জন্যে সুভাষচন্দ্র কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে করা মেথর ধর্মঘটকে সমর্থন করেছিলেন। সেই সমর্থনে অবাক হয়ে মুজফফর আহ্‌মেদ লিখেছেন——

মেয়রের নির্বাচনে সুভাষ বসু হেরে যাওয়ায় ও কংগ্রেস দল কর্পোরেশনে সংখ্যাল্প দল হয়ে পড়ায় কংগ্রেসীদের মতির কিছু পরিবর্তন দেখা দিল। কংগ্রেসের কাগজগুলি আমাদের গিরেফতারের বিরুদ্ধে লিখতে লাগলেন। এমন কি যে সুভাষ বসু বর্মার জেল

হতে মুক্ত পেয়ে আসা অবাধ স্থান-অস্থান বিবেচনা না করেই মার্কসবাদকে গ্যাল বর্ষণ করে যাচ্ছিলেন, যাঁর বক্তৃতা অসহ্য হয়ে ওঠায় একদিন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভায় আমি তাঁকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান পর্যন্ত করেছিলেম,—(সকলে একবার ভাবুন যে আমি বক্তৃতা তো দিতেই পারিনে, ভালো ক'রে গুছিয়ে কথাও বলতে পারিনে, সে কিনা করল সুভাষ বসুকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান।) কিন্তু ঘৃণাভরে বা অহঙ্কারভরে কিংবা ঘৃণা ও অহঙ্কার দু' কারণেই যিনি আমার আহ্বানে সাড়া দেননি, সেই সুভাষ বসু কিনা ময়দানে বের হয়ে আমাদের গিরেফতারের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিলেন। *(আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি)* সুভাষচন্দ্রের সাথে কমিউনিস্টদের সম্পর্ক এমনই তিক্ত ছিল। কিন্তু প্রয়োজনে কমিউনিস্টদের কাজে লাগাতে সুভাষ এতটুকু পেছ-পা হতেন না। অথচ কোন কোন আলোচক (তরুণ রায়—অনীক, পঁচিশ বছর, প্রবন্ধ সংকলন) বলেছেন—"এ সময়ে কমিউনিস্টদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সম্পর্ক ছিলো বেশ ঘনিষ্ঠ।"

কমিউনিস্টদের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ নিয়েই সুভাষচন্দ্র ১৯৩২ সালে জেলে গেলেন। সেখান থেকে একবছর পর গেলেন ইউরোপে চিকিৎসার জন্যে। এই ইউরোপে বসেই সুভাষচন্দ্র লিখলেন—"দ্য ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল"। এই বইতে তিনি লিখলেন ভারতে কোনদিনই কমিউনিজম গৃহীত হবে না। তিনি তার মোক্ষম মোক্ষম পাঁচটি কারণ দেখালেন। (১) কমিউনিজম জাতীয়তাবাদকে সমর্থন করে না অথচ ভারতীয় আন্দোলন জাতীয়তাবাদী, (২) রাশিয়ার এখন বিশ্ববিপ্লব গড়ে তোলবার ব্যাপারে আগ্রহ নেই, (৩) কমিউনিজম ধর্ম-বিরোধী ও নাস্তিকতা মূলক, (৪) ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা ভারতবাসী মেনে নেবে না এবং (৫) অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই মতবাদ জোরালো নয়। তো এই হল সুভাষচন্দ্রের চোখে ভারতবর্ষে কমিউনিজমের ভবিষ্যৎ।

এই সুভাষ যখন ১৯৩৫ সালে দেশে ফিরলেন, কমিউনিস্টেরা তাকেই সমর্থন করেছিলেন। এরই মধ্যে ১৯৩৫ সালে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেসে 'যুক্ত ফ্রন্ট'—এর তত্ত্ব গৃহীত হয়েছে। 'যুক্তফ্রন্ট' নীতি নেওয়া হয়েছিল বিশ্বব্যাপী ফ্যাসীবাদের বিপদের সামনে একটা সমবেত প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্যে। ভারতের কমিউনিস্টরা সেই অনুযায়ী কংগ্রেসের মধ্যে ঢুকে একসাথে কাজ করতে চাইলেন। অবশ্য আর একটা উদ্দেশ্যও ছিল। ১৯৩৪ সালের ২৩ জানুয়ারী কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কংগ্রেসের মধ্যে থেকে তাদের কাজ করার সুবিধাও হয়ে গেল। ভারতের কমিউনিস্টরা ভাবলেন, সুভাষচন্দ্র হচ্ছেন কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বামপন্থী ধারা, অন্ততঃ গান্ধীপন্থীদের চেয়ে প্রগতিশীল। সুতরাং তারা সুভাষচন্দ্রকেই সমর্থন করতে লাগলেন। সুভাষচন্দ্র এই সুযোগটাই চাইছিলেন। তিনি বামপন্থীদের নেতা হয়ে বসলেন।

আমরা আগেই দেখেছি যে সুভাষচন্দ্র বা জওহরলাল দু'জনের কেউই আদতে বামপন্থী নন। তাদের বামপন্থা কেবল বক্তৃতায় আর লেখাপত্রে। কার্যাবলীতে এরা রাজেন্দ্রপ্রসাদ বা প্যাটেলের চেয়ে এককদম পিছিয়ে নেই। আর গান্ধীও তাদের এই বৈশিষ্ট্যটুকু সার্থকভাবে ব্যবহার করে নিয়েছেন। ১৯৩৮-এ সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস সভাপতি হলেন স্বয়ং গান্ধীর মনোনীত প্রার্থী হয়ে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। তাকে সভাপতি করে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের একটুও অসুবিধা হয় নি। একের পর এক শ্রমিক-কৃষক বিরোধী কাজ তাকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছেন। (বিস্তারিত আলোচনা 'কংগ্রেসের সেরা সভাপতি—সুভাষচন্দ্র' অধ্যায়ে করেছি)। সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বে বোম্বাই শ্রমবিবাদ আইন (নভেম্বর ১৯৩৮) যা কিনা প্রচন্ড শ্রমিকবিরোধী তা পাশ হয়। ১৯৩৮ এর সেপ্টেম্বরে তারই সভাপতিত্বে এ আই সি সি 'শ্রেণীসংগ্রাম' মতবাদের নিন্দা প্রস্তাব পাশ করে। প্রদেশে প্রদেশে শ্রমিক কৃষক আন্দোলনের উপর কংগ্রেস সরকার দমন পীড়ন চালায়। সেযুগের কমিউনিস্টরা ভুল

করেছিলেন, অবশ্যই ভুল করেছিলেন সুভাষচন্দ্রকে বামপন্থী ধরে নিয়ে শ্রমজীবী মানুষের উপর এই আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ না গড়ে। একে 'যুক্তফ্রন্ট' নীতিতে বহাল থাকতে গিয়ে কংগ্রেসের সাথে গাঁটছড়া বেঁধে চলার ইচ্ছা, অন্যদিকে 'বামপন্থী' সভাপতি সুভাষের প্রতি আস্থা, এই দুয়ে মিলে প্রদেশে প্রদেশে কংগ্রেস সরকারগুলোর জন-বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে জঙ্গী আন্দোলন সেদিনের কমিউনিস্টরা করতে পারেন নি।

১৯৩৮ এই মহাচ্ছন্নতার মধ্যে কেটে গেল। নতুন বছরে সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয়বারের জন্যে সভাপতি হতে চাইলেন। তার এই দ্বিতীয়বার সভাপতি নির্বাচনকে প্রথম সমর্থন জানিয়েছিল কমিউনিস্টরাই 'ন্যাশন্যাল ফ্রন্ট' পত্রিকায় (১৬ অক্টোবর ১৯৩৮)। সুভাষচন্দ্র যে সীতারামাইয়াকে হারিয়ে দ্বিতীয়বারের জন্যে সভাপতি হতে পেরেছিলেন তার পিছনে কমিউনিস্টদের অবদান অনেকটাই। সেদিনও কমিউনিস্টরা ভেবেছিলেন যে কংগ্রেসের মধ্যে সংগ্রামী ধারারই জয় হল। 'ন্যাশনাল ফ্রন্ট'—পত্রিকায় পি সি যোশি একে Rank and File Victory : Majority for struggle বলে অভিহিত করলেন। তখনকার কমিউনিস্টরা বুঝতে পারেন নি যে এ লড়াই কোন নীতির লড়াই ছিল না। এ ছিল দুজন ব্যক্তির নেতৃত্ব দখলের লড়াই। এর পরে গান্ধী তার ঘুঁটি সাজালেন। কংগ্রেস বার্ষিক অধিবেশনে পন্থ-প্রস্তাব আনা হল। এ প্রস্তাব ছিল প্রকৃতপক্ষে গান্ধীর কাছে সুভাষকে নতি স্বীকার করানোর কৌশল। কংগ্রেস সমাজবাদী দল এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে না গিয়ে 'নিরপেক্ষ' থাকার সিদ্ধান্ত নিল। বেআইনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা তখন কংগ্রেস সমাজবাদী দলের ভিতরে থেকে কাজ করছিলেন। পলিটব্যুরো সমাজবাদী দলের পদাঙ্ক অনুসরণ করারই সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু আপত্তি এল কমিউনিস্ট পার্টির নীচুতলার নেতৃত্ব থেকে। অজয়কুমার ঘোষ, সোলি কাটলিওয়ালা, সোমনাথ লাহিড়ী, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, প্রমুখ নেতারা পলিটব্যুরোর সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানালেন। কমিউনিস্ট পার্টি তাদের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক ডাকতে বাধ্য হল। সেই বৈঠকে পলিটব্যুরোর সিদ্ধান্ত বাতিল করে পন্থ প্রস্তাবের বিরোধিতা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১৯৩৯ এর কংগ্রেস বার্ষিক অধিবেশনের সাবজেক্ট কমিটি এবং প্রকাশ্য অধিবেশনে—দু'জায়গাতেই কমিউনিস্টরা পন্থ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে।

আশ্চর্যের বিষয়, এস ইউ সি আই পার্টির নেতা প্রভাস ঘোষ লিখেছেন—"অপরদিকে এই সঙ্কটজনক মুহূর্তে মার্কসবাদী বলে পরিচিত অধুনা সি পি আই এম, সি পি আই (এম এল)-এ বিভক্ত তৎকালীন সময়ের অবিভক্ত সি পি আই নেতৃত্ব চরম সুবিধাবাদ ও বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়ে সুভাষ বসুর পক্ষে না দাঁড়িয়ে নিরপেক্ষ (!) থেকে গান্ধীবাদীদের জয়যুক্ত হতে সাহায্য করলেন।" *(প্রভাস ঘোষ—নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রসঙ্গে)* কিন্তু সি পি আই যে 'নিরপেক্ষ' ছিল সে তথ্যসূত্র প্রভাস ঘোষ কোথায় পেলেন? তিনি তথ্যসূত্র উল্লেখ করেছেন সুভাষচন্দ্রের উদ্ধৃতি দিয়ে—Our Defeat was further due to betrayal of the C S P leadership.........and the Communist Party was also sailing with the C S P। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে প্রভাস ঘোষ তথ্যসূত্রে একটা সম্পূর্ণ বাক্যের অংশ বিশেষ ব্যবহার করেছেন এবং তার ফলে গুরুতর তথ্য-বিকৃতি ঘটেছে। সম্পূর্ণ বাক্যটি এইরকম—

The Communist Party was also sailing with the C S P but at the last moment, the revolt of the rank and file brought about a reversal of the policy decided by the C P leaders (in secret conclave with the C S P leaders).

সুতরাং প্রভাস ঘোষের আনা 'চরম সুবিধাবাদ ও বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয়'—এর অভিযোগ ইতিহাসের বিচারে সঠিক নয়।

সুভাষচন্দ্র ফরোয়ার্ড ব্লক তৈরী করলেন ৩ মে ১৯৩৯ সালে। তিনি চাইলেন সমস্ত দল নিজেদের অবলুপ্তি ঘটিয়ে ফরোয়ার্ড ব্লকে যোগ দিক। কিন্তু বামপন্থী দলগুলো তাতে রাজী না হওয়ায় সুভাষচন্দ্র 'বামপন্থী সমন্বয় কমিটি' তৈরী করলেন। এতে সোসালিস্ট, কমিউনিস্ট, রায়পন্থী, সব বামপন্থীই যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু গোল বাধল কংগ্রেস কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সুভাষচন্দ্রকে শাস্তি দেবার পরে। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আলাদা দল হিসাবে ফরওয়ার্ড ব্লককে প্রতিস্থাপিত করতে চাইলেন। কিন্তু বামপন্থীরা কংগ্রেস ছাড়তে অস্বীকার করলেন। এটাই সমালোচকদের মতে বামপন্থীদের দ্বিতীয় ভুল।

সপ্তম কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালে গৃহীত 'যুক্ত ফ্রন্ট' নীতি ঠিক ছিল কিনা, ভারতের কমিউনিস্টরা সেই নীতি রূপায়ণে ভুল করেছিলেন কিনা সেটা এই স্বল্প পরিসরে আলোচনা করতে চাই না, আমাদের আলোচ্য বিষয়ও তা নয়। আমরা দেখতে চাই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে গৃহীত কর্মসূচীর বাইরে সুভাষচন্দ্রের অধিক সংগ্রামমুখী কোন কর্মসূচী আদৌ ছিল কিনা। ফরোয়ার্ড ব্লক বিপ্লবী নীতি অনুসারী কোন রাজনৈতিক দল ছিল কিনা। তা যদি হয়, তাহলে আমরা সিদ্ধান্তে আসব যে বামপন্থী সমন্বয় কমিটি থেকে বেরিয়ে এসে, সেদিনকার বামপন্থীরা ভুল করেছিল। সুভাষচন্দ্র কেন কি উদ্দেশ্যে ফরওয়ার্ড ব্লক স্থাপন করেছিলেন সে সম্পর্কে মোটামুটি বিস্তৃত বিবরণ 'ফরওয়ার্ড ব্লক' অধ্যায়ে দিয়েছি। সেখানে আমরা দেখেছি ফরোয়ার্ড ব্লক ছিল সুভাষচন্দ্রের কাছে কংগ্রেসের নেতৃত্বে পুনর্বাসনের জন্য একটা কৌশলী পদক্ষেপমাত্র। কারণ সুভাষের মতে—"দক্ষিণপন্থীরা বা গান্ধীপন্থীরা দৃঢ় সংগঠিত ব্লকের সম্মুখীন হইলে আপস চুক্তিতে আসিতে সম্মত হইবে।" তিনি বারবার অনুগামীদের কাছে বলেছেন—'বামপন্থীগণ যদি দৃঢ় ব্লক হিসাবে নিজেদের সংগঠিত করিতে পারেন তাহা হইলে কংগ্রেসের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই তাঁহাদের সহিত আপস-রফার চেষ্টা করিতে বাধ্য হইবেন।"

কমিউনিস্টদের উপর অভিযোগ, তারা কংগ্রেসের প্রতি মোহ ত্যাগ করতে না পেরে সুভাষকে সমর্থন করেন নি। এখন প্রশ্ন, সুভাষ নিজেও কি কংগ্রেসের প্রতি মোহ ত্যাগ করতে পেরেছিলেন? শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার পর সুভাষচন্দ্র বিবৃতি দিয়ে জানালেন—

আমাকে আজ শাস্তি দেওয়া হইলে তাহাতে কী আসে যায়? আমি পূর্বের তুলনায় আরও অধিকতর নিষ্ঠার সহিত কংগ্রেসকে আঁকড়াইয়া ধরিব ও জাতির সেবক হিসাবে কংগ্রেস ও দেশের সেবা করিয়া চলিব। আমার দেশবাসীগণ লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় আসিয়া কংগ্রেস ও ফরওয়ার্ড ব্লকের সদস্য হিসাবে যোগ দিন, আমি এই আবেদন জানাই।

শুধু তাই নয়, কংগ্রেসের লোকেরা যখন পাটনায় তার সভা বানচাল করেছে, জুতো ছুঁড়ে মেরেছে, তখনও কংগ্রেস থেকে 'কার্যত বহিষ্কৃত' সুভাষ বলেছেন—

আমি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী নই কিংবা আমি কংগ্রেসের শত্রু নই। আমার বিরুদ্ধে যে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থাই লওয়া হইয়া থাকুক না কেন আমি আরো বেশি নিষ্ঠার সহিত ইহার সেবা করিব। এমনকি যদি কংগ্রেস আমাকে বাহির করিয়া দেয় তাহা হইলেও আমি তাহাকে নিজের বলিয়া মনে করিতে থাকিব। সামান্যতম তিক্ততা ব্যতীত, সামান্যতম কুণ্ঠা ব্যতীত আমি কুকুরের মতো ধৈর্য ও বিশ্বস্ততার সহিত কংগ্রেসকে অনুসরণ করিব। *(২৭ আগস্ট ১৯৩৯ পাটনার বাঁকিপুরে জনসভায় ভাষণ)*

এর পরও বলা যাবে সুভাষ কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে একটা আলাদা বিপ্লবী দল করতে চেয়েছিলেন? সুভাষচন্দ্রের নিজের যেখানে এই মনোভাব, তাকে ভরসা করে কংগ্রেস ছাড়াটা সেদিনের কমিউনিস্টরা ঠিক বলে মনে করেন নি।

ভারতের কমিউনিস্টদের এই কংগ্রেস নির্ভরতা নিয়ে অবশ্যই প্রশ্ন করা যেতে পারে। এই নীতি ঠিক ছিল কি ভুল ছিল সে আলোচনা চলতেই পারে। কিন্তু যারা বলেন যে সেদিনের কমিউনিস্টরা বামপন্থী সমন্বয় কমিটি ছেড়ে ভুল করেছিলেন তাদের ভাবনা এই ধারণাতেই মোহগ্রস্ত হয়ে থাকে যে সুভাষচন্দ্র ছিলেন কংগ্রেসের সংগ্রামমুখী বামপন্থী ধারা। বস্তুতপক্ষে কি বর্তমানে, কি তখনকার দিনে ভারতবর্ষের বামপন্থীরা এই মনোভাবেই হয়ে আছেন। আর এই মনোভাব থেকেই সেদিনকার কমিউনিস্টরা যেমন পরিস্থিতি বিচারে নির্ভুল হতে পারেন নি, আজও তাদের মূল্যায়ন সেই মোহেই আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। সুভাষচন্দ্র আজও ভারতের কমিউনিস্টদের কাছে 'বামপন্থী', কারও কাছে এমনকি 'বিপ্লবী'।

কমিউনিস্টদের প্রতি সমালোচকদের আর একটা বড় অভিযোগ যে তারা 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন। গত ১৯৯২ সালে ভারত-ছাড় আন্দোলনের সুবর্ণ জয়ন্তী আড়ম্বরের সাথে হয়ে গেল। এই উপলক্ষ্যে সারা ভারতজুড়ে চলল তীব্র কমিউনিজম বিরোধী প্রচার। সেই প্রচারের বিরুদ্ধে যোগ্য জবাব দিতে কোন বামপন্থী লেখক এগিয়ে এলেন না। একতরফা প্রচারে সাধারণ মানুষের কাছে প্রমাণিত করার চেষ্টা ফলপ্রসূ হয়ে গেল যে সেদিনকার কমিউনিস্টেরা সব দেশদ্রোহী ছিলেন, ইংরেজদের দালাল ছিলেন। কোন কমিউনিস্ট নেতা, কোন কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবী এগিয়ে এসে ভারত-ছাড় আন্দোলনের স্বরূপ তুলে ধরলেন না, ফ্যাসিবাদের সংকট কিভাবে বিশ্বকে গ্রাস করছিল তার আলেখ্য সামনে রাখতে পারলেন না, আন্তর্জাতিক যুদ্ধ পরিস্থিতিতে গান্ধীর বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস বিশ্লেষণ করলেন না। করবেন কেন, উত্তরসূরীদের ত্যাগের ফসল তারা এখন ঘরে তুলতে ব্যস্ত। তাই তাদের মুখে এই কথা বারবার শোনা যায়—— কমিউনিস্টেরা সেদিন ভুল করেছিল। (ভারত ছাড় আন্দোলনের কথা 'যুদ্ধের দিনগুলি ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' এবং 'গান্ধীর চমকপ্রদ শিবির বদল' অধ্যায় দুটিতে আলোচনা করেছি)। ভারত ছাড় আন্দোলনের সময় কৌশলগত কি কি উপায় অবলম্বন করা যেত, কিভাবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লড়াইকে একই সাথে ফ্যাসিবাদ বিরোধী লড়াইয়ে পরিণত করা যেত সে বিষয়ে আগের অভিজ্ঞতা, ভুলত্রুটি থেকে বর্তমানের কমিউনিস্টরা শিক্ষা নিতেই পারেন, কিন্তু পূর্বসূরীদের আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বর্তমানের কমিউনিস্টেরা ভোটের ঝুলি সামলাচ্ছেন।

আজ এই সুভাষ জন্মশতবর্ষে কমিউনিস্টদের প্রতি বিষোদ্গার করা হচ্ছে, কেন তারা সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজের ভারত অভিযানের বিরোধিতা করেছিলেন। আমরা সেসময়কার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি কোন পরিপ্রেক্ষিতে কমিউনিস্টেরা এই বিরোধিতা করেছিলেন। সেদিন কমিউনিস্টেরা সুভাষচন্দ্রের প্রতি যে ভাষা প্রয়োগ করেছিলেন তা অবশ্যই সঠিক ছিল না, কিন্তু মনে রাখতে হবে যে সেই সময়ে কমিউনিস্টদের উদ্দেশ্যেও ওর চেয়ে খারাপ ভাষা প্রয়োগ করা হত। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দালাল, দেশদ্রোহী অপবাদ শুনতে হত প্রতি মুহূর্তে। বহু জায়গায় কমিউনিস্ট কর্মীদের ধরে পেটানোও হয়েছিল, ভাঙ্গা হয়েছিল অনেকগুলি পার্টি অফিস। তার মধ্যেই সেদিনকার কমিউনিস্ট কর্মীরা অকুতোভয়ে কাজ করে গেছেন। জনবিচ্ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কায় আদর্শচ্যুত হন নি। আজকে তাদের উত্তরসূরীদের মুখে প্রায়শই শোনা যায় জনবিচ্ছিন্ন হওয়ার ভয়ের কথা। তারাই প্রতিনিয়ত বিচ্ছিন্নতার আতঙ্কে ভোগে যারা নিজেরা জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। নীতি আদর্শের প্রতি অটল নিষ্ঠা থাকলে ও ভয় থাকে না।

আশ্চর্য মনে হলেও একথা সত্যি সেই সময় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়ে যায়। ১৯৪২ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র ৪ হাজার, ১৯৪৩ এর মে মাসে তা বেড়ে হয়েছিল ১৫ হাজার এবং ১৯৪৬ সালের

মাঝামাঝি নাগাদ সদস্য সংখ্যা ৫৩ হাজার ছাড়িয়ে যায়। কি দিয়েছিল সেদিনকার কমিউনিস্ট পার্টি এই মানুষদের। সেদিন তো কমিউনিস্ট পার্টি করলে চাকরি মিলত না, টেন্ডার মিলত না, গাড়ি-বাড়ির মালিকও হওয়া যেত না। পরিবর্তে মিলত 'দেশদ্রোহী', 'রাশিয়ার চর', 'সাম্রাজ্যবাদের দালাল', প্রমুখ শিরোপা আর দেশপ্রেমের ধ্বজাধারী কিছু লুম্পেনদের দ্বারা শারীরিক নির্যাতন। তবুও সেদিন আদর্শের প্রতি সমর্পিত প্রাণ কমিউনিস্ট কর্মীর অভাব হয় নি। একটা অংশের মানুষ সাময়িক ভুল বুঝলেও সত্য চাপা থাকে নি। ভয়াবহ মন্বন্তরের মধ্যে মানুষ দেখল তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে কমিউনিস্ট কর্মীরা। ৪৬-এর দাঙ্গায় কমিউনিস্টরা পালন করলেন এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। আর এইসব আদর্শনিষ্ঠ কমিউনিস্ট কর্মীদের আত্মত্যাগের সৌরভকে কাজে লাগিয়ে শাসন ক্ষমতায় বসে আজকের তাবড় কমিউনিস্ট নেতারা তারস্বরে চিৎকার করছেন——সেদিনকার কমিউনিস্টরা ভুল করেছিল। পূর্বসূরীদের প্রতি যোগ্য মর্যাদা দানই বটে!

দক্ষিণপন্থীদের তরফ থেকে অতীতে বারবার কমিউনিস্টদের প্রতি বিষোদ্গার করা হয়েছে, ভবিষ্যতেও হবে। আর সেই বিষোদ্গারের সামনে দাঁড়িয়ে আজকের কমিউনিস্ট নেতারা নতজানু হয়ে ভুল স্বীকার করে ক্ষমা ভিক্ষা করে যাবে। কুৎসা, বিষোদ্গার তাতে থামবে না। মনে রাখতে হবে এই আক্রমণ কোনো জ্যোতি বসু, রাজ্যেশ্বর রাও বা কোনো অজয় ঘোষের বিরুদ্ধে নয়——এ আক্রমণ গোটা কমিউনিস্ট মতাদর্শের প্রতি। তাই আজকের দিনে আদর্শবান কমিউনিস্টরা যদি এই আক্রমণের বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে পারে, তুলে ধরতে পারে সঠিক ইতিহাস——তবেই তারা আগামী দিনের চালক হতে পারবেন। নতুবা মুখ লুকিয়েই চলতে হবে।

আজকের ভারতে শাসক শ্রেণীর কাছে সুভাষচন্দ্রের প্রাসঙ্গিকতা

সুভাষচন্দ্র বাঙালীর এক আবেগ-স্থল। এই আবেগ তো আর এমনি এমনি হয় নি। দীর্ঘদিন ধরে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, সযত্নে লালিত করা হয়েছে, বর্ধিত করা হয়েছে। আবার এই আবেগই রাজনৈতিক দলগুলোর মস্তবড় পুঁজি। এই বাংলাতেই এমন রাজনৈতিক দল আছে সুভাষচন্দ্রের নামের এই আবেগটুকু সম্বল করে যাদের বাড়-বাড়ন্ত। কিন্তু এই দোষে একমাত্র এই দলটিই দুষ্ট তা নয়। সবদলই কমবেশি ভোট বাক্স স্ফীত করতে সুভাষচন্দ্রের নাম ভাঙায়। অথচ ভাব দেখায় যত দোষ ঐ বিশেষ দলটির। এ রাজ্যের বৃহত্তম দল সি পি এম যখন কেন্দ্রের বঞ্চনার কথা সবিস্তারে বলে, তারা সুভাষচন্দ্রের প্রতি নেহেরুদের আচরণ ইত্যাদির কথা বেশ রঙ চড়িয়েই বর্ণনা করে। এর মধ্যে দিয়েই আম বাঙালীর মনস্তত্ত্বের যে কংগ্রেস কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বিরোধী দিকটি আছে, তাকে সুকৌশলে কাজে লাগান হয়। সুভাষের প্রতি বাঙালীর আবেগের কথা মনে রেখেই কংগ্রেসের নেতা বা নেত্রী দিল্লীর সংসদে বারবার সুভাষচন্দ্রের কথা তুলে বাঙালী প্রীতির পরিচয় দেন। হিন্দু মৌলবাদী দলনেতারাও সুভাষভক্তির পরিচয় দিতে আকুল হয়ে ওঠেন, যদিও তখনকার রাজনীতিতে হিন্দু-মহাসভার সাথে সুভাষচন্দ্রের সম্পর্ক ছিল অতি তিক্ত।

স্বাধীন ভারতে বাংলার মানুষের অন্যতম অভিযোগ, দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকার সুভাষচন্দ্রকে যথেষ্ট মর্যাদা দেয় না। বস্তুতপক্ষে স্বাধীনতার পর দীর্ঘদিন কেন্দ্রীয় সরকার চালিয়েছেন জওহরলাল নেহেরু, তারপরে তার মেয়ে এবং সবশেষে তার নাতি। আবার বাঙালীর নিশ্চিত ধারনা জওহরলাল এবং তার বংশধরেরা সকলেই তীব্র সুভাষ-বিদ্বেষী। এই ধারণা আংশিক সত্যও বটে। সব মিলিয়ে সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি একটা বিরূপ মনোভাব বাঙালীর বরাবর রয়েছে। এমনকি কংগ্রেসের সমর্থকদের মধ্যেও একটা অভিমান কাজ করে। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হল নরসিমহা রাও প্রধানমন্ত্রী

হওয়ার পর। তিনি বলেছেন যে তিনি অত্যন্ত সুভাষভক্ত। এত ভক্ত যে ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরী কংগ্রেসে গান্ধীপন্থী নেতাদের নির্দেশ অমান্য করে তিনি নাকি সুভাষচন্দ্রের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন *(আনন্দবাজার পত্রিকা ১ নভেম্বর ১৯৯৫)*। তিনি সুভাষচন্দ্রকে যোগ্য মর্যাদা দিতে চান এবং জাতীয় ইতিহাসে তার অবদানকে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে স্বীকৃতি দিতে চান। তার তোড়জোড়ও দেখা গেছে। মহা আড়ম্বরে সুভাষচন্দ্রের জন্মশতবর্ষ পালন করার উদ্যোগ হচ্ছে। জন্মশতবর্ষ উদযাপন কমিটিও তৈরী হয়েছে, সভাপতি প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং।

একথা নিশ্চিত বলা যায় যে আম বাঙালীর বহুদিনকার ক্ষোভ এতদিনে দূর হওয়ার সময় এসেছে। ভারতবর্ষের দিকে দিকে চলবে সুভাষ-পূজো। কেন্দ্রীয় সরকার আর রাজ্যসরকারগুলো জাঁকজমকের প্রশ্নে একে অপরকে টেক্কা দেবে। কোটি কোটি টাকা বাতাসে উড়বে। সভা-সমাবেশ, জাঠা-মিছিল, সুভাষ মেলা-সুভাষ উৎসব, যাত্রা-টিভি সিরিয়াল, বোম্বাইয়ের গাইয়েদের সুভাষ-বন্দনার ক্যাসেট, সুভাষ-কাপ ফুটবল বা ক্রিকেট, সুভাষ পুরস্কার, ২৩ জানুয়ারী জাতীয় ছুটির দিন ঘোষণা, কোনটাই বাদ যাবে না। একজন বাঙালীকে ঘিরে এত আয়োজন, এত আড়ম্বর দেখে বাঙালী পুলকিত হবে আর নিজেই নিজের পিঠ চাপড়াবে।

কিন্তু এতদিন পরে স্বাধীন ভারতের শাসকদের এ সুভাষ-প্রীতি উথলে উঠল কেন? কি কারণে তারা গান্ধী-জওহর ভজনা ছেড়ে প্রভু-বদল করতে চাইছে। এর কারণ নিহিত আছে আজকের ভারতের অর্থনৈতিক ব্যস্হার মধ্যে। ভারতে এখন চলছে 'উদার অর্থনীতির যুগ। বর্তমান শাসনকর্তারা বলছেন এতদিন যে অর্থনীতি চালু ছিল সেটাই হচ্ছে ভারতবাসীর যত দুঃখ-দুর্দশার মূল। তা থেকে এই নতুন অর্থনীতি 'নতুন আশা নতুন দিশায়' নিয়ে যাবে। তো এতদিন কোন অর্থনীতি চালু ছিল? সেটা ছিল নেহেরুর মিশ্র অর্থনীতি। সুতরাং বর্তমান শাসক দল ভারতের দুর্দশার জন্যে কার্যত নেহেরুকেই দায়ী করছেন। তার উপর নেহেরুর বিরাট নাম ছিল আন্তর্জাতিক নির্জোট আন্দোলনের এক নেতা হিসাবে। সে অর্থে এখন আর কোন জোটই নেই, তো নির্জোট! সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙে যাবার পর তৃতীয় বিশ্বের উপস্হিতিটাই হারিয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তৃতীয় বিশ্বের দেশ হিসেবে ভরত যেটুকু ভূমিকা পালন করত তার থেকে হাত ধুয়ে নিতে চাইছে। সুতরাং নেহেরুর বৈদেশিক নীতির ফাঁস বর্তমান শাসকেরা গলা থেকে নামাতে পারলে বাঁচে। ভারতের বড় বড় শিল্পপতিরা এখন বহুজাতিক সংস্হাগুলোর সাথে গাঁটছড়া বেঁধে বহির্বিশ্বে বাণিজ্য করতে চায়। আফ্রিকা এশিয়ার গরীব দেশগুলো তাদের কাঙ্খিত মৃগয়া-ক্ষেত্র। ভারতকে এক অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদী দেশে পরিণত করতে শাসক শ্রেণী এখন মরিয়া। নেহেরু আমলের সেই 'বস্তাপচা পঞ্চশীল' এখন চলবে না। এখন চাই এক নতুন আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী। এখানেই সুভাষচন্দ্রের চিন্তাধারার সঙ্গে বর্তমান শাসক শ্রেণীর আশা-আকাঙ্খা খাপ খেয়ে যায়। সুভাষচন্দ্র বারবার বলেছেন যে ভারতের বৈদেশিক নীতি একমাত্র তার নিজের স্বার্থ বিবেচনা করে নির্ধারিত হওয়া উচিত। আদর্শের গালভরা কথায় চলবে না। আজকের ভারতীয় শাসক শ্রেণী এই বক্তব্যকেই আঁকড়ে ধরতে চায়। সেক্ষেত্রে ভারতের স্বার্থ মানে অবশ্যই ভারতীয় ধনিক শ্রেণীর স্বার্থ। আজকের সাম্রাজ্যবাদীরা দুনিয়ার যে অর্থনৈতিক শোষণ চালাচ্ছে ভারত তার অংশীদার হতে চায়। সেটাই নাকি ভারতের স্বার্থ। আর এই অনুন্নত গরীব দেশগুলোকে নিংড়ে নিতে ও সব আদর্শ-টাদর্শ চলবে না। পাঠক লক্ষ্য করবেন যে এ ধরনের চিন্তার সপক্ষে জনমত তৈরীর চেষ্টা ইতিমধ্যেই চলছে। সুভাষচন্দ্র হিটলারের পরিকল্পনাপ্রসূত 'নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থা'র সমর্থক ছিলেন। তার হয়ে প্রচার করেছেন। আর আজকের ভারতবর্ষের শাসকশ্রেণী মার্কিন

সাম্রাজ্যবাদীদের সৃষ্ট 'নতুন বিশ্বব্যবস্থা'-র অন্যতম সমর্থক এবং বাহক। সুতরাং তারা যে আজ সুভাষচন্দ্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠবে, এতে আর আশ্চর্য কি!

একদিকে অনুন্নত বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠন চালাবার স্বপ্ন দেখলেও ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে অবস্থা কিন্তু ভয়াবহ। অপুষ্টি আর রোগাক্রান্ত লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী ফুটপাতে আর ঝুপড়িতে মৃত্যু-পথযাত্রী। রাজ্যে রাজ্যে কোটি কোটি মানুষ বেকার। বন্ধ কল-কারখানার লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কাজ খুইয়ে নতুন করে বেকার হয়ে পড়ছে। প্রচণ্ড মুদ্রাস্ফীতি আর মূল্যবৃদ্ধিতে গরীব মানুষ তো দূরের কথা নিম্ন মধ্যবিত্তেরও জীবন যাপন কঠোর হয়ে পড়েছে। এর উপর শাসকশ্রেণী আনছে একটার পর একটা আঘাত। শিক্ষার বেসরকারীকরণের মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষকে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা হচ্ছে. বিনামূল্যে চিকিৎসার যেটুকু ব্যবস্থা ছিল শাসকেরা তার মূলোচ্ছেদ করতে ব্যগ্র. কর্মে বিনিয়োগ নয় কর্ম-সংকোচন-ই এখন সরকারী নীতি। শাসক শ্রেণীর সর্বদাই ভয় সংঘবদ্ধ জনতা যদি এই জনবিরোধী কাজগুলোর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। যদি দেশের যুব-সমাজ তার জীবন-যন্ত্রণা অবসানের প্রকৃত পথ খুঁজে পায়। তাই যুবকদের সামনে ছড়িয়ে রাখা হচ্ছে নানা বিনোদনের পসরা। চলচ্চিত্র-দূরদর্শনে যৌনতা প্রদর্শন তো একটা স্থূল ব্যাপার——আপাত সৎ. আপাত মহৎ নানা ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যেও যুবসমাজকে আটকে রাখার নানান পরিকল্পনা নিয়েছে শাসকশ্রেণী। কখনও তা জাতীয় সংস্কৃতির নাম করে রংবেরং-এর অনুষ্ঠান. কখনও যুব মহোৎসব. কখনও বিজ্ঞান জাঠা, কখনও নেলসন ম্যান্ডেলার সম্বর্ধনা। সে তালিকায় এখন নতুন সংযোজন 'নেতাজী জন্মশতবর্ষ উৎসব'। যেমন করে দুর্গাপুজো দিয়ে যুবসমাজকে মাতানো হয়. যেমন করে ভোট-রঙ্গে যুবসমাজকে মাতানো হয়, যেমন করে বিশ্বকাপ ক্রিকেট দিয়ে যুবসমাজকে মাতানো হয়——ঠিক তেমনভাবেই যুবসমাজকে মাতানো হবে নেতাজী-উৎসব নিয়ে। আর এরই ফাঁকে কার্যকর হয়ে যায় গ্যাট চুক্তি, শিক্ষায় বেসরকারীকরণ, শ্রমিক-ছাঁটাই, হাসপাতালে চিকিৎসা-ব্যবস্থার অবলুপ্তি। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারে আছে যুব-কল্যাণ দপ্তর। এগুলোর দায়িত্বে থাকে করিৎকর্মা সব মন্ত্রী। এরা কোটি কোটি টাকা উড়িয়ে জলসা বসায়, যুব মহামিছিল করে, উৎসবে আনন্দে মাতিয়ে রাখে। সুতরাং এখন কংগ্রেস. বামফ্রন্ট. বি জে পি, সকলেই যে সুভাষ-ভক্তিতে মাতোয়ারা হয়ে যাচ্ছে এতে কোন আশ্চর্যের কিছু নেই।

তাহলে যে বৃটিশ-বিরোধী সংগ্রাম ভারতবর্ষের মাটিতে হয়েছিল, তার থেকে কি আজকের যুবসমাজের কিছুই শেখার নেই ? স্বাধীনতা সংগ্রামের কোন ধারাটিকে আগামী দিনের বিপ্লবীরা আপন ঐতিহ্য বলে বুকে করে রাখবে? কার কাছ থেকে মিলবে লড়াই য়ের অনুপ্রেরণা? না গান্ধীর অহিংস আন্দোলন. না সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজ——কেউই আজকের ভারতবাসীর কাছে বিপ্লবী ঐতিহ্য হতে পারে না। সেই বিপ্লবী ঐতিহ্য নিহিত আছে বৃটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষের শ্রমজীবী মানুষের জঙ্গী আন্দোলনের মধ্যে। কত শ্রমিক কাজ খুইয়ে আনাহারে মারা গিয়েছে, কত সংগ্রামী শ্রমিক কারখানার মালিকের গুন্ডা আর বৃটিশ পুলিশের হাতে খুন হয়েছে, কতজনের কারবাস হয়েছে——সে হিসাব কেউ রাখে না। কত প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে কৃষকের রক্তে জমি ভিজে গিয়েছে, কত সংগ্রামরত জনজাতি গোষ্ঠী অত্যাচারে নিপীড়নে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে, কত কৃষক পরিবারকে গ্রামকে গ্রাম ধরে উৎখাত করা হয়েছে——সে ঘটনা ইতিহাসে লেখা হয় না। কিন্তু ইতিহাস থেমে থাকবে না। সে ইতিহাস অবশ্যই লেখা হবে. আজকের যুক্তিনিষ্ঠ ইতিহাস লেখকরাই লিখবেন। সেই ইতিহাসের আলোয় অনেক ভাবমূর্তি খানখান হয়ে ভেঙে পড়বে। উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবেন অনেক নিরক্ষর লড়াকু মেঠো মানুষ——তাঁদের নাম এখনও কেউ শোনে নি। এই ইতিহাসই আমাদের ঐতিহ্য——ভারতবাসীর ঐতিহ্য।

সহায়ক পত্র-পত্রিকা ও পুস্তকাদি

১) 'অনীক' পত্রিকা
২) অমিতাভ চন্দ্র—অবিভক্ত বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলন
৩) 'আজকাল' পত্রিকা
৪) 'আত্মশক্তি' পত্রিকা
৫) আনন্দবাজার পত্রিকা
৬) উত্তমচাঁদ—সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান কাহিনী
৭) কে পি কেশব মেনন—ফেলে আসা দিনগুলি
৮) 'গণবাণী' পত্রিকা
৯) গৌতম চট্টোপাধ্যায়—সুভাষচন্দ্র ও ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন
১০) জওহরলাল নেহরু—আত্মচরিত
১১) 'জয়শ্রী' পত্রিকা
১২) 'দেশ' পত্রিকা
১৩) নরহরি কবিরাজ—স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা
১৪) নগেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী—নেতাজী : সঙ্গ ও প্রসঙ্গ
১৫) নলিনীকিশোর গুহ—বাংলায় বিপ্লববাদ
১৬) নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিপ্লবের সন্ধানে
১৭) নেপাল মজুমদার—রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র
১৮) পবিত্রমোহন রায়—নেতাজী'র সিক্রেট সার্ভিস
১৯) 'প্রণব' পত্রিকা
২০) প্রফুল্লচন্দ্র রায়—আত্মজীবনী
২১) প্রবীর ঘোষ—সংস্কৃতি : সংঘর্ষ ও নির্মাণ
২২) প্রমোদ সেনগুপ্ত—ভারতীয় মহাবিদ্রোহ
২৩) 'বাংলার কথা' পত্রিকা
২৪) 'বিজলী' পত্রিকা
২৫) বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস
২৬) বিমলানন্দ শাসমল—স্বাধীনতার ফাঁকি
২৭) বীরেন্দ্রনাথ শাসমল—স্রোতের তৃণ
২৮) ভগৎরাম তলওয়ার—আমি নেতাজীর অন্তর্ধানে সঙ্গী ছিলাম
২৯) ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত—ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ
৩০) ম বকিম—বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস
৩১) মুজফফর আহমেদ—সমকালের কথা
৩২) মুজফফর আহমেদ—আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি
৩৩) যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়—বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি
৩৪) যোগেশচন্দ্র বাগল—মুক্তির সন্ধানে ভারত
৩৫) রজনীকান্ত গুপ্ত—সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস
৩৬) রাহুল সাংকৃত্যায়ন—দর্শন দিগদর্শন
৩৭) শিবনাথ শাস্ত্রী—আত্মচরিত
৩৮) শিশিরকুমার বসু—বসু বাড়ী
৩৯) শিশিরকুমার বসু—মহানিষ্ক্রমণ
৪০) সত্যেন্দ্রনাথ বসু—জাপানী বন্দী শিবিরে
৪১) সত্যেন্দ্রনাথ বস—আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে
৪২) সরোজ দত্ত—সরোজ দত্ত রচনাবলী
৪৩) সরোজ মুখোপাধ্যায়—ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা
৪৪) সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়—সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র
৪৫) সুধী প্রধান—সুভাষচন্দ্র, ভারত ও অক্ষশক্তি
৪৬) সুভাষচন্দ্র বসু—সমগ্র রচনাবলী (আনন্দ পাবলিশার্স)
৪৭) সুভাষচন্দ্র বসু—সুভাষ রচনাবলী (জয়শ্রী প্রকাশন)
৪৮) সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—জীবন প্রবাহ
৪৯) সোমনাথ লাহিড়ী—সোমনাথ লাহিড়ী রচনাবলী

৫০। হেমন্তকুমার সরকার—সুভাষের সঙ্গে বারো বৎসর
51) Abid Hassan Safrani—A Soldier Remembers
52) Abid Hassan Safrani—The Men from Imphal
53) Adam, Brooke—The Law of Civilisation and Decay
54) Amrita Bazar Patrika
55) AYER, S. A.—Unto Him A Witness
56) Azad, Abul Kalam—India Wins Freedom
57) Bagchi, A K —Private Investment in India
58) Banerjee, S. N —A Nation in Making
59) Banerjee, W. C —Introduction of Indian Politics
60) Beauchamp, J —British Imperialism in India
61) Birla, G D —In the Shadow of Mahatma
62) Blitz
63) Bolts—Considerations on Indian Affairs
64) Bose, A N —My Uncle Netaji
65) Bose, Subhash Chandra—The Indian Struggle
66) Bose, Subhash Chandra—An Indian Pilgrim
67) Bose, Subhash Chandra—Cross Roads
68) Bose, Subhash Chandra—Selected Speeches
69) Bose, S K ed —A Beacon Across India
70) Broomfield, J H —Elite Conflict in a Prual Society—20th Century Bengal
71) Calcutta Review
72) Cecil, K —Communism in India
73) Chatterjee, A C.—India's Struggle for freedom
74) Chiano, G —Diaries
75)Das Gupta, H N.—Subhash Chandra
76) Dutt, R C.—Economic History of India
77) Dutta, R P —India today
78) forward Block
79) Fujiwara, I —Fujiwara Kikan
80) Gandhi, M K —Story of My Experiment with Truth
81) Gandhi, M. K —Works
82) Ganpuley, N. G —Netaji in Germany
83) Giani, K S —Indian Indepedence Movement in East Asia
84) Gordon, L. A.—Brothers Against the Raj
85) Harijan
86) Hayashida, T —Netaji Subhash Ch Bose
87) Indian National Congress, Annual reports
88) Jog, N G —In Freedom's quest
89) Keith, A B —Speeches and Documents of Indian Policy
90) Khaliquzzaman, C —Pathway to Pakistan
91) Khan, Sahnawaj—My Memoirs of INA and its Netaji
92) Kurti, K.—Subhash Ch Bose as I know
93) Lebra, J C —Jungle Alliance
94) Lewin, Roland—The American Magic
95) Liberty
96) Majumder, B. B.—History of Political Thought in India
97) Majumder, R C —History of the Freedom Movement in India
98) Mallik, A R.—Partition of Bengal
99) Mansergh, N. ed.—Transfer of power
100) Markovits, C —Indian Business and National Politics
101) Mitra, N. N.—The Indian Annual Register
102) Modern Review
103) Mukherjee, G.—Subhash Chandra Bose
104) Mukherjee, N —Netaji Through German Lens

105) Namboodiripad, E. M. S.—A History of Indian Freedom Struggle
106) National Front
107) Nehru, J. L.—A Bunch of old Letters
108) Nehru, J. L.—Works
109) Nair, A. M.—An Indian Freedom Fighter in Japan
110) Ohsawa, J. G.—The Two Great Indians in Japan
111) Roy, Dilip Kumar—The Subhash I knew
112) Roy, Dilip Kumar—Netaji, the Man
113) Roy, M. N.—M. N. Roy's Memoirs
114) Roy, M. N.—India in Transition
115) Roy, Prithwish Chandra—The Life and Times of C. R. Das
116) Russel, Bertrand—History of Western Philosophy
117) Sardar's Letters, Mostly Unknown
118) Sarkar, Sumit—Modern India
119) Schnabel, R. ed.—Tiger and Schakal
120) Sengupta, J. M.—The Congress and the National Movement
121) Servant
122) Shah, Hurin—Gallant End of Netaji Subhash Ch. Bose
123) Shirer, W. L.—The Rise and Fall of the Third Reich
124) Sivram, M.—The Road to Delhi
125) Siddiqui, Majid—Agrarian Unrest in North India
126) Singh, Mohon—Leaves from my Diary
127) Singh Mohon—Soldier's Contribution to Indian Independence
129) Singh, N. Iqbal—The Andaman Story
130) Sitaramayya, P.—The History of Indian National Congress
131) Statesman
132) Sykes, C.—Troubled Loyality
133) Tarachand—History of Freedom Movement in India
134) Thakurdas Papers
135) Thivy, J. A.—The Struggle in East Asia
136) Times of India
137) Toye, Hugh—The Springing Tiger
138) Vyas, M. R.—Turbulent Era
139) Wavell, A.—The Viceroys Journal
140) Werth, A.—Netaji in Germany
141) Young India

পুস্তক খানিতে উদ্ধৃত সুভাষচন্দ্রের চিঠি ও বক্তৃতার কয়েকটি নেতাজী সমগ্র রচনাবলী (আনন্দ পাবলিশার্স) এবং সুভাষ রচনাবলী ([illegible] প্রকাশনী) থেকে নেওয়া হয়েছে।